

الرسالة القشيرية

في علم التصوف

ইমাম আবুল কাসিম আবদুল করিম বিন হাওয়াজিন কুশাইরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

রিসালাতুল কুশাইরী

২য় খণ্ড

মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান



খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

ইমাম আবুল কাসিম আবদুল করিম বিন হওয়াজিন কুশাইরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [মৃ: ৩৭৬-৩৬৫ হিজরি]

রিসালাতুল কুশাইরী
(২য় খণ্ড)
মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান



খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

الرسالة القشيرية في علم التصوف

-عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري

রিসালাতুল কুশাইরী (২য় খণ্ড)

মূল: ইমাম আবুল কাসিম আবদুল করিম বিন হওয়াজিন কুশাইরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [মৃ: ৩৭৬-৩৬৫ হিজরি]

অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

পাণ্ডুলিপি: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্কসজ্জা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সর্বস্বত্ব: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ:

জুলাই, ২০১৭ ঈসাবী

১ শ্রাবণ, ১৪২৮ বাংলা

২১ শাওয়াল, ১৪৩৮ হিজরি

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রিসালাতুল কুশাইরী (রাহ.)

ইমাম আবুল কাসিম হাওয়াজিন কুশাইরী
(রাহ.) এর

রিসালাতুল কুশাইরী

অনুবান: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

ইন্টারনেট সংস্করণ

ঈডুতুৎরমযঃ ঘঙঞঔঈউ:

All rights reserved. This electronic book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in book review. This electronic book may only be used for private reading, it is forbidden to print and distribute all or any part of it and distribute for commercial purposes. However this book's link may be freely given to anyone for reading and downloading as it is a book of Islamic Dawah.

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ

সূচিপত্র

খানকায়ে আমীনীয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আরজ	০০৮
বিষয়: মাকামাত	
বাবুর রিদ্দা [সম্ভ্রষ্ট অধ্যায়]	০১০
অনুবাদ	০১৬
বাবুল 'উবুদিয়াত [দাসত্ব অধ্যায়]	০২২
অনুবাদ	০২৭
বাবুল ইরাদা [মুরীদ হওয়ার অধ্যায়]	০৩২
অনুবাদ	০৩৮
মুরীদ ও মুরাদের মধ্যে পার্থক্য	০৪২
বাবুল ইস্তিকামাত [অটল থাকা অধ্যায়]	০৪৫
অনুবাদ	০৪৭
বাবুল ইখলাস [একনিষ্ঠতা অধ্যায়]	০৫১
অনুবাদ	০৫৬
বাবুস সিদ্ক [সত্যবাদিতা অধ্যায়]	০৬০
অনুবাদ	০৬৫
বাবুল হায়া [লজ্জা অধ্যায়]	০৭০
অনুবাদ	০৭৬
বাবুল হুররিয়াহ [স্বাধীনতা অধ্যায়]	০৮১
অনুবাদ	০৮৪
বাবুয জিকির [স্মরণ অধ্যায়]	০৮৮
অনুবাদ	০৯৫
বাবুল ফুতুওয়াহ [বীরত্ব অধ্যায়]	১০২
অনুবাদ	১১০
বাবুল ফিরাসাত [অন্তর্দৃষ্টি অধ্যায়]	১১৭
অনুবাদ	১২৯
বাবুল খুলুক [চরিত্র অধ্যায়]	১৪৫
অনুবাদ	১৫২
বাবুল জুদ ওয়াসসাখা [অপিরিমিত দানশীলতা ও উদারতা অধ্যায়]	১৬০
অনুবাদ	১৬৮
বাবুল গাইরাত [লজ্জাবোধ অধ্যায়]	১৮০
অনুবাদ	১৮৭
বাবুল ওয়ালায়া [আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব]	১৯৪

অনুবাদ	২০০
বাবুদ-দু'আ [প্রার্থনা অধ্যায়]	২০৬
অনুবাদ	২১৭
বাবুল ফুক্বারা [ফকিরী অধ্যায়]	২২৭
অনুবাদ	২৪০
বাবুত তাসাওউফ [আত্মশুদ্ধি অধ্যায়]	২৫২
অনুবাদ	২৫৯
বাবুল আদাব [শিষ্টাচার অধ্যায়]	২৬৫
অনুবাদ	২৭২
বাব আহকামিহিম ফিস্-সাফর (সফরের অবস্থায় তাদের আচার-আচরণ)	২৭৮
অনুবাদ	২৮৭
বাবুস সুহবাত [সান্নিধ্য অধ্যায়]	২৯৬
অনুবাদ	৩০২
বাবুত তাওহীদ [একত্ববাদ অধ্যায়]	৩০৮
অনুবাদ	৩১৫
বাবুল খুরুজ মিনাদ দুনইয়া [দুনিয়া থেকে বিদায়ের অধ্যায়]	৩২১
অনুবাদ	৩৩৩
বাবুল মা'রিফাতু বিল্লাহ [আল্লাহর পরিচিতি অধ্যায়]	৩৪৫
অনুবাদ	৩৫২
বাবুল মুহাব্বাত [প্রেম অধ্যায়]	৩৬০
অনুবাদ	৩৭৩
বাবুশ শওকু [আবেগপ্রবণ বিরহ অধ্যায়]	৩৮৮
অনুবাদ	৩৯৩
[কিভাবে সুফি শায়খদের হৃদয় সংরক্ষিত থাকে এবং তাদের আকাজ্জ্বার বিরোধিতা হয় না]	৪০১
অনুবাদ	৪০৪
বাবুস সামা' [সামা' শ্রবণ অধ্যায়]	৪০৯
অনুবাদ	৪২৯
বাব কারামাতুল আউলিয়া [আউলিয়াদের কারামাত অধ্যায়]	৪৫৩
অনুবাদ	৪৫৭
আল-কারামাত	৪৬৩
অনুবাদ	৪৬৩
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -১	৪৬৪
অনুবাদ	৪৬৪
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -২	৪৬৫

অনুবাদ	৪৬৫
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৩	৪৬৬
অনুবাদ	৪৬৬
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৪	৪৬৭
অনুবাদ	৪৬৭
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৫	৪৬৭
অনুবাদ	৪৬৮
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৬	৪৬৮
অনুবাদ	৪৬৮
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৭	৪৬৯
অনুবাদ	৪৭১
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৮	৪৭৫
অনুবাদ	৪৮৩
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -৯	৪৯৩
অনুবাদ	৫০০
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -১০	৫০৮
অনুবাদ	৫১৮
ফাসল [পরিচ্ছেদ] -১১	৫৩০
অনুবাদ	৫৪৫
বাব রু'ইয়াল কাওম [সুফিদের দৃকশক্তি]	৫৬৩
অনুবাদ	৫৭২
ফাসল [পরিচ্ছেদ]	৫৮৩
অনুবাদ	৫৮৯
বাবুল ওয়াসিয়াতু লিলমুরিদীন [মুরীদদের প্রতি আধ্যাত্মিক উপদেশ]	৫৯৮
অনুবাদ	৫১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ ‘রিসালাতুল কুশাইরী’র মূল আরবিসহ বঙ্গানুবাদ মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়া ও অনুগ্রহে খানক্বার গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুল মাশাইখ ও লেখক ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘আর-রিসালাতুল কুশাইরী ফী ইলমিত-তাসাওউফ’ নামক গ্রন্থটি সুফি-দরবেশ ও তরীকতের সালিকদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে সুলুকের খুঁটিনাটি বিষয়াদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা তথা তাসাওউফের ওপর এরূপ কোনো প্রমাণ্যগ্রন্থ আজো রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাস্তবে এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নি, এমন কোনো তাসাওউফশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ পরবর্তিতে রচিত হয়েছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরূপ বিরাট মূল্যবান একটি কিতাব কোন্ কারণে আজো বাংলায় অনূদিত হয় নি, সে রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি নি। যা হোক, আল্লাহ তা’আলার অপরিসীম কৃপায় অবশেষে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা আবারও মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ভাষায় তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর লেখালেখি খুব একটা হয় নি। ইসলামের ‘কল্ব’ নামে খ্যাত এই শাস্ত্রের ওপর প্রচুর লেখালেখির প্রয়োজন। আমরা আশা করবো রিসালাতের বঙ্গানুবাদ এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করবে একটি সহায়ক প্রমাণ্যগ্রন্থ হিসাবে। আর এ কারণেই অনেক পরিশ্রম ও টাকার বিনিময়ে আমরা লেখকের মূল আরবি রচনাও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। পৃষ্ঠাসংখ্যা বিরাট হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দু’টি আলাদা খণ্ডে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ করে খানক্বায় সংরক্ষিত হয়েছে। তাসাওউফ শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন অভিলাষী বিদ্বান পাঠকবর্গসহ সকল মুসলমান এই অনুবাদ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন এটাই আশা।

সবশেষে, শ্রদ্ধেয় প্রকাশকসহ এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি একান্ত আন্তরিকভাবে। বিশেষ করে গ্রন্থের অনুবাদক খলীফায়ে মাদানী হযরত মাওলানা আবদুল মতিন শায়খে ফুলবাড়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ও তাঁর সহায়ক আমার শায়খ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ মুরীদ ও ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী গ্রন্থটি ভাষান্তরের ক্ষেত্রে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন বছরের পর বছরব্যাপী তা সত্যিই অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও বর্ষণ করুন তাঁদের ওপর স্বীয় রাহমাত ও করুণার বারিধারা। আমীন।

(খলীফায়ে কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ.) মাওলানা ফরুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।
১লা নভেম্বর, ২০১৬

الجزء الثاني
تابع المقامات
দ্বিতীয় খণ্ড
বিষয়: মাকামাত

باب الرضا

বাবুর রিদ্দা [সন্তুষ্টি অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: " رضي الله عنهم ورضوا عنه " .. الآية.
أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي، رحمه الله، قال: حدَّثنا أحمد بن عبيد
البصري، قال: حدَّثنا الكريمي، قال: حدَّثنا يعقوب بن إسماعيل السلال،
قال: حدَّثنا أبو عاصم العباداني، عن الفضل بن عيسى الرقاشي، عن محمد
بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " بينا
أهل الجنة في مجلس لهم، إذ سطع لهم نورٌ على باب الجنة، سلوئي. فقالوا:
نسألك الرِّضا عَنَّا، قال تعالى: رضاي قد أحلَّكم داري، وأنا لكن
كرامتي، هذا أوانها، فاسألوني. قالوا: نسالك الزيادة. قال: فيؤتون بنجائب
من ياقوت أحمر.. أزمتهَا زُمُرْدٌ أخضر، وياقوت أحمر، فجاءوا عليها، تضع
حوافرَها عند منتهى طرفها، فيأمر الله، سبحانه، بأشجار عليه الثمار،
وتجيء جوار من الحوار العين، وهنَّ يقلن: نحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن

الخالدات فلا نموت، أزواج قومؤمنين كرام، ويأمر الله، سبحانه، يكتبان من مسك أبيض أذفر، فتثير عليهم ريحاً يقول لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن، وهي قصبة الجنة، فتقول الملائكة: يا ربنا، قد جاء القوم. فيقول الله: مرحباً بالصادقين.. مرحباً بالطائعين.

قال: فيكشف لهم الحجاب.. فينظرون إلى الله، عز وجل.. فيتمنون بنور الرحمن، حتى لا يبصر بعضهم بعضاً، ثم يقول: أرجعوههم إني الصور بالتحف قال: فيرجعون، وقد أبصر بعضهم بعضاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: "نُزلاً من غفور رحيم".

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا: هل هو من الأحوال، أو من المقامات. فأهل خراسان قالوا: الرضا: من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، ومعناه: أنه ينول إلى أنه يتوصل إليه العبد باكتسابه. وأما العراقيون؛ فإنهم قالوا: الرضا: من جملة الأحوال، وليس ذلك كسباً للعبد، بل هو نازلةٌ تحل بالقلب كسائر الأحوال. ويمكن الجمع بين اللسانين؛ فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد، وهي من المقامات، ونهايته من جملة الأحوال، وليست بمكتسبة.

وتكلم الناس في الرضا؛ فكل عبر عن حاله وشربه، فهم في العبارة، عنه مختلفون، كما أنهم في الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون. فأما شرط العلم، والذي هو لا بد منه: فالراضي بالله تعالى، هو: الذي لا يعترض على

تقديره. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء، إنما الرضا: أن لا تعترض على الحكم والقضاء.

واعلم أن الواجب على العبد: أن يرضى بالقضاء الذي أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا؛ كالمعاصي، وفنون محن المسلمين. وقال المشايخ: الرضا باب الله الأعظم. يعنون: ن من أكرم بالرضا فقد لقي بالترحيب الأوفى، وأكرم بالتقريب الأعلى.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: أخبرنا أبو جعفر الرازي قال: حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي الحواري قال: قال عبد الواحد بن زيد: الرضا بابُ الله الأعظم، وجنة الدنيا. واعلم: أن العبد لا يكاد يرضى عن الحق. سبحانه، إلا بعد أني رضى عنه الحق سبحانه؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قال: "رضي الله عنهم ورضوا عنه".

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: قال تلميذ لأستاذه: هذا يعرف العبد أن الله تعالى راضٍ عنه؟ فقال: لا، كيف يعلم ذلك. ورضاه غيب؟ فقال التلميذ: بل يعلم ذلك، فقال: كيف؟! فقال: إذا وجدت قلبي راضياً عن الله تعالى. علمت أنه راضٍ عني فقال الأستاذ: أحسنت يا غلام.

وقيل: قال موسى عليه السلام: إلهي، دلني على عمل إذا عملته رضت به عني. فقال: إنك لا تُطيق ذلك: فخر موسى عليه السلام ساجداً له، متضرعاً، فأوحى الله تعالى إليه: يا ابن عمران، إن رضاي في رضاك

بقضائي.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، قال: حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راضٍ. وسمعته يقول: سمعت النصراباذي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وقال محمد بن خفيف: الرضا على قسمين: رضا به، ورضاع عنه؛ فالرضا به أن يرضاه مدبراً، والرضا عنه فيما يقضى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: طريق السالكين أطول، وهو طريق الرياضة، وطريق الخواص أقرب، لكنه أشق، وهو أن يكون عملك بالرضا، ورضاك بالقضاء.

وقال رويم: الرضا: أن لو جعل الله جهنم على يمينه ما سأل أن يحولها إلى يساره. وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا: إخراج الراهية من القلب، حتى لا يكون فيه إلا فرح وسرور. وقال الواسطي: استعمل الرضا جهداً، ولا تدع الرضا يستعملك؛ فتكون محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. واعلم أن هذا الكلام الذي قاله الواسطي شيء عظيم، وفيه تنبيه على مقطعة للقوم خفية، فإن السكون عندهم إلى الأحوال: حجاب عن محول الأحوال، فإذا استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شهود حقه.

ولقد قال الواسطي أيضاً: إياكم واستحلاء الطاعات، فإنها سموم قاتلة. وقال ابن خفيف: الرضا: سكون القلب إلى أحكامه، وموافقة القلب بما رضي الله به واختاره له. وسئلت رابعة العدوية: متى يكون العبد راضياً؟ فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة.

وقيل. قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له الجنيد: قولك ذا ضيقٌ صدر، وضيقُ الصدر لترك الرضا بالقضاء، فسكت الشبلي. وقال أبو سليمان الداراني: الرضا: أن لا تسأل الله تعالى الجنة، ولا تسعِذ به من النار.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون المصري، رحمه الله، يقول: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء.

وسمعه يقول: سمعت محمد بن جعفر البغدادي يقول: سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول: سمعت محمد بن يزيد المبرد يقول: قيل للحسين بن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنهما: إِنَّ أبا ذرٍّ يقول: الفقر أحب إليّ من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنَّ غيرَ ما اختاره الله عز

وجل له. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافى: الرضا افضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته.

وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أسألك الرضا بعد القضاء " فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت ابن أبي حسان الأنماطي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان يقول: أرجوا أن أكون عرفت طرفاً من الرضا: لو انه أجخلني النار لكنت بذلك راضياً.

وقال أبو عمر الدمشقي: الرضا: ارتفاع الجزع في أيّ حكم كان، وقال الجنيد: الرضا: رفع الاختيار، وقال ابن عطاء: الرضا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد، وهو ترك التسخط، وقال رُويم. الرضا: استقبال الأحكام بالفرح، وقال المحاسبي: الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقال النوري: الرضا: سرور القلب بمرّ القضاء.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: من رضي بدون قدره رفعه الله تعالى فوق غايته.

وسمعت يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت الحسن بن علوية يقول: قال أبو تراب النخشي: ليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان

قال: حدثنا عبد الله بن شتويه قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً".

وقيل: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما، "أما بع، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضي، وإلا، فاصبر".
وقيل: إنَّ عتبة الغلام بات ليلة يقول إلى الصباح: "إن تعذبنني فأنا لك محبٌ، وإن ترحمني فأنا لك محب". سمى الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول: الإنسان خرف، وليس للخرف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى. وقال أبو عثمان الحيري: منذ أربعين سنة ما أقامني الله، عز وجل، في حال فكرهته، وما نقلني إلى غير فسخطته.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: غضب رجل على عبدٍ له، فاستشفع العبد إلى سيده إنساناً، فعفا عنه، فأخذ العبد يبكي، فقال له الشفيع: لم تبكي وقد عفا عنك سيدك؟ فقال له السيد: إنما يطلب الرضا مني ولا سبيل له إليه، فإنما يبكي لأجله.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

-“আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।” [মাইদাহ : ১১৯]

হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাতবাসীরা মজলিসে বসা থাকবেন। জান্নাতের দরজায় প্রকাশ হবে একটি নূর। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আমার কাছে চাও! তারা বললেন, আপনার সম্ভৃষ্টি চাই। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সম্ভৃষ্টিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তোমরা আমার নিকট চাও! তারা বলবেন, আমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিন। তখন তাদের আশপাশ লাল রঙের ইয়াকূত পাথর দ্বারা সাজিয়ে দেওয়া হবে। নিকটে আসবেন সুন্দর চোখওয়ালা ছুরগণ। তারা বলবেন, আমরা সুখী, আনন্দিত, কখনো ব্যতিত হবো না, আমরা এখানে চিরকাল থাকবো। আমাদের মৃত্যু হবে না। এরপর তাদেরকে জান্নাতুল আ’দনে নেওয়া হবে। ফিরিশতারা বলবেন, হে প্রভু! লোকজন এসে গেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলবেন, হে সত্যবাদীরা! তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। হে আনুগত্যশীলরা! তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। এসময় পর্দা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। লোকজন আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার দীদার লাভ করবেন। তারা রাহমানের নূরের আকাঙ্ক্ষা ও উপভোগ করতে থাকবে। কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। এরপর আল্লাহ তা’আলা বলবেন, তোমরা পূর্বের আকৃতিতে ফিরে যাও! তখন সকলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে ও একে অন্যকে দেখতেও পাবে।” তিনি আরো বলেন, “এটাই হলো আল্লাহ তা’আলার এই আয়াতের উদ্দেশ্য:

نُزْلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

–“এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সদয় আপ্যায়ন”। [হা-মীম সিজদাহ : ৩২]”

রিদ্বা ‘হালের’ না ‘মাক্বামাতের’ অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে খোরাসানী ও ইরাকীদের মধ্যে ভিন্নমত আছে। খোরাসানীরা বলেন, রিদ্বা মাক্বামাতের অন্তর্ভুক্ত। এটা হলো তাওয়াঙ্কুলের শেষ পর্যায়। মাক্বামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হলো, অর্জন ও চেষ্টা-সাধনা ছাড়া বান্দা এ স্তরে আরোহণ করতে পারে না। অপরদিকে ইরাকীরা বলেন, রিদ্বা হালের অন্তর্ভুক্ত। এটা বান্দার উপার্জনের আওতাধীন নয়। বরং অপরাপর হালের মতো এটাও অন্তরে অবতীর্ণ হয়। এই দু’টি ভাষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন এভাবে দেওয়া যেতে পারে: রিদ্বার প্রাথমিক স্তর বান্দার উপার্জনের আওতাধীন এবং

তা মাক্কাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর চূড়ান্ত স্তর হলো হালের অন্তর্ভুক্ত যা অর্জন দ্বারা লাভ হয় না।

রিদ্বা সম্পর্কে সুফিয়ায়ে কিরাম অনেক কথা বলেছেন। যার-তার স্বাদ ও অর্জন অনুসারে বিভিন্ন কথা উচ্চারণ করেছেন। উস্তাদ হযরত আবু আলী দা঳াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “রিদ্বার অর্থ এটা নয় যে, তুমি বিপদ অনুভব করবে। বরং এর অর্থ, কাজ ও ফায়সালা নিয়ে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না।”

জেনে রাখো, সন্তোষজনক কাজের ফায়সালার উপর বান্দাকে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যিক। কারণ অসন্তোষজনক কাজের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা জায়য নয়, যেমন আল্লাহর অবাধ্যতা করা। মাশায়খরা বলেন, রিদ্বা হলো আল্লাহ তা’আলার শ্রেষ্ঠ দরজা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রিদ্বার সম্মান লভ করলো সে তো পরিপূর্ণ প্রীতি ও সর্বোচ্চ সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো। হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্বা হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দরজা এবং দুনিয়ার জান্নাত।” জেনে রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার উপর সন্তুষ্ট না হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

–“আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দা঳াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “একজন শিষ্য তার উস্তাদকে বললেন, আমি জানি এই বান্দার উপর আল্লাহ কখন সন্তুষ্ট থাকেন। উস্তাদ বললেন, এটা কিভাবে সম্ভব? রিদ্বা তো অদৃশ্য একটি বিষয়! শিষ্য জবাব দিলেন, অবশ্যই সে জানে! উস্তাদ প্রশ্ন করলেন, বলো! কিভাবে? শিষ্য জবাব দিলেন, যখন দেখি আমার অন্তর আল্লাহ তা’আলার উপর সন্তুষ্ট, তখন আমি বুঝতে পারি আল্লাহও আমার উপর সন্তুষ্ট। এবার শিক্ষক মন্তব্য করলেন, ওহে বৎস! তুমি চমৎকার একটি কথা বলেছো!”

বর্ণিত আছে, হযরত মুসা আলাইহিস্সালাম প্রার্থনা করলেন, হে মা’বুদ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ বললেন, “তুমি এ কাজটির ক্ষমতা রাখো না!”। একথা শুনে মুসা আলাইহিস্সালাম কাতর

হয়ে সিজদায় পড়ে গেলেন। এসময় আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “হে ইমরানের পুত্র! আমার ফায়সালায় তোমার সন্তুষ্টির মধ্যেই আমার সন্তুষ্টি নিহিত।”

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “বান্দা যখন শাহাওয়াত [প্রচণ্ড যৌন-কামনা] থেকে মুক্ত হবে, তখনই আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি লাভ করবে।” হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি রিদ্দার মাক্লাম অর্জনে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজ করতে হবে।” উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সালিকদের রাস্তা অত্যন্ত দীর্ঘ। এটা তো সাধনার পথ। পক্ষান্তরে বিশেষ লোকদের রাস্তা অতি নিকটবর্তী! তবে তা খুব কষ্টদায়ক। এর অর্থ হলো, তোমার আমল যেনো সন্তোষজনক হয়। আর ফায়সালার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাকবে।”

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দা হচ্ছে, আল্লাহ যদি তোমার বাম হাতে জাহান্নাম রেখে দেন, তবুও ডান হাতে তা সরিয়ে দিতে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে না।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দাকে দিয়ে তোমার চেষ্টা কাজে লাগাও! তুমি রিদ্দার দ্বারা ব্যবহৃত হয়ো না। কারণ এতেকরে রিদ্দার স্বাদ পেয়ে এর হাক্কিকাত থেকে তুমি বঞ্চিত থাকবে।”

জেনে রাখো, হযরত ওয়াসিতী খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এটা তো একদল মানুষের জন্য সতর্কবাণী। কারণ, তারা যদি হালের উপর সন্তুষ্ট থাকে, তখন হালের মধ্যে একটি পর্দা পড়ে যাবে। তাই, রিদ্দার উপর সন্তুষ্ট থাকলে এর স্বাদ পাবে ঠিকই কিন্তু এর হাক্কিকাত পর্যন্ত পৌঁছুতে বাঁধা পড়বে। হযরত ওয়াসিতী আরো বলতেন, আনুগত্যের স্বাদ অনুসন্ধান থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, এটা এক প্রকার বিষধর ঘাতক। হযরত ইবনে খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দা হলো, আল্লাহর বিধান পালনে অন্তরের প্রশান্তি। আর সন্তোষজনক কাজের উপর হৃদয়ের একাত্মতা পোষণ।”

হযরত রাবিয়া আদাওয়িয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দা কখন রিদ্দার অধিকারী হয়? তিনি জবাব দিলেন, “নিয়ামত পেয়ে সে যেভাবে আনন্দ লাভ করে ঠিক তদ্রূপ বিপদে পতিত হয়েও যদি অনুরূপ আনন্দ লাভ করে তাহলেই বুঝা গেলো সে রিদ্দার অধিকারী হয়েছে।”

বর্ণিত আছে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সামনে ‘লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা’ বললেন। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমার কণ্ঠ থেকে হৃদয়ের সংক্ষীর্ণতার পরিচয় মিলে। আর অন্তর তো তখনই সংক্ষীর্ণ হয়ে পড়ে যখন রিদ্দা বিল কাযা ছেড়ে দেওয়া হয়! একথা শুনে হযরত শিবলী নীরব হয়ে গেলেন।

হযরত আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দা হলো, তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে না এবং তাঁর নিকট জাহান্নাম থেকেও মুক্তি চাইবে না!” হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাহিমাতুল্লাহু আনহুমাকে বলা হলো, হযরত আবুযর রাহিমাতুল্লাহু আনহু বলেন, “আমার নিকট ধনাঢ্যতা থেকে দারিদ্র্যতা উত্তম ও পছন্দনীয়। আর সুস্থতার চেয়ে রোগ-শোক পছন্দনীয়।” একথা শুনে হুসাইন রাহিমাতুল্লাহু আনহু বললেন, “আল্লাহ আবুযরকে করুণা করুন! কথাটি আমি এভাবে বলবো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সুন্দর ফায়সালা মেনে নেবে, সে কখনো আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন নি, তার আকাজ্জা করবে না।”

হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেন, “দুনিয়ার জীবনে যুহদ থেকে রিদ্দা হলো উত্তম। কারণ, রিদ্দার অধিকারী ব্যক্তি এর উপরের স্তরের কোনো আকাজ্জা করে না।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, “ফায়সালার পর আমি তোমার নিকট সম্ভষ্টি কামনা করছি।” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, ফায়সালার পূর্বে সম্ভষ্টি থাকার অর্থ হলো এর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর ফায়সালার পরের সম্ভষ্টি হলো আসল সম্ভষ্টি।

হযরত আবু সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আমি আকাজ্জী, যদি রিদ্দার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য চিনতে পারতাম! তখন যদি আমাকে দোষখেও দেওয়া হতো আমি তাতেও সম্ভষ্টি থাকতাম।” হযরত আবু উমর দামেস্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সর্বপ্রকার হুকুম ও ফায়সালায় অস্থিরতা দূর করার নামই রিদ্দা।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দা হলো নিজের স্বাধীনতা দূর করা।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্দা হলো বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলার চিরন্তন ফায়সালার প্রতি অন্তরদৃষ্টি। আর তাতে সর্বপ্রকার নারাজী

বর্জন করা।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্বা অর্থ, সানন্দে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে নেওয়া।” হযরত মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর বিধানে অন্তরের প্রশান্তি হলো রিদ্বা।”

হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফায়সালা জারী হওয়ার উপর অন্তরের প্রশান্তির নাম রিদ্বা।” হযরত আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যার অন্তরে কিঞ্চিৎ পরিমাণও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকবে সে রিদ্বা লাভ করতে পাবে না।”

আল্লাহর রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিল, সে ঈমানের স্বাদ পেল।” বর্ণিত আছে, ক্রীতদাস উৎবা একরাত সকাল পর্যন্ত এ কথাটি বলে কাটিয়ে দিলেন, “হে আল্লাহ! যদি আমাকে শাস্তি দাও, তবুও তোমার প্রেমিক! আর যদি দয়া করো তবুও আমি তোমার প্রেমিক!” হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ তা’আলা আমাকে এমন কোনো হালের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন নি যা আমি অপছন্দ করেছি।” হযরত আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের উপর অসম্মত হলো। দাসটি তখন কোনো এক ব্যক্তি দ্বারা তার মালিকের নিকট সুপারিশ করালো। সে অনুযায়ী মালিক তাকে ক্ষমা করলো। এতে ক্রীতদাস কাঁদতে লাগলো। সুপারিশকারী জিজ্ঞেস করলো, কাঁদছো কেন, মালিক তো তোমাকে ক্ষমা করেছেন? এসময় মালিক জবাব দিলেন, সে তো চায় আমার সম্মতি! আর আহাজারী ছাড়া আমার সম্মতি লাভের অন্য কোনো পথ নেই।”

باب العبودية

বাবুল 'উবুদিয়াত [দাসত্ব অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين".

وأخبرنا أبو الحسن الإهوازي، رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن عمر بن الخطاب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعت امرأته ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله يقول: العبودية أتم من العبادة، فأولاً: عبادة، ثم عبودية؛ ثم عبودة. فالعبادة للعوام من المؤمنين، والعبودية للخواص، والعبودة لخاص الخاص.

وسمعتة يقول: العبادة: لمن له علم اليقين، والعبودية؛ لمن له عين اليقين، والعبوة: لمن له حق اليقين. وسمعتة يقول: العبادة: لأصحاب المجاهدات،

والعبودية: لأرباب المكابدات، والعبودية: صفة أهل المشاهدات، فمن لم يدخر عنه نفسه، فهو صاحب عبادة، ومن لم يضمن عليه بقلبه فهو صاحب عبودية: ومن لم ييخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. ويقال: العبودية: القيام بحق الطاعات بشرط التوفير والنظير إلى ما منك بعين التقصير، وشهود ما يحصل من مناقبك من التقدير. ويقال: العبودية: ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار.

ويقال: العبودية: التبرؤ من الحول والقوة، والإقرار بما يعطيك ويولييك من الطول والمنة. ويقال: العبودية: معانقة ما أمرت به، ومفارقة ما زجرت عنه. وسئل محمد بن خفيف: متى تصح العبودية؟ فقال: إذا طرح كل علي مولاه، وصبر معه على بلواه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت ابن مسروق يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يصح التعبد لأحدٍ حتى لا يجزع من أربعة أشياء: من الجوع، والعري، والفقر، والذل.

وقيل: العبودية: أن تسلم إليه كلك، وتحمل عليه كلك. وقيل: من علامات العبودية: ترك التدبير، وشهود التقدير. وقال ذو النون المصري: العبودية: أن تكون أنت عبده في كل حال، كما أنه ربك في كل حال.

وقال الجريري: عبيدُ النعم كثير عديدهم؛ وعبيدُ المنعم عزيز وجودهم.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: أنت عبدٌ من أنت في رقة وأسرهِ، فإن كنت في أسر نفسك فأنت عبدٌ نفسك، وإن كنت في أسر دنياك فأنت عبدٌ دنياك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة ". ورأى أبو رزين رجلاً فقال له: ما حرفتكَ؟ فقال: خربندة ". فقال: أما الله تعالى حمارك، لتكون عبد الله، لا عبد الحمار.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: لا تصفو لأحد قدمٌ في العبودية حتى يشاهد أعماله عنده رياء، وأحواله دعاوى. وسمعتَه يقول: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: العبد عبد ما لم يطلب لنفسه خادماً، فإذا طلب لنفسه خادماً فقد سقط عن حد العبودية وترك آدابها.

وسمعتَه يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت ابن مسروق يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يصلح للعبد التعبد حتى يكون بحيث لا يرى عليه أثر المسكنة في العدم، ولا أثر الغنى في الوجود. وقيل: العبودية شهود الربوبية.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: سمعت النصراباذي يقول: قيمة العابد بمعبوده، كما أن شرف العارف بمعروفه. وقال أبو حفص: العبودية زينة العبد، فمن تركها تعطل من الزينة.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت عباس بن حمزة يقول: حدثنا أحمد بن الحواري قال: سمعت النباجي يقول: اصل العبادة في ثلاثة أشياء: لا ترد من أحكامه شيئاً، ولا تدخر عنه شيئاً، ولا يسمعك تسأل غيره حاجة. وسمعت يقول: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: العبودية في أربع خصال: الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر عن المفقود.

وسمعت يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت الكتاني يقول: سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول: ما رأيت أحداً من المتعبدين، في كثرة من لقيت بمكة وغيرها، ولا أحداً ممن قدم علينا في المواسم أشد اجتهاداً ولا أدوم على العبادة من المزني، رحمه الله تعالى، ولا رأيت أحداً أشد تعظيماً لأوامر الله تعالى عنه، وما رأيت أحداً أشد تضيقاً على نفسه وتوسعة على الناس منه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية، ولا أسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية، ولذلك قال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج - وكان أشرف أوقاته في الدنيا - " سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ". وقال تعالى: " فأوحى إلى عبه ما أوحى " ، فلو كان اسمٌ أجل من العبودية لسماه به. وفي معناه أأشدوا:

يا عمرو ثاري عند زهرائي ... يعرفه السامعُ والرأي
لا تدعني إلا يباعبدها ... فإنه أشرف أسمائي

وقال بعضهم: إنما هم شيئان: سكونك إلى اللذة، واعتمادك على الحركة،
فإذا أسقطت عنك هذين فقد أديت العبودية حقها. كما قال الواسطي:
احذروا لذة العطاء؛ فإنها غطاء لأهل الصفاء. وقال أبو علي الجوزجاني:
الرضا: دار العبودية، والصبر بابه، والتفويض بيته، فالصوت على الباب
والفراغة في الدار، والراحة في البيت. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول:
كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول عنه، فالعبودية صفة للعبد
لا تفارقه ما دام. وأنشد بعضهم:

فإن تسألوني قلت: هاأنا عبده ... وإن سألوه قال هاذاك مولاي

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت النصراباذي يقول:
العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب
الإعواض والجزاء عليها. وسمعتة يقول: سمعت النصراباذي يقول:
العبودية اسقاط رؤية التبعد في مشاهدة المعبود. وسمعتة يقول: سمعت أبا
بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت الجريري يقول. سمعت
الجنيد يقول: العبودية، تركُّ الأشغال، والاشتغال بالشغل الذي هو أصل
الفراغة.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

-“পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।” [হিজর : ৯৯]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাঈআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তা'আলা সাত দল লোককে রোজ কিয়ামতে নিজের ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন অন্য কোন ছায়া থাকবে না। এরা হলেন: ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. যে যুবক আল্লাহর দাসত্বে বড়ো হয়েছেন, ৩. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর থেকে পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের প্রতি লেগে থাকে, ৪. যে দু'ব্যক্তি একে অন্যকে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে- তারা একত্র হন এ উদ্দেশ্যে এবং একে অন্য থেকে দূরে যান এ উদ্দেশ্যেই, ৫. ঐ ব্যক্তি যিনি গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং চোখের পানি বর্ষণ করেন, ৬. যে লোককে কোনো সুন্দরী মহিলা খারাপ কাজে আহ্বান জানায় এবং তিনি বলেন, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি এবং ৭. যে ব্যক্তি এমন গোপনে সাদকা দেন যে তার বাম হাত জানতেই পারে না ডান হাতে কী দান করেছে।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “উবুদিয়াত হলো ইবাদত থেকে উচ্চ পর্যায়ের। আর উ'বুদাত উবুদিয়াত থেকেও উত্তম। ইবাদাত সাধারণ মু'মিনদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য আর উ'বুদিয়াত বিশেষ মু'মিনদের জন্য খাস। অপরদিকে উ'বুদাত হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের বিশেষ লোকদের জন্য।” তিনি আরো বলেন, “ইলমুল ইয়াক্বীনের লোকদের জন্য খাস হলো ইবাদাত, যারা আ'ইনুল ইয়াক্বীনের স্তরে পৌঁছুছেন তাদের জন্য উ'বুদিয়াত ও হাক্কুল ইয়াক্বীন লাভকারীদের জন্য খাস হলো উ'বুদাত। যারা মুজাহাদা করেন তাদের জন্য ইবাদত, যারা মুকাবাদা করেন তাদের জন্য উ'বুদিয়াত ও যারা মুশাহাদায় উপনীত তাদের জন্য খাস হলো উ'বুদাত।”

বলা হয়, উ'বুদিয়াত হলো পরিপূর্ণ শর্তানুযায়ী আনুগত্যের হক্ব আদায়ে সচেষ্টিত হওয়া। নিজ থেকে যেসব কার্য সাধন হবে তাতে ভুল-ত্রুটি দেখা। নিজের অর্জিত

বৈশিষ্ট্যকে ভাগ্যলিপি হিসাবে দেখা। আরো বলা হয়, ভাগ্যলিপি থেকে যাকিছু প্রকাশ পায়, তাতে ইচ্ছাশক্তি বিলীন করার নাম হলো 'উবুদিয়াত'। 'উবুদিয়াত' হলো নিজ শক্তি-সামর্থ্য থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হওয়া। তোমাকে যে কাজে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একে সাদরে গ্রহণ ও যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকাই হলো 'উবুদিয়াত'। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চারটি বিষয়ে অস্থিরতা না করলে কারো জন্য 'উবুদিয়াত' শুদ্ধ হবে না। ১. ক্ষুধা, ২. নগ্ন দেহ, ৩. দারিদ্র্য ও ৪. অপদস্থতা।”

বলা হয়, 'উবুদিয়াতের' আলামত হলো, ফন্দি-ফিকির ছাড়া ও তাকদীরের উপর দৃষ্টিপাত। হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “'উবুদিয়াত' হলো আপনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবেন, যেভাবে তিনি সর্বাবস্থায় আপনার প্রভু হয়ে আছেন।” হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নিয়ামতের দাস-দাসীদের অভাব নেই- তাদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু নিয়ামত দাতার দাস-দাসীদের সংখ্যা খুবই কম।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যার বন্দীত্বে তুমি অবস্থান করো, তুমি তাঁরই গোলাম। যদি নফসের বন্দীত্বে থাকো তাহলে তুমি নফসের গোলাম। আর যদি দুনিয়ার বন্দীত্বে আবদ্ধ হও, তবে তুমি দুনিয়ার গোলাম।”

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “দীরহামের দাস ধ্বংস হোক! দীনারের দাস নিপাত যাক!”

হযরত আবু রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পেশা কি? সে উত্তর দিল, খরবান্দা [গাধারক্ষক]। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার গাধাটি ধ্বংস করুন! তুমি বরং আল্লাহর গোলাম হও, গাধার গোলাম হয়ো না!”।

হযরত আবু আমর ইবনে নাজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন “যতক্ষণ না কেউ তার আমলের মধ্যে রিয়ার সন্ধান পেয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'উবুদিয়াতের' মধ্যে তার জন্য পা ফেলা সঠিক হবে না।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মানাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা গোলাম হিসাবে থাকবে, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য কোনো খাদিম গ্রহণ

করেছে। যখন নিজের স্বার্থে খাদিমের সন্ধান করবে, তখন সে 'উবুদিয়াতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে 'উবুদিয়াতের আদব ছেড়ে দিল।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যখন দরিদ্রতার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভব করবে না এবং ধনাঢ্যতার মধ্যেও কোনো ফখর দেখবে না তখই সে 'উবুদিয়াতের উপযুক্ত হলো।”

বলা হয়, আল্লাহর প্রভুত্বের দর্শনের নামই হলো 'উবুদিয়াত। হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা'বুদের মূল্যায়নেই আ'বিদের মর্যাদা নিহিত।” হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “'উবুদিয়াত হলো বান্দার সৌন্দর্য। এটি ছেড়ে দিলে সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়।” হযরত নাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি বিষয়: ১. আল্লাহর কোনো বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে না। ২. তাঁর দেওয়া নিয়ামতকে মওজুদ করবে না। ৩. তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে ভিক্ষা করছে তাও তিনি শোনবেন না।”

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “'উবুদিয়াতের বৈশিষ্ট্য চারটি: ১. ওয়াদা পূর্ণ করা, ২. সীমাতিক্রম না করা, ৩. যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং ৪. হারিয়ে যাওয়া বস্তুর উপর ধৈর্যধারণ করা।”

হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মক্কা শরীফ বা অন্যান্য নগরীতে আমি মুজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চেয়ে এতো বেশী ইবাদাতগুজার, আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ, নিজের জন্য সংকোচ অবলম্বন ও লোকদের জন্য প্রশস্ততা অবলম্বনকারী আর কোনো ব্যক্তি দেখি নি।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “'উবুদিয়াতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো স্তর নেই। মু'মিনের জন্য এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ছিলো পবিত্র শবে মিরাজ। এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

-“পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত।” [বনী ইসরাঈল : ১]

তিনি [আল্লাহ তা’আলা] আরো বলেন:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

-“তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন।” [নাজম : ১০] ‘আবিদ’ ছাড়া আরো কোনো উত্তম নাম থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সে নামে ডাক দিতেন।”

এ ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কিরাম আবৃত্তি করতেন:

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

‘আমর’, আমার প্রতিশোধ নেওয়া ‘জাহরা’র দায়িত্ব, যে কেউ শুনে ও দেখে এটা জানে

আমাকে তার দাস ছাড়া আর কোনভাবে সম্বোধন করো না, কারণ এটাই হলো আমার সর্বাধিক সম্মানজনক নাম!

একজন সুফি বলেন, দু’টি বিষয় আছে: স্বাদ পেয়ে নীরব থাকা আর নড়াচড়ার উপর ভরসা করা। এ দুটো থেকে তুমি মুক্তি পেলেই ‘উবুদিয়াতের’ হক্ক আদায় করলে। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দান-খয়রাতে স্বাদ গ্রহণের সন্ধান থেকে সাবধান! কারণ আহলে সফাদের [সুফিদের] জন্য এটা একটি পর্দাস্বরূপ।” হযরত আবু আলী জুযজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রিদ্বা হচ্ছে ‘উবুদিয়াতের’ ঘর, সবর এর দরজা, তাফয়ীদ এর কক্ষ- তাই আওয়াজ দিলে দরজায় দেবে। অবস্থান করলে ঘরে করবে। আর আরাম পেলে এই কামরায়ই পাবে।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “রবুবিয়াত হলো আল্লাহর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বান্দা যতক্ষণ গোলাম হিসাবে থাকবে, ‘উবুদিয়াত তার জন্য হবে চিরসাথী বৈশিষ্ট্য।” একজন সুফি আবৃত্তি করতেন:

যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো, ‘আমি তাঁর গোলাম’।

যদি তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি বলবেন, ‘এইতো আমার ভূত’।

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবাদতের বিনিময়ের প্রতি লক্ষ্য করা থেকে, ইবাদতে যে ভুল-ত্রুটি হয় তার দিকেই দৃষ্টি রাখা উত্তম।” তিনি আরো বলেছেন, “মা’বুদের সাক্ষাতের সময় ইবাদতকে ইবাদত হিসাবে না দেখাই হলো ‘উবুদিয়াতের লক্ষণ।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “‘উবুদিয়াত হলো সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে দেওয়া এবং একটি মাত্র ব্যস্ততায় লিপ্ত থাকা। এই ব্যস্ততাই হলো আসল স্বাধীনতা।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الإرادة

বাবুল ইরাদা [মুরীদ হওয়ার অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: " ولا تطرد الذين يدعون ربَّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " .

وأخبرنا: علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا هشام بن علي قال: حدثنا الحكم بن أسلم قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. فقيل له: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت " .

والإرادة: بدء طريق السالكين، وهي أسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى.

وإنما سميت هذه الصفة: إرادة؛ لأن الإرادة مقدمة كلِّ أمر، فما لم يُرد العبد شيئاً لم يفعله، فلما كان هذا أوَّل الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سُمي: إرادة تشبيهاً بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها.

والمريد، على موجب الاشتقاق: من له إرادة، كما أن العالم: من له علم؛ لأنه من الأسماء المشتقة.

ولكن المريد في عُرف هذه الطائفة: من لا إرادة له، فمن لم يتجرد عن

إرادته لا يكون مريداً، كما أنَّ من لا إرادة له، علي موجب الاشتقاق لا يكون مريداً.

وتكلم الناس في معنى الإرادة؛ فكلُّ عبر علي حسب ما لاح لقلبه، فأكثر المشايخ قالوا: الإرادة: ترك ما عليه العادة وعادة الناس - في الغالب - التعرّيج في أوطان الغفلة، والركونُ إلى اتباع الشهوة، والإخلادُ إلى ما دعت إليه المنية.

والمريد منسلخ عن هذه الجملة؛ فصار خروجه إمارة ودلالة علي صحة الإرادة، فسميت تلك الحالة: إرادة، وهي خروج عن العادة؛ فإن ترك العادة أمانة الإرادة.

فأما حقيقتها: فهي نهوض القلب في طلب الحق، سبحانه، ولهذا يقال: إنها لوعةٌ تهون كل روعة.

سمت: الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول حاكياً علي ممشاد الدينوري، أنه قال: مذ علمتُ أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمارح فقيراً؛ وذلك أن فقيراً قدم عليّ فقال: أيها الشيخ أريد أن تتخذ لي عصيدة. فجرى علي لساني إرادة وعصيدة فتأخر الفقير ولم أشعر به، فأمرتُ باتخاذ عصيدة.. وطلبت الفقير. فلم أجده.. فتعرفت خبره.. فقليل لي: إنه انصرف من فوره، وكان يقول في نفسه: إرادة وعصيدة.. إرادة وعصيدة.. وهام علي وجهه حتى دخل البادية، ولم يزل يقول هذه الكلمات حتى مات.

وعن بعض المشايخ قال: كنت بالبادية وحدي، فضاقت صدري، فقلت: يا إنس، كلموني.. يا جن كلموني، فهتف بين هتف: ما تريد؟ فقلت: أريد الله تعالى، فقال: متى تريد الله؟ يعني: أن من قال للجن والإنس: كلموني، متى يكون مريداً لله عزَّ وجلَّ؟! والمريد لا يفتر آناء الليل والنهار، فهو في الظاهر بنعت المجاهدات، وفي الباطن بوصف المكابدات.. فارق الفراش، ولازم الانكماش، وتحمل المصاعب، وركب المتاعب، وعالج الأخلاق، ومارس المشاق، وعانق الأهوال، وفارق الأشكال، كما قيل:

ثم قطعت الليل في مهمةٍ ... لا أسد أخشى ولا ذيباً

يغلبني شوقي فأطوي السرى ... ولم يزل ذو الشوق مغلوباً

سمعت: الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الإرادة: لوعة في الفؤاد.. لدغة في القلب.. غرام في الضمير.. انزعاج في الباطن.. نيران تتأجج في القلوب.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر السباك يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان بين أبي سليمان وأحمد بن أبي الحواري عقد: لا يخالفه أحمد في شيء يأمره به.. فجاءه يوماً وهو يتكلم في مجلسه، فقال: إن التنور قد سجر، فما تأمر؟ فلم يجبه، فقال مرتين أو ثلاثة، فقال أبو سليمان: اذهب فاقعد فيه!! كأنه ضاق به قلبه، وتغافل عنه أبو سليمان ساعة، ثم ذكر فقال: ادركوا أحمد فإنه في التنور؛ لأنه آلى على نفسه أن لا يخالفني؛ فنظروا فإذا هو في التنور

لم تحترق منه شعرة.

وسمعت الأستاذ أبا علي يقول: كنت في ابتداء صباي محترقاً في الإرادة وكنت أقول في نفسي: ليت شعري!! ما معنى الإرادة. وقيل: من صفات المريدين: التحبب إليه بالنوافل، والخلوص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوه، والتعرض لكل سبب يتوصل إليه، والقناعة بالحمول، وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل إلى الرب.

وقال أبو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء: التزويج، وكتبة الحديث، والأسفار. وقيل له: لم تركت كتابة الحديث؟ فقال: منعتني عنها الإرادة.

وقال حاتم الأصم: إذا رأيت المريد يريد غير مراده، فاعلم أن قد أظهر بذلته.

سمعت: محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الكنانى يقول: من حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء: نومه غلبة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة. وسمعت يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله تعالى بالمريد خيراً أوقعه إلى الصوفية، ومنعه صحبة القراء.

وسمعت يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت الدقاق يقول: نهاية الإرادة أن تشير إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة،

فقلت: فأني شيء يستوعب الإرادة؟ فقال: أن تجد الله تعالى بلا إشارة. سمعت: محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت عباس بن أبي الصحو يقول: سمعت أبا بكر الدقاق يقول: لا يكون للرد مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال عشرين سنة. وقال أبو عثمان الحيري: من لم تصح إرادته بداراً لا يزيد مرور الأيام عليه إلا إدباراً.

وقال أبو عثمان: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره، ينتفع به، ولو تكلم به انتفع به من سمعه. ومن سمع شيئاً من علومهم، ولم يعمل به، كان حكاية يحفظها أياماً ثم ينسها.

وقال الواسطي: أول مقام المريد: إرادة الحق، سبحانه، بإسقاط إرادته.

وقال يحيى بن معاذ: أشد شيء علي المريدين: معاشرة الأضداد. سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا القاسم الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب؛ فليس يجيء منه شيء.

وسمعت يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت جعفر الخالدي يقول: سئل الجنيد: ما للمريدين في مجارة الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله تعالى، يقوي بها قلوب المريدي. فقليل له : فهل لك في ذلك شاهد؟ فقال: نعم، قوله عز وجل: " وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما

نثبت به فؤادك " .

وسمعتہ يقول: سمعت محمد بن خالد يقول: سمعت جعفرًا يقول: سمعت الجنيد يقول: المرید الصادق غني عن علم العلماء. فأما الفرق بين المرید والمراد: فكلُّ مرید علی الحقيقة مرا. إذ لو لم یکن مراد الله تعالى بن یریده لم یکن مریداً؛ إذ لا یكون إلا ما أراده الله تعالى، وكل مرادٍ مرید؛ لأنه إذا أراده الحق سبحانه بخصوصية وفقه للإرادة. ولكن القوم فرقوا بين المرید والمراد: فالمرید عندهم هو المبتدئ، والمراد: هو المنتهي، والمرید: الذي نصب بعین وألقى في مقاسات المشاق، والمراد: الذي كفى بالأمر من غیر مشقة، فالمرید متعنّ، والمراد: مرفوق به مرفقاً.

وسنة الله تعالى مع القاصدين مختلفة، فأكثرهم يوفّقون للمجاهدات، ثم يصلون، بعد مقاساة اللتيّ والتي، إلى سني المعاني. وكثير منهم يكاشفون في الابتداء بجليل المعاني، ويصلون إلا ما لم يصل إليه كثيرون من أصحاب الرياضات، إلا أن أكثرهم يردّون إلى المجاهدات بعد هذه الأرفاق؛ ليستوفي منهم ما فاتهم من أحكام أهل الرياضة.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: متحمّل، والمراد محمول.

وسمعتہ يقول: كان موسى، عليه السلام، مریداً، فقال: " ربي اشرح لي صدري " ، وكان نبينا، صلى الله عليه وسلم، مراداً، فقال الله تعالى: " ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

ذكرك " . وكذلك قال موسى عليه السلام: " رب، أرني أنظر إليك، قال: لن تراني " وقال لنبينا، صلى الله عليه وسلم: " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل " .

وكان أبو علي يقول: إن المقصود قوله " ألم تر إلى ربك " وقوله: " كيف مد الظل " : ستر للقصة وتحصين للحالة. وسئل الجنيد، رحمه الله، عن المريد والمراد، فقال: المريد: تتولاه سياسة العلم، والمراد: تتولاه رعاية الحق، سبحانه، لأن المريد يسير، والمراد يطير، فمتى يلحق السائر الطائر؟ وقيل: أرسل ذو النون إلى أبي يزيد رجلاً، وقيل له: قل له إلى متى النوم والراحة، وقد جازت القافلة؟! فقال أبو يزيد: قل لأخي ذي النون: الرجل من ينام الليل كله، ثم يصبح في المنزل قبل القافلة. فقال ذو النون: هنيئاً له؛ هذا كلام لا تبلغه أحوالنا.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

-“আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে।” [আনআম : ৫২]

হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো মানুষের কল্যাণ চান, তাকে কাজে লাগিয়ে দেন।” জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কিভাবে কাজে লাগান? জবাব দিলেন, “মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎকাজের শক্তি প্রদান করা হয়।”

ইরাদা হলো সলিকদের রাস্তার সূচনা। আল্লাহর পথযাত্রীদের প্রথম স্তর হলো ইরাদা। প্রতিটি বিষয়ের সূচনা হয় ইরাদার মাধ্যমে। এ কারণে, এ বৈশিষ্ট্যকে এই নামে

নামকরণ করা হয়েছে। কারণ বান্দা যতক্ষণ কোনো কাজের ইরাদা করবে না ততক্ষণ সে তা করবেও না। যে ব্যক্তির ইরাদা আছে তাকেই বলে মুরীদ। যেমন জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বলা হয় আলিম। আলিম যেমন ‘ইল্ম’ থেকে উদ্ভূত, ঠিক তদ্রূপ মুরীদ উদ্ভূত হয়েছে ইরাদা থেকে। সুফিয়াকে কিরামের ভাষায় ঐ ব্যক্তিকে মুরীদ বলে যার কোনো ইরাদা নেই! নিজ ইরাদা ও ইচ্ছা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মুরীদ হতে পারবে না। ইরাদার তাৎপর্য নিয়ে সুফিয়ায়ে কিরামের অনেক কথা আছে। প্রত্যেকেই নিজের অন্তরে যেভাবে ব্যাপারটি ফুটে ওঠেছে ঠিক সেভাবেই বলেছেন। অধিকাংশ মাশায়িখের অভিমত হলো, অভ্যাসানুসারে যাকিছু করা হয় তা ছেড়ে দেওয়াই হলো ইরাদা। অভ্যাসের অর্থ, উদাসীনতার ভাব, প্রবৃত্তির অনুসরণে ঝোঁকে পড়া এবং কল্পনাতে যা-ই আসে তাতে জড়িয়ে পড়া। মুরীদ ব্যক্তিকে সবকিছু থেকে মুক্ত হতে হবে। আর এই মুক্ত হওয়াটাই হলো ইরাদা শুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ। এই অবস্থাকেই বলে ‘ইরাদা’ - অর্থাৎ আদৎ অভ্যাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কারণ আদৎ বর্জনের মধ্যেই ইরাদার নিদর্শন নিহিত।

ইরাদার হাক্কিকাত হলো আল্লাহর সন্ধানে অন্তরের জাগরণ। এজন্য বলা হয়, এটা একটি দাহন, যা অন্য সব দাহনকে নীচে ফেলে দেয়। উস্তাদ আবু আলী দাক্বাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, যেদিন থেকে জানতে পেরেছি দরবেশদের প্রতিটি হালই বাস্তবভিত্তিক, সেদিন থেকে কোনো দরবেশকে নিয়ে আমি তামাশা করি নি।”

একজন সুফী শায়খ বলেন, আমি জঙ্গলে একাকী ছিলাম। আমার অন্তর সংক্ষীর্ণ হয়ে ওঠলো। হঠাৎ বলে ওঠলাম, হে মানব সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে কথা বলো! হে জিন সম্প্রদায় আমার সঙ্গে কথা বলো! তখন এক আওয়াজ শুনলাম, তুমি কী চাও? বললাম, আল্লাহকে চাই! আবার আওয়াজ আসলো, তুমি আল্লাহকে কিভাবে চাও? তুমি যদি আল্লাহকে চাও, তাহলে জিন ও মানুষকে ডাকছো কেনো? মুরীদ তো দিবারাত্র কখনো অলস হয় না। সে তো জাহির ও বাতিনে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত থাকে। তা-ই বিছানা ত্যাগ করো, কষ্ট করো, সাধনা করো, চরিত্রের চিকিৎসা করো, বিপদ-আপদের আলিঙ্গন করো, যুক্তি-তর্ক বর্জন করো। একজন শায়খ এ সম্পর্কে আবৃত্তি করতেন:

আমি মরুভূমিতে রাত্রিযাপন করেছি, ভয় পাইনি হিংস্র সিংহ কিংবা নেকড়ে বাঘের

বিরহ যন্ত্রণা আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, আমি ছুটে চলেছি রাতব্যাপী, কারণ আমার আবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি।

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইরাদা হলো আত্মার একটি দাহন, অন্তরের এক দংশন। ইরাদা তো এমন এক জিনিস যা অন্তরে কেবল দাউদাউ করে।” হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু সুলাইমান ও আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারির মধ্যে আনুগত্যের বন্ধন ছিলো। আহমদ কখনো আবু সুলাইমানের নির্দেশ অমান্য করতেন না। একদিন তিনি আবু সুলাইমানের দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চুলায় আগুন জ্বলছে, আপনি কি নির্দেশ দিবেন? তিনি নিরোত্তর রইলেন। এভাবে একই প্রশ্ন দু’তিন বার করলেন। এরপর আবু সুলাইমান নির্দেশ দিলেন, যাও! তুমি এতে বসে পড়ো! যেনো তিনি বিরক্তিবোধ করছিলেন। দীর্ঘসময় তিনি আহমদ থেকে উদাসীন ছিলেন। এরপর হঠাৎ আহমদের কথা মনে পড়লো। লোকদেরকে বললেন, ওহে! আহমদকে এশুগি নিয়ে আসো। সে তো চুলায় বসে আছে। সে শপথ করেছে, আমার নির্দেশ কখনো অমান্য করবে না। লোকজন ছুটে গেলো। দেখলো আহমদ ঠিকই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত চুলায় বসে আছেন। কিন্তু তার শরীরের একটি পশমও জ্বলে নি!”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, শৈশবকালে ইরাদা সম্পর্কে আমার অন্তরে একটি অগ্নিদাহ ছিলো। মনে মনে আক্ষেপ করে বলতাম, হায়! যদি ইরাদার অর্থ কী তা বুঝতে পারতাম! বর্ণিত আছে, মুরীদদের বৈশিষ্ট্য হলো নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মুহাব্বাত সৃষ্টি করা। উত্তমের কল্যাণ কামনায় নিষ্ঠা অবলম্বন করা। একাকীত্ব পছন্দ করা। আল্লাহর বিধান পালনে কষ্ট সহ্য করা। তাঁর বিধানকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া। নিজের প্রতি কারো দৃষ্টি পড়লে লজ্জাবোধ করা। মাহবুবকে পাওয়ার জন্য সবকিছু খরচ করা। তাঁর সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত অন্তর অস্থির থাকা। হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তিনটি বিষয় মুরীদের জন্য বিপদ: ১. বিবাহ করা, ২. হাদিস লেখা ও ৩. ভ্রমণ করা”। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি হাদিস লেখা কেনো ছেড়ে দিলেন? জবাব দিলেন “ইরাদা আমাকে বাঁধা দিয়েছে।”

হযরত হাতিমে আছম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যখন দেখবে মুরীদ তার মুরাদ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইরাদা করছে, জেনে রেখো এতেই তার অপদস্ততা প্রকাশ পেলো।” হযরত কান্ডানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তিনটি বিষয় মুরীদের মধ্যে প্রজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ: ১. ঘুম হবে জাগরণ, ২. ক্ষুধা হবে তার আহার এবং ৩. কথাবার্তা হবে একদম প্রয়োজনমাত্রিক।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ যখন মুরীদকে কল্যাণ দানে আগ্রহশীল হন, তখন তাকে সুফিদের নিকট পৌঁছে দেন এবং ক্বারীদের সান্নিধ্য থেকে রক্ষা করেন।” হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “তুমি ইশারা করবে, আর এরই মাধ্যমে আল্লাহকে পেয়ে যাবে। এটাই হলো ইরাদার সর্বশেষ স্তর।” শ্রবণকারী হযরত রুকি রাহমাতুল্লাহি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ইরাদা পরিপূর্ণ হবে কিসে? জবাব দিলেন, “ইশারা ছাড়াই আল্লাহকে পেয়ে যাওয়া!”

হযরত আবু বকর দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বললেন, “বাম কাঁধের ফিরিশতা বিশ বছর একনাগাড়ে না লিখা পর্যন্ত কেউ মুরীদ হতে পারবে না।” হযরত আবু উসমান-হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি দ্রুত শুদ্ধভাবে ইরাদা করবে না, সময় তাকে কেবল পেছন দিকে নিয়ে যাবে।” তিনি আরো বলেছেন, “সুফিয়ায়ে কিরামের কাছ থেকে কোনো মুরীদ উপদেশ শুনার পর যদি তার উপর আমল করে, মৃত্যু পর্যন্ত এটি তার অন্তরে এক হিকমাত হয়ে থাকবে। সে এর দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে। এই উপদেশ নিয়ে যদি সে অন্যদের সাথে আলাপ করে তাহলে তারাও তা-তে উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে মুরীদ যদি উপদেশ শুনে আমল করে না, তাহলে তার অন্তরে তা ক’দিন মাত্র স্থায়ী থাকবে- এরপর সে ভুলে যাবে।”

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুরীদের প্রথম মাক্কা হচ্ছে, নিজের ইরাদা বিলুপ্ত করে একমাত্র আল্লাহ তা’আলার ইরাদা করা।” হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যখন দেখবে মুরীদ রুখসাত ও উপার্জনে লিপ্ত, তখন তার কাছ থেকে আর কিছুই বেরিয়ে আসবে না।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, মুরীদরা যদি সুফিয়ায়ে কিরামের গল্প-কাহিনী বর্ণনা করেন, তাতে কি কোনো কল্যাণ আছে? তিনি জবাব দিলেন, “সুফিদের কেছা-কাহিনী আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে একদল

সৈনিকস্বরূপ। এদের দ্বারা তিনি মুরীদদের অন্তর দৃঢ় করেন।” জিজ্ঞেস করা হলো, এ কথাটির প্রমাণ কি? জবাবে বললেন, “হ্যাঁ, প্রমাণ তো আছে, আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ * وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

–“আর আমি রাসূলগণের সব ব.,ভাস্তাই তোমাকে বলছি, যদ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করেছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।” [হূদ : ১২০]”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, “সত্যিকারের মুরীদ আলিমদের ইলমের মুখাপেক্ষী নয়।”

মুরীদ ও মুরাদের মধ্যে পার্থক্য

প্রত্যেক মুরীদই মুরাদ। কারণ, কোনো মুরীদ যদি আল্লাহর মুরাদ না হয় তাহলে মুরীদ হতে পারবে না। আর প্রত্যেক মুরাদও মুরীদ। কারণ, সে আল্লাহ তা’আলার ইরাদা করে। তবে সুফিয়ায়ে কিরাম বলেছেন, তরীকতের প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিকে বলে মুরীদ আর চূড়ান্ত স্তরের ব্যক্তিকে বলে মুরাদ। মুদীরকে আল্লাহর বিধান পালনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। মুরাদের জন্য নির্দেশই যথেষ্ট, কষ্ট সহ্য লাগে না। তাই বলা যায় মুরীদ মানে যন্ত্রণা সহ্যকারী। আর মুরাদ মানে বিলাসী।

আল্লাহর পথের পথিকদের সাথে তাঁর আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশকেই মুজাহাদার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অতঃপর প্রচুর কষ্ট সহ্য করে উচ্চস্তরে উন্নীত হন। আর একদল লোক প্রথম পর্যায়ে উচ্চাঙ্গের বিষয়ে মুকাশাফা করেন। এরপর রিয়াজতে যে পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তবে তারাও মুজাহাদা করেন যাতে করে কোনো কমতি থাকলে তা তার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

বলতেন, “মুরীদ হচ্ছে বাহক- আর মুরাদকে বহন করা হয়।” তিনি আরো বলেছেন,
“হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম ছিলেন মুরীদ- আল্লাহ তা’আলা বলেন:

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

-“বললেন: হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।” [তোয়া-হা : ২৫]
পক্ষান্তরে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুরাদ, আল্লাহ
তা’আলা বলেন:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا

Khanqa-e-Ali Center, Sylhet

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

-“আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিই নি? আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা,
যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।”
[ইনশিরাক : ১-৪]

ALL RIGHTS RESERVED

মুসা আলাইহিস্‌সালাম বলেছিলেন:

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

-“বললেন, হে আমার প্রভু! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেনো আমি তোমাকে
দেখতে পাই।” [আ’রাফ : ১৪৩]

জবাব আসলো:

قَالَ لَنْ تَرَاني

-“বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না!” [আ’রাফ : ১৪৩]

আর আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা’আলা
বলেছিলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

-“তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন?”
[ফুরকান : ৪৫]

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মুরীদ ও মুরাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, “মুরীদকে তার জ্ঞান পরিচালনা করে। আর মুরাদ পরিচালিত হয় আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা। মুরীদ চলে আর মুরাদ উড়ে বেড়ায়। তাই, স্থলের পথিক কখনো আকাশের চলন্ত ব্যক্তির সাথে মিলতে পারে না।” বর্ণিত আছে হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন এ কথা জিজ্ঞাসার জন্য, “ঘুম ও আরাম আর কতো! কাফিলা তো চলে গেল?” আবু ইয়াজিদ জবাব দিলেন, “আমার ভাই যুননূনকে গিয়ে বলো, এই লোকটি তো সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়। অতঃপর কাফিলার পূর্বেই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়!” উত্তরটি শুনে যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “এটি তো উচ্চতর স্তরের কথা। তাতো আমাদের হালের বাইরে।”

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الاستقامة

বাবুল ইস্তিক্বামাত [অটল থাকা অধ্যায়]

قال الله تعالى: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا".

أخبرنا: الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك، رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: أخبرنا أبو بشر يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان مولي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير دينكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن".

ALL RIGHTS RESERVED

والاستقامة: درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب جهده؛ قال الله تعالى: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً".

ومن لم يكن مستقيماً في صفته لم يرتق من مقامه إلى غيره، ولم يبن سلوكه على صحة؛ فمن شرط المستأنف: الاستقامة في أحكام البداية، كما أن من حق العارف الاستقامة في آداب النهاية.

فمن أمارات استقامة أهل البداية: أن لا تشوب معاملاتهم فترة. ومن أمارات استقامة أهل الوسائط: أن لا يصحب منازلهم وقفة.

ومن أمارات استقامة أهل النهاية: أن لا تتداخل مواصلتهم حجة. سمعت: الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: الاستقامة؛ لها ثلاثة مدارج: أولها: التقويم، ثم الإقامة، ثم الاستقامة؛ فالتقويم، من حيث تأديب النفوس. والإقامة: من حيث تهذيب القلوب، والاستقامة: من حيث تقريب الأسرار.

وقال أبو بكر، رضي الله عنه، في معنى قوله: "ثم استقاموا": لم يشركوا.

وقال عمر، رضي الله عنه، لم يزوغوا زوغان الثعالب.

فقول الصديق، رضي الله عنه، محمول على مراعاة الأصول في التوحيد.

وقول عمر، رضي الله عنه، محمول على طلب التأويل والقيام بشرط العهود.

ALL RIGHTS RESERVED

وقال ابن عطاء: استقاموا على انفراد القلب بالله تعالى.

وقال أبو علي الجوزجاني: كن صاحب الاستقامة، لا طالب الكرامة، فإن

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك، عز وجل، يطالبك بالاستقامة.

سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا عليّ الشَّبُوي

يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: روى عنك يا

رسول الله أنك قلت: "شيبتي هود" فما الذي شيبك منها: قصص الأنبياء

وهلاك الأمم؟ فقال: لا، ولكن قوله تعالى: "فاستقم كما أمرت".

وقيل: إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات،

ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق؛

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا".
وقال الواسطي: الخصلة التي بها كملت المحاسن، وبفقدتها قبحت
المحاسن: الاستقامة.

وحكى عن الشبلي، رحمه الله، أنه قال: الاستقامة: أن تشهد الوقت قيامة.
ويقال: الاستقامة في الأقوال: بترك الغيبة، وفي الأفعال: بنفي البدعة، وفي
الأعمال بنفي الفترة، وفي الأحوال بنفي الحجة.

سمعت: الأستاذ الإمام أبا بكر محمد بن الحسين بن فورك يقول: السيد
في الاستقامة: سين الطلب، أي: طلبوا من الحق، تعالى، أن يقيمهم على
توحيدهم، ثم على استدامة عهودهم، وحفظ حدودهم.

قال الأستاذ: واعلم أن الاستقامة: توجب دوام الكرامات، قال الله تعالى: "
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا" ولم يقل: سقيناهم، بل
قال: "أسقيناهم" يقال: أسقيته إذا جعلت له سقيا؛ فهو يشير إلى الدوام.

سمعت: محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت الحسين بن أحمد
يقول: سمعت أبا العباس الفرغني يقول: قال الجنيد: لقيت شاباً من
المريدين في البادية تحت شجرة من شجر أم غيلان فقلت: ما أجلسك ها
هنا؟ فقال: مال افتقدته، فمضيت وتركته. فلما انصرفت من الحج إذا أنا
بالشاب قد انتقل إلى موضع قريب من الشجرة، فقلت: ما جلوسك هنا؟
فقال: وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضع فلزمته.

فقال: الجنيد: فلا أدري أيُّهما كان أشرف: لزومه لا فتقاده حاله، أو لزومه للموضع الذي نال فيه مراده.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

–“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে।”
[আহকুফ : ১৩ এবং হা-মীম-সিজদাহ : ৩০]

হযরত সাওবান রাহিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা অটল থাকো। গণনা করো না। জেনে রাখো দ্বীনের শ্রেষ্ঠ কাজ হলো ন্যায়। সত্যিকার মু'মিনই কেবল প্রযুক্তির প্রতি মনোযোগী থাকে।”

ইস্তিকামাত হলো প্রতিটি কাজের পূর্ণতাদানকারী। এর দ্বারাই সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সুশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে ইস্তিকামাত নেই, তার চেষ্টা-সাধনা সবকিছুই ব্যর্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

–“তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে।” [নাইল : ৯২]

তাই ইস্তিকামাত ছাড়া কেউ এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে পারবে না। আল্লাহর পথে চলা তার জন্য পরিশুদ্ধ হবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির জন্য মৌলিক বিধি-বিধানের ইস্তিকামাত শর্ত। যেমনটি, আ'রিফের জন্য চূড়ান্ত স্তরের ইস্তিকামাত একান্ত শর্ত। প্রাথমিক স্তরের লোকদের মধ্যে ইস্তিকামাতের নিদর্শন হলো কাজেকর্মে উদাসীনতা না থাকা। মধ্যম স্তরের লোকদের ইস্তিকামাতের পরিচয় হলো উচ্চ স্তর পাড়ি দিতে কোনো বিরতি অবলম্বন না করা। আর চূড়ান্ত স্তরের ইস্তিকামাতের নিদর্শন হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে কোনো ধরনের পর্দার সম্মুখীন না হওয়া। উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইস্তিকামাতের স্তর তিনটি: ১. তাক্বীম [সংবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সবকিছু সঠিক রাখা], ২. ইকামাত [প্রতিষ্ঠা করা] ও ৩. ইস্তিকামাত [অটল থাকা]। নফসকে

শিক্ষাদানের নাম হলো তাকুয়ীম। কুলবের পরিশুদ্ধি হলো ইকামাত। আর অন্তঃস্থলকে গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী করার নাম ইস্তিকামাত।”

হযরত আবু বকর রাহিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তা’আলার কথা: “তারা অটল থাকলো।” অর্থাৎ তারা শিরক করে নি। হযরত উমর রাহিআল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ শৃগালের মতো বক্র হয়ে তারা চলে নি। হযরত আবু বকর রাহিআল্লাহু আনহুর কথার অর্থ হলো তাওহীদের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করা। পক্ষান্তরে হযরত উমর রাহিআল্লাহু আনহুর কথার অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রতিজ্ঞাসমূহের শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহর সাথে অন্তরের একাকীত্বে তারা অটল থাকলো।” হযরত আবু আলী জুযজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইস্তিকামাত অবলম্বন করো। কারামাতের সন্ধানে লেগো না। কারামাতের সন্ধানে থাকলে তোমার নফস কেবল নড়াচড়া করবে। পক্ষান্তরে তোমার প্রভু তো তোমার নিকট থেকে কেবলমাত্র ইস্তিকামাত চান।” হযরত আবু আলী শাবায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি স্বপ্নে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছেন সূরায়ে হুদ আপনাকে বুদ্ধ বানিয়েছে। সূরার কোন্ অংশটি- নবীদের গল্প-কাহিনী না বিভিন্ন জাতির ধ্বংস-বৃত্তান্ত আপনাকে এরকম করলো? তিনি জবাব দেন, না- বরং আল্লাহ তা’আলার এই কথাটি,

Ali Centre, Syedhazar, Sylhet

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ

-“সোজা পথে চলে যাও, যেভাবে তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে।” [হুদ : ১১২]”

বলা হয়ে থাকে, একমাত্র বিশেষজ্ঞ লোকেরা ইস্তিকামাতের অধিকারী হতে পারেন। কারণ, রুসুমাত ত্যাগ আর সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মনা থাকাই হলো আসল সত্যবাদিতা। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অটল-অবিচল থাকো, কখনো গণনা করো না।

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইস্তিকামাত এমন একটি আদর্শ-যার দ্বারা সর্বপ্রকার সৌন্দর্যে পূর্ণতা আসে। আর এর অনুপস্থিতিতে সুন্দর অনুসন্দর হয়ে যায়।” হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইস্তিকামাত হলো আপনি বর্তমানকে কিয়ামতের সময় হিসাবে মনে করবেন।” বর্ণিত আছে,

কথাবার্তার ইস্তিকামাত হলো গীবত ছেড়ে দেওয়া। কাজ-কর্মের ইস্তিকামাত হলো বিদআত ও অলসতা বর্জন করা। হালের ইস্তিকামাত হলো পর্দা সরিয়ে দেওয়া। উস্তাদ হযরত ইবনে ফুরাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইস্তিকামাতের সীন অক্ষর হলো অনুসন্ধানের জন্য, তাই [পূর্বোল্লিখিত] আয়াতের মর্মার্থ হবে, তারা আল্লাহ তা’আলার উপর এই পার্থনা করেন, যেনো তাদেরকে তাওহীদের উপর অটল রাখেন এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ ও সীমানা রক্ষায় তাওফিক দান করেন।” উস্তাদ আরো বলেন, “ইস্তিকামাতের দ্বারা সম্মান আবশ্যিক। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا

-“আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিজ্ঞ করতাম”। [৭২:১৬]

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জঙ্গলে উন্মে গাইলানের [বাবলা] বৃক্ষের নীচে এক যুবক মুরীদকে দেখতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেনো এখানে বসে আছো? জবাব দিলো, আমার একটি মাল হারানো গেছে। একথা শুনে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। হাজ্জ আদায় করে আমি যখন আবার একই স্থান দিয়ে অতিক্রম করি, তখনো যুবকটিকে ঐ বৃক্ষের পাশে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আরে! এখনও বসে আছো- কি জন্য? সে জবাব দেয়, হারানো জিনিসটি আমি এখানে পেয়েছি। তাই বসে আছি।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি জানি না কোন্টি উত্তম- হারিয়ে যাওয়া হালকে ধরে রাখা নাকি যে স্থানে একে পাওয়া গেলো সেটি ধরে রাখা উত্তম?”

باب الإخلاص

বাবুল ইখলাস [একনিষ্ঠতা অধ্যায়]

قال الله تعالى: "ألا لله الدين الخالص".

أخبرنا: علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد الغرياني قال: حدثنا أبو طلوت قال: حدثني هانيء بن عبد الرحمن بن أبي عقبة، عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي قال: حدثني عطية ابن وشاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين".

وقال الأستاذ: الإخلاص، إفراذ الحق، سبحانه، في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخر؛ من تصنّع لمخلوق أو اكتساب محمّدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى.

ويصحّ أن يقال: الإخلاص: تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين.

ويصحّ أن يقال الإخلاص: التوقّي عن ملاحظة الأشخاص.

وقد ورد خبر مسند: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل، عليه السلام، عن الله سبحانه وتعالى، أنه قال: الإخلاص سر من سري،

استودعته قلب من أحبته من عبادي " .

سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: وقد سألته عن الإخلاص: ما هو؟ فقال: سمعت: علي بن سعيد، وأحمد بن محمد بن زكريا، وقد سألتهما عن الإخلاص، فقالا: سمعنا علي بن إبراهيم الشقيقي، وقد سألناه عن الإخلاص، فقال: سمعت: محمد بن جعفر الخصاف، وقد سألته عن الإخلاص، فقال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت الحسن عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت حذيفة عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص: ما هو؟ قال: سألت ربّ العزة عن الإخلاص: ما هو؟ قال: " سرّ من سرّي استودعته قلب من أحبته من عبادي " .

سمعت: الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: الإخلاص: التوقيّ عن ملاحظة الخلق، والصدق: التنقيّ من مطالعة النفس فالملخلص؛ لا رياء له، والصادق: لا إعجاب له.

وقال ذو النون المصري: الإخلاص: لا يتم إلا بالصدق فيه، والصبر عليه، والصدق لا يتم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه.

وقال أبو يعقوب السوسي: متى شهدوا في إخلاصهم الخلاص إحتاج

إخلاصهم إلى إخلاص.

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة.

سمعت: الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الإخلاص: ما يكون للنفس فيه حظ بحال، وهذا إخلاص العوام. وأما إخلاص الخواص: فهو ما يجري عليهم، لا بهم، فتبدو منهم الطاعات، وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية، ولا بها اعتداد، فذلك: إخلاص الخواص.

وقال أبو بكر الدقاق: نقصان كل مخلص في إخلاصه: رؤية إخلاصه؛ فإذا أراد الله تعالى أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه؛ فيكون مخلصاً لا مخلصاً.

وقال سهل: لا يعرف الرب إلا مخلص.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الجوهري يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: قال لي رويم: قال أبو سعيد الخزاز: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين.

وقال ذو النون: الإخلاص: ما حفظ من العدو أن يفسده.

وقال أبو عثمان: نسيان رؤية الخلق به وام النظر إلى فضل الخالق.

وقال حذيفة المرعشي: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن.

وقيل: الإخلاص: ما أريد به الحق، سبحانه، وقُصد به الصدق.

وقيل: الإغماض عن رؤية الأعمال.

سمعت: محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الحسين الفراسي

يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عليّ بن عبد الحميد يقول:

سمعت السري يقول: من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

تعالى.

وسمعت يقول: سمعت عليّ بن بندار الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن

محمود يقول: سمعت محمد بن عبد ربه يقول: سمعت الفضيل يقول ترك

العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص:

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

أن يعافيك الله منهما.

وقال الجنيد: الإخلاص سرٌّ بين الله تعالى وبين العبد، لا يعلمه مَلَكٌ

فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله.

وقال رويم: الإخلاص من العمل هو: الذي لا يريد صاحبه عليه عوضاً من

الدارين، ولا حَظٌّ من الملكين.

وقيل لسهل بن عبد الله: أيُّ شيء أشدُّ على النفس؟ فقال: الإخلاص: لأنه

ليس لها فيها نصيب.

وسئل بعضهم عن الإخلاص: فقال: أن لا تشهد على عملك غير الله عز وجل.

وقال بعضهم: دخلت علي سهل بن عبد الله يوم الجمعة قبل الصلاة بيتاً.. فرأيت في البيت حيّة. فجعلت أقدم رجلاً وأؤخر أخرى، فقال: ادخل، لا يبلغ أحدٌ حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شيء يخافه. ثم قال: هل لك في صلاة الجمعة؟ فقلت: بيننا وبين المسجد مسيرة يوم وليلة.. فأخذ بيدي، فما كان إلا قليل حتى رأيت المسجد، فدخلناه؛ وصلينا الجمعة. ثم خرجنا؛ فوقف ينظر إلى الناس وهم يخرجون، فقال: أهل لا إله إلا الله كثير، والمخلصون منهم قليل.

أخبرنا: حمزة بن يوسف الجرجاني قال: حدثنا محمد بن محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال: حدثنا أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني قال: حدثنا زكريا بن نافع قال: حدثنا محمد بن يزيد القراطيسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مكحل قال: ما أخلص عبداً قط أربعين يوماً، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: أعزُّ شيء في الدنيا الإخلاصُ، وكن أجتهد في إسقاط الرياء

عن قلبي، فكأنه ينبت فيه على لون آخر.

وسمعتة يقول: سمعت النصراباذي يقول: سمعت أبا الجهم يقول: سمعت ابن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان يقول: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسوس والرياء.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

-“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত [দ্বীন] আল্লাহরই নিমিত্ত।” [যুমার : ৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃরাঃ আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলমানের অন্তরে হিংসা আসে না: ১. আল্লাহর জন্য ইখলাসের সাথে কাজ করা, ২. দেশের শাসকের কল্যাণ কামনা করা এবং ৩. মুসলমান জামআতের সঙ্গে লেগে থাকা।”

হযরত উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইখলাস হলো, ইবাদত পালনে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ইচ্ছা করা। আল্লাহর ইবাদত করবে একমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য- অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। যেমন, মানুষের প্রশংসা লাভের আশা বা তাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা অর্জন ইত্যাদি।” তাই বলা যায়, সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে কর্মের পরিশুদ্ধতাই হলো ইখলাস। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রীল আলাইহিসসালাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “ইখলাস আমার এক গুণ্ত রহস্য। যে বান্দাকে স্নেহ করি আমি এটি তার অন্তরে আমানত হিসাবে রেখে দিই।”

আমি শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইখলাস কী? তিনি জবাব দিলেন, “আমি আলী ইবনে সাঈদ এবং আহমদ ইবনে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইখলাস কী? তারা বলেন, আমরা ইব্রাহীম শাকিকীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ খাসসাফকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি ইবনে বাশশারকে জিজ্ঞেস করলাম ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি আবু ইয়াকুব সুরাইতিকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনি

বললেন, আমি আহমদ ইবনে গাস্‌সানকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনিও বললেন, আমি আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী, তিনি বললেন, আমি হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি হুজাইফা রাঈআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনি জবাব দিলেন, আমি হযরত জিব্রীল আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ রাক্বুল ইয়্যাজাতকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ রাক্বুল ইয়্যাজাতকে জিজ্ঞেস করেছি ইখলাস কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, “ইখলাস আমার এক গুণ্ড রহস্য। যে বান্দাকে স্নেহ করি আমি এটি তার অন্তরে আমানত হিসাবে রেখে দিই।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মাখলুকের দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার নাম ইখলাস। আর নফসের দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার নাম সিদ্ক। তাই রিয়াজীন ব্যক্তি হলো মুখলিস। আর যার মধ্যে আত্মপ্রীতি নেই তিনি হলেন সাদিক।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সিদ্ক ছাড়া ইখলাস পূর্ণ হয় না। আর ইখলাস ছাড়া সিদ্ক পূর্ণ হয় না।” তিনি আরো বলেন, “ইখলাসের আলামত হলো প্রশংসা ও নিন্দা নিজের কাছে সমান হওয়া। নিজের আমলের দিকে দৃষ্টিপাত ভুলে যাওয়া। পরকালীন জীবনে আমলের বিনিময় পাওয়ার কথাও ভুলে যাওয়া।” হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইখলাস হলো নফসের মধ্যে হালের স্বাধ অনুভব- আর এটা সাধারণ লোকের ইখলাস। পক্ষান্তরে বিশেষ লোকদের ইখলাস হলো তারা আনুগত্য করবেন, কিন্তু এর প্রতি কোনো দৃষ্টি পড়বে না- তারা এগুলো গণনাও করবেন না।”

হযরত আবু বকর দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুখলিস যদি তার ইখলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহলে ত্রুটি সৃষ্টি হবে। তাই সত্যিকারের মুখলিসের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখেন।” হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহকে একমাত্র মুখলিসই চিনতে পারেন।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুরীদদের ইখলাস থেকে আরিফদের রিয়াও অনেক উত্তম।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইখলাস হলো শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সমপর্যায়ের কাজ।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সৃষ্টির

দৃষ্টিপাতকে ভুলে যাওয়া আর স্রষ্টার করুণার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নাম ইখলাস।” বলা হয়, আল্লাহকে পাওয়ার নামই ইখলাস।

হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কিছু অবলম্বন করে মানুষকে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে চায় যা তার মধ্যে আদৌ নেই, সে ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে।” হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে রিয়া। আর মানুষের জন্য আমল করা হলো শিরক। আর ইখলাস হলো এ উভয়টি থেকে আল্লাহ তা’আলা আপনাকে মুক্তি দান করেন।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইখলাস হলো, আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার এক রহস্য। ফিরিশতা এটা জানেন না, তিনি যে লিখবেন। শয়তান জানে না, সে যে এটিকে নষ্ট করবে। আর না জানে প্রবৃত্তি যে এটাকে বাঁকা বানাবে।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইখলাস হলো তুমি আমল করে ইহ-পরকালে বিনিময় লাভের প্রত্যাশা করবে না। আর না লিখক ফিরিশতাদের কাছ থেকেও।” হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো নফসের জন্য কোন বিষয়টি অতি কষ্টকর? তিনি জবাব দিলেন, “ইখলাস। কারণ এতে নফসের কোনো অংশীদারিত্ব নেই।” একজন শায়খকে ইখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেন, আমলের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আরেকজন শায়খ বলেন, আমি জুমুআর দিন হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। গৃহের মধ্যে একটি সাপ চোখে পড়লো। আমি একপা সামনে বাড়াছিলাম আর একপা পেছনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি ভেতর থেকে বললেন, এসো! ঈমানের হাক্কিকাতে পৌঁছুতে হলে দুনিয়ার কোনো কিছুকে ভয় করলে চলবে না। অতঃপর বললেন, তুমি জুমুআর নামায আদায় করে নিয়েছো? জবাব দিলাম, না। তিনি আমার হাতে ধরলেন। একটু হেঁটেই দেখতে পেলাম মসজিদ। আমরা সেখানে আদায় করে নিলাম জুমুআর নামায। এরপর বেরিয়ে আসলাম। লোকজনও চলে আসছিলো। তিনি তাদের দিকে চেয়ে বললেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র লোকজন তো অনেক। কিন্তু মুখলিসদের সংখ্যা একদম কম!”

হযরত মুকহাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো মানুষ যদি চল্লিশ দিন যাবৎ ইখলাস অবলম্বন করে, তবে তার অন্তর ও মুখ দিয়ে হিকমাতের বারণাসমূহ ভেসে যায়।” হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “পৃথিবীতে ইখলাস হলো সর্বোচ্চ স্তর। যখনই আমি লৌকিকতা দূর করার চেষ্টা করেছি, তখনই মনে হতো অন্তরে একটি রঙ ধারণ করছে।” হযরত আবু সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দা যখন ইখলাস অবলম্বন করে, তার মধ্য থেকে প্রবঞ্চনা ও লৌকিকতার প্রাবল্য কমে যায়।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الصدق

বারুস সিদ্ক [সত্যবাদিতা অধ্যায়]

قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".

أخبرنا: الإمام أبو بكر محمد بن فورك، رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقاً، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً".

قال الأستاذ: والصدق: عماد الأمر، وبه تمامه، وفيه نظامه، وهو تالي درجة النبوة، قال الله تعالى: "فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين.. " الآية.

والصادق الاسم اللازم من الصدق، والصديق المبالغة منه: وهو الكثير الصدق، الذي الصدق غالبه، كالسكير والخمير.. وبابه.

وأقل الصدق: استواء السر والعلانية. والصادق: من صدق في أقواله.

والصديق: من صدق في جميع أقواله، وأفعاله وأحواله.

وقال أحمد بن خضروية: من أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم

الصدق؛ فإن الله تعالى قال: "إن الله مع الصادقين".

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول: الصادق: ينقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة. وقال أبو سليمان الداراني: لو أراد الصادق أن يصف ما في قلبه ما نطق به لسانه.

وقيل الصدق: القول بالحق في مواطن الهلكة. وقيل: الصدق: موافقة السرِّ النطق.

وقال القناد: الصدق: منع الحرام من الشدق.

وقال عبد الواحد بن زيد: الصدق: الوفاء لله سبحانه بالعمل.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره.

وقال أبو سعيد العرشي: الصادق: الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف، قال الله تعالى: "فتمنوا الموت إن كنتم صادقين".

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: كان أبو علي الشقي يتكلم يوماً، فقال له عبد الله بن منازل: يا أبا علي، استعد للموت فلا بد منه. فقال أبو علي: وأنت يا عبد الله، استعد للموت فلا بد منه. فتوسد عبد الله

ذراعہ، ووضع رأسہ، وقال: قد مِتُّ.
فانقطع أبو علي؛ لأنه لم يمكنه أن يقابله بما فعل، لأنه كان لأبي عليّ
علاقات وكان عبد الله مجرداً لا شغل له.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: كان أبو العباس
الدينوري يتكلم.. فصاحت عجوز في المجلس صيحة، فقال لها أبو العباس
الدينوري: مُوتي.. فقامت وخطت خطوات.. ثم التفتت إليه، وقالت: قد
مِتُّ. ووقعت ميّته.

وقال الواسطي: الصدق: صحة التوحيد مع القصد.

وقيل: نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قد نحل بدنه، فقال:
يا غلام، أتديم الصوم؟ فقال: ولا أديم الإفطار. فقال: أتديم القيام بالليل؟
فقال: ولا أديم النوم.

فقال: فما الذي أمحلك؟ فقال: هوى دائم.. وكتمان دائم عليه. فقال عبد
الواحد: اسكت؟ فما أجراك!! فقام الغلام، وخطا خطوتين، وقال إلهي، إن
كنت صادقاً فخذني؛ فخر ميتاً.

وحكي عن أبي عمرو الزجاجي أنه قال: ماتت أمي.. فورثت منها داراً، فبعتها
بخمسين ديناراً.. وخرجت إلى الحج، فلما بلغت باب استقبلي من واحد
القناقنة وقال: ما معك؟ فقلت في نفسي: الصدق خير.. ثم قلت: خمسون
ديناراً. فقال: ناولنيها. فناولته الصرة.. فعدها؛ فإذا هي خمسون ديناراً.

فقال: خذتها؛ فلقد أخذني صدقك. ثم نزل عن الدابة، وقال: أركبها.
فقلت: لا أريد! فقال لا بد. وألح عليّ.
فركبتها. فقال: وأنا على أثرك.

فلما كان العام المستقبل لحق بي، ولا زمني حتى مات.
سمت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله
يقول: سمعت جعفرًا الخواص يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول:
الصادق. لا نراه إلا في فرض يؤديه، أو فضل يعمل فيه.
وسمعت يقول: سمعت أبا الحسين بن مقسم يقول: سمعت جعفرًا الخواص
يقول: سمعت الجنيد يقول: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك
منه إلا الكذب.

وقيل: ثلاثة لا تخطيء الصادق: الحلاوة، والهيبة، والملاحة.
وقيل: أوحى الله، سبحانه، إلى داود عليه السلام، يا داود من صدقي في
سريره صدقته عند المخلوقين في علانيته.

وقيل: دخل إبراهيم بن دوحه مع غبراهيم بن ستنبة البادية، فقال إبراهيم
بن ستنبة: اطرح ما معك من العلائق. قال: فطرحته كل شيء إلا ديناراً
فقال: يا إبراهيم، لا تشغل سري، اطرح ما معك من العلائق!! قال:
فطرحته الدينار، ثم قال: يا إبراهيم، اطرح ما معك من العلائق!!
فتذكرت أن معي شسوعاً للنعل، فطرحتها، فما أحتجت في الطريق إلى

شع إلا وجدته بين يدي.

فقال: إبراهيم بن ستنبة: هكذا من عامل الله تعالى بالصدق.

وقال ذو النون المصري، رحمه الله: الصدق سيف الله، ما وُضع على شيء، إلا قطع.

وقال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم.

وسئل فتح الموصلي عن الصدق، فأدخل يده في كير الحداد.. وأخرج الحديد المحمأة.. ووضعها على كفه، وقال: هذا هو الصدق.

وقال يوسف بن أسباط: لأن آيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من أن أضرب بسيفي في سبيل الله تعالى.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، يقول: الصدق أن تكون مع الناس كما ترى من نفسك، أو أن ترى من نفسك كما تكون.

وسئل الحارث المحاسبي عن علامة الصدق، فقال: الصادق: هو الذي لا

يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يجب

إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يُطلع

الناس على السيء من عمله؛ فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة

عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين.

وقال بعضهم: من لم يؤد الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت.

وقيل له: ما الفرض الدائم؟ قال: الصدق.

وقيل: إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تُبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة.

وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك.

وقيل: كل شيء، ومصادقة الكذاب لا شيء.

وقيل: علامة الكذاب جوده باليمين بغير مستحلف.

وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب طريف.

وقيل: ما أملق تاجر صدوق.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

–“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।” [তাওবাহ : ১১৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মানুষ যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার চর্চা করে, সে আল্লাহর কাছে কাজ্জাব [অতিমিথ্যুক] নাম ধারণ করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন সত্য বলে ও সত্যের চর্চা করে সে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক [অতিসত্যবাদী] নাম ধারণ করে।”

উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দ্বীনের খুঁটি হলো সত্যবাদিতা। দ্বীনের পূর্ণতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয় সত্যবাদিতা দ্বারা। এটা হলো নুবুওয়াতের পরবর্তী স্তর। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ ...

-“যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে: তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক...।”

সাদিক্ হুছে সিদ্কের অসমাপ্ত বিশেষ্য। আর সিদ্দীক হলো সাদিক্‌র পরমোৎকৃষ্ট স্তর। যে সর্বদা সত্য বলে। যার মধ্যে সত্যবাদিতার প্রাবল্য বিরাজমান। যেমন আরবীতে অতি-মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সিদ্ধীর এবং খিম্মীর বলে। ভেতর-বাইর যখন সমান হবে তখন অর্জিত হবে সত্যবাদিতার স্তর। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় সত্যবাদী সে হলো সাদিক্। পক্ষান্তরে যার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও হালের মধ্যে সত্যবাদী সে হলো সিদ্দীক। হযরত আহমদ ইবনে খাদরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যদি এরূপ চায়, আল্লাহ তার সাথে সব সময় থাকবেন, সে যেনো সত্যবাদিতাকে আকড়ে ধরে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

-“অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” [বাক্বারাহ : ১৫৩]”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সত্যবাদী লোক প্রত্যহ চল্লিশবার নড়াচড়া করে। আর লৌকিকতা প্রদর্শনকারী চল্লিশ বছরও একই অবস্থায় থাকে।” হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সত্যবাদী লোক যদি বর্ণনা করতো তার অন্তরের অবস্থা কী, তাহলে সে বাকহারা হয়ে পড়তো।”

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

বিপদের সময়ও সত্য কথা বলা হুছে সিদ্ক। অন্তরের সাথে কথার মিলকেও বলে সিদ্ক। হযরত কানাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুখের সওয়ালকে হারাম থেকে বাঁচানোকে বলে সিদ্ক বা সত্যবাদিতা।” হযরত আবদুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করাকে বলে সিদ্ক।” হযরত আবু সাঈদ আরশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রকৃত সত্যবাদী লোক মাউতের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু প্রকাশ হওয়ার ভয়ে তা মুখে ব্যক্ত করেন না। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

-“তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।” [বাক্বারাহ : ৯৪]”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু আলী সাখাফী কথা বলছেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মানাযিল বললেন, আবু আলী! মাউতের প্রস্তুতি নাও- এটা একান্ত আবশ্যিক। একথা শুনে আবু আলী বললেন, হে আবদুল্লাহ! মাউতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো- এটা জরুরী। এরপর আবদুল্লাহ মাটিতে পড়ে হাতের উপর মাথা রেখে বললেন, আমি মরে গেলাম। আবু আলী আর কিছুই বললেন না। আবদুল্লাহর এই কর্মের উপর আর কোনো প্রশ্নের ক্ষমতা তার ছিলো না। কারণ, আবদুল্লাহ দীর্ঘ সময় অবচেতন অবস্থায় থাকতে পারতেন।” শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত আবুল আব্বাস দিনাওয়ারী কথা বলছেন। মজলিস থেকে এক বৃদ্ধা চিৎকার দিলেন। দিনাওয়ারী তাকে নির্দেশ দিলেন, মরে যাও! মহিলাটি ওঠে কয়েক পা এগুলেন অতঃপর তাঁর দিকে মুখ করে বললেন, আমি এই তো মরে যাচ্ছি। এরপর বাস্তবিকই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইচ্ছাশক্তির সাথে তাওহীদের পরিশুদ্ধতা হলো সিদ্ধ।”

বর্ণিত আছে, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন যুবককে বেশ দুর্বল দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তুমি কি সব সময় রোযা রাখো? সে জবাব দিল, আমি সব সময় ইফতার করি না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি তুমি সারা রাত জেগে থাকো? সে উত্তর দিল, আমি সবসময় ঘুমাই না। এবার তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি এতো দুর্বল হলে কেনো? সে জবাব দেয়, চিরন্তন যে বাসনা, আবার এটিকে লুকিয়ে রাখা- এ উভয় কারণে আমার এ অবস্থা। একথা শুনে আবদুল ওয়াহিদ বললেন, চুপ থাকো! তোমার কী সাহস? যুবকটি ওঠে দাঁড়ায়। মাত্র দু’ কদম অগ্রসর হয়ে বললো, হে প্রভু! আমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকি, এন্ফুণি আমাকে নিয়ে যাও! একথা বলেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।”

বর্ণিত আছে হযরত আবু আমর জায্যাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার মা মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরাধিকার হিসাবে তার একখানা গৃহের মলিক হলাম। ৫০ দিনারে এটি বিক্রি করে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাই। ভ্রমণপথে কানাকিনা কাফিলার এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কী আছে? আমি মনে মনে ভাবলাম, সত্যবাদিতার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ

নিহিত। তাই জবাব দিলাম, আমার নিকট ৫০ দীনার আছে। তিনি বললেন, আমাকে এসব দীনার দাও! আমি থলেটি তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি গুণে দেখলেন, ঠিকই ৫০ দীনার আছে। আমার নিকট থলেটি ফেরৎ দিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে যান। আপনার সত্যবাদিতায় আমি বন্দী। সওয়ারী থেকে নেমে বললেন, আরোহণ করুন আমার সওয়ারীতে। আমি বললাম, আমার প্রয়োজন নেই। তিনি বার বার অনুরোধ করলেন। আমি শেষ পর্যন্ত আরোহণ করলাম। তিনি বললেন, চলুন। আমি আপনার পেছনে আছি। পরবর্তী বছর হাজ্জের সময় ঐ একই ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমার নিকটে থেকেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।”

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রকৃত সত্যবাদীকে আমরা ফরয আদায়ের মধ্যে অথবা নফল কাজের মধ্যে দেখতে পাই।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ক্ষেত্রে মিথ্যা ছাড়া মুক্তি নেই, সেখানেও সত্য বলা হলো আসল সত্যবাদিতা।” বর্ণিত আছে, তিনি জিনিস সত্যবাদী লোকের বৈশিষ্ট্য: ১. মিষ্টির স্বাদ, ২. গাম্ভীর্য ও ৩. চেহারার ঔজ্জ্বল্যতা।” আল্লাহ তা’আলা হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “হে দাউদ! যে ব্যক্তি গোপনে আমার সত্যায়ন করে, আমি প্রকাশ্যে মাখলুকের সামনে তার সত্যায়ন করি।”

বর্ণিত আছে ইব্রাহীম ইবনে দাওহা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জঙ্গলে ইব্রাহীম ইবনে সাতাম্বার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন ইব্রাহীম ইবনে সাতাম্বা বললেন, তোমার নিকট যা কিছু আছে সব ফেলে দাও! তিনি তাই সবকিছু ফেলে দিলেন, রাখলেন শুধু একটি দীনার। সাতাম্বা বললেন, ইব্রাহীম! আমার অন্তরকে ব্যস্ত রাখো না- সব ফেলে দাও! এবার তিনি ওই দীনারটিও ফেলে দিলেন। এরপর সাতাম্বা আবার বললেন, ইব্রাহীম! যা আছে সব ফেলে দাও! দাওহা এবার মনে মনে ভাবলেন, আমার সাথে একটি জুতার ফিতা আছে- আর তো কিছু নেই। সুতরাং এটিও তিনি ফেলে দিলেন। এই ঘটনার পর থেকে একটি জুতার ফিতারও প্রয়োজন হলে তিনি তা পেয়ে যেতেন। কোনো কিছুর অভাব হতো না। একদিন ইব্রাহীম ইবনে সাতাম্বা তাঁকে বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার আচরণ করে আল্লাহ তা’আলা তার সাথে এরূপই আচরণ করে থাকেন।”

হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সত্যবাদিতা আল্লাহর এক তলোওয়ার। যেখানেই এর ছোঁয়া লাগবে এটি তা কেটে দেবে।” হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সিদ্দীকদের প্রথম খিয়ানত হলো নিজের মনের সাথে গল্প করা।” হযরত ফাতেহ মুসেলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সিদ্ক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি কামারের হাপারে হাত ঢুকিয়ে গরম লৌহখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে মুষ্ঠিতে রাখলেন। এরপর বললেন, একেই বলে সিদ্ক।” হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর পথে তলোওয়ার দ্বারা আঘাত করা থেকেও একরাত যদি আমি আল্লাহ তা’আলার সাথে সত্যবাদিতার লেনদেন করি তবে তাই হবে উত্তম।” উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তুমি নিজের জন্য যা কিছু ভালো মনে করো, মানুষের জন্যও তাই ভালো মনে করার নাম সিদ্ক।” হযরত হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো সিদ্কের আলামত কী? তিনি জবাব দিলেন, “প্রকৃত সত্যবাদী লোক নিজের অন্তরের সংশোধন করতে যেয়ে মানুষের মধ্যে সম্মান বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তিনি অটল থাকেন। মানুষ তার নেক কাজের একটি কোণও দেখুক- তাও তিনি কামনা করেন না। এমনকি মানুষ যদি তার কোনো মন্দ কাজ সম্পর্কে জেনে নেয়, তাতেও তার মন খারাপ হয় না।”

একজন সুফি বলেন, যে ব্যক্তি দায়িমী ফরয আদায় করে না তার সাময়িক ফরয কবুল হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত! দায়িমী ফরয কোন্টি? তিনি জবাব দিলেন, সিদ্ক। বর্ণিত আছে, তুমি যদি আল্লাহর নিকট সিদ্ক কামনা করো, তিনি তোমাকে একটি দর্পণ প্রদান করেন। এর দ্বারা ইহ-পরকালের আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ তুমি দেখতে পাবে। যেখানে সত্য বললে তোমার ক্ষতি হয়, সেখানে সত্য বলো। কারণ এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। যেখানে মিথ্যা বললে তোমার লাভ হবে সেখানে মিথ্যা বলা বর্জন করো। কারণ মিথ্যা বললে তোমার অবশ্যই ক্ষতি হবে। প্রতি কাজেই কল্যাণ আছে কিন্তু মিথ্যুকদের সান্নিধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মিথ্যুকের পরিচয় হলো, না চাইলেও সে কসম করে ফেলে। সত্যবাদী ব্যবসায়ী কতোই না সফল!

باب الحياء

বাবুল হায়া [লজ্জা অধ্যায়]

قال الله تعالى: "ألم يعلم بأن الله يرى".

وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبدوس الحيري! المزي قال: أخبرنا أبو سهل أحمد ابن محمد بنزياد النحوي ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الهيثم قال: حدثنا موسى بن حيان قال: حدثنا المقدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافقع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"الحياء من الإيمان".

وأخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الاسماعيلي قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا أبان بن إسحق، عن الصباح بن محمد، عن مُرّة الهمذاني، عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال ذات يوم لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله.

قال: ليس ذلك، ولكن استحيوا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعي، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد

الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء".

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: أخبرنا أبو نصر الوزيري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا محمد بن مخلد، عن أبيه قال: قال بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحى منه.

وسمعه يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت ابن عطاء يقول: العلم الأكبر: الهيبة والحياء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحياء لم يبق فيه خير. وسمعه يقول: سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب يقول: حدثني محمد بن عبد الملك قال: سمعت ذا النون المصري يقول: الحياء وجود الهيبة في القلب، مع وحشة ما سبق منك إلى ربك تعالى.

وقال ذو النون المصري: الحبُّ ينطق، والحياة يسكب، والخوف يقلق. وقال أبو عثمان: من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله عز وجل فيما يتكلم به، فهو مستدرج.

سمعت أبا بكر بن أشكيب، يقول: دخل الحسن بن الحداد على عبد الله ابن منازل، فقال: من أين تجيء؟ فقال: من مجلس أبي القاسم المذكر. قال: في ماذا كان يتكلم؟ فقال: في الحياء. فقال عبد الله: واعجباه!! من لم يستح

من الله تعالى كيف يتكلم في الحياء؟! سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: سمعت محمد بن عبدون يقول: سمعت أبا العباس المؤدب يقول: قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب؛ فإن وجدا فيه الزهد والورع خطأ، وإلا رحلا.

وسمعه يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت الجريري يقول: تعامل القرن الأول من الناس فيما بينهم بالدين، حتى رق الدين.. ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرغبة.

وقيل في قوله تعالى: "ولقد همت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه". البرهان: أنها ألفت ثوباً على وجه صنم في زاوية البيت، فقال يوسف عليه السلام: ماذا تفعلين؟ فقالت: استحي منه، قال يوسف عليه السلام: أنا أولى منك أن أستحي من الله تعالى.

وقيل في قوله تعالى: "فجاءته إحداها تمشي على استحياء" قيل: إنما استحييت منه؛ لأنها كانت تدعوه إلى الضيافة، فاستحييت أن لا يجيب موسى عليه السلام، فصفة المضيف الاستحياء، وذلك استحياء الكرم. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله. يقول: سمعت عبد الله بن الحسين

يقول. سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله. يقول: سمعت أبا عبد الله العمري يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الدارقي يقول: قال الله تعالى: " يا عبدي إنك ما استحييت مني؛ أنسيْتُ الناس عيوبك، وأنسيْتُ بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة " .

وقيل: رأى رجل يصلي خارج المسجد، فقليل له: لم لا تدخل المسجد فتصلي فيه؟ فقال: استحي منه تعالى أن أدخل بيته، قد عصيته!! وقيل: من علامات المستحي: أن لا يرى بموضع يستحي منه.

وقال بعضهم: خرجنا ليلة فمررنا بأجمة، فإذا رجل نائم، وفرص عند رأسه ترعى، فحركناه، وقلنا له: ألا تخاف أن تنام في مثل هذا الموضع المخوف وهو مُسبِع؟

فرفع رأسه، وقال: أنا أستحي منه تعالى، أن أخاف غيره، ووضع رأسه ونام. وأوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسك؛ فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح مني أن تعظ الناس.

وقيل: الحياء على وجوه: حياء الجناية؛ كآدم، عليه السلام، لما قيل له: أفراراً منا!! فقال: لا، بل حياء منك.

وحياء التقصير؛ كالملائكة يقولون: سبحانه: ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال؛ كإسرافيل، عليه السلام، تسربل بجناحه حياء من الله

عَزَّ وَجَلَّ.

وحیاء الکرم؛ کالنبي صلی الله علیه وسلم، کان یستحي من أمته أن یقول لهم: أخرجوا، فقال الله عز وجل: " ولا مستأنسين لحديث " .

وحیاء حشمة؛ کعلی، رضي الله عنه، حين سأل المقداد بن الأسود حتى سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن حکم خروج المذي، لمکان فاطمة رضي الله عنها.

وحیاء الاستحقار؛ کموسى علیه السلام، قال: إني لنعرض لي الحاجة من الدنيا، فاستحي أن أسألك يا رب، فقال لله عز وجل له: سلني حتى عن ملح عجینک، وعلق شاتک.

وحیاء الإنعام، هو حیاء الرب سبحانه، يدفع إلى العبد کتاباً محتوماً بعد ما عبر الصراط، وإذا فيه: فعلت ما فعلت، وقد استحييت أن أظهره عليك، فاذهب، فإني قد غفرت لك.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق یقول في هذا الخبر: إن یحي بن معاذ قال: سبحان من یذنب العبد فیستحي هو منه.

سمعت محمد بن الحسین یقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن جعفر یقول: سمعت زنجوية اللباد یقول: سمعت علي بن الحسین الهلالي یقول: سمعت إبراهيم بن الأشعث یقول: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: خمس من علامات الشقاء: القسوة فی القلب، وجمود العین، وقلة الحیاء، والرغبة فی

الدنيا، وطول الأمل.

وفي بعض الكتب: ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحي ن أرده، ويعصيني فلا يستحي مني.

وقال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله تعالى منه وهو مذنّب.

وأعلم أن الحياء: يوجب التدويب، فقال: الحياء: ذوبان الحشا لاطلاع المولى.

ويقال: الحياء: انقباض القلب، لتعظيم الرب وقيل: إذا جلس الرجل ليعظ الناس ناداه ملكاه: عظ نفسك بما تعظ به أخاك، وإلا فاستحي من سيدك؛ فإنه يراك.

وسئل الجنيد عن الحياء، فقال: رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد من بينهما حالة تسمى الحياء.

وقال الواسطي: لم يذق لذعات الحياء من لابس خرق حدّ أو نقض عهد. وقال الواسطي أيضاً: المستحي يسيل منه العرق، وهو الفضل الذي فيه، وما دام في النفس شيء فهو مصروف عن الحياء.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: الحياء: ترك الدعوى بين يدي الله عزّ وجلّ.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا العباس بن الوليد الزوزني يقول: سمعت محمد بن أحمد الجوزجاني يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: ربما أصلي لله تعالى ركعتين، فأصرف عنهما، وأنا بمنزلة من ينصرف عن السرقة من الحياء.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

-“সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?” [আলাক : ১৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাহিমাহু ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হায়া ঈমানের অঙ্গ”। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহু ল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, “আল্লাহ তা'আলার সামনে তোমরা সত্যিকার অর্থে লজ্জা অবলম্বন করো।” তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো লজ্জাবোধ করি, সত্যিকারের লজ্জা কী? তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহ তা'আলার সামনে সত্যিকারের লজ্জা হলো মাথা, পেট এবং অন্যান্য অঙ্গের হিফাজত করা। মৃত্যুর স্মরণ করা। যে ব্যক্তি আখিরাতে কামনা করে সে তো দুনিয়ার সৌন্দর্য বিসর্জন দেবে। এসব কাজ করলেই মানুষ আল্লাহর সামনে সত্যিকার অর্থে লজ্জা বোধ করলো।”

একজন জ্ঞানী লোক বলেন, লজ্জাশীল লোকদের কাছে গিয়ে লজ্জার চর্চা করো। হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “গাভীর্য ও লজ্জা হলো জ্ঞানের বড় অংশ। এ দুটো না থাকলে কোনো কল্যাণ থাকে না।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হায়া হলো অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি এবং জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া পাপের প্রতি ঘৃণা।” তিনি আরো বলেন, “প্রেম কথা বলে, লজ্জা পানি ভাসায় আর ভয় অস্থির করে তুলে।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি নিজে হায়া বোধ করে না অথচ এ সম্পর্কে কথা বলে, সে তো ধর্মদ্রোহী!”

বর্ণিত আছে, হযরত হাসান ইবনে হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মানাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কোথেকে আসলেন?” জবাবে বললেন, “আবুল কাসিম বক্তার সমাবেশ থেকে আসলাম।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কোন বিষয় তিনি কথা বলছিলেন?” জবাব দিলেন, “হায়া সম্পর্কে।” তিনি বললেন, “কী আশ্চর্য! যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেই লজ্জাবোধ করেন না, তিনি কিভাবে লজ্জা সম্পর্কে বক্তব্য দিতে পারেন?”

হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হায়া ও প্রেম অন্তরে কটকট করে। সেখানে যদি যুহুদ এবং পরহেজগারী পায় তবে সেথায় অবস্থান করে। আর না পেলে এই অন্তর ছেড়ে চলে যায়।” হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রথম যুগে লোকেরা দ্বীনদারির মাধ্যমে লেনদেন করতেন। দ্বিতীয় যুগে যখন দ্বীনদারিতে দুর্বলতা আসলো তখন লোকজন, আনুগত্যতার মাধ্যমে লেনদেন করতেন। তৃতীয় যুগে যখন এতেও দুর্বলতা দেখা দেয় তখন মানুষ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে লেনদেন করতেন। চতুর্থ যুগে যখন এটাতেও দুর্বলতা দেখা দেয় তখন হায়ার মাধ্যমে লেনদেন শুরু হলো। এরপর যখন হায়া চলে গেলো, লোকজন আগ্রহ ও ভীতির মাধ্যমে লেনদেন করতে লাগলো।”

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা’আলার বাণী:

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

-“নিশ্চয় মহিলা [জুলায়খা] তার [ইউসুফের] বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত- যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত।” [ইউসুফ : ২৪]

এখানে ‘বুরহান’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ঘরের কোণে একটি মূর্তির উপর জুলায়খা কাপড় বুলিয়ে রাখলো। ইউসুফ আলাইহিসসালাম তখন বললেন, তুমি কী করছো? সে জবাব দেয়, মূর্তির সামনে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। একথা শুনে ইউসুফ আলাইহিসসালাম বলেন, তাহলে তো আল্লাহর সামনে তোমার চেয়ে বেশী লজ্জাবোধ করার উপযুক্ত আমিই।

বর্ণিত আছে আল্লাহ তা’আলার কথা:

فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْثِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

-“অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর [মূসা আলাইহিস্সালামে] কাছে আগমন করল”। [কাসাস : ২৫]

এখানে বলা হচ্ছে, মূসা আলাইহিস্সালাম দাওয়াত কবুল করেন কি না এ জন্য তার লজ্জাবোধ হচ্ছিলো। লজ্জাবোধ মেজবানের একটি বৈশিষ্ট্য। এটা ভদ্রতার কারণে হয়ে থাকে। আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, বান্দা! তুমি যতক্ষণ আমার সামনে লজ্জাবোধ করো, আমি মানুষকে তোমার দোষ-ত্রুটি স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেবো, ভূপৃষ্ঠকে তোমার পাপের কথা ভুলিয়ে দেবো এবং আমলনামা থেকে সমস্ত পদস্খলন মুছে দেবো। কিয়ামতের দিন তোমার হিসাব নেবো না।” বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তিকে দেখা গেলো মসজিদের বাইরে নামায পড়ছেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো, মসজিদে ঢুকে কেনো নামায পড়ছেন না? জবাব দিলেন, আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতে আমার লজ্জা লাগে। কারণ আমি তো তাঁর নাফরমানি করেছি!”

বর্ণিত আছে, লজ্জার একটি নিদর্শন হলো, যে স্থানে নাফরমানি হয়েছে তা দেখতেও লজ্জাবোধ করা। একজন সুফি বলেন, একরাত আমরা বেরিয়ে পড়ি। জঙ্গল পাড়ি দিছি। দেখলাম একব্যক্তি শুয়ে আছেন। তাঁর আশেপাশে হিংস্র জন্তু! আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এরকম ভীতিপ্রদ স্থানে নিদ্রা যেতে ভয় পান না? তিনি মাথা তুলে জবাব দিলেন, আল্লাহর সামনে আমার লজ্জাবোধ হয় যে, তিনি ছাড়া আমি অন্য কোনো মাখলুককে ভয় করি। একথা বলে তিনি মাথা রেখে নিদ্রিত হলেন।

আল্লাহ তা’আলা হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, “তুমি নিজেকে উপদেশ দাও! নিজে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলে লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করো। যদি নিজে উপদেশ গ্রহণ করতে না পারো তাহলে মানুষকে আমার সামনে উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করো।”

বর্ণিত আছে, হাযা কয়েক প্রকার: ১. পাপ করার পর হাযা বোধ, যেমন আদম আলাইহিস্সালামকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তুমি আমার নিকট থেকে পলায়ন করছো?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘না! আপনার সামনে থাকতে আমার হাযা বোধ

করছে।’ ২. ঙ্গটির কারণে হায়া বোধ, যেমন ফিরিশতাগণ বলেছিলেন, ‘তাঁর গুণগান বর্ণনা করছি, আমরা তো আপনার হাক্ অনুযায়ী গুণগান করতে অপারগ।’ ৩. সম্মানের কারণে হায়া বোধ, যেমন হযরত ঈসরাফীল আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর সামনে লজ্জাবোধের কারণে নিজের ডানা বিছিয়ে দিয়েছেন। ৪. করুণার কারণে হায়া বোধ, যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদেরকে, ‘তোমরা বের হও!’ কথাটি বলতে লজ্জাবোধ করছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

–“[খাওয়া শেষে আপনা-আপনি চলে যেয়ো] কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না।”

[আহযাব : ৫৩]

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

৫. অস্বস্তিবোধের মধ্যে হায়া, যেমন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেনো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বীর্য নির্গত হওয়ার হুকুম সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে অনুরোধ করেন। কারণ তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। ৬. হেয় প্রতিপন্নের কারণে হায়া, যেমন হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট প্রার্থিব কোনো কিছু চাইতে লজ্জা লাগে। আল্লাহ তা’আলা তখন জবাব দিলেন, ‘আঠার সাথে লবণ ও বকরী আহারের প্রয়োজন হলেও তা চাও!’ ৭. নিয়ামত দানের মধ্যে হায়া, এটা হলো আল্লাহ তা’আলার হায়া। ফুলসিরাত পাড়ির পর আল্লাহ তা’আলা বান্দাকে একখানা বন্ধ কিতাব প্রদান করবেন। এতে লিখা থাকবে, তুমি যেটুকু পাপ কাজ করেছো! কিন্তু লজ্জার কারণে এগুলো প্রকাশ করি নি। এখন চলে যাও! তোমাকে ক্ষমা করলাম।’

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি। বান্দা তাঁর সামনে গুনাহ করে, অথচ তিনি নিজে বান্দা থেকে লজ্জা বোধ করেন।” হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দুর্ভাগ্যের ৫টি নিদর্শন: ১. অন্তরের কঠোরতা, ২. চোখের পানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ৩. হায়া কমে যাওয়া, ৪. দুনিয়ার প্রতি অতিশয় আগ্রহ ও ৫. দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। একটি আসমানী কিতাবে আছে, ‘বান্দা আমার সাথে ইনসাফ করে নি। সে যখন আমাকে ডাকে,

তাকে তাড়িতে দিতে আমার লজ্জা লাগে। কিন্তু সে আমার সামনে নাফরমানী করতে তার কোন লজ্জা লাগে না।’

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবাদতের সময় যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে লজ্জাবোধ করে, সে যদি নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তা’আলাও তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন।”

জেনে রাখো, হায়া অন্তরকে গলিয়ে দেয়। তাই বলা হয়, আল্লাহর সামনে হায়া মানবের অভ্যন্তর বিগলিত করে তুলে। আল্লাহর বড়ত্বের সামনে হায়ার দ্বারা অন্তর সংকোচন হয়। কেউ যখন মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বসে, তখন দু’জন ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলেন, মানুষকে যে কাজের উপর উপদেশ দিচ্ছ, এ উপদেশ নিজেকে দাও। নতুনা তোমার মালিকের সামনে লজ্জা রাখো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, হায়া কি? তিনি জবাব দিলেন, “নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। আর ভুল-ত্রুটির প্রতি চোখ রাখা। এ উভয়টির কারণে তৃতীয় একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়- সেটাই হলো হায়া। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো সীমালঙ্ঘন করে কিংবা কোনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, সে কখনো হায়ার স্বাদ পাবে না।” তিনি আরো বলেন, “লাজ্জাশীল লোকের শরীর ঘর্মে ভেসে যায়। এটা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি একটি করুণা। অন্তরে অন্য অল্প কোনো কিছু থাকলেও লজ্জাশীলতা থেকে সে বঞ্চিত হবে।” উস্তাদ হযরত আবু আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “হায়া হলো আল্লাহর সামনে দাবী-দাওয়া ছেড়ে দেওয়া।” হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দু’রাকাত নামায পড়ার পর এমন লজ্জাবোধ করি, মনে হয় যেনো চুরি করে এসেছি!”

باب الحرية

বাবুল হুররিয়াহ [স্বাধীনতা অধ্যায়]

قال الله عز وجل: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " .

قال: إنما آثروا على أنفسهم لتجردهم عما خرجوا منه، وآثروا به.

أخبرنا: علي بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال:

حدثنا ابن أبي قماش قال: حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال: حدثنا

نعيم بن مورع بن توبة، عن إسماعيل المكي، عن عمرو بن دينار، عن

طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما

يكفي أحدكم: ما قنعت به نفسه، قال: وإنما يصير إلى أربعة أذرع

وشبر، وإنما يرجع الأمر إلى آخر " .

قال: الحرية: أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات، ولا يجري عليه

سلطان المكونات، وعلامة صحته: سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء،

فيتساوى عنده أخطار الأعراض.

قال حارثة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عزفت نفسي

عن الدنيا؛ فاستوى عندي حجرها وذهبها.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: من دخل الدنيا وهو عنها

حار ارتحل إلى الآخرة وهو عنها حُر.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا محمد المراغي يحكي عن الرقي،
عن الدقاق: يقول: من كان في الدنيا حراً منها كان في الآخرة حراً منها.
واعلم أن حقيقة الحرية في كمال العبودية؛ فإذا صدقت لله تعالى عبوديته
خلصت عن رق الأغيار حريته.

فأما من توهم أن العبد يسلم له أن يخلع وقتاً عذار العبودية، ويحيد
بلحظه عن حد المر والنهي وهو مميز، في دار التكليف، فذلك انسلاخ من
الدين.

قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: "وأعبد ربك حتى يأتيك
اليقين" يعني: الأجل، وعليه أجمع المفسرون.

وأن الذي أشار إليه القوم من الحرية هو: أن لا يكون العبد تحت رق
شيء من المخلوقات لا من أعراض الدنيا، ولا من أعراض الآخرة؛ فرداً
لفرد لم يسترقه عاجل دنيا، ولا حاصل هوى، ولا أجل مني، ولا سؤال،
ولا تصد ولا أرب، ولا حظ.

وقيل للشبلي: ألم تعلم أنه تعالى رحمن؟ فقال: بلى ولكن منذ عرفت
رحمته ما سألته أن يرحمني.

ومقام الحرية عزيز.

سمعت الشيخ أبا علي، رحمه الله، يقول. كان أبو العباس السيارى يقول: لو
صحت صلاة بغير قرآن لصحت بهذا البيت:

أُنمى على الزمان محالاً... أن ترى مقلتي طلعة حُرّ
وأما أقاويل المشايخ في الحرية؛ فقال الحسين بن منصور: من أراد الحرية
فليصل العبودية.

وسئل الجنيد عن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة، فقال:
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي
يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيد يقول: إنك لا تصل
إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية.

وقال بشر الحافي: ما أراد أن يذوق طعم الحرية، يستريح من العبودية
فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى.

وقال الحسن بن منصور: إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير
حُرّاً من تعب العبودية، فيترسم بالعبودية بلا عناء ولا كلفة، وذلك ما قام
الأنبياء والصديقين، يعني يصير محمولاً، لا يلحقه بقلبه مشقة وإن كان
متحلياً بها شرعاً، أنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن قال: أنشدنا أبو بكر
الرازي قال: أنشدني منصور الفقيه لنفسه:

ما بقي في الإنس حر... لا، ولا في الجن حرُّ
قد مضى حر الفريقين... فحلوا العيش مرُّ
واعلم أن معظم الحرية في خدمة الفقراء.

سمعت الشيخ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً.
وقال صلى الله عليه وسلم: "سيد القوم خادهم".

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله يقول: سمعت محمد بن إبراهيم بن الفضل يقول: سمعت محمد بن الرومي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد، وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار.

وسمعته يقول: سمعت عبد الله بن عثمان بن يحيى يقول: سمعت علي بن محمد المصري يقول: سمعت يوسف بن موسى يقول: سمعت بن خبيق يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: إن الحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يُخرج منها.
وقال إبراهيم بن أدهم: لا تصحب إلا حراً كريماً؛ يسمع ولا يتكلم.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

-“নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।” [হাশর : ৯]

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যেটুকুর উপর একজন মানুষের মন সন্তুষ্ট থাকে- তা-

ই তার জন্য যথেষ্ট। কারণ, প্রত্যেকেই সাড়ে চারহাত জায়গায় ফিরে যাবে। সবকিছুই তার শেষ পরিণতিতে ফিরবে।”

বলা হয়, স্বাধীনতার অর্থ হলো, সৃষ্ট জীবের অধীনস্থ না হওয়া। তার উপর যেনো সৃষ্টির কোনো আধিপত্য বিরাজ না করে। হররিয়াত শুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন হলো অন্তর থেকে বস্তুসমূহের পার্থক্য দূর হয়ে যাওয়া। হযরত হারিসা রাহিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন দুনিয়ার স্বর্ণ ও পাথর আমার কাছে সমান হয়ে গেছে।” উস্তাদ হযরত আবু আলী দাঙ্গাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বাধীন হয়ে অবস্থান করবে, সে আখিরাতেও স্বাধীনভাবে যাত্রা করবে।”

জেনে রাখো, ইবাদতের পরিপূর্ণতায়ই স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম নিহিত। যদি আল্লাহর ইবাদত খালিসভাবে করতে পারো, তাহলে তুমি গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। কেউ যদি মনে করে কিছুক্ষণ সে ইবাদত থেকে মুক্ত থাকবে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন থেকে সে বিরত থাকবে, তাহলে তো সে দ্বীন থেকে দূরে সরে পড়লো। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

–“এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।” [হিজর : ৯৯]

এখানে উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু। সকল মুফাস্সির এই অভিমত দিয়েছেন। সুফিয়ায়ে কিরাম যে বলেছেন, স্বাধীনতার অর্থ মানুষ সৃষ্ট জীবের বন্দীত্বে থাকবে না- তার সারকথা হলো সে না পার্থিব বস্তু কিংবা পরকালীন কোনো বস্তুর বন্দীত্বে আবদ্ধ থাকবে। সে কেবলমাত্র একাকার হয়ে থাকবে একক সত্তার জন্য। পার্থিব কোনো অর্জন, প্রবৃত্তির চাহিদা, কোনো আকাঙ্ক্ষার বাসনা, কোনো প্রশ্ন বা কোনো অংশীদারিত্ব তাকে গোলাম বানাতে পারবে না।

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি জানেন না, আল্লাহ তা’আলা রাহমান? তিনি জবাব দিলেন, “যেদিন থেকে আমি তাঁর রাহমাত চিনতে পেরেছি, সেদিন থেকে তাঁর নিকট রাহমাতের জন্য প্রার্থনা করি নি।”

হুররিয়াতের মাকামে পৌঁছানো বড়ই কঠিন। হযরত আবুল আব্বাস সাইয়্যারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যদি নামায শুদ্ধ হতো তাহলে আমি বলবো এই কবিতার পঙক্তি দ্বারা নামায শুদ্ধ হতো:

আমি আশা করি ভাগ্য [যামান] আমাকে সে জিনিস এনে দেবে যা [কঠিনভাবে]
সম্ভাব্য:

আর আমার চোখদ্বয়ের দৃষ্টি পতিত হবে মুক্ত সে মুখশ্রী পরে [হুর]!”

হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যদি স্বাধীনতা [হুররিয়াত] চায়, সে যেনো ইবাদতের নিকটে আসে।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা মোটেই নাই শুধুমাত্র একটি বিচি পরিমাণ ছাড়া। জবাব দিলেন, ‘মুকাতাবের [চুক্তির] উপর যদি এক দিরহাম পরিমাণও বাকী থাকে তবুও তো সে ক্রীতদাস!’। তিনি আরো বলেন, “ইবাদতের অত্যল্প অংশও যদি বাকী থেকে যায় তবুও তুমি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।” হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যদি স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়, ইবাদতে আরাম চায়, তার জন্য উচিৎ আল্লাহর সাথে তার অন্তরকে পবিত্র করে তোলা।” হাসান ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দা যখন সকল স্তর পাড়ি দেয় সে তখন ইবাদতের ক্লাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কোনো প্রকার কষ্ট-সাধনা ছাড়াই সে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটাই হলো নবী ও সিদ্দীকীনের স্তর।” হযরত আবু বকর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, যা তিনি মানসুর ফক্বীহ থেকে শুনছিলেন:

মানব মাঝে একজনও মুক্ত মানুষ থাকে নি,
না আছে মুক্ত কেউ জিনদের মাঝে!
এ উভয় উম্মার স্বাধীনতা বিদায় নিয়েছে
আর জীবনের মিষ্টতা তিক্ত হয়েছে!

জেনে রাখো, দরবেশদের খিদমতেই আসল স্বাধীনতা নিহিত। উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, ‘যখন আমার কোনো অনুসন্ধানীকে

পাও, তুমি তার খাদিম হয়ে যাও।” আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জাতির সেবকই জাতির নেতা হয়ে থাকে।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যারা দুনিয়াদার তাদের খাদিম থাকে দাস-দাসীরা। আর যারা আখিরাতের পাগল, নেক ও স্বাধীন লোকই তাদের খাদিম হয়ে থাকেন।” হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “স্বাধীন-সম্মানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বের করে দেওয়ার পূর্বেই সে নিজে বের হয়ে যায়।” তিনি আরো বলেছেন, “সম্মান্ত-স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সান্নিধ্যে যাবে না। সে তো শুধু শুনবে, কোনো কথা বলবে না।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الذكر

বাবুয় জিকির [স্মরণ অধ্যায়]

قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً".

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد، قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن زياد بن أبي زياد، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأربعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: ما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الديري، عن عبد الرزاق، عن معمر: عن الزهري، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقوم الساعة على أحد يقول: الله.. الله..".

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي، عن حميد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله.. الله "

قال الأستاذ: والذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر.

والذكر على ضربين: ذكر اللسان، وذكر القلب. فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب. والتأثير لذكر القلب؛ فإذا كان العبد ذاكراً

بلسانه وقلبه، فهو الكامل في وصفه في حل سلوكه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: الذكر منشور الولاية؛ فمن

وُفق للذكر فقد أعطى المنشور، ومن سلب الذكر فقد عزل.

وقيل: إن الشبلي كان في ابتداء أمره ينزل كل يوم سرباً ويحمل مع نفسه

حزمة من القضبان، فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الحشب

حتى يكسرها على نفسه، فربما كانت الحزمة تفني قبل أن يمسي، فكان

يضرب بيده ورجليه على الحائط.

وقيل: ذكر الله بالقلب سيف المريدين، به يقاتلون أعداءهم، وبه يدفعون

الآفات التي تقصدهم، وإن البلاء إذا أظل العبد؛ فإذا فزع بقلبه إلى

الله تعالى يجيد عنه في الحال كل ما يكرهه.

وسئل الواسطي عن الذكر فقال: الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء

المشاهدة على غلبة الخوف، وشدة الحب له.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن الحسين يقول: سمعت أبا محمد البلاذري يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله تعالى عليه كل شيء، وكان له عوضاً عن كل شيء.

وسمعه يقول: سمعت عبد الله المعلم يقول: سمعت أحمد المسجدي يقول: سئل أبو عثمان؛ فقليل له: نحن نذكر الله تعالى، ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدهم الله تعالى، عن أن زين جارية من جوارحكم بطاعته.

وفي الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. فقليل له: وما رياض الجنة؟ فقال: خلق الذكر ".

أخبرنا أبو الحسن علي بن بشر ببغداد قال: حدثنا أبو علي بن صفوان قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن عمر بن عبد الله: أن خالد بن عبد الله بن صفوان أخبره عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا أيها الناس؛ ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر؟ اغدوا، وروحوا، واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته

عند الله فليَنظر كيف منزلةُ الله عنده؟ فإن الله سبحانه، ينزل العبد منه حيث أنزله عن نفسه.

وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمداً الفراء يقول: سمعت الشبلي يقول: أليس الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني؟ ما الذي استفدت من محالسة الحق سبحانه؟ وسمعتة يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت الشبلي ينشد في مجلسه:

ذكرتك، لا أني نسيتك لحظةً... وأيس ما في الذكر ذكرٌ لساني
وكدت بلا وجود أموت من اله... وى وهام على القلب بالخفقان
فلما رآني الوجد أنك حاضري... شهدتك موجوداً بكل مكان
فخاطبت موجوداً بغير تكلم... ولاحظت معلوماً بغير عيان

ومن خصائص الذكر: أنه غير مؤقت، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله: إما فرضاً، وإما ندباً. والصلاة، وإن كانت أشرف العبادات، فقد لا تجوز في بعض الأوقات. والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات.

قال الله تعالى: "الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم..".
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك، رحمه الله، يقول: قيماً: بحق الذكر، وقعوداً: عن الدعوى فيه.

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يسأل الأستاذ أبا علي الدقاق، فقال: الذكر

أتم أم الفكر؟ فقال الأستاذ أبو علي: ما الذي يقول الشيخ فيه؟ قال الشيخ أبو عبد الرحمن: عندي الذكر أتم من الفكر؛ لأن الحق، سبحانه، يوصف بالذكر، ولا يوصف بالفكر، وما وصف به الحق سبحانه أتم مما اختص به الخلق. فاستحسنه الأستاذ أبو علي، رحمه الله.

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكناني يقول: لولا أن ذكره فرض عليّ لما ذكرته إجلاله، مثلي يذكره!! ولم يغسل فمه بألف توبة منقبلة عن ذكره. وسمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، ينشد لبعضهم:

ما إن ذكرتك إلا هم يزجرني ... قلبي وسري وروحي عند ذكراكا
حتى كأن رقيباً منك يهتف بي ... إياك، ويحك والتذكاري إياك

ومن خصائص الذكر: أنه جعل في مقابلته الذكر. قال الله تعالى: " فذكروني أذكركم ".

وفي خبر: " أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم، فقال: وما ذاك يا جبريل؟ فقال: قوله تعالى: " فذكروني أذكركم " ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة " .

وقيل: إن الملك يستأمر الذاكر في قبض روحه.

وفي بعض الكتب: أن موسى، عليه السلام، قال يارب: أين تسكن؟

فأوحى الله تعالى إليه، في قلب عبدي المؤمن. ومعناه: سكون الذكر في القلب فإن الحق سبحانه وتعالى منزّه عن كل سكون وحلول، وإنما هو: إثبات ذكر وتحصيل.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت فارساً يقول: سمعت الثوري يقول: سمعت ذا النون، وقد سأله عن الذكر فقال: هو غيبة الذاكر عن الذكر، ثم أنشأ يقول:

لا لأني أنساك أكثر ذكراً... لك، ولكن بذاك يجري لساني
وقال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي: يا عبدي، ما أنصفتني؛ أذكرك وتنساني، وأدعوك إليّ وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف الخطايا، يا بن آدم، ما تقول غداً إذا جئتني؟!
وقال أبو سليمان الداراني: إن في الجنة قيعاناً، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فيها، فربما يقف بعض الملائكة، فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: فسّتر صاحبي.

وقال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.

وقال حامد الأسود: كنت مع إبراهيم الخواص في سفر، فجئنا إلى موضع فيه حيات كثيرة.. فوضع ركوته وجلس، فلما كان برد الليل وبرد الهواء خرجت الحيات، فصحت بالشيخ، فقال: اذكر الله.. فذكرت فرجعت، ثم

عادت، فصحت به، فقال مثل ذلك. فلم أزل إلى الصباح في مثل تلك الحالة.. فلما أصبحنا قام، ومشى، ومشيت معه، فسقطت من وطائه حية عظيمة وقد تطوقت به. فقلت: ما أحسست بها؟ فقال: لا، منذ زمان ما بت ليلة أطيب من البارحة.

قال أبو عثمان: من لم يذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذكر. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبدالرحمن بن عبد الله الديباني يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى: "إذا كان الغالب علي عبدي ذكرني عشقي وعشقتي".

وبإسناده: أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: "بي فافرحوا، ويذكرني فتنعما".

وقال الثوري: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف بالله انقطاعه عن الذكر. وفي الإنجيل ذاكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، وارض بنصرتي لك؛ فإن نصرتي لك خير لك من نصرتك لنفسك.

وقيل لراهب: أنت صائم؟ فقال: صائم بذكره، فإذا ذكرت غيره أفطرت. وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب، فن دنا منه الشيطان صرع، ما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنس.

وقال سهل: ما أعرف معصية أقبح من نسين الربّ تعالى. وقيل الذكر الخفي لا يرفعه الملك، لأنه لا اطلاع له عليه، فهو سر بين العبد وبين الله عز وجل.

وقال بعضهم: وصف لي ذاكر في أجمه، فأثيته، فبينما هو جالس إذا سبع عظيم ضربه ضربة، واستلب منه قطعة، فغشي عليه وعلي، فلما أفاق، قلت: ما هذا؟ فقال: قبيض الله هذا السبع عليّ، فكلما دخلتني فترة عضني عضة، كما رأيت.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجريري يقول: كان من بين أصحابنا رجل يكثر أن يقول: الله.. الله.. فوق يوماً على رأسه جذع فاندشج رأسه وسقط الدم، فاكْتُتَبَ على الأرض: الله.. الله..

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

[৪১ : আহযাব] “হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো!”

হযরত আবু দারদা রাঃরাঃ আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম আমলের কথা বলবো না, যা তোমাদের মালিকের কাছে খুবই উঁচু মানের, যেটি সোনা-রূপা দান করা থেকেও উত্তম, যা শত্রুকে আঘাত করা বা শত্রু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকেও শ্রেয়? তাঁরা বললেন, অবশ্যই, সেটি কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জবাব দিলেন, তাহলো আল্লাহ তা'আলার জিকির।”

হযরত আনাস বিন মালিক রাধিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পৃথিবীতে যতক্ষণ ‘আল্লাহু আল্লাহ’ আওয়াজ হবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না।”

উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জিকির হলো আল্লাহর রাস্তার খুব শক্ত একটি খুঁটি। বরং তাসাওউফের সুদৃঢ় খুঁটিই হলো জিকিরুল্লাহ।” নিয়মিত জিকির ছাড়া কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জিকির দুই প্রকার: মুখের ও অন্তরের জিকির। মুখের জিকির দ্বারা বান্দা অন্তরের সার্বক্ষণিক জিকিরে পৌঁছতে পারে। অন্তরের জিকিরের মধ্যে প্রভাব আসে মুখের জিকির থেকে। তাই বান্দা যখন মুখ ও অন্তর দ্বারা জিকির করতে থাকবে, তখন সে আল্লাহর পথে যাত্রায় কামিল হয়ে গেল। উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জিকির হলো ওলায়াতের নিদর্শন। কেউ যদি জিকিরের তাওফিক লাভ করে, সে তো ওলায়াতের এক বিজ্ঞাপন পেয়ে গেল। যার কাছ থেকে জিকির ছিনিয়ে নেওয়া হলো, সে এই বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হলো।”

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক জীবনে এক জঙ্গলে যেতেন এবং লাকড়ির আঁটি বহন করে নিয়ে আসতেন। অন্তরে যখন জিকিরের গাফলতি আসত তখন লাঠি দ্বারা নিজেকে প্রহার করতেন। এমনকি প্রহার করতে করতে লাঠি ভেঙ্গে ফেলতেন। মাঝে-মধ্যে সন্ধ্যের পূর্বেই আঁটি আনা শেষ হয়ে যেতো, তখন [লাঠি না পেয়ে] নিজের হাত-পা দ্বারা দেওয়ালে আঘাত করতেন ব্যথা অনুভবের জন্য।

আল্লাহর জিকির হলো মুরীদদের তলোওয়ার। এটা দ্বারা তারা শত্রুদেরকে আঘাত করেন। যখন অন্তরে বিপদ-আপদ অনুভব করেন, তখন এটা দ্বারা তা প্রতিরোধ করেন। বান্দা বিপদে পড়ে যখন ভীতু অন্তরে আল্লাহমুখী হয় তখন সব ভীতিকর অবস্থা দূর হয়ে যায়। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিকির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, “জিকির হলো গাফলতির ময়দান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর অতিমাত্রায় ভয় ও মুহাব্বাতের ময়দানে এগিয়ে যাওয়া।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা’আলাকে স্মরণ করে সে আশপাশের সবকিছুর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছুর হিফাজত করেন। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কেবল উত্তম বিনিময়ই লাভ করে।”

কয়েক ব্যক্তি হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর জিকির করি ঠিকই কিন্তু অন্তরে কোনো মিষ্টি স্বাদ পাই না। তিনি জবাব দিলেন, “তাতে কী হয়েছে? আল্লাহর প্রশংসা করো, তোমার একটি অঙ্গকে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর আলো দ্বারা নূরান্বিত করেছেন।”

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস আছে, তিনি বলেন, “জান্নাতের বাগান দিয়ে অতিক্রমকালে তোমরা তা উভভোগ করো।” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, “জিকিরের হালকা।” হযরত জাবির রাহিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, “হে লোকজন! তোমরা জান্নাতের বাগানের স্বাদ খুব বেশী উপভোগ করো!” আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের বাগান কি? তিনি জবাব দেন, “তাহলো জিকিরের মজলিসসমূহ। সকাল-বিকাল সেখানে যাও, আল্লাহকে স্মরণ করো। কেউ যদি আল্লাহর কাছে নিজের স্তর সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেনো তার নিজের নিকট আল্লাহর স্তর কেমন তা নিয়ে চিন্তা করে। কারণ, মানুষ যখন নিজের মধ্য থেকে আল্লাহকে দূরে সরিয়ে রাখে, আল্লাহও তাকে দূরে ঠেলে দেন।”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে আমি তাঁর পাশে বসি? তাহলে আল্লাহর পাশে বসে তোমরা কী অর্জন করছে?”। তিনি আবৃত্তি করতেন:

একটি মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে ভুলে যেয়ে তোমার স্মরণ করছি না,
সবচেে সহজ উপায়ে তোমাকে স্মরণ করা হলো জিহ্বা দ্বারা
আমি মৃত্যুর দুয়ারে চলে গিয়েছিলাম, অথচ তখনো আত্মবিস্মৃতি আমাকে আড়ষ্ট করে নি

আমার হৃদয় কেঁপে ওঠেছে, প্রেমের প্রাবল্য হেতু
আমার আত্মবিস্মৃতি দেখিয়েছে, তুমি আছো আমার সাথে
আমি তোমার উপস্থিতি অবলোকন করেছি সর্বত্র

এরপর আমি ওকে ডেকেছি যে ছিলো সেথায় উপস্থিত- কিন্তু মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করি নি

আমি অনুভব করেছি ওকে যাকে আমি চিনি, কিন্তু তাকে দেখি নি কখনো!

জিকিরের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। যে কোনো একটি সময়েই বান্দা জিকির করতে পারে। আর এজন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামায যদিও শ্রেষ্ঠ ইবাদাত- কিন্তু কিছু বিশেষ সময় তা জাযিয নয়। পক্ষান্তরে সর্বাবস্থায়ই জিকির অন্তরে বিরাজমান থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।” [আলে ইমরান : ১৯১]

ইমাম আবু বকর ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “উল্লেখিত আয়াতে দাঁড়িয়ে জিকির করার অর্থ হলো, জিকিরের হক আদায় করা। আর বসে জিকির করার অর্থ হলো কপটতা ও ভান না ধরা।” শায়খ আবু আবদুর রহমান উস্তাদ আবু আলী দা঳াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, কোন্টি পূর্ণাঙ্গ- জিকির না ফিকির? তিনি জবাব দিলেন, “আমার নিকট ফিকিরের চেয়ে জিকির হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ। কারণ জিকির হলো আল্লাহর গুণ, পক্ষান্তরে ফিকির তা-ই নয়। আর মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ থেকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ উত্তম।” উস্তাদ আবু আলী দা঳াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথাটি বেশ পছন্দ করতেন।

উস্তাদ আবু আলী দা঳াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

আমি তোমার নামকে স্মরণ করতে অপারগ

আমার হৃদয়, আমার অন্তঃস্থ আপন ও রূহ

আমাকে থামিয়ে দেয় যখনই তোমার সম্পর্কে

একটি মাত্র ভাবনা এসে আমাকে হানা দেয়-

কে যেনো বলে ওঠে: “সাবধান! তোমার ধ্বংস হোক!”

“এ স্মরণ থেকে সাবধান!”

জিকিরের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো, জিকিরের সময় আল্লাহ নিজেও জিকির বা স্মরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

-“তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।” [বাকুরাহ : ১৫২]

এক হাদীসে আছে, হযরত জিব্রীল আলাইহিসসালাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমার উম্মতকে একক কিছু দান করেছি যা তোমার পূর্ববর্তী উম্মতকে দিই নি।” নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করছেন, এটা কী? তিনি বললেন, “এটা হলো আল্লাহ তা'আলার বাক্য-فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ” আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি পূর্বেকার কোন উম্মতকে বলেন নি।”

বর্ণিত আছে, জিকিরকারীর রুহ কব্জের সময় ফিরিশতা তার অনুমতি গ্রহণ করেন। একটি আসমানী গ্রন্থে আছে, মুসা আলাইহিসসালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আপনি কোথায় থাকেন? জবাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “আমি আমার মু'মিন বান্দার অন্তরে থাকি।” একথার অর্থ হলো অন্তরে জিকিরের স্থায়িত্ব। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুতে অবস্থান করা থেকে পবিত্র। হযরত ফারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিকির সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তিনি জবাবে বলেছেন, “জিকির থেকে জিকিরকারীর বিস্মৃতি হলো জিকির।” এরপর তিনি আবৃত্তি করেন:

আমি তোমার স্মরণকে গুণ করি, তোমাকে ভুলে যাওয়ার কারণে নয়
বরং জিকির তো এমনতেই আমার জিহ্বা থেকে নির্গত হচ্ছে!

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বলেন না, হে বান্দা! তুমি আমার সাথে ন্যায়বিচার করো নি। আমি তোমাকে স্মরণ করি কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যাও। তোমাকে আমার পথে ডাকি কিন্তু তুমি চলে যাও অপরের পথে। আমি তোমার

বিপদ-আপদ দূর করি, অথচ তুমি ডুবে থাকো পাপ-পঙ্কিলতায়। হে আদমসন্তান! আগামীকাল যখন [কিয়ামত] আসবে- কী জবাব দেবে?

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জান্নাতে কিছু ময়দান আছে, জিকিরকারী জিকির শুরু করলে তাতে ফিরিশতারা বৃক্ষ রোপণ শুরু করেন। কোনো এক সময় কিছু কিছু ফিরিশতা রোপণ কাজ বন্ধ করে দেন। জিজ্ঞেস করা হয়, ওহে! তুমি থামলে কোনো? জবাব দেন, যার জন্য এ কাজ তিনি তো থেমে গেছেন!” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তিনটি কাজে স্বাদ অনুসন্ধান করো: ১. নামাযে, ২. জিকিরে এবং ৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে। যদি স্বাদ পাও তো ভালো, নতুবা বুঝে নেবে দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে।”

হযরত হামিদ আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি এক সফরে ইব্রাহীম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ছিলাম। আমরা এক স্থানে আসলাম, সেখানে ছিলো অনেক সাপ-বিচ্ছু। তিনি নিজের থলে রেখে সেই স্থানে বসে পড়লেন। রাত্রি যখন ঘনালো এবং শীতল বাতাস বইতে লাগলো, গর্ত থেকে সাপ-বিচ্ছু বেরিয়ে আসলো। আমি তা লক্ষ্য করে শায়খকে ডাক দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহকে স্মরণ করো। আমি তা-ই শুরু করলে, ওগুলো দূরে সরে গেলো। এরপর তারা আবার আসলো। আমি এবারও শায়খকে ডাক দিলাম। তিনি একই কাজ [জিকির] করতে বললেন, এভাবে সকাল পর্যন্ত চললো। ভোরে তিনি হাঁটা শুরু করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। লক্ষ্য করলাম, তাঁর ব্যাগ থেকে একটি বড় সাপ বেরিয়ে চলে গেলো। এটা পাক পেঁছিয়ে বসেছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ সাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? জবাব দিলেন, না! বরং দীর্ঘদিন পরে গত রাতের মতো এতো আরামে আমি ঘুমোই নি!”

হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি উদাসীনতার কষ্ট সহ্য করবে না, সে জিকিরের একাকীত্বের স্বাদ পাবে না।” হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একটি আসমানী গ্রন্থে লিখা আছে, বান্দার মধ্যে যখন জিকিরের ইশ্ক থাকে, আমি তাকে ভালোবাসি।” তাঁর সনদে আরেকটি বর্ণনা আছে, “আল্লাহ তা’আলা হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “আমার মধ্যে আনন্দ লাভ করো, আমার জিকির দ্বারা উপভোগ করো।” হযরত সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রত্যেক কাজের শান্তি আছে। আরিফ বিল্লাহর শান্তি

হলো আল্লাহর জিকির থেকে বঞ্চিত থাকা।” ইঞ্জিল শরীফে আছে, ‘যখন তুমি রাগ করো, আমাকে স্মরণ করো। আমার রাগের বেলায়ও আমি তোমাকে স্মরণ করবো। আমি তোমাকে যা সাহায্য করছি তাতে সন্তুষ্ট থাকো। তোমার প্রতি তোমার নিজস্ব সাহায্য থেকে তোমার প্রতি আমার সাহায্য উত্তম।’ একজন দরবেশকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রোজাদার? তিনি জবাব দিলেন, “তাঁর জিকির দ্বারা আমি রোজা পালন করছি। আমি যখন অন্য কাউকে স্মরণ করি তখন ইফতার করি।”

বর্ণিত আছে জিকির যখন কারো অন্তরে স্থান পায় তখন শয়তান যদি তার কাছে যায়, জিকিরের প্রভাবে সে চলে পড়ে। যেভাবে শয়তানের ছোঁয়ায় মানুষ চলে পড়ে। অন্যান্য শয়তান একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, ওর কী হয়েছে? জবাব আসে, ওকে মানুষ স্পর্শ করেছে!

হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আর কোনো বড়ো গুনাহ আমার জানা নেই।” বর্ণিত আছে, জিকিরে খফীকে ফিরিশতারা উপর দিকে নিয়ে যান না- কারণ, এ জিকির সম্পর্কে তাদের অবগতিই নেই। এটা তো বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যকার এক গোপন বিষয়।

একজন সুফি বলেন, আমি জানতে পারলাম কোনো এক জঙ্গলে আল্লাহর এক জাকির আছেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম। লক্ষ্য করলাম, তিনি বসে আছেন। এরপর হঠাৎ এক হিংস্র প্রাণী এসে তার উপর আক্রমণ করলো এবং শরীর থেকে একখণ্ড মাংস ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। দরবেশ এতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমিও অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞেস করলাম, এ কী দেখলাম হযরত? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তাআলা এই হিংস্র প্রাণীকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যখনই আমার মধ্যে কোনো উদাসীনতা আসে তখনই এটা এসে আমাকে আক্রমণ করে, যেমনটি তুমি দেখলে।

হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাদের একজন সাথী ছিলেন। তিনি খুব বেশী ‘আল্লাহ! আল্লাহ!’ জিকির করতেন। একদিন তাঁর মাথায় এক টুকরো কাণ্ড পতিত হলো। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। জমিনের উপর রক্ত পড়ে তাতে লিখা হলো ‘আল্লাহ! আল্লাহ!’।

باب الفتوة

বাবুল ফুতুওয়াহ [বীরত্ব অধ্যায়]

قال الله تعالى: "إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى".

قال الأستاذ: أصل الفتوة أن يكون العبد ساعياً أبداً في أمر غيره.

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله تعالى في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه المسلم".

أخبرنا به علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا به أحمد بن عبيد قال: حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا به يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا به ابن أبي حازم، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عبد الرحمن بن حومز الأعرج، عن أبي هريرة، عن يزيد بن ثابت رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الله تعالى في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه المسلم".

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: هذا الخلق، لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فن كل أحد في القيامة يقول: نفسي.. نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم، يقول: أمّتي.. أمّتي.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول: الفتوة

بالشام، واللسان بالعراق، والصدق بخراسان.
وسمعتة يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت محمد بن
نصر ابن منصور الصائغ يقول: سمعت محمد بن مردويه الصائغ يقول:
سمعت الفضيل يقول: الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان.
وقيل: الفتوة: أن لا ترى لنفسك فضلاً عن غيرك.
وقال أبو بكر الوراق: الفتى من لا خصم له.
وقال محمد بن علي الترمذي: الفتوة: أن تكون خصماً للربك على نفسك
ويقال: الفتى: من لا يكون خصماً لأحد.
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: سمعت النصراباذي يقول:
سُئِلَ أصحاب الكهف فتية؛ لأنهم آمنوا بربهم بلا واسطة.
وقيل: الفتى: من كسر الصنم: قال الله تعالى: " سمعنا فتى يذكرهم يقال له
إبراهيم " وقال تعالى: " فجعلهم جذاذاً " وصنم كل إنسان نفسه؛ فمن
خالف هواه فهو فتى علي الحقيقة.
وقال الحارث المحاسبي: الفتوة: أن تنصفَ ولا تنتصف.
وقال عمر بن عثمان المكي: الفتوة: حسن الخلق.
وسئل الجنيد عن الفتوة، فقال: أن لا تنافر فقيراً، ولا تعارض غنياً.
وقال النصراباذي: المروءة شعبة من الفتوة، وهو الإعراض عن الكونين،
والأنفة منها.

وقال محمد بن علي الترمذي: الفتوة أن يسوي عندك المقيم والطارىء.
سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت علي بن عمر الحافظ
يقول: سمعت أبا سهل بن زياد يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل
يقول: سئل أبي: ما الفتوة؟ فقال: ترك ما تهوى لما تخشى.
وقيل لبعضهم: مال الفتوة؟ فقال: أن لا يُميز بين أن يأكل عنده ولي أو
كافر.

سمعت بعض العلماء يقول: استضاف مجوسي إبراهيم الخليل عليه
السلام، فقال: بشرط أن تُسلم، فمر المجوسي، فأوحى الله تعالى إليه: منذ
خمسين سنة نطعمه علي كفره، فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير
دينه؟! فمضى إبراهيم عليه السلام، على أثره، حتى أدركه.. واعتذر إليه،
فسأله عن السبب، فذكر له ذلك؛ فأسلم المجوسي.
وقال الجنيد: الفتوة: كف الأذى، وبذل الندى.

وقال سهل بن عبد الله: الفتوة: اتباع السنّة.

وقيل: الفتوة: الوفاء والحفاظ.

وقيل: الفتوة: فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها.

وقيل: الفتوة: أن لا تهرب إذا أقبل السائل.

وقيل: أن لا تحتجب من القاصدين.

وقيل: أن لا تدخر ولا تعتذر.

وقيل: إظهار النعمة، وإسرار المحنة.

وقيل: أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغير إن جاء تسعة أو أحد عشر.

وقيل: الفتوة: ترك التمييز.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: قال أحمد بن خضرويه لامرأته أم عليّ: أريد أن أتخذ دعوة أدعو فيها عياراً شاطراً كان في بلدهم رأس الفتیان.

فقلت: امرأته: إنك لا تهتدي إلى دعوة الفتیان. فقال: لا بد.

فقلت: إن فعلت فاذبح الأغنام والبقر والحُمُر، وألقها من باب دار الرجل إلى باب دارك.

فقال: أما الأغنام والبقر فأعلم. فما بال الحُمُر؟ فقلت: تدعو فتى إلى دارك، فلا أقل من أن يكون لكلاب المحلة خير.

وقيل: اتخذ بعضهم دعوة، وفيهم شيرازي، فلما أكلوا وقع عليهم النوم في حال السماع.

فقال الشيخ الشيرازي لصاحب الدعوة: ما السبب في نومنا؟ فقال: لا أدري!! اجتهدت في جميع ما أطعمتكم إلا الباذنجان، فلم أسأل عليه.

فلما أصبحوا سألو بائع الباذنجان، فقال: لم يكن لي شيء، فسرقت الباذنجان من الموضع الفلاني وبعته، فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله في حل، فقال الرجل: تسألون مني ألف باذنجان؟ قد وهبته تلك الأرض

ووهبته ثورين وحماراً، وآلة الحرث؛ لئلا يعود إلى مثل ما فعل.
وقيل: تزوج رجل بامرأة.. فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدرى، فقال الرجل:
اشتكت عيني، ثم قال: عميت، فزفت إليه المرأة.. ثم ماتت بعد عشرين
سنة.. ففتح الرجل عينيه، فقبل له في ذلك فقال: لم أعم، ولكن تعاميت
حذاراً، تحزن، فقبل له: سبقت الفتیان.

وقال ذو النون المصري: من أراد الظرف فعليه سقاة الماء ببغداد.
فقبل له: كيف هو؟ فقال: لما جُملت إلى الخلفية، فيما نُسب لى من الزندقة،
رأيت سقاء عليه عمامة، وهو مترد بمنديل مصري، وييده كيزان خرف
رقاق، فقلت: هذا ساقى السلطان، فقالوا: لا، هذا ساقى العامة.
فأخذت الكوز وشربت. وقلت لمن معي: أعطه ديناراً. فلم يأخذه، وقال:
أنت أسير، وليس من الفتوة أن آخذ مكن شيئاً.
وقيل: ليس من الفتوة أن تربح علي صديقك. قاله بعض أصدقائنا، رحمه
الله تعالى.

وكان فتى يسمى أحمد بن سهل التاجر، وقد اشترت منه خرقة بياض فأذ
الشنم رأس ماله فقلت له: ألا تأخذ رجماً؟ فقال: أما الشنم فأخذه، ولا
أؤملك مِنَّة؛ لأنه ليس له من الخطر ما أتحلق به معك، ولكن لا أخذ
الربح؛ إذ ليس من الفتوة أن تربح علي صديقك.

وقيل: خرج إنسان يدعى الفتوة من نيسابور لى نسا فاستضافه رجل، ومعه

جماعة من الفتيان، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم، فانقبض النيسابوري عن غسل اليد، وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال!! قال واحد منهم: أنا سنين أدخل هذه الدار لم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أم رجلاً.

سمعت منصوراً المغربي يقول: اراد واحد أن يمتحن نوحاً النيسابوري العيار.. فباع عنه جارية في زي غلام، وشرط أنه غلام، وكانت وضیئة الوجه، فاشتراها نوح علي أنها غلام، ولبثت عنده شهوراً كثيرة، ففيل الجارية: هل علم أنك جارية؟ فقالت: لا، إنه ما مسني، وتوهم أني غلام.

وقيل: إن بعض الشطار طلب منه تسليم غلام كان يخدمه إلى السلطان، فأبى. فضربه ألف سوط، فلم يُسلم، فاتفق أنه احتلم تلك الليلة، وكان برداً شديداً، فلما أصبح اغتسل بالماء البارد، ففيل له: خاطرت بروحك، فقال: استحيت من الله تعالى أن أصبر على ضرب ألف سوط لأجل مخلوق، ولا أصبر على مقاساة يرد الاغتسال لأجله.

وقيل: قدم جماعة من الفتيان لزيارة واحد يدعي الفتوة، فقال الرجل: يا غلام قدم السفارة. فلم يقدم. فقال له الرجل ذلك ثانياً وثالثاً.. فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفارة كل هذا!! فقال الرجل: لِمَ أبطأت يا سفر؟ فقال الغلام كان عليها نمل، فلم يكن من الأدب تقديم السفارة إلى الفتيان مع

النمل، ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل من السفرة، فلبثت حتى دب النمل. فقالوا له: دقت يا غلام، مثلك من يخدم الفتیان.

وقيل: إن رجلاً نام بالمدينة من الحاج. فتوهم أن هميانة سرق، فخرج، فرأى جعفرًا الصادق.. فتعلق به، وقال له: أنت أخذت همياني؟ فقال له: ماذا كان فيه؟ فقال: ألف دينار.

فأدخله داره.. ووزن له ألف دينار، فرجع إلى منزله، ودخل بيته، فرأى هميانة في بيته وقد كان توهم أنه سرق؛ فخرج إلى جعفر معذراً، وردّ عليه الدنانير، فأبى أن يقبلها، وقال: شيء أخرجه من يدي لا أسترده.

فقال الرجل: من هذا؟! ف قيل: جعفر الصادق.

وقيل: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة، فقال: ما تقول أنت؟ فقال شقيق: إن أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا.

فقال جعفر: الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل!! فقال شقيق: يا ابن رسول الله، ما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة إلى بيته، فاستقبلنا صديق لنا، فقلنا له: ارجع معنا، فنحن في ضيافة الشيخ، فقال: إنه لم يدعني!! فقلنا: نحن نستثنى. كما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.

فرددناه، فلما بلغ باب الشيخ أخبرناه بما قال، وقلنا، فقال: جعلت موضعي من قلبك أن تجيء إلى منزلي من غير دعوة، على كذا وكذا إن مشيت إلى الموضع الذي تقعد فيه منه إلا على خدي، وألح عليه. ووضع خده على الأرض، وحمل الرجل، فوضع قدمه على خده من غير أن يوجعه، وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه.

وأعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء، لاسيما إذا كان لهم فيه شماتة الأعداء.

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول للنصراباذي كثيراً: إن علياً القوال يشرب بالليل ويحضر مجلسك بالنهار، وكان لا يسمع فيه ما يقال، فانفق أنه كان يمشي يوماً ومعه واحد ممن يذكر علياً بذلك عنده فوجد علياً مطروحاً في موضع، وقد ظهر عليه أثر السكر، وصار بحيث يغسل فمه، فقال الرجل: إلى كم نقول فيه للشيخ ولا يسمع؟! هذا عليٌّ على الوصف الذي نقول. فنظر إليه النصراباذي وقال للعدول: احمله في رقبتك، وانقله إلى منزله. فلم يجد بدا من طاعته فيه.

وسمعته يقول: سمعت أبا عليٍّ الفارسي يقول: سمعت المرتعش يقول: دخلنا مع أبي حفص على مريض نعوذه، ونحن جماعة، فقال للمريض: أتحب أن تبرأ؟ فقال: نعم فقال لأصحابه: تحملوا عنه.. فقام العليل.. وخر معنا. وأصبحنا كلنا أصحاب فراش نعاد.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

-“তারা ছিল [আসহাবে কাহাফ] কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।” [কাহাফ : ১৩]

উস্তাদ [লেখক হযরত কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] বলেন, ফুতুওয়াহর মূল কথা হলো, অন্যের কাজের জন্য মানুষ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “বান্দা যতক্ষণ তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে লিপ্ত থাকবে আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সাহায্য করবেন।” উস্তাদ আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, শুনেছি, এটা এক মহান চরিত্র। এর পরিপূর্ণতার অধিকারী একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রোজ কিয়ামতে সবাই বলবেন ‘নাফসী! নাফসী!’ কিন্তু তিনি বলবেন ‘উম্মাতী! উম্মাতী!’।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফুতুওয়াহ পাওয়া যায় শামে, ইরাকে জিহ্বা আর খুরাসানে সত্যবাদিতা।” হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বন্ধু-বান্ধবদের ভুলত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত না করার নামই ফুতুওয়াহ।” বলা হয়ে থাকে, অন্য থেকে নিজেকে মর্যাদার অধিকারী হিসাবে না দেখাই হলো ফুতুওয়াহ। হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তির শত্রু নেই তাঁকে বলে ফাতাহ।” মুহাম্মদ তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তুমি প্রভুর পক্ষ থেকে নিজের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে। এটাই হলো ফুতুওয়াহ।” বলা হয়, যে কারো শত্রু নয় সে ফাতাহ। হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “গর্তে অবস্থানকারী লোকদেরকে [আসহাবে কাহাফ] ফিত্যাহ বলা হয়। কারণ, তারা কোনো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল।” বলা হয়, যে ব্যক্তি মূর্তি ভাঙ্গে সে হলো ফাতাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالُوا سَاعِنَا فَنَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

-“কতক লোক বললো: আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইব্রাহিম বলা হয়।” [আম্বিয়া : ৬০]

তিনি আরো বলেছেন:

فَجَعَلَهُمْ جُذَاءً

-“অতঃপর তিনি [ইব্রাহিম] সেগুলোকে [মূর্তিগুলোকে] চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।”
[আম্বিয়া : ৫৮]

প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নফস হলো একটি মূর্তি। সে-ই প্রকৃত ফাতাহ, যে তার নিজের খাহিশাতের বিরোধিতা করে। হযরত মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফুতুওয়াহ হলো কেবল ইনসাফ চাইবে না বরং নিজ থেকেই ইনসাফ করবে।” হযরত উমর মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুন্দর চরিত্রের নাম ফুতুওয়াহ।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ফুতুওয়াহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেন, “তুমি কোনো ফকিরকে তাড়িয়ে দেবে না। আর কেনো ধনী লোকের মুখাপেক্ষী হবে না।” মুহাম্মদ তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুফ্রিম ও মুসাফির তোমার নিকট সমান হওয়াকেই বলে ফুতুওয়াহ।” হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছেলে হযরত আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বাবাকে ফুতুওয়াহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দেন, ‘নির্ভয়ে নিজের খাহিশাত ছেড়ে দেওয়া।’” একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফুতুওয়াহ কী? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কাছে কোনো বন্ধু কিংবা কেনো কাফির আহার করছে- সেই বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার নামই ফুতুওয়াহ।”

[লেখক বলেন] আমি একজন আলিমের কাছ থেকে শুনেছি, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম এক অগ্নিপূজককে মেহমানদারীর আহ্বান করলেন এই শর্তে, সে যেনো মুসলমান হয়ে যায়। একথা শুনে সে চলে গেলো। আল্লাহ তা’আলা ইব্রাহীম আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ কুফরী সত্ত্বেও তাকে খাবার দিচ্ছি। তাকে ধর্মত্যাগের আদেশ না দিয়েই তো তুমি খাওয়াতে পারতে!” একথা শুনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম তার নিকট ছুটে গেলেন ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। সে এর কারণ জানতে চাইলো। তিনি পুরো ঘটনার বিবরণ দিলেন। অগ্নিপূজারী লোকটি তা শ্রবণ করে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলো।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কাউকে কষ্ট না দেওয়া ও দান-খয়রাত করাকে বলে ফুতুওয়াহ।” হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুন্নাহর অনুসরণই হলো ফুতুওয়াহ।” বলা হয়, ওয়াদা পূর্ণ করা ও হিফাজত করাকে বলে ফুতুওয়াহ। ফুতুওয়াহ একটি গুণ। তা তোমার কাছে আসবে, কিন্তু তুমি কখনো বুঝতে পারবে না, এর মধ্যে আছে। ভিক্ষুক আসলে পলায়ন না করাকেই বলে ফুতুওয়াহ। তোমার নিকট যারা আসবে, তাদের থেকে আড়ালে থাকবে না। মজুতদারী করবে না। অপারগতাও পেশ করবে না। নিয়ামতের প্রকাশ ঘটাবে, চেষ্টা-সাধনা লুকিয়ে রাখবে। এসব হলো ফুতুওয়াহ। মনে করো তুমি দশ ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়েছো। আসলো ৯ কিংবা ১১ জন। এতে তোমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। একেই বলে ফুতুওয়াহ।

বৈষম্য পরিত্যাগ হলো ফুতুওয়াহ। শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আহমদ ইবনে খাজরাওয়া তাঁর স্ত্রী উম্মে আলীকে বললেন, আমাদের শহরের ডাকাত সরদার যুবককে আমি দাওয়াত দিতে চাই। স্ত্রী জবাব দিলেন, তুমি দাওয়াত দিতে পারবে না। আহমদ বললেন, অবশ্যই দেবো। স্ত্রী বললেন, যদি পারো তাহলে ছাগল, গরু ও গাধা জবাই করো। নিজের ঘর থেকে ডাকাত সর্দাদের ঘর পর্যন্ত তা ছিটিয়ে ফেলে রাখো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গরু-ছাগলের বিষয় তো বুঝলাম-গাধা জবাই করবো কেনো? উম্মে আলী জবাব দিলেন, তুমি যখন দাওয়াত দিচ্ছো তাহলে শহরের কুকুরগুলো বধিত থাকবে কেনো?”

বর্ণিত আছে একব্যক্তি কয়েকজন সুফিকে দাওয়াত দিলেন। মেহমানদের মধ্যে একজন ছিলেন শায়খ সিরাজী। সা’মা পাঠকালে সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। সিরাজী মেজবানকে বললেন, আমরা এভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম কোন্ কারণে? মেজবান জবাব দিলেন, আমি জানি না। আপনাদেরকে যাকিছু আপ্যায়ন করেছি, একমাত্র বেগুন ছাড়া সবই হালাল উপায়ে সংগ্রহ করেছি বলে আমি নিশ্চিত। সকালবেলা বেগুন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমার কাছে কিছুই ছিলো না বিক্রি করার। তাই বাধ্য হয়ে একজনের খেত থেকে বেগুন চুরি করে এনে বিক্রি করেছি। তারা একথা শুনে বেগুন বিক্রেতাকে বেগুন খেতের মালিকের নিকট নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিলো তার এ কাজটিকে বৈধ করা। মালিকের নিকট পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন। মালিক বললেন, আপনারা কেনো আমাকে এক হাজার বেগুনের কথা

জিজ্ঞেস করছেন না? আমি পুরো বেগুন খেতই তাকে দিয়ে দিলাম। এসাথে আরো দিলাম দু'টি ষাড়, একটি গাধা ও খেতের আরো কিছু উপকরণ। আশা করছি, লোকটি আর এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হবে না।

আরো বর্ণিত আছে, একব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। মিলনের পূর্বে দেখা গেলো মহিলাটির মুখে গুটি বসন্তের দাগ আছে। লোকটি তখন বললেন, আমার চোখে অসুস্থতা অনুভব করছি। এরপর বললেন, আমি তো অন্ধ হয়ে গেলাম। এরপর তিনি স্ত্রীর সাথে মিলন করলেন। বিশ বছর পর স্ত্রিলোকটি মারা যান। এরপর তিনি চোখ খুললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি তো অন্ধ ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, না। আমি অন্ধত্বের ভান করেছি মাত্র যাতে মহিলাটি কষ্ট না পায়। বলা হলো, আপনি তো বীর পুরুষদের অগ্রগামী।

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ যদি বদান্যতা দেখতে চায় তাহলে সে যেনো একজন পানি প্রদানকারীর নিকট চলে যায়।” জিজ্ঞেস করা হলো, এ লোকটি কেমন? তিনি জবাব দিলেন, “ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে আমাকে যখন খলিফার দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন পানি প্রদানকারী এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তাঁর মাথায় ছিলো পাগড়ি ও হাতে পানির লোটা। আমি বললাম, এতো বাদশাহর সাকী। লোকজন বললো, না, সে সাধারণ লোকের সাকী। আমি তখন পাত্র নিয়ে পানি পান করলাম। সাথীদেরকে বললাম, তাকে এক দীনার দাও। সাকী লোকটি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, আপনি একজন বন্দী। বন্দীর কাছ থেকে বিনিময় নেবো, তাতো ফুতুওয়াহ হতে পারে না।”

বন্ধু-বান্ধবদের চেয়ে নিজে বেশী লাভবান হওয়া ফুতুওয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের এক বন্ধু বর্ণনা করেন, একব্যক্তি ছিলেন যার নাম আহমদ ইবনে সাহাল। তার নিকট থেকে একখণ্ড সাদা কাপড় ক্রয় করলাম। তিনি কেবল কাপড়ের ক্রয়মূল্য নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লাভ নেবেন না? জবাব দিলেন, আমি কেবল ক্রয়মূল্য নেবো- তোমার কাছ থেকে লাভ করবো না। কারণ, বন্ধুদের নিকট থেকে লাভ গ্রহণ ফুতুওয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ফুতুওয়াহর দাবীদার ছিলেন। একজন লোক তাকে ও আরো কিছু ফাতাহ লোকদেরকে আপ্যায়নের দাওয়াত করলো। খাওয়া-দাওয়া শেষে

একজন ক্রীতদাসী সবার হাত ধোঁয়ানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন ঐ ফুতুওয়ার দাবীদার লোকটি হাত সরিয়ে নিলেন। বললেন, মেয়েলোক পুরুষের হাত ধোঁয়াবে- তাতো ফুতুওয়াহ নয়। উপস্থিত আরেকজন ফাতাহ বললেন, আমি আজ কয়েক বছর যাবৎ এ বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে আসছি। আজো বুঝতে পারি নি, নারী না পুরুষ আমার হাত ধোঁয়ে দিয়েছেন!

হযরত মানসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একব্যক্তি নূহ নিশাপুরীকে পরীক্ষা করতে চাইলো। সে তাঁর কাছে এক দাসীকে পুরুষ ক্রীতদাসের রূপে সাজিয়ে বিক্রি করলো। এরপর বলে দিলো, এটা একটি ছেলে। আসলে দাসীটি ছিলো বেশ সুন্দরী। নূহ একে ছেলে ভেবেই খরিদ করলেন। কয়েক মাস যাবৎ সে তার নিকট ছিলো। একদিন মেয়েটিকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, নূহ কি জানেন না তুমি যে একজন মেয়েমানুষ? সে জবাব দিল, না- তিনি তো আজো আমাকে স্পর্শই করেন নি! তিনি আমাকে একটি ছেলে হিসাবেই মনে করে আসছেন।”

বর্ণিত আছে, কয়েকজন ফাতাহ লোক অনুরূপ আরেক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলেন। তিনি খাদিমকে বললেন, দস্তারখান নিয়ে আসো। খাদিম তা নিয়ে আসলো না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার নির্দেশের পরও সে তা নিয়ে আসলো না। উপস্থিত মেহমানরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। বললেন, যে লোক দস্তারখান আনতে এতো অবাধ্যতা করে- তাকে খেদমতে নিয়োগ দেওয়া তো ফুতুওয়াহ হতে পারে না। অবশেষে সে যখন দস্তারখান নিয়ে আসলো, জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি এতো দেরী করলে কেনো? খাদিম জবাব দেয়, দস্তারখানে বেশ কিছু পিপড়া ছিলো। আপনাদের মতো ফাতাহদের নিকট পিপড়াসহ দস্তারখান আনবো- তা তো ফুতুওয়াহ হতে পারে না! অন্যদিকে পিপড়াদের তাড়িয়ে দেওয়া তো ফুতুওয়াহ বিরোধী কাজ। তাই ওগুলো এমনিতেই দস্তারখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলাম। মেহমানরা তখন বললেন, হে যুবক! তুমি তো গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তোমার মতো লোকই ফাতাহদের খেদমতের জন্য উপযুক্ত।

বর্ণিত আছে, হাজ্জব্রত পালনকারী একব্যক্তি মদীনা শরীফে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ তার মনে পড়লো টাকার থলেটি চুরি হয়ে গেছে! কামরা থেকে বের হয়ে তিনি প্রথমেই সাক্ষাৎ পেলেন হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। তিনি তাঁকে আঁকড়ে ধরে বললেন, তুমিই আমার থলেটি চুরি করেছো! তিনি জিজ্ঞেস

করলেন, আপনার থলেতে কি ছিলো? লোকটি জবাব দিলেন, এতে ছিলো ১ হাজার দীনার। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। ওজন করে পুরো এক হাজার দীনার তাকে প্রদান করলেন। লোকটি তা নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন, এক হাজার দীনার ভর্তি তার নিজের সেই থলেটা ঘরেই পড়ে আছে! তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। ক্ষমা চেয়ে তাঁর দীনারগুলো ফেরৎ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন, যে হাত দিয়ে আমি কিছু প্রদান করি তা ফিরিয়ে নেই না! লোকটি তখন অন্যান্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো, উনি কে? তারা বললো, উনি হচ্ছেন হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আরো বর্ণিত আছে, হযরত শাক্কীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ফুতুওয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি পাঁচটা প্রশ্ন করলেন, তুমিই বলো ফুতুওয়াহ কী? শাক্কীক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, যদি আমাদেরকে কিছু দান করা হয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর না দিলে ধৈর্য ধারণ করি। জাফর বললেন, মদীনায় আমাদের আশেপাশে কিছু কুকুর আছে- তারাও তো অনুরূপ করে। তখন শাক্কীক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! বলুন ফুতুওয়াহর সঠিক অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন, যদি আমাদেরকে কিছু দেওয়া হয় আমরা তা অপরকে দান করে দিই। আর যদি না দেওয়া হয় কৃতজ্ঞতা আদায় করি!

হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “শায়খ আবুল আব্বাস একদা তাঁর বাড়িতে আমাদেরকে দাওয়াত করলেন। পথিমধ্যে আরেক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। শায়খের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করি। তিনি বললেন, শায়খ তো আমাকে দাওয়াত দেন নি! বললাম, তাঁর কাছ থেকে আমরা অনুমতি নিয়ে নেবো যেভাবে হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকেসহ শায়খের বাড়ির দিকে চললাম। সেখানে পৌঁছে শায়খকে ঘটনার বর্ণনা দিলাম। তিনি ঐ বন্ধুকে বললেন, তোমার স্থান তো আমার অন্তরে। তুমি তো দাওয়াত ছাড়াই আসবে! তুমি নিজ স্থানে যেয়ে বসতে পারবে না আমার গালে পদার্পণ ছাড়া। তিনি মাটিতে গাল রেখে বার বার তাকে বলতে লাগলেন, আমার গালে পাড়া দিয়ে যাও। অবশেষে বন্ধুটি বাধ্য

হয়ে শায়খের গালে পা রাখলেন। এরপর শায়খ তাকে টেনে বসার স্থানে নিয়ে গেলেন।”

জেনে রাখো, বন্ধুদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা হলো ফুতুওয়াহ। বিশেষ করে যাদের ব্যাপারে দোষ-ত্রুটি ঢেকে না রাখলে শত্রুরা আনন্দিত হয়। শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি অনেকবার হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেছি, আলী কাওয়াল রাতে মদ পান করে ও দিনের বেলা আপনার মজলিসে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি আমার কথায় কান দেন নি। একদিন রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। সাথে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আলী কাওয়ালকে সমালোচনা করে থাকেন। এরপর দেখা গেলো, আলী কাওয়াল ঠিকই মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে! তার মুখমণ্ডলে মদের ছিটেফুটো। শায়খ সুলামী এগিয়ে যেয়ে তার মুখমণ্ডল ধোঁয়ে দিতে উদ্যত হলেন। সাথী লোকটিকে মন্তব্য করলাম, আমি কতবার শায়খকে আলী সম্পর্কে অবগত করেছি এবার দেখুন কীভাবে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে আছে! শায়খ লোকটির দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন, ওকে তোমার কাঁধে ওঠাও! বাড়িতে নিয়ে চলো! এ নির্দেশ শ্রবণের পর সাথী বাধ্য হয়ে তাই করলেন।

হযরত মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা আবু হাফসের সঙ্গে এক অসুস্থ লোককে দেখতে গেলাম। হাফস রোগিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সুস্থ হতে চাও? সে বললো, অবশ্যই হযরত! তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তার বোঝা [রোগ] বহন করে নিয়ে যাও! একথা শুনার পর রোগি লোকটি বিছানা থেকে উঠে আমাদের সাথে বেরিয়ে আসলো। এরপর আমরা নিজেরা শয্যাশায়ী হলাম! বন্ধু-বান্ধবরা রোগি হিসাবে আমাদেরকে দেখতে আসলেন।”

باب الفراسة

বাবুল ফিরাসাত [অন্তর্দৃষ্টি অধ্যায়]

قال الله تعالى: "إن في ذلك لآيات للمتوسمين". قيل: للمتفرصين. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين الرازي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن السكن قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن كثير الكوفي قال: حدثنا عمرو بن قيس: عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله عز وجل". والفراس: خاطر على القلب فينفي ما يضاده. وله على القلب حكم اشتقاقاً من: فريسة السبع، وليس في مقابلة الفراسة مجوزات للنفس. وهي علي حسب قوة الإيمان: فكل من كان أقوى إيماناً كان أد فراسة. وقال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة، بل حكم حق جرى على لسان عبد.

وقوله: "نظر بنور الحق" يعني: بنور خصه به الحق سبحانه. وقال الواسطي: إن الفراسة: سواطع أنوار لمعت في القلوب، وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق، سبحانه، إياها؛ فيتكلم على ضمير الخلق. ويحكى عن أبي الحسن الديلمي أنه قال: دخلت أنطاكية لأجل أسود قيل لي: إنه يتكلم على الأسرار فأقمت فيها إلى أن خرج من جبل لكam ومعه

شيء من المباح يبيعه، وكنت جائعاً منذ يومين لم آكل شيئاً فقلت له: بكم هذا؟ وأوهمته أنني أشتري ما بين يديه فقال: اقعد ثم؛ حتى إذا بعناه نعطيك ما تشتري به شيئاً.. فتركته وسرت إلى غيره؛ أوهمه أنني أساومه. ثم رجعت إليه، وقلت له: إن كنت تبيع هذا فقل لي بكم؟ فقال: إنما جعت يومين، اقعد ثم، حتى إذا بعناه نعطيك ما تشتري به شيئاً.. فقعدت.. فلما باعه أعطاني شيئاً ومشى، فتابعت.. فالتفت إليّ وقال لي: إذا عرضت لك حاجة، فأنزلها بالله تعالى، إلا أن يكون لنفسك فيها حظ فتحجب عن حاجتك.

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقول: الفراسة: مكاشفة اليقين، ومعاينة الغيب، وهو من مقامات الإيمان.

ALL RIGHTS RESERVED

وقيل: كان الشافعي، ومحمد بن الحسن، رحمهما الله تعالى، في المسجد الحرام فدخل رجل، فقال محمد بن الحسن: أتفرّس أنه نجار، وقال الشافعي: أتفرّس أنه حداد، فسألاه، فقال: كنت قبل هذا حداداً، والساعة أنجرّ. وقال أبو سعيد الخراز: المستنبط: من يلاحظ الغيب أبداً، ولا يغيب عنه، ولا يخفى عليه شيء، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: " لعلمه الذين يستنبطونه منهم " .

والمتوسم: هو الذي يعرف الوسم، وهو العارف بما في سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات، قال الله تعالى: " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " . أي للعارفين بالعلامات التي يبيدها على الفريقين من أوليائه وأعدائه. وللتفرّس: ينظر بنور الله تعالى، وذلك: سواطع أنوار لمعت في قلبه فأدرك

بها المعاني، وهو من خواص الإيمان، والذين هم أكبر منه خطأً الربانيون الحق نظراً وخلقاً، وهم فارغون عن الإخبار عن الخلق، والنظر إليهم، والاشتغال بهم.

وقيل: كان أبو القاسم المنادي مريضاً، وكان كبير الشأن، من مشايخ نيسابور فعاده أبو الحسن البوشنجي، والحسن الحداد، واشتريا بنصف درهم تفاحاً في الطريق نسيئة، وحمله إليه، فلما قعدا قال أبو القاسم: ما هذه الظلمة؟ فخرأ. وقالأ: ماذا فعلنا؟. وتفكرأ. فقالأ: لعلنا لم نؤد ثمن التفاح، فأعطياه الثمن، وعادا إليه، فلما وقع بصره عليهما قال: هذا عجب، أيمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟! أخبراني عن شأنكما.. فذكر له هذه القصة، فقال: نعم، كان يعتمد كل واحد منكما على صاحبه في إعطاء الثمن، والرجل يستحي منكما في التقاضي، فكان تبقى التبعة، وأنا السبب، إنما رأيتُ ذلك فيكما وكان أبو القاسم المنادي هذا يدخل السوق كل يوم يُنادي، فإذا وقع بيده ما فيه كفايته من دائق إلى نصف درهم خرج منه. وعاد إلى رأس وقته، ومراعاة قلبه.

وقال الحسين بن منصور: الحق إذا استولى على سر ملكه الأسرار؛ فيعانيها، ويخبر عنها.

وسئل بعضهم عن الفراسة، فقال: أرواح تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني الغيوب، فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة، لا نطق ظن وحسبان.

وقيل: كان بين زكريا الشختي وبين امرأة سبب قيل توبته، فكان يوماً واقفاً على رأس أبي عثمان الحيري، بعدما صار من خواص تلاميذه،

فتفكر في شأنها، فرفع أبو عثمان رأسه إليه وقال: أما تستحي؟! قال الأستاذ الإمام، رحمه الله: كنت في ابتداء وصليتي بالأستاذ أبي علي الدقاق، رضي الله عنه، عقد لي المجلس في مسجود المطرز فاستأذنته وقتاً للخروج إلى نسا فأذن لي فيه، فسكنت أمشي معه يوماً في طريق مجلسه، فخطر ببالي: ليته ينوب عني في مجالسي أيام غيبيتي. فالتفت إليّ، وقال لي: أنوبُ عنك أيام غيبتك في عقد المجالس.

فمشيت قليلاً.. فخطر ببالي أنه عليل يشق عليه أن ينوب عني في الأسبوع يومين، فليته يقتصر علي يوم واحد في الأسبوع؛ فالتفت إليّ وقال: إن لم يمكنني في الأسبوع يومان أنوبُ عنك في الأسبوع مرة واحدة، فمشيت معه قليلاً؛ فخطر ببالي شيء ثالث، فالتفت إليّ وصرح بالإخبار عنه على القطع.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كان شاه الكرمان حاد الفراسة، لا يُخطيء، ويقول: من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال؛ لم تخطيء فراسته.

وسئل أبو الحسن النوري: من أين تولدت فراسة المتفرسين؟ فقال: من قوله تعالى: "ونفخت فيه من روحي"، فمن كان حظه من ذلك النور أتم، كانت مشاهدته أحكم، وحكمه بالفراسة أصدق، ألا ترى كيف أوجب نفخ الروح فيه السجود له بقوله تعالى: "فأذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين".

وهذا الكلام من أبي الحسن النوري فيه أدنى غموض وإيهام؛ بذكر نفخ الروح، لتصويب من يقول بقدم الأرواح، ولا كما يلوح لقلوب المستضعفين؛ فإن الذي يصح عليه النفخ والاتصال والانفصال فهو قابل للتأثير والتغيير، وذلك من سمات الحدوث، وأن الله، سبحانه وتعالى، خص المؤمنين ببصائر وأنوار بها يتفرسون، وهي في الحقيقة معارف، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: " فإنه ينظر بنور الله " أي بعلم وبصيرة يخصه الله تعالى به ويفرده به من دون أشكاله. وتسمية العلوم والبصائر أنواراً: غير مستبعد، ولا يبعد وصف ذلك بالنفخ، والمراد منه: الخلق.

وقال الحسين بن منصور: المتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده، ولا يعرج على تأويل وظن وحسبان.

وقيل: فراسة المريدين تكون ظناً يوجب تحقيقاً، وفراسة العارفين تحقيق يوجب حقيقة.

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: إذا جلستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب؛ يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من حيث لا تحسون.

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الخلدی يقول: سمعت أبا جعفر الحداد يقول: الفراسة أول خاطر بلا معارض؛ فإن عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس.

ويُحكى عن أبي عبد الله الرازي نزيل نيسابور قال: كساني ابن الأنباري صوفاً، ورأيت على رأس الشبلي قلنسوة ظريفة تليق بذلك الصوف،

فتمنيت في نفسي أن يكونا جميعاً لي.. فلما قام الشبلي من مجلسه التفت إلي.. فتبعته، وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلي، فلما دخل داره دخلت؛ فقال لي: انزع الصوف. فنزعته.. فلفه وطرح القلنسوة عليه، ودعا بنار فأحرقهما.

وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة، ولكن يتقي الفراسة من الغير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا فراسة المؤمن " ولم يقل: تفرسوا فكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟! وقال أبو العباس بن مسروق: دخلت علي شيخ من اصحابنا أعوده.. فوجدته على حال رثة، فقلت في نفسي: من أين يرتزق هذا الشيخ؟ فقال لي: يا ابا العباس: دع عنك هذه الخواطر الدنيئة؛ فإن الله أظافاً خفية.

ويحكى عن الزبيدي قال: كنت في مسجد ببغداد مع جماعة من الفقراء، فلم يفتح علينا بشيء أياماً فأتيت الخواص لأسأله شيئاً، فلما وقع بصره علي قال: الحاجة التي جئت لأجلها يعلمها الله أم لا؟ فقلت: بلى؛ فقال: اسكت ولا تبدها لمخلوق، فرجعت ولم ألبث إلا قليلاً حتى فتح علينا بما فوق الكفاية. وقيل: كان سهل بن عبد الله يوماص في الجامع، فوق حمام في المسجد من شدة ما لحقه من الحر والمشقة، فقال سهل: إن شاهاً الكرمانى مات الساعة، إن شاء الله تعالى، فكتبوا ذلك.. فكان كما قال.

وقيل: خرج أبو عبد الله التروغندي - وكان كبير الوقت - إلى طوس فلما بلغ خر وقال لصاحبه: اشتر الخبز. فاشترى ما يكفيهما، فقال: اشتر أكثر من ذلك. فاشترى صاحبه ما يكفي عشرة أنفس تعمداً، فكأنه لم يجعل

لقول ذلك الشيخ تحقيقاً قال: فلما صعدنا إلى الجبل إذا بجماعة قيدتهم للصوص، لم يأكلوا منذ مدة، فسألونا الطعام، فقال: قدم إليهم السفرة. وقال الأستاذ الإمام: كنت بين يدي الأستاذ الإمام أبي علي رحمه الله يوماً فجرى حديث الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وأنه يقوم في السماع موافقة للفقراء، فقال الأستاذ أبو علي: مثله في حاله؛ لعل السكون أولى به. ثم قال: في ذلك المجلس أمض إليه فستجده وهو قاعد في بيت كتبه، وعلى وجه الكتب مجلدة حمراء مربعة صغيرة فيها أشعار الحسين بن منصور. فاحمل تلك المجلدة ولا تقل له شيئاً وجئني بها. وكان وقت الهجرة.. فدخلت عليه فإذا هو في بيت كتبه والمجلدة موضوعة بحيث ذكر، فلما قعدت أخذ الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في الحديث وقال: كان بعض الناس ينكر علي أحد من العلماء حركته في السماع، فرؤى ذلك الإنسان يوماً خالياً في بيت وهو يدور كالمتواجد، فسئل عن حاله فقال: كانت مسألة مشكلة عليّ، فتبين لي معناها، فلم أتمالك من السرور حتى قمت أدور، فقيل له: مثل هذا يكون حالهم.

فلما رأيت ما أمرني به الأستاذ أبو علي، وما وصف لي على الوجه الذي قال وجرى على لسان الشيخ أبي عبد الرحمن ما كان ذكره به، تحيرت، وقلت: كيف أفعل بينهما؟ ثم فكرت في نفسي وقلت: لا وجه إلا الصدق، فقلت: إن الأستاذ أبا علي وصف لي هذه المجلدة وقال لي أحملها من غير أن تستأذن الشيخ، وأنا هو ذا أخافك، وليس يمكنني مخالفته، فأني شيء تأمرني به؟.. فأخرج مسدساً من كلام الحسين، وفيه تصنيف له سماه: كتاب الصهيور في نقض الدهور وقال: أحمل هذا إليه، وقل له: إني أطلع

تلك المجدة وأنقل منها أبياتاً إلى مصنفاتي.. فخرجت.

ويحكى عن الحسن الحداد، رحمه الله، أنه قال: كنت عند أبي القاسم المنادي وعنده جماعة من الفقراء، فقال لي: أخرج وأتهم بشيء، فسررت: حيث أذن لي في التكلف للفقراء وأن آتهم بشيء بعد ما علم فقري، قال: فأخذت مكتلاً وخرجت.. فلما أتيت سكة سيار رأيت شيخاً بهياً فسلمت عليه وقلت: جماعة من الفقراء في موضع، فهل لك أن تتخلق معهم بشيء؟ فأمر.. حتى إذا أخرج إلى شيئاً من الخبز واللحم والعنب، فلما بلغت الباب نادى أبو القاسم المنادي من وراء الباب: رده إلى الموضع إلي أخذته منه. فرجعت واعتذرت إلى الشيخ، وقلت: لم أجدهم.. وعرضت بأنهم تفرقوا، ورددت السبب عليه ثم جئت إلى السوق ففتح عليّ بشيء، فحملته، فقال: ادخل.

فقصصت عليه القصة، فقال: نعم، ذاك ابن سيار رجل سلطاني، إذا جئت للفقراء بشيء فأتهم بمثل هذا، لا بمثل ذاك. قال أبو الحسين القرافي: زرت أبا الخير التناقي، فلما ودعته.. خرج معي إلى باب المسجد، وقال لي: يا أبا الحسين، أنا أعلم أنك لا تحمل معك معلوماً، ولكن أحمل معك هاتين التفاحتين.

فأخذتهما.. ووضعتهما في جيبِي، وسرت، فلم يفتح لي بشيء ثلاثة أيام، فاخرجت واحدة منهما، وأكلتها، ثم أردت أن أخرج الثانية، فإذا هما جميعاً في جيبِي، فكنت آكل منهما ويعودان.. إلى باب الموصل، فقلت في نفسي: إنهما يفسدان على حال توكلِي؛ إذ صارتا معلوماً لي!! فأخرجتهما من جيبِي بمرّة. فنظرت فإذا فقير ملفوف في عباءة يقول: أشتى تفاحة!!

فناولتهما إياه.. فلما عبرتُ وقع لي: أن الشيخ إنما بعثهما إليه. وكنت في رُفقه في الطريق.. فأنصرفت إلى الفقير، فلم أجده.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أبا عمر بن علوان يقول: كان شاب يصحب الجنيد.. وكان يتكلم علي خواطر الناس، فذكر للجنيد، فقال له الجنيد: ما هذا الذي ذكر عنك؟ فقال الجنيد: اعتقد شيئاً. فقال: اعتقدت!! فقال الشاب: اعتقدت كذا وكذا! فقال الجنيد: لا. فقال: اعتقد ثانياً، ففعل، فقال: اعتقدت كذا وكذا. فقال: لا فقال: ثالثاً. فقال: مثله. فقال الشاب هذا عجب، أنت صدوق، وأنا أعرف قلبي؟! فقال الجنيد: صدقت في الأول والثاني والثالث، ولكني أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك!! وسمعته يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: أعتل ابن الرقي، فحل إليه دواء في قدح، فأخذه، ثم قال: وقع اليوم في المملكة حدث: لا أكل ولا أشرب حتى أعلم ما هور؟ فورد الخبر بعده بأيام: أن القرمطي دخل مكة ذلك اليوم، وقتل بها تلك للقتلة العظيمة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: ذكر الكاتب هذه الحكاية، فقال: هذا عجب!! فقلت له: هذا ليس بعجب، فقال لي أبو علي بن الكاتب: ما خبر مكة اليوم؟ فقلت: هو ذا: تحاربَ الطلحيون وبنو الحسن، ومقدم الطلحيين أسودُ عليه عمامة حمراء، وعلى مكة اليوم غيم على مقدار الحرم، فكتب أبو علي إلى مكة، فكان كما ذكرت له.

ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت على عثمان بن

عفان رضي الله عنه، وكنت رأيت في الطريق امرأة تأملت محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل على أحدكم وآثار ظاهرة على عينيه، فقلت له: أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: لا، ولكن تبصرة، وبرهان، وفراصة صادقة.

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت المسجد الحرام، فرأيت فقيراً عليه خرقتان يسأل الناس شيئاً، فقلت في نفسي: مثل هذا كل على الناس!! فنظر إليّ وقال: "واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه". قال: فاستغفرت في سري، فناداني، وقال: "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده".

وحكى عن إبراهيم الخواص أنه قال: كنت ببغداد في جامع المدينة، وهناك جماعة من الفقراء، فأقبل علينا شاب ظريف، طيب الرائحة، حسن الحزمة، حسن الوجه، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي!! فكلهم كرهوا ذلك، فخرجت، وخرج الشاب، ثم رجع إليهم وقال: ماذا قال الشيخ في؟! فاحتشموه. فألح عليهم، فقالوا: قال إنك يهودي. قال: فجاءني وأكب على يدي، وأسلم. فقلت له: ما السبب؟ قال: نجد في كتبنا أن الصديق لا يخطئ فراسته. فقلت: أمتحن المسلمين؛ فتأملتهم، وقلت: إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة: لأنهم يقولون حديثه سبحانه، فليست عليكم.. فلما اطلع هذا الشيخ عليّ، وتفرس فيّ علمت أنه صديق، وصار الشاب من كبار الصوفية.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول سمعت عبد الله بن إبراهيم بن العلاء، يقول: سمعت محمد بن داود يقول: كنا عند الجريري

فقال: هل فيكم من إذا أراد الحق، سبحانه، أن يحدث في المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يُبديه؟ قلنا: لا. فقال: أبكوا على قلوب لم تجد من الله تعالى شيئاً.

وقال أبو موسى الديلمي: سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل، فقال: لو أدخلت يدك في فم التنين حتى بلغ الرسغ لا تخاف مع الله تعالى شيئاً غيره. قال: فخرجت إلى أبي يزيد لأسأله عن التوكل، فدققت عليه الباب، فقال: أليس لك في قول عبد الرحمن كفاية؟! فقلت: افتح الباب. فقال: مازرتني، أذاك الجواب من وراء الباب. ولم يفتح لي الباب؛ فمضيت، ولبثت سنة، ثم قصدته، فقال: مرحباً، جئتني زائراً. فكنت عنده شهراً، فكان لا يخطر بقلبي شيء إلا حدثني عنه. فعند وداعه لي قلت: أفدني فائدة. فقال: حدثني أمي: أنها كانت حاملاً بي، فكانت إذا قدم لها طعام من حلال امتدت يدها إليه، وإذا كان فيه شبهة انقبضت يدها عنه.

وقال إبراهيم الخواص: دخلت البادية، فأصابني شدة، فلما بلغت مكة، داخلني شيء من الإعجاب، فنادتني عجوز: يا إبراهيم، كنت معك في البادية فلم أكلّمك؛ لأنني لم أرد أن أشغل شرك أخرج عنك هذا الوسواس!! وحكي أن الفرغاني كان يخرج كل سنة إلى الحج، ويمر بنيسابور، ولا يدخل علي أبي عثمان الخيري قال: فدخلت عليه مرة، وسلمت، فلم يرد علي السلام، فقلت في نفسي: مُسلم يدخل عليه ويسلم عليه فلا يرد سلامه؟ فقال أبو عثمان: مثل هذا يحج ويَدع أمه لا يبرها؟! قال: فرجعت إلى فرغانة ولزمتها حتى ماتت. ثم قصدت أبا عثمان، فلما دخلت استقبلنين وأجلسني، ثم إن الفرغاني لازمه وسأله سياسة دابته، فولا ه

ذلك حتى مات أبو عثمان.

وقال خير الناساج: كنت جالساً في بيتي، فوقع لي: أن الجنيد بالباب، فنفيت عن قلبي، فوقع لي ثانياً، وثالثاً، فخرجت فإذا بالجنيد، فقال: لِمَ لم تخرج مع الخاطر الأول؟! وقال محمد بن الحسين البسطامي: دخلت على أبي عثمان المغربي، فقلت في نفسي: لعله يتشهى عليّ شيئاً؟ فقال أبو عثمان: لا يكفي الناس أن آخذ منهم حتى يريدوا مسألتي إياهم.

وقال بعض الفقراء: كنت ببغداد، فوقع لي: أن المرتعش يأتيني بخمسة عشر درهماً؛ لأشتري بها الركوة، والحبل، والنعل، وأدخل البادية: قال: فدق عليّ الباب، ففتحت، فإذا أنا بالمرتعش معه خريقة، فقال: خذها. فقلت: يا سيدي، لا أريدها!! فقال: فلم تؤذينا؟! كم أردت؟ فقلت: خمسة عشر درهماً. فقال: هي همسة عشر درهماً.

وقال بعضهم في قوله تعالى: "أو من كان ميتاً فأحببناه" أي: ميت الذهن فأحياه الله تعالى بنور الفراسة، وجعل له نور التجلي والمشاهدة، لا يكون كمن يمشي بين أهل الغفلة غافلاً.

وقيل: إذا صحت الفراسة أرتقى صاحبها إلى المشاهدة.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت أبا العباس بن مسروق يقول: قدم علينا شيخ، فكان يتكلم علينا في هذا الشأن بكلام حسن، وكان عذب اللسان، جيد الخاطر، فقال لنا في بعض كلامه: كل ما وقع لكم في خاطركم فقولوه لي. فوقع في قلبي أنه يهودي، وكان الخاطر يقوى ولا يزال. فذكرت ذلك للجريري، فكبر عليه ذلك،

فقلت: لا بد لي أن أخبر الرجل بذلك؛ فقلت له: تقول لنا ما وقع لكم في خاطركم فقولوه لي؛ إنه يقع: إنك يهودي!! فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وقال: قد مارست جميع المذاهب وكنت أقول: إن كان مع قوم منهم شيء فمع هؤلاء؛ فداخلتكم لأختبركم، فأنتم على الحق. وحسن إسلامه.

ويحكي عن الجنيد: أنه كان يقول له السري: تكلم على الناس. فقال الجنيد: وكان في قلبي حشمة من الكلام على الناس؛ فإني كنت أتهم نفسي في استحقاق ذلك. فرأيت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكانت ليلة جمعة، فقال لي: تكلم على الناس. فانتهمت.. واتييت باب السري قبل أن أصبح؛ فدققت عليه الباب، فقيل: لم تصدقنا حتى قيل لك؟ فقعد للناس في الجامع بالغد، فانتشر في الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس؛ فوقف عليه غلام نصراني متنكراً، وقال له: أيها الشيخ، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا فراسة المؤمن، فإن المؤمن ينظر بنور الله تعالى؟ ".

قال: فأطرق الجنيد... ثم رفع رأسه وقال: أسلم؛ فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام.

অনুবাদ: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّينَ

-“নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” [হিজর : ৭৫]

এখানে উদ্দেশ্য হলো অন্তর্দৃষ্টিম্পন্ন লোকজন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঈআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন, “মু’মিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, সে তো আল্লাহর নূর দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।”

ফিরাসাত অন্তরের এমন এক বিষয় যা বৈপরিত্যকে দূর করে। অন্তরে ফিরাসাতের নির্দেশ স্থাপিত হয়। শব্দটি আরবী ‘ফারিসাতুস সাবউ’ [فريسة السبع] থেকে উদ্ভূত। ফিরাসাতের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানোর ক্ষমতা নফসের মধ্যে নেই। ঈমানদের শক্তি অনুসারে ফিরাসাত লাভ হয়। যার ঈমান যতো মজবুত সে ততো বেশী ফিরাসাতের অধিকারী। হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি ফিরাসাতের আলোয় দেখে সে তো আল্লাহর আলোয় দেখে। কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও উদাসীনতা ছাড়াই তার জ্ঞানের উপায়-উপকরণসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। বরং বলা যায় আল্লাহর হুকুম তাঁর এক বান্দার মুখ দিয়ে জারি হয়ে গেছে।” ‘আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে’, এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা’আলা তাকে বিশেষ একটি নূর দান করেছেন। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফিরাসাত হলো আলোর কিছু চমক যা অন্তরে চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। এর দ্বারা মা’রিফাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মা’রিফাতই এক গায়েব থেকে আরেক গায়েবের দিকে গোপন রহস্যাদি বহন করে নিয়ে যায়। এ সময় আল্লাহ পাক বস্ত্রসমূহ তাকে যেভাবে দেখাতে চান, সেভাবেই তিনি দেখান।”

বর্ণিত আছে, হযরত আবুল হাসান দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আসওয়াদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য [তুর্কিস্থানের] আন্তাকিয়ায় গেলাম। জানতে পেরেছিলাম, তিনি গোপন বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলেন। লুকাম নামক জায়গায় পৌঁছে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়িলাম। তিনি সেখান থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, এগুলো বিক্রি করা। এদিকে আমি দু’দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত ছিলাম, কিছুই ভক্ষণ করি নি। জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! এগুলো কতো দামে বিক্রি করবেন? ইচ্ছা ছিলো তাঁকে বুঝানো, আমি এগুলো ক্রয় করতে চাচ্ছি। তিনি জবাব দিলেন, এখানে বসো! বেচাকেনার কিছু থাকলে তোমাকে তা দেবো। আমি তাঁকে ছেড়ে অপর আরেক বিক্রেতার নিকট চলে গেলাম। বুঝাতে চাইলাম তাঁর সঙ্গে দরকষাকষি করছি। এরপর ফিরে আসলাম তাঁর নিকট। আবার বললাম, আপনি যদি এগুলো বিক্রি করতে চান তাহলে দামটা কি হবে? তিনি এবার বললেন, তুমি দু’দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত আছো, বেচাকেনার কিছু থাকলে তোমাকে দেবো। আমি বসে পড়লাম। বেচাকেনা শেষ করে তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। এরপর তিনি চলে যেতে লাগলেন। আমিও তার পেছনে চললাম। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে

বললেন, তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে আল্লাহর দরবারে পেশ করো। কিন্তু তুমি যদি নিজের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য কিছু কামনা করো তাহলে তা পূর্ণ হবার নয়।”

হযরত কাভানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ফিরাসাত হলো ইয়াক্বীনের দর্শন। অদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি। এটা ঈমানের মাকামাতের অন্তর্ভুক্ত।” বর্ণিত আছে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদুল হারামে বসা ছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমার মন বলছে এই লোকটি কাঠ মিস্ত্রী হবে। হযরত শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আমার ধারণা লোকটি একজন কামার। উভয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কাজ কি? সে জবাব দেয়, আমি ইতোপূর্বে কামার ছিলাম। বর্তমানে কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করছি।

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি গায়েব দেখতে পায় সে হলো মুস্তাম্বিত [গোপন বাস্তবতার অনুসন্ধানী]। অদৃশ্যের কোনো কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলার কথা হলো:

ALL RIGHTS RESERVED
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

–“তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত”। [নিসা : ৮৩]

যে ব্যক্তি নিদর্শন দেখে বুঝতে পারে, তাকে বলে মুতাওয়াস্‌সিম [বোধশক্তিসম্পন্ন]। এরকম ব্যক্তি বাহ্যিক আলামত দেখেই অন্তরের কালো দাগগুলো বুঝতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

–“নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।”

অর্থাৎ, আল্লাহ তা’আলার বন্ধুজন ও শত্রুদের পরিচয় সম্পর্কে এরা অবগত। মুতাফাররিস [অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন] ব্যক্তি আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে। তার অন্তরে নূর চমকতে থাকে। এর চমকেই সে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়। এটা ঈমানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের মধ্যে যারা অগ্রগামী, তাদেরকে বলা হয় ‘রাব্বানী’ [ওহির্জানে গুণান্বিত আল্লাহওয়ালা]। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلَّمُونَ الْكِتَابَ

-“তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে।” [আলে ইমরান : ৭৯]

অর্থাৎ, তারা জ্ঞানী, তাত্ত্বিক এবং দর্শন ও চরিত্রে আল্লাহর অনুগত। সৃষ্টির খবরা-খবরের প্রতি মনোযোগ থেকে তারা একদম মুক্ত।”

বর্ণিত আছে, হযরত আবুল কাসিম মুনাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ হলেন। নিশাপুরের মাশাইখের মধ্যে তিনি ছিলেন বেশ মর্যাদবান। হযরত আবুল হাসান বুশান্দি ও হযরত হাসান হাদ্দাদ তাঁকে দেখতে গেলেন। রাস্তায় অর্ধ দিরহাম মূল্যের একটি আপেল ক্রয় করলেন। তাঁর কাছে এটি হাদিয়া হিসাবে নিয়ে গেলেন। আবুল কাসিমের ঘরে বসার পরই তিনি তাদেরকে বললেন, কেন এই নির্যাতন? সকলে হতবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, আমরা কী করলাম? শেষে বুঝতে সক্ষম হলেন, ঐ আপেলটির মূল্য আদায় করেন নি! সুতরাং চলে গেলেন আপেল বিক্রেতার নিকট এবং মূল্য আদায় করে ফিরে আসলেন। এবার আবুল কাসিম মন্তব্য করলেন, কী আশ্চর্য! মানুষ কি এতো দ্রুত যুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে? বলুন, ব্যাপার কি? তারা পুরো ঘটনার বর্ণনা করলেন। সব শুনে তিনি বললেন, মূল্য আদায়ের ব্যাপারে তোমরা একে অন্যের প্রতি নির্ভর করছিলে। আর বিক্রেতা লোকটি তোমাদের নিকট টাকা চাইতে লজ্জাবোধ করলো- আর এতেই আপেলটির মূল্য বাকী হয়ে থাকলো। এটাই তো এ ঘটনার মূল কারণ, তোমাদের মধ্যে তা-ই আমি লক্ষ্য করছি।

এই আবুল কাসিম মুনাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যহ বাজারে গিয়ে আওয়াজ দিতেন। তাতে যদি তাঁর হাতে অর্ধ দিরহামও আসতো তা-ই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন এবং নিজের কাজে ফিরে যেয়ে মুরাক্বাবায় লিপ্ত হতেন। হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “অন্তরে যখন সত্যের প্রাবল্য সৃষ্টি হয় তখন মানুষ গোপন ভেদ-রহস্য দেখতে পায়। আর এ সম্পর্কে বর্ণনা গোপন ভেদ-রহস্য জ্ঞাত ব্যক্তি প্রকাশ করে।”

একজন সুফিকে ফিরাসাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, উর্ধ্বজগতে কিছু রূহ আছে। তারা ঘুরাফেরা করে। এরা অদৃশ্যের বিভিন্ন ব্যাপার জানতে পারে। তারা

চান্দুয সাক্ষীদের মতো প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সৃষ্টি-রহস্যের বর্ণনা দেয়। বর্ণিত আছে, তাওবাহ করার পূর্বে হযরত জাকারিয়া শাখতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে একজন মহিলার সম্পর্ক ছিলো। এরপর তিনি আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ হলেন। একদিন তিনি স্বীয় গুরুর পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। এমন সময় ঐ মহিলাটির কথা তাঁর স্মরণ হলো। আবু উসমান সঙ্গে সঙ্গে মাথা উত্তোলন করে ধমকের সুরে বললেন, তোমার লজ্জাবোধ হয় না!

[লেখক বলেন] উস্তাদ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতরাজ নামক জায়গায় অবস্থিত এক মসজিদে ওয়াজ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। আমি সেথায় বয়ান করতাম। একবার নাসা শহরে যাওয়ার জন্য শায়খের নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। অনুমতি নেওয়ার সময় তিনি তাঁর নিজের মজলিসের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর পেছনে হাঁটছিলাম। এ সময় আমার মনে একটি কথার উদয় হলো, আমার অনুপস্থিতিতে হযরত যদি আমার মজলিসে বয়ান দিতেন! তিনি সাথে সাথে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতে ঐ মসজিদের মজলিসে আমি বসে ওয়াজ করবো। আরো একটু হাঁটলাম। এবার আমার মনে ধারণা হলো, হযরত তো অসুস্থ। সপ্তাহে যদি একদিন মাত্র মজলিসে এসে বয়ান করেন তাহলে ভালো হতো। তিনি ফিরে তাকিয়ে বললেন, সপ্তাহে দু’দিন সম্ভব না হলেও অন্তত একদিন আমি মজলিসে আসবো। আরো একটু হাঁটলাম। এবার অন্তরে তৃতীয় আরেক বিষয় আসলো। এবারও তিনি আমার দিকে চেয়ে সে সম্পর্কে বলে দিলেন।

শাখয সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ফিরাসাতে ভুল হতো না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হারাম থেকে চোখ বাঁচিয়ে রাখে, খাহিশাত থেকে নফসকে রক্ষা করে, সবসময় মুরাক্বাবার মাধ্যমে নিজের বাতিনকে আবাদ করে রাখে, সুন্নাতের ইত্তিবায নিজের জাহিরকে সুন্দর রাখে এবং হালাল খায় তার ফিরাসাতে কখনো ভুল হয় না।”

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, চান্দ্রমহমানদের দৃষ্টিশক্তি কোথেকে সৃষ্টি হয়? তিনি জবাব দেন, “আল্লাহ তা’আলার বাণীতেই তা আছে:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

–“তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁক দেবো।” [হিজর : ২৯]

এই নূর থেকে যে যতটুকু অংশ লাভ করেছে তার মুজাহাদার মাত্রাও সে পরিমাণ হবে। তুমি কি দেখছো না, কিভাবে আল্লাহ তা’আলা রুহ ফুৎকার করার পর তাদেরকে সিজদার নির্দেশ দিলেন?

فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

–“তখন তোমরা তার [আদম আ.এর] সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো।” [হিজর : ২৯]

আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা খুবই জটিল। তাঁর কথার দ্বারা মোটেই একথা বুঝা যায় না যে, রুহ চিরন্তন। যেমন নাকি কিছু দুর্বলমনা লোক এরূপ ধারণা পোষণ করে। কারণ যে জিনিষের মধ্যে ফুৎকার হয়, মিলন ঘটে ও বিচ্ছিন্নতাও আসে তা-তো পরিবর্তনশীল জিনিস। এটা চিরন্তনতার কোনো নিদর্শন নয়। আল্লাহ তা’আলা মু’মিনদেরকে বিশেষ জ্ঞান ও নূর দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এসব নূর হলো মূলত মা’রিফাত ও হিকমাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, “মু’মিন আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে”- এর উদ্দেশ্য মূলত মা’রিফাত।

হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর [হাল্লাজ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে সে হলো মুতাফাররিস [চান্দ্রমহমান]। তার জন্য ধারণা কিংবা কল্পনার প্রয়োজন নেই।” বলা হয়ে থাকে, মুরীদদের ফিরাসাত ধারণার উপর হয়ে থাকে। ধারণা থেকে একটি বাস্তবতার সৃষ্টি হয়। আরিফদের ফিরাসাত দ্বারা প্রথম থেকেই হাক্কিকাত লাভ হয়। হযরত আহমদ ইবনে আসিম আস্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সত্যবাদী ও খাঁটি লোকদের কাছে যখন তোমরা বসো, খুবই নিষ্ঠা ও সততার সাথে ওঠাবসা করবে। তাঁরা হলেন, অন্তরের গুণ্ডচর, অন্তরে ঘোরাফেরা করেন। আর তোমার অজান্তেই তাঁরা

আবার বেরিয়ে আসেন। হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংঘাত ছাড়াই অন্তরে যে ভাব আসে তা-ই ফিরাসাত। কোনো প্রকারের সংশয় এসে গেলে তা ফিরাসাত নয় বরং কল্পনা।” বর্ণিত আছে, নিশাপুরে অতিথি জীবনধারী আবু আব্দুল্লাহ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবনুল আম্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে একটি পশমের তৈরি পোশাক দিলেন। এ সময় হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাথায় একটি টুপি দেখি। এটি পশমের সাথে বেশ যুৎসই ছিলো। ভাবলাম, এই উভয়টি যদি ব্যবহার করতে পারতাম! এরপর, শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মজলিস থেকে ওঠার পর আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর পেছনে চলতে লাগলাম। যখন আমি তাঁর সাথে এভাবে চলতাম তিনি আমার দিকে এভাবে তাকাতে- এটা তাঁর রীতি ছিলো। তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। নির্দেশ দিলেন, পশমের পোশাক খোলো। আমি তা-ই করলাম। পোশাকটি ভাজ করে রেখে তার উপর নিজের মাথার টুপিটিও রাখলেন। এরপর উভয়টিতে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে ফেললেন।”

হযরত আবু হাফস নিশাপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কারোর জন্য ফিরাসাতের দাবী ঠিক নয়। তবে অন্যের ফিরাসাতকে ভয় করা উচিত। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ফিরাসাতের ভয় করো। একথা বলেন নি, তোমরা ফিরাসাতের চর্চা করো। তাই, যেখানে ফিরাসাতকে ভয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে ফিরাসাতের দাবী করা কতটুকু শুদ্ধ?”

হযরত আবুল আব্বাস ইবনে মাসরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাদের সময়ের একজন শায়খের সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি তখন অসুস্থ। তাঁর দুর্বলতা দেখে মনে মনে ভাবলাম, আহ! না জানি শায়খ কিভাবে কোথেকে খাবার গ্রহণ করেন? তিনি বলে ওঠলেন, হে আবুল আব্বাস! এরূপ চিন্তা-কল্পনা ছেড়ে দাও! আল্লাহ তা’আলার এমন কিছু দয়া আছে যা গোপন থাকে।” হযরত জুবাইদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি কিছু দরবেশের সাথে বাগদাদের এক সমজিদে ছিলাম। বেশ ক’দিন গত হলো, আমরা কোনো খাবার-দাবার পাই নি। আমি খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট কিছু চাইতে আসলাম। আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হলে বলে ওঠলেন, যে প্রয়োজনে তুমি আমার নিকট এসেছো তা কি আল্লাহ জানেন না? জবাব দিলাম, অবশ্যই জানেন? বললেন, তাহলে নীরব থাকো।

কোনো মাখলুকের কাছে প্রকাশ করো না। আমি ফিরে যাই। সামান্য সময় স্থির থাকার পর দেখি, এমন পরিমাণ খাবার-দাবার আসলো যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো।”

বর্ণিত আছে, হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো একদিন এক জামে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি কবুতর প্রচণ্ড গরমের কারণে ছায়ায় আশ্রয় নিতে মসজিদে প্রবেশ করলো। হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এই মুহূর্তে শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্তিকাল করেছেন! কথাটি উপস্থিত লোকজন লিখে রাখলেন। পরে জানা গেলো, সত্যিই এসময় শাহ কিরমানীর ওফাত হয়েছিল।

আরো বর্ণিত আছে, হযরত আবু আবদুল্লাহ তারুগিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক সময়ের বড় একজন বুজুর্গ ছিলেন। একদা তিনি তুস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। খারু নামক স্থানে পৌঁছে সাথীকে বললেন, রুটি ক্রয় করে নিয়ে আসো। সাথী দু’জনের চাহিদানুযায়ী রুটি খরিদ করে আনলেন। হযরত বললেন, আরো বেশী নিয়ে আসো। এবার সাথী দশজন লোকের চাহিদা পরিমাণ রুটি ক্রয় করে নিয়ে আসলেন। উভয় কাজ ছিলো শায়খের নির্দেশ পালন- অন্য কোনো কারণ ছিলো না। সাথী বর্ণনা করেন, আমরা এরপর পাহাড়ে আরোহণ করলাম। দেখলাম একদল লোককে চোর-ডাকাতরা বেঁধে রেখেছে। বেশ দিন যাবৎ তারা আহার করেন নি। আমাদেরকে দেখে খাবার চাইলেন। শায়খ এবার আমাকে নির্দেশ দিলেন, এসব রুটি তাদেরকে পরিবেশন করো।

[লেখক বলেন] উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে সামনের সারিতে বসে আছি। শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। বলা হলো, দরবেশদের সাথে মিল রেখে সামা’ পাঠের সময় হযরত শায়খ সুলামীও দাঁড়িয়ে গেলেন। শায়খ দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে মন্তব্য করলেন, এ সময় তাঁর জন্য স্থির অবস্থায় বসে থাকাই উত্তম হতো। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন, তুমি এম্ফুগি শায়খ সুলামীর নিকট চলে যাও। দেখবে তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে বসে আছেন। সেখানে অনেক পুস্তকাদির মধ্যে লাল বর্ণের চতুর্ভুজ আকারের একটি বই দেখবে। এতে হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর

[হাল্লাজ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু কবিতা আছে। তুমি এটা আমার নিকট নিয়ে এসো। এ ব্যাপারে সুলামী সাহেবের সাথে কোনো কথা বলবে না।

তখন ছিলো দুপুর বেলা। আমি হযরত সুলাইমির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। ঠিকই তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে বসা ছিলেন, উস্তাদের কথা মতো। যে গ্রন্থটির কথা উস্তাদ বলেছিলেন, সেটাও পেলাম। আমি শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পাশে বসলাম। তিনি কথা শুরু করলেন। বললেন, কিছু মানুষ সামান্য সময় নড়াচড়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। অথচ ঐ ব্যক্তিকেই নিজের কক্ষে আত্মভুলা [উজ্জদ এর] অবস্থায় নৃত্য করতে দেখা গেছে। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, “আমি এমন এক সমস্যায়া ছিলাম যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে ঘুরতে লাগলাম।” এরপর তিনি [সুলামী] বললেন, এটা হলো সুফিদের হাল। উস্তাদ দাঈয়াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা মুতাবিক আমি সবকিছু দেখতে পেলাম। অন্যদিকে উস্তাদ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যা বললেন তাতেও আমি হযরান হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, তাঁদের উভয়কে নিয়ে কোন্ সিদ্ধান্তে যাবো? মনে মনে স্থির করলাম সত্য কথাই বলবো।

সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললাম, উস্তাদ আবু আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই গ্রন্থটির বর্ণনা দিয়েছেন এবং তা আপনাকে না জানিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। এখন আমি আপনাকে ভয় করছি, অপরদিকে তাঁর বিরোধিতাও করতে পারবো না। বলুন, আমি কি করবো? আমার কথা শুনে তিনি হুসাইন ইবনে মানসুরের গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড বের করলেন। এতে তাঁর আরেকটি রচনা ছিলো যার শিরোনাম ‘আস্ সাইহুর ফী নাক্বদিদ্ দুহুর’ [الصهيور في نقض الدهور] তিনি আমাকে বললেন এটি নিয়ে যাও। শায়খ দাঈয়াককে বলবে, আমি এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করছি। এ থেকে আমার নিজের কিতাবেও কিছু কবিতা নকল করছি। এরপর আমি [লেখক] সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলাম।

হযরত হাসান হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমি আবুল ক্বাসিম মুনাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে উপস্থিত ছিলাম। এসময় কয়েকজন দরবেশ আসলেন। হযরত আমাকে নির্দেশ দিলেন, বের হয়ে যাও, তাঁদের জন্য কিছু খাবার

নিয়ে আসো। আমি খুব খুশী হলাম, তিনি যে আমাকে দরবেশদের খিদমাতের সুযোগ দিয়েছেন। হাতে থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সাইয়্যারের রাস্তায় এসে এক বৃদ্ধকে দেখে সালাম জানালাম। বললাম, কয়েকজন দরবেশ এখানে এসেছেন। আপনি কি তাঁদের সেবা করবেন? একথা শোনে তিনি কিছু আঙ্গুর, মাংস ও রুটি নিয়ে আসলেন। আমি এসব নিয়ে দরোজার নিকট পৌঁছুতেই হযরত আবুল কাসিম মুনাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেখান থেকে এগুলো এনেছো সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! আমি বৃদ্ধের নিকট জিনিসগুলো ফেরৎ দিয়ে কৌশলে বললাম, দরবেশগণ চলে গেছেন। এরপর বাজারে এসে এক ব্যক্তির নিকট কিছু জিনিস পেলাম ও তা নিয়ে ফিরে আসলাম হযরতের বাড়িতে। এবার তিনি বললেন, আসো! আমি হযরতের নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ! এ লোকটি হলেন ‘ইবনে সাইয়্যার’ [অর্থাৎ সাইয়্যার অঞ্চলের পুত্র]। তিনি শাসকের লোক। তুমি এখন যা এনেছো তা-ই সুফিদের খেদমতে পরিবেশন করো, আগের লোকটির কাছ থেকে কিছু আনবে না!

হযরত আবুল হুসাইন ক্বারারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবুল খায়ের তানাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিদায় বেলা তিনি মসজিদের দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসলেন। বললেন, আবুল হুসাইন! আমি জানি তোমার সাথে কিছু নেই। এ দু’টো আপেল নিয়ে যাও। আমি আপেলগুলো পকেটে রেখে দিলাম। আমি চলতে থাকি। দীর্ঘ তিনদিন পর্যন্ত কিছু খেলাম না। এরপর পকেট থেকে একটি আপেল খেলাম। এরপর যখন দ্বিতীয়টি বের করার জন্য পকেটে হাত ঢুকলাম, লক্ষ্য করলাম দু’টি আপেলই আছে! অনুরূপ আমি যতোটি আপেলই আহার করি না কেনো, আগের মতো সর্বদাই পকেটে দু’টি আপেল রয়ে গেছে দেখলাম।

মুসলে পৌঁছার পর ভাবলাম, এ দু’টো আপেল আমার তাওয়াক্কুল নষ্ট করবে। তাই আমি পকেট থেকে উভয়টি বের করলাম। সামনেই দেখতে পেলাম কাপড়ে মুড়ানো এক ফকির। সে বলছে, আপেল চাই! আপেল চাই! আমি উভয় আপেল তাঁকে প্রদান করলাম। একটু অগ্রসর হওয়ার পর ভাবলাম, আমার শায়খ কী ঐ লোকটিকে আপেল প্রদানের জন্য আমার নিকট দিয়েছিলেন? আমি এগুলোর বাহক ছিলাম মাত্র!

আমি ফকির যেখানে ছিলো সেখানে ছুটে আসলাম। কিন্তু তাকে আর পেলাম না- সে গায়েব হয়ে গেছে।”

হযরত আবু আমর ইবনে উলওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে এক যুবক থাকতেন। তিনি মানুষের অন্তরের গোপন কথাও বলে ফেলতেন। বিষয়টি হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অবগত করা হলো। তিনি যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সম্পর্কে কি শুনা যাচ্ছে? তা কি সঠিক? যুবক বললেন, আপনি কিছু কল্পনা করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছে। যুবক বললেন, আপনি কি এমন এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন? তিনি বললেন, না। যুবক বললেন, আপনি কল্পনা করুন। তিনি তা করলেন। যুবক এবার জিজ্ঞেস করলেন, এই এই বিষয় কি আপনি কল্পনা করেছেন? এভাবে তৃতীয়বারও কল্পনা করলেন ও অনুরূপ জবাব দিলেন জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যুবক এবার বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি একজন সত্যবাদী মানুষ আমি তো আমার নিজের অন্তর সম্পর্কেও অবগত আছি। জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যুবক! তিনবারই তুমি সত্য বলেছো। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম- এ ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো পরিবর্তন আসে কি না।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবনে রুকা একদা অসুস্থ হলেন। একটি পাত্রে তাঁকে ঔষধ দেওয়া হলো। তিনি বললেন, দেশে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। এ ব্যাপারে না জানা পর্যন্ত আমি কিছুই পানাহার করবো না। কিছুদিন পর জানা গেলো, ঐ দিনই কারামাতি সম্প্রদায় মক্কা শরীফ ঢুকে অনেক লোককে হত্যা করেছিল।” হযরত শায়খ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু আলী কাতিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু আলী মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট উল্লেখিত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন ও মন্তব্য করলেন, কী আশ্চর্য ঘটনা! মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আশ্চর্যের কী আছে? এবার কাতিব জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে বলুন, আজকের মক্কা শরীফের সংবাদ কি? তিনি জবাব দিলেন, তালহা এবং হাসান গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। তালহা সৈন্যদলের অগ্রগামী ব্যক্তিটি কালো, তার মাথায় লাল পাগড়ি। মক্কার আকাশে হারাম শরীফ এলাকায় মেঘের ঘোর আছে। আবু আলী এ বিষয়গুলো লিখে মক্কা শরীফ অবস্থানকারী এক ব্যক্তির নিকট পাঠালেন। দেখা গেলো সবকিছু হুবহু মিলে গেছে!

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন “আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। পথিমধ্যে এক সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেয়ে তাঁর রূপ-লাবণ্য নিয়ে ভেবেছিলাম। উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি আসলেন যার চোখে পাপের চিহ্ন আছে। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরেও কী ওহীর দরজা খোলা রইলো! তিনি বললেন, না- খোলা নেই। তবে এখনো দৃষ্টি-গভীরতা, অকাট্য প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান।”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলাম। খিরকা পরিহিত এক দরবেশকে দেখলাম মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করছেন। মনে মনে ভাবলাম, এ ধরনের মানুষ সবার জন্য যেনো বোঝা! লোকটি আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন:

وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

-“একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক” [বাক্বারাহ : ২৩৫]

আমি মনে মনে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তিনি এবার বললেন:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

-“তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন।” [শুরা : ২৫]”

হযরত ইব্রাহীম খাওওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বাদগাদ নগরীর জামে মসজিদে বসা ছিলাম। সেখানে আরো কয়েকজন দরবেশও ছিলেন। এসময় এক যুবকের আগমন ঘটে। সুদর্শন এ যুবককে বুদ্ধিমান বলেও মনে হলো। খুব ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। সাথীদেরকে বললাম, এ যুবকটি মনে হয় ইয়াহুদী হবেন। তারা আমার এই মন্তব্যটি পছন্দ করলেন না। এরপর আমি বেরিয়ে পড়লাম, যুবকটিও বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর দরবেশদের নিকট ফেরৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন, শায়খ আমার সম্পর্কে কী বলেছেন? তারা কথাটি গোপন রাখলেন। তিনি যখন জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন তারা বললেন, তিনি বলেছেন আপনি একজন ইয়াহুদী। একথা শোনে যুবক আমার নিকট ছুটে আসলেন এবং

উপুড় হয়ে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।” পরবর্তীতে যুবকটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঘটনা কি? তিনি বললেন, আমরা আমাদের কিতাবে পড়েছি, সিদ্দীক লোকদের ফিরাসাত কখনো ভুল হয় না। আমি মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করছিলাম। যখন এই [দরবেশ] দলের নিকট আসলাম তখন বুঝতে পারলাম এরাই সিদ্দীকিনের দল। শায়খ আমার সম্পর্কে যে তথ্য বলে দিলেন, তা থেকেই বুঝতে পেরেছি তিনি সত্যিই একজন সিদ্দীক। জানা যায়, এ যুবকও পরবর্তীতে এক উচ্চ স্তরের সুফি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, দেশের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটানোর পূর্বেই আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেন? আমরা জবাব দিলাম, না- এমন কেউ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ঐসব অন্তরের জন্য তোমরা আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকো, যারা আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পায় না।”

হযরত আবু মুসা দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াহইয়াকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দেন, তোমার হাত যদি কনুই পর্যন্ত অজগরের মুখের ভেতর ঢুকে যায় তবুও তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না।” দায়লামী আরো বলেন, “এরপর আমি আবু ইয়াজিদেদর নিকট তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আরো জানতে চলে যাই। দরজায় নাড়া দেওয়ার পরই তিনি ভেতর থেকে বললেন, আবদুর রহমানের কথা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, দরজাটা খুলুন হযরত! তিনি জবাব দিলেন, তুমি তো আমার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসো নি- যে কারণে এসেছো, তার জবাব তো ইতোমধ্যে পেয়ে গেছো। তিনি দরজা খুললেন না। আমি বিদায় হয়ে গেলাম। এক বছর পর আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। এবার তিনি আমাকে দেখেই বললেন, স্বাগতম! এখন তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছো। তাঁর নিকট দীর্ঘ এক মাস অবস্থান করি। এ সময়ের মধ্যে আমি যে বিষয় নিয়েই ভাবতাম, তিনি আমাকে বলে দিতেন। বিদায়ের সময় বললাম, হযরত! আমাকে উপদেশ দিন। বললেন, আমার আশ্মা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন আমাকে তাঁর পেটে ধারণ করেছিলেন তখন তাঁর সামনে হালাল

খাবার আসলে হাত এগিয়ে যেতো। আর সন্দেহযুক্ত খাবার এলে তাঁর হাত অবশ্য হয়ে পড়তো- এগুতো না।”

হযরত ইব্রাহীম খাওওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি এক সফরে বিজন মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিলাম। এতে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হলো। এরপর মক্কা শরীফ পৌঁছুলাম। এসময় [স্বভাবতই] আমার মধ্যে আত্মতৃপ্তির ভাব আসলো। পাশেই ছিলেন এক বৃদ্ধা। আমাকে ডাক দিলেন, ইব্রাহীম! মরুভূমিতে তোমার সঙ্গে আমিও ছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলি নি। তোমার অন্তরকে ব্যস্ত করে তুলতে চাই নি। এখন যে প্রবঞ্চনা অনুভব করছো তা বের করো!”

বর্ণিত আছে, হযরত ফারগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতি বছর পবিত্র হাজ্জ পালনে যেতেন। পথিমধ্যে নিশাপুর অতিক্রম করে যেতে হতো। কিন্তু সেখানকার ওলি হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করতেন না। হযরত ফারগানী বলেন, একবার আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, সালাম জানালাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। মনে মনে ভাবলাম, একজন মুসলমান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, সালাম জানালো- অথচ তিনি জবাবই দিলেন না? আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সাথে বললেন, অন্তরে এরকম ভাবনা আসতেই পারে! এরপর আমি চলে গেলাম ফারগানায়। দীর্ঘদিন পরে পুনরায় আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে আসলাম। এবার তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁর সাথেই ছিলাম।

হযরত খাইরুন নাস্‌সাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আমার ঘরে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে ভাবনা আসলো, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পর আমি এ চিন্তা থেকে মুক্ত হই। এরপর আবার একই ভাবনা আসলো। এবারও এ থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করি। তৃতীয়বার এই ভাবনা আসার পর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কী আশ্চর্য! দেখলাম সত্যিই হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, যখন প্রথমবার তোমার অন্তরে আমার ভাবনা জাগ্রত হলো তখনই কেনো তুমি বেরিয়ে আসলে না?”।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার মনে ভাবনা উঠলো, সম্ভবত আবু উসমান আমার নিকট কিছু চাইবেন। সাথে সাথে তিনি বলে ওঠলেন, এটা তো যথেষ্ট নয়, আমি মানুষের কাছে কিছু চাইবো আর তখন মানুষ আমাকে কিছু দেবে!”

একজন দরবেশ বলেন, একদা আমি বাগদাদে ছিলাম। হঠাৎ মনে ভাবনা ওঠলো, হযরত মুরতায়িশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫ দিরহাম নিয়ে আমার নিকট আসছেন। এগুলো দিয়ে আমি পাত্র, রশি ও জুতা ক্রয় করবো। এরপর বিজন মরুভূমিতে চলে যাবো। পরমুহূর্তে দরোজায় করাঘাত শুনলাম। দরজা খুলে দেখলাম সত্যিই মুরতায়িশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসেছেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি থলে। বললেন, এই নাও। আমি বললাম, হযরত! আমি তো এটা চাই নি। বললেন, যদি না চেয়ে থাকো তাহলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেনো? তোমার কতো দরকার? বললাম, ১৫ দিরহাম। তিনি বললেন, এই থলেতে ১৫ দিরহামই আছে!

অপর এক দরবেশ বলেন, আল্লাহ তা’আলার বাণী:

أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

–“আর যে মৃত ছিলো আমি তাকে জীবিত করেছি ..” [আনআম : ১২২]

অর্থাৎ যার অন্তর মৃত আল্লাহ তা’আলা একে ফিরাসাতের নূর দিয়ে জীবন্ত করেন। তাজাল্লি ও মুশাহাদার নূর তাতে দান করেন। গাফিলদের সামনে সে চলাফেরা করলেও নিজে গাফিল থাকে না।

ফিরাসাত যখন শুদ্ধ হয়, তখন এর অধিকারী ব্যক্তি মুশাহাদার স্তরে উন্নীত হন। হযরত আবুল আব্বাস ইবনে মাসরুখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাদের কাছে এক বৃদ্ধ আসলেন। অন্তরের বিষয়-আসয় নিয়ে খুব সুন্দর করে কথা বলতে লাগলেন। খুবই মিষ্টভাষী মেধাবী ছিলেন লোকটি। কথা প্রসঙ্গে বলে ওঠলেন, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আমাকে বলো। আমার ধারণা আসলো লোকটি ঈয়াহুদী হবে। এ ধারণা ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে ওঠলো। পরে বিষয়টি হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জানালাম। ব্যাপারটি তাঁর নিকটও জটিল মনে হলো। আমি তারপর ঠিক করলাম অন্তরের ধারণা লোকটিকে জানাবো। এরপর সত্যিই

তাকে বললাম, আপনি বলেছিলেন অন্তরের কথা বলে দিতে। আমার অন্তর বলছে, আপনি একজন ইয়াহুদী! কিছুক্ষণ মাথা নত করে তিনি বসে রইলেন। অতঃপর মাথা উত্তোলন করে বললেন, আপনি সত্যিই বলছেন। আমি এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি ‘আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’। এরপর তিনি বললেন, আমি প্রায় সবক’টি ধর্মবিশ্বাস তন্ন তন্ন করে দেখেছি। অবশেষে ভাবলাম, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী দল তাঁরাই [অর্থাৎ সুফিরা]। তাই আমি নিবিষ্টমনে আপনাদের নিকট এসেছি। পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি, আপনারাই সত্যের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। [বর্ণনাকারী বলেন] সেই থেকে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে পরিণত হন।”

বর্ণিত আছে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত সিররি সাকাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। হযরত জুনাইদ বলেন, মানুষকে উপদেশ দিতে আমি অন্তরে কিছুটা বিতৃষ্ণা অনুভব করি। আমি মনে করি, উপদেশ পাওয়ার হক্কার আমিই। এরপর আমি একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। ঐ রাত পবিত্র জুমু’আর রাত ছিলো। তিনি আমাকে বললেন, মানুষকে উপদেশ দাও! আমি ঘুম থেকে জেগে ওঠেই ফযরের পূর্বে হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আওয়াজ তুলতেই তিনি বলে ওঠলেন, [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের] নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমার কথাটি বিশ্বাস করলে না?

এর পরদিনই হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্থানীয় জামে মসজিদে মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসে গেলেন। চতুর্দিকে এই সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লো, হযরত জুনাইদ মানুষকে উপদেশ দেবেন। এসময় ছদ্মবেশে এক খ্রিস্টান যুবক বয়ান শুনার জন্য সেখানে উপস্থিত হলো। সে তাঁকে প্রশ্ন করলো, শায়খ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু’মিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো, সে তো আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে! এ কথার মর্ম কী? হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নিলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করে তাকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো! তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়েছে। সাথে সাথে যুবকটি মুসলমান হয়ে গেলেন।

باب الخلق

বাবুল খুলুক [চরিত্র অধ্যায়]

قال الله تعالى: " وإنك لعلی خُلِقَ عظیم " .

أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أبو الحسن الصفار البصري:
قال: حدثنا هشام بن محمد بن غالب قال: حدثنا معلي بن مهدي قال:
حدثنا بشار بن إبراهيم النميري، قال: حدثنا غيلان بن جرير عن أنس
قال: " قيل يا رسول الله: أيُّ المؤمنين أفضل إيماناً؟ قال: أحسنهم خُلُقاً " إذ
الخلق الحسن أفضل مناقب العبد، وبه يظهر جواهر الرجال، والإنسان
مستور بخلقه مشهود بخُلُقه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: إن الله تعالى، خص نبيه
صلى الله عليه وسلم بما خصه به، ثم لم يثن عليه بشيء من خصاله بمثل
ما أثنى بخلقه؛ فقال عزّرن قائل: " وإنك لعلی خُلِقَ عظیم " .

وقال الواسطي: وَصَفَه بالخلق العظيم؛ لأنه جاد بالكونين، واكتفى بالله
تعالى. وقال الواسطي أيضاً: الخلق العظيم: أن لا يُخَاصِمَ ولا يُخَاصِمَ، من
شدة معرفته بالله تعالى. وقال الحسين بن منصور: معناه: ولم يؤثر فيك
جفاء الخلق بعد مطالعتك الحق..

وقال أبو سعيد الخراز: لم يكن لك همة غير الله تعالى.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول: سمعت الكتاني يقول: التصوف خُلُق، من زاد عليك بالخلق، فقد زاد عليك في التصوف.

ويروي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: إذا سمعتموني أقول لمملوك: أخزاه الله فأشهدوا أنه حر. وقال الفضيل: لو أن العبد أحسن الإحسان كله، وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين.

وقيل: كان ابن عمر، رضي الله عنهما، إذا رأى واحداً من عبيده يُحسن الصلاة يعتقه. فعرفوا ذلك من خُلُقه، فكانوا يحسنون الصلاة مراعاة له، وكان يعتقهم، ف قيل له في ذلك. فقال: من خدعنا في الله انخدعنا له.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت الحارث المحاسبي يقول: فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الأمانة، وحسن الإخاء مع الوفاء.

وسمعت يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: الخلق: استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه إليك. وقيل للأحنف: ممن تعلمت الخلق؟ فقال: ن قيس بن عاصم للنقري قيل: وما بلغ من خُلُقه؟ قال: بينا هو جالس في داره إذ جاءت خادم له بنفود عليه شواء، فسقط من يدها، فوقع علي ابن له، فمات، فدهشت الجارية، فقال: لا رَوْعة عليك، أنت حرة لوجه

الله تعالى.

وقال شاه الكرمانى: علامة حسن الخلق: كف الأذى، واحتمال المؤن.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لا تسعون الناس بأموالكم
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق".

وقيل لذي النون المصري: من كثر الناس همأً؟ قال: أسوأهم خلفاً. وقال
وهب: ما تخلق عبد يخلق أربعين صباحاً إلا جعله الله طبيعة فيه.
وقال الحسن البصري في قول الله تعالى: "وثيابك فطهر" أي: وخلفك
فحسن..

وقيل: كان لبعض النساك شاة فرآها على ثلاثة قوائم. فقال: من فعل بها
هذا؟ فقال غلام له: أنا. فقال: لم؟ قال: لا غمك بها!! فقال: لا، بلا لأغنم
من أمرك بذلك. أذهب فأنت حر.

وقيل لإبراهيم بن أدهم: هل فرحت في الدنيا قط؟. فقال: نعم، مرتين
إحداهما: كنت قاعداً ذات يوم فجاء إنسان وبال عليّ؛ والثانية: كنت
قاعداً فجاء إنسان وصفعني.

وقيل: كان أوديس القرني إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة، فيقول: إن كان
ولا بد فارموني بالصغار: كيلا تدقوا ساقي فتمنعوني عن الصلاة.

وشتم رجل الأحنف بن قيس... وكان يتبعه... فلما قرب من الحي وقف،
وقال: يا فتى، إن بقي شيء فقله؛ كيلا يسمعك بعض سفهاء الحي

فيجيبيوك.

وقيل لحاتم الأصم: أيمتلم الرجل من كل أحد؟.. فقال: نعم، إلا من نفسه. وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دعا غلاماً له، فلم يجب، فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعاً، فقال: أما تسمع يا غلام؟ فقال: نعم. قال: فما حملك على ترك جوابي؟ فقال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. فقال: أمض؛ فأنتحر لوجه الله تعالى. وقيل: نزل معروف الكرخي الدجلة ليتوضأ، ووضع مصحفه وملحفته، فجاءت امرأة وحملتهما، فتبعها معروف، وقال: يا أختي، أنا معروف ولا بأس عليك، ألك ابن يقرأ؟ قالت: لا. قال: فزوج؟ قالت: لا، قال: فهاتي المصحف وخذي الثوب.

ودخل اللصوص مرة دار الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي بالمكابرة، وحملوا وجدوا، فسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول: اجتزت بالسوق، فوجدت جبتي على من يزيد، فأعرضت، ولم ألتفت إليه.

سمعت الشيخ أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: سمعت الوجيهي يقول: قال الجريري: قدمت من مكة، حرسها الله تعالى، فبدأت بالجنيذ، لكيلا يتعنى ألي، فسلمت عليه، ثم مضيت إلى المنزل فلما صليت الصبح في المسجد إذا أنا به خلفي في الصف، فقلت:

إنما جئتكم أمس لئلا تتعني، فقال: ذاك فضلك، وهذا حقك.
وسئل أبو حفص عن الخلق. فقال: هو ما اختار الله - عزَّ وجلَّ - لنبيه
صلى الله عليه وسلم ي قوله تعالى: " خذ العفو وأمر بالعرف.. " الآية.
وقيل: الخلق: أن تكون من الناس قريباً، وفيما بينهم غريباً.
وقيل: الخلق قبول ما يردُّ عليك من جفاء الخلق، وقضاء الحق بلا ضجر
ولا قلق.

وقيل: كان أبو ذر على حوض يسقي إبلأله، فأسرع بعض الناس إليه،
فانكسر الحوض، فجلس، ثم اضطجع، ف قيل له في ذلك فقال: إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فإن ذهب عنه.
وإلا فليضطجع. وقيل: مكتوب في الإنجيل: عبدي.. أذكرني حين تغضب
أذكرك حين أغضب. وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي!! فقال: يا هذه،
وجدت أسمى الذي أضله أهل البصرة.

وقال لقمان لابنه: لا تُعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة: الحليم عند الغضب
والشجاع عند الحرب، والأخ عند الحاجة إليه. وقال موسى، عليه
السلام: إلهي، أسألك أن لا يقال ما ليس فيه؛ فأوحى الله سبحانه إليه: ما
فعلت ذلك لنفسي، فكيف أفعله لك؟ وقيل ليحيى بن زياد الحارثي، وكان
له غلام سوء: لم تمسك هذا الغلام؟ فقال: لأتعلم عليه الحلم.

وقيل في قوله تعالى: " وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة " : الظاهرة:

تسوية الخلق، والباطنة: تصفية الخلق. وقال الفضيل: لأن يصحبي فأجر
حسن الخلق أحب إليّ ن أن يصحبي عابد سيء الخلق. وقيل: الخلق
الحسن احتمال المكروه بحسن المداراة.

وحكي أن إبراهيم بن أدهم خرج إلى بعض البراري فاستقبله جنيدي،
فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة، فضرب رأسه وأوضحه، فلما جاوزه،
قيل له: إنه إبراهيم بن أدهم زاهد خراسان فجاءه يتعذر إليه، قال: إنك لما
ضربتني سألت الله تعالى لك الجنة. فقال: لم؟ فقال علمت أني أؤجر عليه،
فلم أرد أن يكون نصيبي منك الخير، ونصيبك مني الشر.

وحكي أن أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة، فلما وافى باب داره
قال: يا أستاذ، ليس الآن وقت دخولك، وقد ندمت، فانصرف، فرجع أبو
عثمان، فلما وافى منزله عاد إليه الرجل، وقال: يا أستاذ، ندمت!! وأخذ
يتعذر إليه، وقال أحضر الساعة.. فقام أبو عثمان ومضى، فلما وافى باب
داره قال: مثل ما قال في الأولى، ثم كذلك فعل في الثالثة والرابعة، وأبو
عثمان ينصرف ويحضر، فلما كان يعد مرات قال: يا أستاذ، أردت
اختبارك. وأخذ يعتذر ويمدحه، فقال أبو عثمان: لا تمدحني على خلق
تجد مثله مع الكلاب: الكلب إذا دعي حضر، وإذا زجر انزجر.

وقيل: إن أبا عثمان اجتاز بسكة وقت الهاجرة، فألقى عليه من سطح
طشت رماد، فتغير أصحابه، وبسطوا ألسنتهم في الملقى، فقال أبو عثمان:

لا تقولوا شيئاً، من استحق أن يصبَّ عيه النار، فصولح على الرماد لم يحز له أن يغضب.

وقيل: نزل بعض الفقراء على جعفر بن حنظلة، فكان جعفر يخدمه جداً، والفقير يقول: نعم الرجل أنت لو لم تكن يهودياً!! فقال جعفر: عقيدتي لا تقدر فيما تحتاج إليه من الخدمة؛ فسل لنفسك الشفاء ولي الهداية.

وقيل: كان لعبد الله الخياط حُرِّيف مجوسي، يخطط له ثياباً، ويدفع إليه دراهم زيوفاً، وكان عبد الله يأخذها.. فاتفق أنه قام من حانوته يوماً لشغل، فجاء بالدراهم الزيوف، فدفعها إلى تلميذه، فلم يقبلها، فدفع إليه الصراح، فلما رجع عبد الله قال لتلميذه: أين قميص المجوسي؟ فذكر له القصة.. فقال: بئس ما عملت؟ إنه منذ مدة يعاملني بمثلها، وأنا أصبر عليه، وألقيها في بئر، لئلا يغير بها غيري.

وقيل: الخلق السوء يضيق قلب صاحبه؛ لأنه لا يسع فيه غير مراده، كالمكان الضيق لا يسع غير صاحبه. وقيل حسن الخلق: أن لا تتغير من يقف في الصفِّ بجانبك. وقيل: من سوء خلقك: وقوع بصرك على سوء خلق غيرك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشؤم، فقال: "سوء الخلق".

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي، قال: حدثنا أبو الحسن الصغار البصري قال: حدثنا معاذ بن المثني قال: حدثنا يحيى بن معني قال: حدثنا

مروان الفزاري قال: حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله، ادع الله تعالى على المشركين. فقال: "إنما بعثت رحمة، ولم أبعث عذاباً".

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা [তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে] বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

-“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।” [কলম : ৬৮]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাধিআল্লাহু আনহু বলেন, “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের মুসলমান উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, যার চরিত্র সুন্দর।”

আসলেই সৎ চরিত্রই হলো মানবজীবনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান, বুদ্ধি এর দ্বারাই প্রকাশ পায়। আকৃতির ক্ষেত্রে মানুষ গুণ্ড এক সত্তা। আর চরিত্রের মাধ্যমে এই গোপন সত্তার বিকাশ ঘটে। উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা যে গুণ দ্বারা নিজের বর্ণনা দিয়েছেন, এটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তিনি বিশেষভাবে দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের এমন প্রশংসা করেছেন যা সৃষ্টির আর কাউকে নিয়ে এরূপ করেন নি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।” [কলম : ৬৮]

খুলুকে আজীম সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা: হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাঁকে [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে] উত্তম চরিত্রে উন্নীত করেছেন, এর অর্থ হলো তিনি উভয় জাহানের জন্য করুণা।” তিনি আরো বলেছেন, “আল্লাহর মা'রিফাতের প্রাবল্যে একজন মানুষ নিজে ঝগড়া করবে না অথবা অন্য কেউও তার সঙ্গে ঝগড়া করবে না- এটাই হলো খুলুকে আজীম।” হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর [হাল্লাজ] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “খুলুকে আজীম মানে সত্য দর্শনের পর সৃষ্টির কোনো ক্লেশ তোমাকে কষ্ট দেবে না।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ ছাড়া কিছুই তোমার অন্তরে থাকবে

না- তাই হলো খুলুকে আজীম।” হযরত কান্ডানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চরিএই তাসাওউফ। যার মধ্যে চরিএর সন্ধান পাবে তার মধ্যে তাসাওউফও পাবে।”

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলতেন, “আমি যদি কোনো ক্রীতদাসকে বলি আল্লাহ তোকে অপদস্থ করুক! তাহলে তোমরা জেনে রেখো, এ কথার দ্বারা আমি তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করছি!” হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মানুষ যতোই করুণা করুক না কেনো, সে যদি তার গৃহপালিত মুরগীর প্রতিও দয়াপ্রবণ না হয়, তাহলে সে কখনো দয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।” আরো বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা যখন দেখতেন তাঁর কোনো ক্রীতদাস খুব সুন্দরভাবে নামায আদায় করছে, তিনি সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দিতেন। অন্যান্য ক্রীতদাসরা যখন এ ব্যাপারটি অবগত হলো তখন তারাও সুন্দরভাবে নামায আদায় করতে লাগলো। তিনিও তাদেরকে মুক্ত করতে লাগলেন। দাসদের এ চালাকি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করা হলো। তিনি বললেন, যে আল্লাহর জন্য আমাদের সাথে প্রতারণা করে, তাহলে তার দ্বারা প্রতারণিত হতে আমরা রাজী!

হযরত মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা তিনটি জিনিস হারিয়ে ফেলেছি: ১. আত্মত্যাগের সাথে সুন্দর চেহারা, ২. আমানতদারীপূর্ণ সুন্দর কথা এবং ৩. নির্ভরশীলতাপূর্ণ সুন্দর আত্মবোধ।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চরিএ হলো আল্লাহর জন্য নিজ থেকে যাকিছু [ভালো আমল] হয় তা ছোট করে দেখা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহ বড়ো করে দেখা।”

বর্ণিত আছে হযরত আহনাফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কার কাছ থেকে চরিএ শিখেছেন? জবাব দিলেন, কায়েস ইবনে আসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁর চরিএ কতটুকু উচ্চমানের ছিলো? জবাব দিলেন, তিনি তখন তাঁর বাড়িতে বসে আছেন। এসময় খাদিমা আসলো কিছু ভুনা গোস্ত নিয়ে। গরম এই খাদ্য হঠাৎ খাদিমার হাত থেকে পড়ে গেলো হযরতের কচি শিশুর উপর। সাথে সাথে শিশুটি মারা গেলো। এতে ঐ

খাদিমা মহিলা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। তিনি সাথে সাথে বলে ওঠলেন, ভয় পেয়ো না! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

শাহ কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুন্দর চরিত্রের নিদর্শন হলো, তুমি অন্যকে কষ্ট দেবে না এবং অপরের বোঝা বহন করবে।” হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অর্থ-সম্পদ দিয়ে তোমরা মানুষকে সুখ দিতে পারবে না- বরং প্রশস্ত মুখ ও সুন্দর চরিত্র দ্বারা এ কাজ করতে পারবে।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ লোকটি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে? জবাব দিলেন, যার চরিত্র খারাপ।

হযরত ওয়াহহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো মানুষ যদি চল্লিশ দিন যাবৎ বিশেষ চরিত্র অবলম্বন করেন, আল্লাহ এটিকে তার মিজাজে পরিণত করবেন।” হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, ‘আপনার কাপড় পবিত্র করুন!’ তার অর্থ হলো ‘আপনার চরিত্র সুন্দর করুন!’”

বর্ণিত আছে এক দরবেশের একটি বকরী ছিলো। তিনি লক্ষ্য করলেন, বকরীটির এক পা নেই! জিজ্ঞেস করলেন, কে এটা করলো? তাঁর এক দাস জবাব দিলো, আমি করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কারণ কি? সে বললো, এর দ্বারা আপনাকে উদ্বিগ্ন করতে চাচ্ছি! তিনি বললেন, যিনি তোমাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তাঁকে কষ্ট দিতে চাই না। যাও! তুমি মুক্ত!” আরো বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি কখনো আনন্দবোধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দু’বার আনন্দ পেয়েছি। একবার আমি বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি আমার উপর প্রসাব করে দিল! আরেকবার বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে আমাকে একটা থাপ্পড় মারলো!

বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন শিশু-কিশোররা দেখতো, তাঁর উপর পাথর ছুড়ে মারতো। তিনি বিনয়ের সাথে বলতেন, পাথর যখন মারছে, অন্তত ছোট্ট আয়তনের পাথর নিক্ষেপ করবে। কারণ ভয় হচ্ছে পায়ে আঘাত পেলে, আমি নামায আদায় করতে পারবো না।

এক ব্যক্তি হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গালিগালাজ করলো। লোকটি তাঁর পেছনে চলছিলো। বাড়ির পাশে আসার পর তিনি তাকে বললেন, ভাই! তোমার আর যাকিছু বলার আছে বলে ফেলো। কারণ মহল্লার নির্বোধেরা যদি তোমার এসব কথা শুনে তাহলে তারা সমুচিত্ত জবাব দেবে!

হাতিমে আসম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষ কি কারো দুর্ব্যবহার সহ্য করে যাবে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ- তবে নিজেরটি ছাড়া। বর্ণিত আছে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজের ক্রীতদাসকে ডাক দিলেন। কিন্তু সে জবাব দিলো না। দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ডাকার পরও সে নীরব রইলো। এরপর তিনি নিজে ওঠে গিয়ে দেখলেন, দাসটি শুয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, “কী মিয়া! আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না বুঝি?” সে জবাব দেয়, “শুণেছি!” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে জবাব দিচ্ছ না কেনো?” সে উত্তর দিলো, “আপনি যে আমাকে শাস্তি দেবেন না, তা নিশ্চিত জেনেই একটু অলসতা করছি!” তিনি বললেন, “যাও! তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।”

বর্ণিত আছে, হযরত মারুফ খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন দজলা নদীতে ওয়ু করতে গেলেন। নদীর তীরে গিলাফে আবৃত কুরআন শরীফ রাখলেন। এসময় এক মহিলা এসে তা তুলে নিল। খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পেছনে হেঁটে বললেন, “ওহে বোন! আমি মা'রুফ। তোমার কোনো অপরাধ হয় নি। কুরআন তিলাওয়াত করবে এমন কোনো ছেলেপেলে তোমার আছে নাকি?” মহিলা জবাব দিলো, “না!” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে তোমার স্বামী আছে, যিনি কুরআন শরীফ পড়বেন?” সে এবারও বললো, “না!” তিনি তখন আবদার করলেন, “তাহলে আমার কুরআন শরীফখানা ফেরৎ দাও। গিলাফখানা নিয়ে যাও।”

একদল চোর হযরত শায়খ আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘরে ঢুকে যাকিছু পেলো সবই নিয়ে গেলো। তিনি পরে বলেছেন, “ঘটনার পর আমি বাজারে গেলাম। লক্ষ্য করলাম আমার জুস্বা এক ব্যক্তির পরনে। আমি মুখ ফিরিয়ে চলে আসলাম, তার দিকে আর তাকলাম না।” হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ফিরে আসলাম। প্রথমেই সাক্ষাৎ করলাম হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে। তিনি নিজে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কষ্ট হবে ভেবেছিলাম। আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে

তারপর নিজের বাড়িতে চলে যাই। ফযরের নামায আদায় করতে যখন মসজিদে গেলাম, তখন দেখলাম তিনি আমারই পাশে নামায পড়ছেন। বললাম, হযরত! আমি তো ইতোমধ্যে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যাতে আপনার কষ্ট না হয়। তিনি বললেন, এটা তো আপনার করুণা। আপনার পাশে এসে নামায পড়া আপনার প্রাপ্য।

হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, “আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, চরিত্র তা-ই। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

-“আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সংকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাক।” [আ’রাফ : ১৯৯]

চরিত্র হলো, আপনি মানুষের কাছে থাকবেন। আর মানুষের মধ্যে যাকিছু ঘটে তা থেকে একদম দূরে থাকবেন। সৃষ্ট জীব থেকে যেসব দুঃখ কষ্ট আপতিত হয় তা মেনে নেওয়া। আর কোনো ভয়-আতঙ্ক ছাড়া সত্য কথা বলে ফেলা।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবু যর রাহিআল্লাহু আনহু তাঁর হাউজে যেয়ে উটকে পানি পান করাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখানে দৌড়ে গেলো, এতে হাউজটি ভেঙ্গে যায়। আবু যর রাহিআল্লাহু আনহু বসে পড়লেন। তারপর শুয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এরূপ করছেন কেনো? জবাব দিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, “রাগ আসলে বসে পড়ো। এতেও যদি রাগ মিটে না যায় তাহলে শুয়ে পড়বে।”

বর্ণিত আছে ইঞ্জিল শরীফে লেখা আছে, “বান্দা! তোমার ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমার রাগের সময় তোমাকে স্মরণ করবো।”

একজন মহিলা হযরত মালিক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে বললো, হে কপট! তিনি বললেন, হে নারী! তুমি আমার জন্য এমন খেতাব আবিষ্কার করলে যা বসরার মানুষ ইতোমধ্যে খোঁজে পায় নি!

হযরত লুকমান আলাইহিসসালাম তাঁর ছেলেকে বললেন, “তিনটে পরিস্থিতি ছাড়া তিন ধরনের মানুষকে চিনা যায় না: ১. রোদের সময় ধৈর্যশীলকে, ২. যুদ্ধের সময় বীর পুরুষকে এবং ৩. প্রয়োজনের সময় ভাইকে।” হযরত মূসা আলাইহিসসালাম বললেন, “হে মা’বুদ! আপনার দরবারে এই প্রার্থনা করি, আমার সম্পর্কে যেনো কেউ এমন কিছু বলে না যা আমার মধ্যে নেই।” আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করলেন, “এটা তো আমার নিজের জন্যও করি নি! তোমার জন্য কিভাবে করবো?”

ইয়াহইয়া ইবনে জিয়াদ হারিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এই গোলামটি কেনো রাখছেন, সে তো উশৃঙ্খল! তিনি জবাব দিলেন, “তার থেকে ধৈর্যশীলতা শেখার জন্য!” আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

—“তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।”

[লুকমান : ২০]

এখানে বাহ্যিক করুণার অর্থ হলো, সুন্দর আকৃতি প্রদান করা। আর গোপন করুণার অর্থ হলো, চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে দেওয়া। ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বদ মিজাজ ইবাদতগুজার ব্যক্তির সান্নিধ্য থেকে আমার নিকট খুশ মিজাজ পাপী লোকের সান্নিধ্য অনেক শ্রেয়।” বলা হয়ে থাকে, হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করার নাম সুন্দর চরিত্র।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মরুভূমিতে বের হলেন। সেখানে এক সৈনিকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। সে তাঁকে প্রশ্ন করলো, তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি কবরের দিকে ইশারা করলেন। সে এতে রাগান্বিত হয়ে তাঁর মাথায় আঘাত হানলো। রক্ত বেরিয়ে পড়লো। সৈন্যটির নিকট থেকে হযরত প্রস্থান করার পর লোকজন এসে বললো, উনি ছিলেন খুরাসানের জাহিদ হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম! সৈনিক ছুটে গেলো হযরতের নিকট। বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, ওহে! তুমি যখন আমাকে আঘাত করছিলে, আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য জান্নাত কামনা করছিলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমি এ কারণে এটা করেছি যে, তোমার

দুষ্কর্মের জন্য আমি উপকৃত হবো তা চাইনি। অপরদিকে এটাও চাইনি যে, আমার কারণে তোমার উপকার না হোক।

আরো বর্ণিত আছে, হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একব্যক্তি দাওয়াত দিলো। তিনি মেজবানের দরজার নিকট উপস্থিত হলেন। লোকটি বেরিয়ে এসে বললো, ‘হযরত! এখন তো আপনার আসার সময় হয় নি! আমি লজ্জিত, দয়া করে চলে যান।’ তিনি চলে গেলেন। লোকটি এবার হযরতের বাড়িতে যেয়ে বললো, ‘হযরত! আমি বেশ লজ্জিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। দয়াকরে ঠিক এই সময়ে যাবেন।’ হযরত আবু উসমান সময়মতো গেলে পরে, ঠিক আগের মতো আচরণ করলো মেজবান লোকটি। এভাবে কয়েকবার আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বাড়িতে গেলেন ও ফিরে আসলেন। অবশেষে সে হযরতকে বললো, ‘আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম।’ এরপর সে হযরতের নিকট ক্ষমা চাইলো এবং তাঁর বেশ প্রশংসা করলো। আবু উসমান বললেন, ‘আমার এই আচরণে তোমার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার কিছু নেই। এটা তো একটি সাধারণ কুকুরও করে থাকে। তাকে ডাক দিলে সে উপস্থিত হয় ও তাড়িয়ে দিলে চলে যায়!’

কথিত আছে, একদা হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি গলিপথে হেটে যাচ্ছিলেন। এক বাড়ির উপর তলা থেকে কেউ এক বালতি পূর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গার তার মাথায় ফেলে দিল। তাঁর সাথীদের মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়লো। তারা অঙ্গার নিক্ষেপকারী ব্যক্তিকে খুব গালিগালাজ করলেন। আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সাথে বললেন, ‘তোমরা তাকে একটি গালিও দেবে না! যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য, সে যদি সামান্য ক’টি জ্বলন্ত অঙ্গারে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে যেতে পারে, তাহলে রাগ করার কী অধিকার আছে তার?’

একজন দরবেশ জাফর ইবনে হানজালার ঘরে আগমন করেন। তিনি দরবেশের খেদমতে লেগে গেলেন। এরপর দরবেশ তাকে বললেন, “তুমি কী চমৎকার এক ব্যক্তি! যদি তুমি ইয়াহুদী না হতো!”। একথা শুনে জাফর আরম্ভ করলেন, ‘আমার ধর্মবিশ্বাস তো খেদমতে কোনো বাধাদান করছে না। সুতরাং আপনি নিজের জন্য আরোগ্য কামনা ও আমার জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করুন।’

বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ খাইয়্যাত [দর্জী] এক অগ্নিপুজারীর কাপড় সেলাই করতেন। সে তাঁকে বিনিময়ে জাল টাকা প্রদান করতো। তিনি তা বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নিতেন। একদিন খাইয়্যাত দোকানে ছিলেন না। লোকটি জাল টাকা নিয়ে আসলো। দোকানে ছিলেন তাঁর এক শাগরিদ। জাল টাকাগুলো সে তার হাতে প্রদান করলো। তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। এরপর সে আসল টাকা দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। আবদুল্লাহ দোকানে ফিরে এসে শাগরিদকে জিজ্ঞেস করলেন, অগ্নিপুজারীর জামাটি কোথায়? শাগরিদ পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। খাইয়্যাত তাকে বললেন, কাজটি তুমি ভালো করো নি! ঐ লোকটি তো অনেক দিন যাবৎ আমার সাথে এভাবেই লেনদেন করে আসছে। আমি ধৈর্য ধারণ করে এসেছি। জাল টাকা যাতে অন্যের হাতে না যায় সেজন্য আমি এগুলো গ্রহণ করে কূপে নিষ্ক্ষেপ করতাম।

[লেখক বলেন] মন্দ স্বভাবের অন্তর সংক্ষীর্ণ হয়ে যায়। এরকম ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝে না। এরূপ ব্যক্তির অন্তর খুব সংক্ষীর্ণ কক্ষের মতো যেখানে মালিক ছাড়া আর কারো স্থান হয় না। অন্যদিকে সুন্দর চরিত্র হলো একই সারিতে পাশের লোকের দ্বারা তোমার মধ্যে কেনো পরিবর্তন না আসা। অন্য মানুষের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করাও একটি দুঃচরিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, অশুভের লক্ষণ কী? তিনি জবাব দিলেন, “মন্দ স্বভাব”। হযরত আবু হুরাইরা রাডিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করা হলো, মুশরিকদের জন্য বদ-দু’আ করুন। তিনি জবাব দিলেন, “আমি তো এসেছি রহমত স্বরূপ। শাস্তি কামনার জন্য নয়।”

باب الجود والسخاء

বাবুল জুদ ওয়াসসাখা [অপিরিমিত দানশীলতা ও উদারতা অধ্যায়]

قال الله عزّ وجلّ: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " .

أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا الحسن بن العباس قال: حدثنا سهل قال: حدثنا سعيد بن مسلم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة، رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السخّس: قريب من الله تعالى، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل: بعيد من الله تعالى، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.

والجاهل السخيّ أحب إلى الله تعالى من العابد البخيل " .
قال الأستاذ: ولا فرق - على لسان القوم - بين الجود والسخاء، ولا يوصف الحق، سبحانه، بالسخاء والسماحة؛ لعدم التوقيف.
وحقية الجود: أن لا يصعب عليه البذل.

وعند القوم، السخاء: هو الرتبة الأولى، ثم الجود بعده، ثم الإيثار؛ فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء، ومن بذل الأكثر، وأبقى لنفسه شيئاً، فهو صاحب إيثار، كذلك سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق،

رحمه الله، يقول: أسماء بن خارجة: ما أحبّ أن أرد أحداً عن حاجة طلبهمني؛ لأنه إن كان كريماً أصون عرضه، وإن كان لئيماً أصون عنه عرضي.

وقيل: كان مورّق العجلي يتلطف في إدخال الرفق على إخوانه؛ يضع عندهم ألف درهم، فيقول: أمسكوها عندكم حتى أعود إليكم. ثم يرسل إليهم: أنتم منها في حلّ.

وقيل: لقي رجل من أهل منبج رجلاً من أهل المدينة، فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل المدينة، فقال له: لقد أتانا رجل منكم يقال له الحكم ابن عبد المطلب فأغنانا. فقال له المدني: وكيف؟ وما أتاكم إلا في جبة صوف! فقال: ما أغنانا بمال، ولكنه علمنا الكرم. فعاد بعضنا على بعض حتى استغنينا.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: لما سعى غلام الخليل بالصوفية إلى الخليفة أمر بضرب أعناقهم؛ فأما الجنيد فإنه تستر بالفقر، وكان بفتى عليّ مذهب أبي ثور، وأما الشحام، والرقام، والنوري، وجماعة، فقبض عليهم؛ فبسط النّطع لضرب أعناقهم.. فتقدم النوري فقال له السيّاف: تدري الى ماذا تبادر؟ فقال: نعم فقال وما يعجلك؟ فقال أوثر عليّ أصحابي بحياة ساعة.

فتحير السيّاف، وأنهى الخبر إلخليفة، فردهم إلى القاضي؛ ليتعرف

حالمهم؛ فألقى القاضي على أبي الحسين النوري مسائل فقهية، فأجابه الكل، ثم أخذ يقول: وبعد؛ فإنه لله عباداً قاموا بالله، وإذا نطقوا نطقوا بالله، وسرد ألفاظاً أبكى بها القاضي فأرسل القاضي إلى الخليفة، وقال: إن كان هؤلاء زنادقة: فما على وجه الأرض مسلم.

وقيل: كان عليّ بن الفضيل يشتري من باعة المحلة؛ فقليل له: لو دخلت السوق فاسترخصت.

فقال: هؤلاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا. *Khanqa-e-Aminia, Sylhet*
وقيل: بعث رجل إلى جبلة تجارية، وكان بين أصحابه، فقال: قبيح أن اتخذها لنفسي وأنتم حضور؛ وأكره أن أخص بها واحداً، وكلكم له حق وحرمة. وهذه لا تحتل القسمة، وكانوا ثمانين؛ فأمر لكل واحد بجزية أو وصيف. *Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

وقيل: عطش عبيد الله بن أبي بكرة يوماً في طريقه، فاستسقى من منزل امرأة، فأخرجت له كوزاً، وقامت خلف الباب، وقالت: تنحوا عن الباب، وليأخذه بعض غلمانكم، فإني امرأة من العرب: مات خادمي منذ أيام، فشرب عبيد الله تسخري؟. فقال: احمل إليها عشرين ألف درهم. فقالت: اسأل الله تعالى العافية. فقال: يا غلام أحمل إليها ثلاثين ألف درهم، فردّت الباب وقالت: أف لك. فحمل إليها ثلاثين ألف درهم، فأخذتها فما أمت حتى كثر خطابها. وقيل: الجود: إجابة الخاطر الأول:

سمعت بعض أصحاب أبي الحسن البوشنجي، رحمه الله، يقول: كان أبو الحسن البوشنجي في الخلاء، فدعا تلميذاً له، وقال له: انزع عني هذا القميص، وادفعه إلى فلان؛ فقبل له: هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟ فقال: لم آمن على نفسي أن يتغير على ما وقع لي من التخلف منه بذلك القميص.

وقيل لقيس بن سعد بن عبادة: هل رأيت أحداً أسخى منك؟ فقال له: نعم؛ نزلنا بالبادية على امرأة، فحضر زوجها، فقالت له: إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة ونحرها، وقال: شأنكم بها..

فلما كان بالغد جاء بأخرى ونحرها، وقال: شأنكم بها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت لنا البارحة إلا اليسير: فقال: إني لأطعم أضيافي الغاب. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة، والسماء تمطر، وهو يفعل كذلك.

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة دينار في بيته، وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه.. ومضيها، فلما مَتَعَ النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام: أعطيتموني ثمن قراي... ثم إنه لحقنا وقال: لناخذنه، وإلا طعنكم برمحي هذا. فأخذناه وانصرف، فأنشأ يقول:

وإذا أخذت ثواب ما أعطيته ... فكفى بذاك لنائل تكديرا

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله يقول: دخل أبو عبد الله الروزباري دار بعض أصحابه، فوجده غائباً، وباب بيت له مقفل، فقال:

صوفيَّ وله باب بيت مقفل!! كسروا القفل، فكسروا القفل وأمر بجميع ما وجد في الدار والبيت، وأنفذه إلى السوق، وباعوه، وأصلحوا وقتاً من الثمن، وقعدوا في الدار.. فدخل صاحب المنزل ولم يمكنه أن يقول شيئاً. فدخلت امرأته بعدهم الدار، وعليها كساء، فدخلت بيتاً، ورمت الكساء، وقالت: يا أصحابنا، هذا أيضاً من جملة المتاع فبيعه. فقال الزوج لها: لِمَ تكلفت هذا باختيارك؟ فقالت له: اسكت، مثل هذا الشيخ يباسطنا، ويحكم علينا، ويبقى لنا شيء ندخره عنه؟ وقال بشر بن الحارث: النظر إلى البخيل يقسى القلب.

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة، فاستبطأ إخوانه. فسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين؛ فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة!! ثم أمر من ينادي مَنْ كان لقيس عليه دين فهو منه في حل، فكسرت عتبه بالعشى، لكثرة ما عاده. وقيل لعبد الله بن جعفر: إنك تبذل الكثير إذا سئلت، وتضنُّ في القليل إذا نُجِزْتَ. فقال: إني أبذل مالي وأضنُّ بعقلي.

وقيل: خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له.. فنزل على نخيل قوم: وفيها غلام أسود يعمل فيها؛ إذ أتى الغلام بقوته، فدخل كلب الخائط ودنا من الغلام، فرمى إليه الغلام بقرص، فأكله، ثم رمى إليه بالثاني، والثالث، فأكله، وعبد الله بن جعفر ينظر إليه فقال له: يا غلام، كم قُوتك كُلَّ

يوم؟ قال: ما رأيت: قال: فلم آثرت هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب،
نه جاء من مسافة بعيدة جائعاً، فكرهت رده.

قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال له: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن
جعفر: أألام على السخاء؟! إِنَّ هذا الأسخى مني، فاشتري الحائط والغلام
وما فيها من آلات، فأعتق الغلام ووهبها له.

وقيل: أتى رجل صديقاً له، ودق عليه الباب، فلما خرج إليه قال: لماذا
جئتني؟ قال لأربعمائة درهم دين ركبتني، فدخل الدار، ووزن له أربعمائة
درهم وأخرجها إليه، ودخل الدار باكياً، فقالت له امرأته: هلا تعللت حين
شق عليك الإجابة؟! فقال: إنما أبكي لأني لم أتعقد حاله حتى أحتاج إلى
مفاتيحي به. وقال مطرف بن الشخير: ذا أراد أحدكم مني حاجة فليرفها
في رقعة؟ فإني أكره أن أرى في وجهه ذل الحاجة.

وقيل: أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس، فأتى وجوه البلد وقال لهم:
يقول لكم ابن العباس تغدوا عندي اليوم. فأتوه، فملئوا الدار، فقال: ما
هذا؟ فأخبر الخبر فأمر بشراء الفواكه الوقت، وأمر بالخبز، والطبخ، وأصلح
أمراً، فلما فرغوا قال لوكلائه: أموجج لنا كل يوم هذا؟ فقالوا: نعم. فقال:
فليتغد هؤلاء كلهم عندنا كل يوم.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: كان الأستاذ أبو
سهل الصعلوكي يتوضأ يوماً في صحن داره، فدخل إليه إنسان وسله شيئاً

من الدنيا، ولم يحضر شيء، فقال: أصبر حتى أفرغ.
فصبر.. فلما فرغ قال له: خذ القمقة واخرج. فأخذها، وخرج، ثم صبر
حتى علم أنه بعد، فصاح وقال: دخل إنسان وأخذ القمقة. فمشوا خلفه،
فلم يدركوه. وإنما فعل ذلك: لأن أهل المنزل كانوا يلومونه على كثرة البذل.
وسمعه يقول: وهب الأستاذ أبو سهل جبته من إنسان في الشتاء، وكان
يلبس جبة النساء حين يخرج إلى التدريس، إذ لم تكن له جبة أخرى،
فقدم الوفد المعروفون من فارس، فيهم من كل نوع: إمام من الفقهاء،
والمتكلمين، والنحويين، فأرسل إليه صاحب لجيش أبو الحسن وأمره بأن
يركب للاستقبال فلبس دُرَاعَةً فوق تلك الجبة التي للنساء، وركب، فقال
صاحب لجيش: إنه يستخف بي أمام البلد؛ يركب في جبة النساء!! ثم إنه
ناظرهم أجمعين فظهر كلامه على كلام جميعهم في كل فن.
وسمعه يقول: لم يناول الأستاذ أبو سهل أحداً شيئاً بيده، وكان يطرحه على
الأرض ليأخذه الآخذ من الأرض، وكان يقول: الدنيا أقل خطراً أن أرى
لأجلها يدي فوق يد أحد.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى".
وقيل: كان أبو مرتد، رحمه الله، أحد الكرام، فمدحه بعض الشعراء، فقال:
ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي، وادع عليّ عشرة آلاف
درهم، حتى أقرّ لك بها، ثم أحبسني، فإن أهلي لا يتركوني مسجوناً. ففعل

ذلك، فلم يُمس حتى دُفع إليه عشرة آلاف درهم، وخر من السجن.
وقيل: سأل رجل الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه شيئاً فأعطاه
خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار، وقيل: أثت بحمال يحملها لك. فأتى
بحمال فأعطاه طيلسانه وقال: يكون كِراءُ الحمال من قبلي.

وسألت امرأة الليث بن سعد سكرجة عسل، فأمر لها بزقٍ من عسل فقيل
له في ذلك، فقال: إنها سألت علي قدر حاجتها، ونحن نعطيها على قدر
نعمنا.

وقال بعضهم صليت في مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غريماً لي،
فلما سلمت وَضِع بين يدي كلِّ واحد حلة ونعلين. وكذلك وضع بين يدي،
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: إن الأشعث قدم من مكة، فأمر بهذا لأهل جماعة
مسجده. فقلت: إنما جئت أطلب غريماً لي، ولست من جماعته. فقالوا: و
لكل من حضر. وقيل: لما قربت وفاة الشافعي، رضي الله تعالى عنه، قال:
مُرُوا فلاناً يغسلني. وكان الرجل غائباً.. فلما قدم أخبر بذلك، فدعا
بتذكرته. فوجد عليه سبعين ألف درهم ديناً، فقضها، وقال: هذا غسلي
إياه.

وقيل: لما قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة كان معه عشرة آلاف دينار،
فقيل له: تشتري بها قنية فضرِب خيمته خارج مكة، وصَبَّ الدنانير، فكل
من دخل عليه كان يعطيه قبضة قبضة، فلما جاء وقت الظهر قام ونفض

الشوب ولم يبق شيء.

وقيل: خرج السريّ يوم عيد، فاستقبله رجل كبير الشأن، فسلم السري عليه سلاماً ناقصاً. فقيل له: هذا رجل كبير الشأن. فقال: قد عرفته، ولكن روي مسنداً: أنه إذا التقى المسلمان قُسمت بينهما مائة رحمة: تسعون لأبشهما، فأردت أن يكون معه الأكثر.

وقيل: بكرى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: لم يأتيني ضيف منذ سبعة أيام، وأخاف أن يكون الله تعالى قد أهانني. وروي عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال: زكاة الدار أن يتخذ فيها بيت للضيافة. وقيل في قوله تعالى: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين..". قيل قيامه عليهم بنفسه، وقيل: لأن ضيف الكريم كريم. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: أربعة لا ينبغي للشریف أن ينف منهن، وإن كان أميراً: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيّفه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لم يعلم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً": إنهم كانوا يتخرجون في أن يأكل أحدهم وحده؛ فرخص لهم في ذلك.

وقيل: أضاف عبد الله بن عامر بن كريز رجلاً، فأحسن قراه، فلما أراد الرجل أن يرحل عنه لم يُعنه غلماناه، فقيل له في ذلك. فقال عبد الله:

إنهم لا يعينون من يرتحل عنا. أنشد عبد الله بن باكوية الصوفي قال:
أنشدنا المتني في معناه:

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... أن لا يفارقهم فالراحلون هم
وقال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من
سخاء النفس بالبذل. وقال بعضهم: دخلت على بشر بن الحارث في يوم
شديد البرد وقد تعرى من الثياب وهو ينتفض، فقلت: يا أبا نصر، الناس
يزيدون في الثياب في مثل هذا اليوم وأنت قد نقصت؟! فقال: ذكرت
الفقراء وما هم فيه، ولم يكن لي ما أواسيهم به، فأردت أن أرافقم بنفسي
في مقاساة البرد. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول:
سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الدقاق يقول: ليس السخاء أن
يعطي الواحدُ المعدم، إنما السخاء أن يُعطى المعدمُ الواحد.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

—“নিজেদের থেকেও তারা অপরদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাবগ্রস্থ।”

[হাশর : ৫৯]

হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দয়াবান ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জান্নাতের নিকটবর্তী। অপরদিকে সে আগুন থেকে দূরবর্তী। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জান্নাত থেকেও দূরে। আর আগুনের নিকটবর্তী। কৃপণ ইবাদতগুজার থেকে মূর্খ দানশীল লোক আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।”

উস্তাদ ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিদের ভাষায় জুদ ও সাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর গুণ হিসাবে এ দু'টো শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কারণ কুরআন ও হাদীসে তাঁর এরূপ কোনো গুণবাচক নাম আসে নি। জুদের হাক্কিকাত হলো ব্যয় করতে কোনো প্রকারের জটিলতা অনুভব হবে না। কোনো কোনো সুফির মতে সাখা প্রথম স্তরের। এর পরের স্তর জুদ ও এর পরেরটা ইসার। তাই যে ব্যক্তি কিছু দিল আর কিছুটা নিজের জন্য রাখলো, সে সাখার অধিকারী। আর যে অধিকাংশ দান করে সামান্য একটু নিজের জন্য রাখলো, সে-ই ইসারের অধিকারী।”

হযরত আসমা ইবনে খারিজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার নিকট কেউ কিছু চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতে মন চায় না। কারণ, লোকটি যদি ভদ্র হয়, তাহলে আমার দ্বারা তার ভদ্রতা বজায় রইলো। আর ইতর প্রকৃতির হলে তার থেকে নিজের সম্মান রক্ষা হলো।” বর্ণিত আছে মুয়াররিক আজালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করতেন। হাজার দিরহাম পাওনা থাকলেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। বলতেন, এগুলো তোমাদের নিকট রক্ষিত থাক, আমি ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তিনি সংবাদ প্রেরণ করতেন, দিরহামগুলো তোমরা খরচ করো- এটা তোমাদের জন্য হালাল। আরো বর্ণিত আছে, মানবিজের অধিবাসী এক ব্যক্তি মদীনা শরীফের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথেকে এসেছেন? দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন মদীনা শরীফ থেকে। এরপর প্রথম জন বললেন, তোমাদের শহর থেকে আমাদের নিকট একজন লোক এসেছেন। তার নাম হাকাম ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি আমাদেরকে প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, ঐ লোকের জন্য এটা কিভাবে সম্ভব হবে? তিনি তো একটি পশমের জুকা পরে বেরিয়ে আসেন। প্রথম ব্যক্তি জবাব দিলেন, না- না, মাল-দৌলত দিয়ে মালামাল করেন নি। বরং তিনি আমাদেরকে ভদ্রতা শিখিয়েছেন। এ শিক্ষাকে সকলের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে সবাই ধনী হয়ে যাই।

আমার উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “বাগদাদের সুফিদের যখন গোলাম খলীল খলীফার দরবারে দোষি সাব্যস্ত করলেন, খলীফা সবাইকে গর্দান কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন একজন ফকীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হযরত আবু সওর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসরণে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি এই দলে ছিলেন না। অন্যদিকে বিশিষ্ট সুফিবর্গ হযরত শাহহাম, রাক্কাম, নূরী প্রমুখ বিচারাধীন ছিলেন। যখন সকলকে কতলের জন্য চামড়ার মাদুর বিছানো হলো তখন হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এগিয়ে গেলেন। জল্লাদ বললো, আপনি কি জানেন কোথায় এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি জানি। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, এতো তাড়াহুড়ো করছেন কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমার বন্ধুদেরকে কিছু সময়ের জন্য হলেও অতিরিক্ত বাঁচার সুযোগ করে দিতে চাই। জল্লাদ একথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লো। সে কথাটি খলীফাকে অবগত করলো। খলীফা তৎক্ষণাৎ বিচারককে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সুফিদের নিকট প্রেরণ করলেন। বিচারক আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কয়েকটি ফকহী প্রশ্ন করলেন। তিনি সবক'টি জবাব সুষ্ঠুভাবে দিলেন। এরপর বললেন, পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁ'আলার কিছু বিশেষ বান্দা আছেন। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাঁড়ান ও কথা বলেন। তাঁর মুখ থেকে এরূপ কয়েকটি কথা শুনেই বিচারক কেঁদে ফেললেন। কাজি খলীফার নিকট যেয়ে বললেন, এই লোকগুলো যদি জিন্দীক হন, তাহলে পৃথিবীর জমিনে আর মুসলমান কে হতে পারে?”

বর্ণিত আছে, হযরত আলী ইবনে ফুজাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মহল্লার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনতেন। বলা হলো, বাজারে গিয়ে ক্রয় করলে অনেকটা সস্তা হতো। তিনি বললেন, এসব দোকানী তো কিছুটা মুনাফার আশায় আমাদের আশে-পাশে দোকান করেছে।

আরো বর্ণিত আছে, জাবালার কাছে এক ব্যক্তি একটি দাসীকে হাদিয়া হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। জাবালা তখন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসা ছিলেন। বললেন, তোমাদের উপস্থিতিতে আমি এই দাসীকে গ্রহণ করা বেশ মন্দ লাগছে। অপরদিকে তোমাদের বিশেষ কাউকে একে প্রদান করাও আমার জন্য অনুচিত। আবার তাকে সবার মধ্যে বণ্টন করারও উপায় নেই। উপস্থিত লোকের সংখ্যা ছিলো ৮০ জন। তিনি প্রত্যেককে একজন দাস কিংবা দাসী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবি বকরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা চলার পথে পিপাসার্ত হলেন। তিনি একজন মহিলার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে পানি চাইলেন।

মহিলাটি একটি পাত্রে পানি প্রদান করে দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘দরজার সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়ান। আপনার দাসদাসীদের কাউকে বলুন পানপাত্রটি নিয়ে যেতে। আমি একজন আরব মহিলা। আমার খাদিমা কিছুদিন পূর্বে মারা গেছে। আবি বকরা পানি পান করে নিজের খাদিমকে নির্দেশ দিলেন, এই মহিলাকে বিশ হাজার দিরহাম প্রদান করো। একথা শুনে মহিলা জবাব দিলেন, আমি আল্লাহর করুণা কামনা করছি। এবার গোলামকে নির্দেশ দিলেন, যাও! তাকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দাও। একথা শুনে মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, আপনার কথায় খুবই লজ্জাবোধ করছি। গোলাম ঠিকই তাকে ত্রিশ হাজার দিল। মহিলা তা গ্রহণ করে নিলেন। এরপর থেকে [ধনী হওয়ার কারণে] অনেকে মহিলার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তাব দিতে লাগলেন।

প্রথম ভাবনাতেই দান খয়রাত করাকে বলে ‘জুদ’। হযরত আবুল হাসান বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সাথীর কাছ থেকে [লেখক বলেন] শুনেছি যে, বুশঞ্জী একদিন ইস্তিজার কক্ষে থাকাবস্থায় তাঁর এক শাগরিদকে নির্দেশ দিলেন, আমার এই জামাটি খুলে নিয়ে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে আসো। পরে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরলেন না কেনো? তিনি জবাব দিলেন, যদি দেবী করে ফেলতাম তাহলে [এই দানের ব্যাপারে] আমার মন হয়তো পরিবর্তন হয়ে যেতো।

বর্ণিত আছে, হযরত কায়স ইবনে সা’দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার দৃষ্টিতে আপনি থেকেও আরো বড়ো দানশীল কেউ আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এক সফরে মরুভূমিতে স্থাপিত একটি বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বাড়িতে একজন মহিলা ও তার স্বামী ছিলেন। মহিলা স্বামীকে জানালো, আপনার কিছু মেহমান এসেছেন। একথা শুনে স্বামী একটি উটনী জাবই করলেন। আমাদের কাছে এসে বললেন, এটি আপনাদের জন্য। এর পরদিনও তিনি আরেকটি উটনী জবাই করলেন এবং অনুরূপ বললেন, এটি আপনাদের জন্য। আমরা বললাম, গতকালের উটনী থেকে তো আমরা অত্যল্প খেয়েছি। তিনি বললেন, আমি কোনো মেহমানকে আগের দিনের কোনো কিছু থেকে আপ্যায়ন করি না! বাইরে প্রচুর বৃষ্টি ছিলো। আমরা কয়েকদিন তার বাড়িতে মেহমান থাকলাম। প্রত্যহই তিনি একইভাবে আমাদেরকে খাওয়ালেন। ফেরার পূর্বে সিদ্ধান্ত নিলাম তার

ঘরে ১০০ দীনার হাদিয়া হিসাবে রেখে দেবো। মহিলাকে বললাম, আমাদের পক্ষ থেকে আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন, আমরা চলে যাচ্ছি। চলে আসার পর দুপুর বেলা হঠাৎ পেছন থেকে একটি শব্দ হলো। ঐ মহিলার স্বামী চিৎকার দিয়ে বললো, ওহে অকৃতজ্ঞ আরোহীরা! তোমরা আমার আতিথেয়তার মূল্য দিয়ে গেছো বুঝি! এগুলো এশুগুণি নিয়ে নাও! অন্যথায় তীর নিক্ষেপ করে তোমাদেরকে মেরে ফেলবো! আমরা দীরহামগুলো ফিরিয়ে নিলাম। তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন:

যা তোমাকে দিয়েছি তার প্রতিদান হিসাবে আমার প্রাপ্য তোমা কর্তৃক ডাকাতি
আমাকে [সারা জনমের জন্য] অপমানিত করার জন্য যথেষ্ট!”

হযরত শায়খ সুলাইমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত আবু আবদুল্লাহ রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এক শাগরিদের বাড়িতে গেলেন। যেয়ে দেখলেন ঘরটি তালাবদ্ধ। সেখানে কেউ নেই। তিনি মন্তব্য করলেন, এই লোকটি সুফি হলো কি করে? তাঁর ঘর তালাবদ্ধ! সাথীদের নির্দেশ দিলেন, তালাটি ভেঙ্গে ফেলো! তাঁরা তালা ভাঙ্গার পর তিনি আবার নির্দেশ দিলেন, ঘরের সবকিছু বাজারে নিয়ে যাও। তাঁরা সত্যিই সবকিছু বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিলেন। এরপর সবাই ঘরে বসে গেলেন। অবশেষে ঘরের মালিক আসলেন। পরিস্থিতি দেখে কোনো কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরে আসলেন মালিকের স্ত্রীও। তার মাথায় ছিলো চাদর। এটি ঝেড়ে বললেন, বন্ধুগণ! এটিও নিয়ে নিন এবং বাজারে বিক্রি করে দিন! তাঁর স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কী করছো? স্ত্রী জবাব দিলেন, আপনি চুপ থাকুন! শায়খের এরূপ করা ঠিক আছে। আমাদের কাছে সম্পদ থাকবে আর সেটা তাঁর অজানা থাকবে- তা হতে পারে না।”

বর্ণিত আছে হযরত কায়স ইবনে সা’দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ হলেন। এসময় বন্ধু-বান্ধবদের কেউই তাঁকে দেখতে আসলেন না। তিনি একজনকে তাঁদের না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ঐ লোকটি জবাবে বললেন, আপনার নিকট তাঁদের পাওনা আছে। তাই লজ্জায় তাঁরা আসছেন না। এসময় তিনি বললেন, যে সম্পদ বন্ধুদেরকে আসতে বাধাদান করে তা যেনো আল্লাহ তা’আলা ধ্বংস করে দেন! এরপর বললেন, একথা ঘোষণা করো- যাদের কাছে কায়সের পাওনা আছে তা মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে। এ কথা জানাজানি হওয়ার পর মানুষের ভীড় এতো বেশী হলো যে, তাঁর ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেলো।

আরো বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার কাছে চাওয়া হলে খুব দান করেন। কিন্তু আপনার বিরোধীদের ব্যাপারে খুব কঠিন। এর কারণ কি? জবাব দিলেন, আমার টাকার প্রতি আমি উদার কিন্তু বিবেকের নিকট আমি কৃপণ। তাঁর সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে, তিনি এক সময় নিজের কিছু জায়গা দেখতে গেলেন। এসময় একটি খেজুর বাগানে গিয়ে থামলেন। লক্ষ্য করলেন বাগানে একজন কালো ভৃত্য কাজ করছে। তার হাতে খাবার এনে দেওয়া হলো। সে তা গ্রহণ করার মুহূর্তে একটি কুকুর বাগানে ঢুকে ঐ ভৃত্যের নিকট চলে আসলো। ভৃত্য কুকুরকে এক টুকরো রুটি দিল। এরপর আরো দু'টুকরো দিলো। আবদুল্লাহ এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তুমি প্রতিদিন কী পরিমাণ খাবার নিজে গ্রহণ করো? সে উত্তর দিলো, যা দেখেছেন তা-ই। তাহলে তুমি কুকুরের খাবারের উপর প্রাধান্য দিলে। সে বললো, আমাদের এলাকায় কোনো কুকুর নেই। বুঝতে পারলাম এটি অনেক দূর থেকে এসেছে। সে খুব ক্ষুধার্ত। তাকে তাড়িয়ে দিতে আমার বেশ কষ্টবোধ হচ্ছিলো। আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে ভুখা অবস্থায় সারাদিন কিভাবে কাটাবে? সে বললো, কষ্ট করে- আর কি। আবদুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমাকে লোকে দানবীর বলে। আমি দেখছি আমার চেয়ে অনেক বেশী দানবীর তুমি! তিনি ঐ বাগান ও ভৃত্যসহ সবকিছু ক্রয় করে নিলেন। এরপর গোলামকে আজাদ করে বাগানটি তাকে উপহার করলেন।

জনৈক ব্যক্তির নিকট এক বন্ধু আগমন করলেন। দরজায় করাঘাত শুনে বাইরে এসে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছো? তিনি জবাব দিলেন, আমার উপর চারশ দীরহামের ঋণের বোঝা আছে। একথা শুনে ঘরে গিয়ে নিয়ে আসলেন পুরো চারশ দিরহাম এবং বন্ধুকে তা প্রদান করলেন। এরপর ঘরে ফিরে কাঁদতে লাগলেন। স্ত্রী বললেন, লোকটির প্রয়োজনে সাড়া দিতে যখন কষ্ট হচ্ছিলো, তাহলে একটু ভঙ্গি ধরলেই হতো! তিনি জবাব দিলেন, আমি অন্য কারণে কাঁদছি। আমি বন্ধুর অবস্থার খবরা-খবর রাখি নি- সে বাধ্য হয়ে আমার নিকট আসতে হয়েছে। এটা উচিত হয় নি।

হযরত মুতাররফ ইবনে শিখ্খির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে লিখিতভাবে পত্রযোগে জানাবে। এর কারণ হলো, কারো মুখে অভাবের চিহ্ন দেখলে আমার কষ্ট লাগে।” বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস রাহিআল্লাহু আনহুমা কে বিবৃত করতে চাইলো। সে শহরের গণ্যমান্য লোকদেরকে বললো, আজ সকালে হযরত ইবনে আব্বাসের ঘরে আপ্যায়ন হবে। তিনি সকলকে দাওয়াত করেছেন। একথা শুনে অনেক লোক আসলো, তাঁর বাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেলো গণ্যমান্য লোকজনে। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সবাই আসার কারণ কি? তাঁরা বললো, আপনি তো আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন শুনলাম। তিনি সাথে সাথে মৌসুমী ফল ক্রয় করে আনার নির্দেশ দিলেন। ঘরে রুটি পাকানোর ব্যবস্থা করলেন। খাওয়া পর্ব শেষে তিনি গৃহ পরিচারককে জিজ্ঞেস করলেন, এরূপ আপ্যায়ন কি প্রত্যহ আমাদের জন্য সম্ভব হবে? সে জবাব দিলো, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে সবাইকে বলো, তাঁরা যোনো এখানে এসে প্রতিদিন খেয়ে যান।

শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একবার আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের ঘরের উঠানে বসে অযু করছিলেন। এসময় এক ভিক্ষুক এসে তাঁর কাছে কিছু চাইলো। কিন্তু হযরতের নিকট দেওয়ার মতো কিছুই ছিলো না। তিনি বললেন, দাঁড়াও। আমাকে অযু শেষ করতে দাও। ভিক্ষুক অপেক্ষা করতে লাগলো। অযু শেষ করে বললেন, এই বদনাটি নিয়ে তুমি দ্রুত প্রস্থান করো। সে বদনা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো। হযরত সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ভিক্ষুক লোকটি বেশ দূরে চলে যাওয়ার পর চিৎকার দিয়ে বললেন, এক ব্যক্তি এসে আমার বদনা নিয়ে গেছে! একথা শুনে লোকজন ভিক্ষুককে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেলো না।” [লেখক বলেন] হযরত সুলুকী খুব বেশী দান-খয়রাত করতেন। ফলে পরিবার-পরিজন তাঁকে তিরস্কার করতো। এ জন্যই তিনি উক্ত হিকমাত অবলম্বন করেছিলেন। একবার তিনি শীতকালে এক ব্যক্তিতে তাঁর জুবা দিলেন। এরপর বের হলে তাঁর গায়ে মহিলাদের একটি জুবা শোভা পেতে! এসময় পারস্য থেকে জ্ঞানী-গুণী একটি দল আসে। তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ফকীহ, মুতাকাল্লিম ও ভাষাবিদ ছিলেন। সেনাপ্রধান আবুল হাসান এক ব্যক্তিকে হযরত সুলুকীর নিকট প্রেরণ করলেন। অতিথিদেরকে স্বাগত জানাতে তাঁর প্রতি অনুরোধ করা হয়। এসময় তিনি মহিলাদের জুবা ও বর্ম পরিধান করছিলেন। সেনাপ্রধানের বার্তাবাহক বললেন, এরকম পোশাকে আপনি শহরে বের হলে তো মর্যাদাহানি হবে! কিন্তু তিনি এরূপ

পোশাকেই বেরিয়ে পড়লেন। অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করে কথা বললেন। অনেক বিষয় নিয়ে তাঁদের সাথে বিতর্ক হলো ও তিনি তাতে জয়লাভ করলেন।

আরো বর্ণিত আছে হযরত আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউকে কিছু নিজ হাতে দান করতেন না। তিনি দান করার বস্তু কোথাও রেখে দিতেন ও গ্রহিতা সেখান থেকে ওঠিয়ে নিয়ে যেতো। তিনি বলতেন, দুনিয়ার মূল্য এতোই অল্প যে, এর প্রতি ভালোবাসার জন্য আমি চাইনা নিজের হাতকে অপরের হাতের উপর রাখতে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নীচের হাত [দান গ্রহণকারীর হাত] থেকে উপরের হাত [দানকারীর হাত] উত্তম”।

বর্ণিত আছে, আবু মারতাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। জনৈক লোক একবার তাঁর প্রশংসা গাইলেন। তিনি শ্রবণ করে বললেন, আপনাকে বিনিময়ে কিছু দেওয়ার আমার নিকট নেই। চলুন, বিচারকের কাছে যাই। সেখানে আপনি আমার নিকট ১০ হাজার দিরহাম পাওনা দাবী করবেন। আমিও তা স্বীকার করবো। ফলে বিচারক আমাকে বন্দী করবেন। অবশ্য আমার পরিবার-পরিজন এই বন্দীত্ব কখনো মেনে নেবেন না। ঘটনা এরকমই ঘটলো। কবি ১০ হাজার দিরহাম পেলেন ও আবু মারতাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জেলখানা থেকে মুক্ত হলেন।

একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট কিছু চাইলেন। তিনি তাকে ৫০ হাজার দিরহাম ও ৫০০ দীনার দান করলেন। এরপর বললেন, একজন কুলি নিয়ে আসো তোমার টাকা বহনের জন্য? লোকটি কুলি নিয়ে আসলে, তিনি কুলিকে নিজের সাল প্রদান করলেন। বললেন, কুলির মজুরী হিসাবে এটা আমার পক্ষ থেকে দিয়ে দিলাম।

একজন মহিলা হযরত লাইস ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট একপাত্র মধু চাইলেন। তিনি তাকে মধুভর্তি চামড়ার থলেটাই দিয়ে দিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, সে তো তার প্রয়োজন অনুসারে আবদার করেছে। আর আমি দিয়েছি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামত অনুসারে। একজন সুফি বলেন, আমি কুফায় হযরত আশআ'তের মসজিদে নামায আদায় করলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে খুঁজছিলাম যে আমাকে ঋণ দিতে পারে। নামায

পরে লক্ষ্য করলাম এক ব্যক্তি আমার সামনেই এক জোড়া কাপড় ও এক জোড়া জুতা রেখে গেছেন। অনুরূপ অন্যদের সামনেও কাপড় ও জুতা ছিলো। আমি বললাম, এটা কী? লোকজন জবাব দিলেন, হযরত আশআ'ত মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে সবাইকে উপহার দিতে। আমি বললাম, আমি তো আসলে একজন ঋণদাতাকে খুঁজছি। এ মসজিদের মুসল্লি আমি নই। লোকজন জবাব দিলেন, না, অসুবিধা নেই। তিনি সবাইকে দেওয়ার জন্যই বলেছেন।

বর্ণিত আছে, ইমাম হযরত শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন তখন বললেন, অমুক ব্যক্তিকে বলো তিনি যেনো আমার গোসল দেন। লোকটি তখন অনুপস্থিত। তিনি যখন বাড়িতে আসলেন, লোকজন ইমাম সাহেবের আবদাদের কথা তাকে জানালেন। তিনি জানতে পারলেন ইমাম সাহেবের নিকট লোকে ৭০ হাজার দিরহাম পাবে। তিনি এই টাকা পরিশোধ করে বললেন, “এটা ইমাম সাহেবকে গোসল দেওয়ার সুযোগের পরিবর্তে দান করলাম!”

বর্ণিত আছে, ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন সানা'আ থেকে মক্কা শরীফ সফরে আসেন, তাঁর সাথে ছিলো ১০ হাজার দীনার। এক ব্যক্তি বললো, আপনি চাইলে একটি বাঁদি সেবার জন্য ক্রয় করতে পারেন। কিন্তু তিনি মক্কা শরীফের বাইরে তাঁবু ফেললেন ও দীনারগুলো নিকটে রাখলেন। কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতে আসলেই এক মুষ্টি দীনার হাদিয়া দিতে লাগলেন। এভাবে ফজর থেকে যুহর পর্যন্ত দান করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে দীনারের থলেটি ঝেড়ে দেখলেন আর একটিও বাকী নেই। এরপর বেরিয়ে পড়লেন।

একবার ঈদের সময় হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাস্তায় বেরিয়ে আসলেন। পথিমধ্যে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো। সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে হাসিখুশী মুখে সৌজন্যমূলক সালাম জানালেন। এরপর কেউ তাকে জ্ঞাত করলো, ঐ লোকটি খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তিনি বললেন, আমি তাকে চিনি। অবিচ্ছেদ্য সদনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, “দু'জন মুসলমানের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলে উভয়ের উপর একশত রহমত বিলিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে হাসিখুশী ব্যক্তি পাবেন ৯০ ভাগ।” সুতরাং আমি সিংহভাগ রহমতের আশায় তাকে সালাম দিয়েছি।

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাঁদলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, বললেন আজ এক সপ্তাহ হলো আমি কোন মেহমান পাই নি। না জানি আল্লাহ আমাকে অপদস্ত করে দেন কি না- তাই আশঙ্কা করছি। ইমাম হযরত মালিক বিন আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ঘরের যাকাত হলো, মেহমানদের জন্য একটি কামরা। আল্লাহর বাণী:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

-“আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?” [যারিয়াত : ২৪] - এ কথার মর্ম হলো মেহমানদের সেবায় নিজে এগিয়ে আসা। আরো বলা হয়, ভদ্র ব্যক্তির মেহমানও ভদ্র হয়ে থাকেন।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চারটি কাজে কোনো ভদ্র মানুষকে হাতছাড়া উচিত নয়- যদিও তিনি একজন শাসক হোন। ১. বাবার জন্য আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। ২. মেহমানের সেবা করা। ৩. আলিম শিক্ষকের সেবা করা। ৪. যে জিনিস জানা নেই তা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া।”

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা আল্লাহ তা'আলার এই বাক্যটি সম্পর্কে বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

-“তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।” [নূর : ৬১] -“সাহাবায়ে কিরাম একা খেতে কষ্ট পেতেন। এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁদেরকে এ থেকে লাঘব করা হয়েছে।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমীর খুরাইজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে মেহমান বানালেন। তিনি খুব মেহমানদারী করলেন। বিদায়ের সময় মেহমানকে আবদুল্লাহর পরিচারকরা কোনো সাহায্য-সহায়তা করলো না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলো? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, মেহমান বিদায় হওয়াকে তারা পছন্দ করে না- এটা তারা চায় নি।

সুফি আবদুল্লাহ ইবনে বাকাওয়ে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবি মুতানাব্বি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রচিত এই পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করতেন:

যদি তুমি বিচ্ছিন্ন হও ঐ সাথীদের থেকে যারা তোমায় বাধা দিতে সক্ষম

তাহলে তো বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেলো ওরাই- তুমি নও!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “অন্যের ধনের প্রতি দয়াপ্রবণ [অর্থাৎ অপরের সম্পদ দেখে খুশী হওয়া] থাকা নিজের ধন বিলিয়ে দেওয়ার চেয়েও উত্তম।” একজন সুফি বলেন, এক প্রচণ্ড শীতের দিন বিশর ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে দেখা করতে গেলাম। লক্ষ্য করলাম তিনি খালি গায়ে আছেন এবং শীতের প্রকোপে কাঁপছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আবুল হুসাইন! এই প্রচণ্ড শীতে মানুষ একাধিক কাপড় পরছেন, কিন্তু আপনি এ কী করছেন? তিনি জবাব দিলেন, দরিদ্র ও অসহায় লোকদের কথা আমার স্মরণ হয়ে যায়। তাদেরকে সাত্ত্বনা দেওয়ার মতো আমার কোন ক্ষমতা নেই। তাই শীত সহ্য করে তাদের সাথে হিসাবে থাকতে চাই!”

হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সাবলম্বীর পক্ষ থেকে নিঃস্বকে কিছু দান করার মধ্যে কোনো উদারতা নেই। বরং নিঃস্ব লোকের পক্ষ থেকে সামর্থবানকে কিছু দান করার মধ্যেই উদারতা নিহিত।”

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الغيرة

বাবুল গাইরাত [লজ্জাবোধ অধ্যায়]

قال الله تعالى: " قل إنما حَرَّمَ ربيّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن ".
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة ابن العباس البزاز ببغداد قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا عبد الله ابن مسلم، قال: حدثنا محمد بن الفرات، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أحدٌ أغير من الله تعالى، ومن غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ".

أخبرنا عليّ بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن بنان قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا حرب بن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: أن أبا هريرة، رضي الله عنه، حدّثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيره الله تعالى: أن يتي العبد المؤمن ما حرّم الله عليه ".

والغيرة: كراهية مشاركة الغير، وإذا وُصف الله سبحانه بالغيرة، فمعناه: أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له.

حكى عن السريّ السقطي: أنه قرىء بين يديه: " وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً " . فقال السريّ لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟! هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله تعالى.

ومعنى قوله: " هذا حجاب الغيرة " يعني: أنه لم يجعل الكافرين أهلاً لمعرفة صدق الدين.

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق، رحمه الله: يقول: إن أصحاب الكل عن عبادته تعالى هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة الخلالان. فأختار لهم البعد عنه، وأخرهم عن محل القرب؛ ولذلك تأخروا. وأنشدوا:

أنا صبٌّ لمن هويْتُ ولكن ... ما احتيالي لسوء رأي الموالى
وفي معناه أيضاً قالوا: سقيم ليس يُعادُ ومريد ولا يُراد.

سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول: سمعت العباس الزوزني يقول: كان لي بداية حسنة.. وكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام: كأني أتدهده من خالق الجبل، فأردت الوصول إلى ذروته. قال: فحزنت، فأخذني النوم فرأيت قائلاً يقول: يا عباس، الحق لم يُرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلب، ولكنه فتح على لسانك الحكمة، قال: فأصبحت وقد ألهمت كلمات

الحكمة.

وسمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال ووقت مع الله، فخفي مدة لم يُر بين الفقراء، ثم إنه ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت. فسئل عنه فقال: آه. وقع حجاب.

وكان الأستاذ أبو علي، رحمه الله تعالى، إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غير الحق سبحانه، يريد أن لا يجري عليهم ما يجري من صفاء هذا الوقت. *Khanqa-e-Ahmad Ali Centre, Subidbazar, Sylhet* وأنشدوا في معناه:

همت بإتياننا حتى إذا نظرت ... إلى المرأة نهاها وجهها الحسن وقيل لبعضهم: تريد أن تراه؟ فقال: لا، فقيل: لم؟ فقال: أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي.

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

وفي معناه أنشدوا:

إني لأحسدُ ناظري عليك ... حتى أغض إذا نظرت إليك

وأراك تخطر في شمائلك التي ... هي فتنتي فأغار منك عليك

وسئل الشبلي: متى تستريح؟ فقال: إذا لم أر له ذاكراً.

سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته فرساً من أعرابي، وأنه استقاله فأقاله، فقال الأعرابي: عمرُك الله تعالى، ممن أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمرؤ من قريش.

فقال بعض أصحابه من الحاضرين للأعرابي: كفاك جفاء أن لا تعرف نبيك!..

وكان رحمه الله يقول: إنما قال امرؤ من قريش غيرة، وإلا كان واجباً عليه التعرف إلى كل أحد: أنه من هو؟.. ثم إن الله؛ سبحانه، أجرى علي لسان ذلك الصحابي التعريف للأعرابي يقول: كفاك جفاء أن لا تعرف نبيك!! من الناس من قال: إن الغيرة من صفات أهل البداية، وإن الموحد لا يشهد الغيرة، ولا يتصف بالاختيار، وليس له فيما يجري في المملكة تحكم، بل الحق سبحانه، أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا عثمان الغربي يقول: الغيرة عمل المریدین، فأما أهل الحقائق فلا.

وسمعتة يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت الشبلي يقول: الغيرة غيرتان: غيرة البشرية على النفوس، وغيرة الإلهية على القلوب.

وقال الشبلي أيضاً: غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله تعالى، والواجب أن يقال: الغيرة غيرتان: غيرة الحق، سبحانه، على العبد: وهو أن لا يجعله للخلق، فيضن به عليهم وغيرة العبد للحق، وهو أن لا يجعل شيئاً من أحواله وأنفاسه لغير الحق تعالى فلا يقال: أنا أغار على الله تعالى، ولكن يقال: أنا أغار لله، فإذا الغيرة على الله تعالى جهل، وربما تؤدي إلى ترك الدين؛ والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له.

واعلموا أنَّ من سنة الحق، تعالى، مع أوليائه: أنهم إذا ساكنوا غيراً، أو لاحظوا شيئاً، أو ضاجعوا بقلوبهم شيئاً، شَوَّش عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه، فارغة عما ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه، كآدم، عليه السلام، لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه منها.

وإبراهيم، عليه السلام، لما أعجبه إسماعيل، عليه السلام، أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه فلما أسلما وتله للجبين وصفا سره منه أمره بالفداء عنه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا زيد المروزي، رحمه الله، يقول: سمعت إبراهيم بن شيان يقول: سمعت محمد بن حسان يقول: بينا أنا أدور في جبل لبنان، إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقتة السموم والرياح؛ فلما نظر إليّ ولى هارباً، فتبعه، وقلت له تعظني بكلمة؟ فقال لي: احذر، فإنه غيور، لا يجب أن يرى في قلب عبده سواه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن، رحمه الله، يقول: قال النصرabadzi: الحق تعالى غيور، ومن غيرته: أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه.

وقيل: أوحى الله، سبحانه، إلى بعض أنبيائه: أنَّ لفلان إلى حاجة، ولي أيضاً إليه حاجة، فإن قضى حاجتي قضيت حاجته؛ فقال ذلك النبي، عليه السلام في مناجاته: إلهي؛ كيف يكون ذلك حاجة؟ فقال: إنه ساكن

بقلبه غيري فليفرغ قلبه عنه أقض حاجته.

وقيل: ن أبا يزيج البسطامي رأى جماعة من الحور العين في منامه.. فنظر إليهن، فسلب وقته أياماً، ثم إنه رأى في منامه جماعة منهن، فلم يلتفت إليهن وقال: إنكنَّ شواغل.

وقيل: مرضت رابعة العدوية، فقليل لها: ما سبب علنك؟ فقالت: نظرت بقلبي إلى الجنة فأدبني، فله العتبي، لا أعود ويحكى عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلاً صديقاً لي مدة من الأوقات فمررت في بعض الجبال: فإذا أنا بجماعة زمني وعميان ومرضي، فسألت عن حالهم، فقالوا: هاهنا يخرج في السنة مرة يدعو لهم فيجدون الشفاء، فصبرت حتى خرج.. ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره وتعلقت به، وقلت له بي علة باطنة!! إن فما دواؤها؟ فقال: يا سري، خلّ عني، فإنه - تعالى - غيور لا يراك تساكُن غيره فتسقط من عينه.

قال الأستاذ: ومنهم من غيرته، حين يرى الناس يذكرونه، تعالى بالغفلة فلا يمكنه رؤية ذلك وتشق عليه.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: لما دخل الأعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبال فيه، وتبادر إليه الصحابة لإخراجه، قال، رحمه الله، إنما أساء الأعرابي الأدب، ولكن الخجل وقع على أصحابه، والمشقة حصلت لهم حين رأوا من وضع خشمته، كذلك العبد

إذا عرف جلال قدره، سبحانه يشقُّ عليه سماع ذكر من يذكره بالغفلة، وطاعة من لا يعبد به بالحرمة.

حكى أنا أبا بكر الشبلي مات له ابن كان أسمه أبا الحسن فجزعت أمه عليه، وقطعت شعر رأسها. فدخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته، فكل من أتاها معزياً قال: ما هذا يا أبا بكر؟ فكان يقول: موافقة لأهلي.

فقال له بعضهم: أخبرني يا أبا بكر لم فعلت هذا؟

فقال: علمت أنهم يعزوني على الغفلة، ويقولون: آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى بالغفلة بلحيتي.

وسمع النوري رجلاً يؤذن، فقال: طعنة وسم الموت، وسمع كلباً ينبح فقال: لبيك وسعديك. فقيل له: إن هذا ترك للدين.. فنه يقول للمؤمن في تشهده طعنة وسم الموت، ويلبي عند نباح الكلاب، فسئل عن ذلك فقال أما ذلك فكان ذكره لله على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده".

وأذن الشبلي مرة، فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك.

وسمع رجلٌ رجلاً يقول: جلَّ الله. فقال له: أحبُّ أن تله عن هذا.

سمعت بعض الفقراء يقول: سمعت أبا الحسن الخفافاني رحمه الله يقول: لا إله إلا الله من داخل القلب. محمد رسول الله من القرط ومن نظر إلى ظهر

هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع. ولا كما يخضر بالبال، إذ الإخطار
للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق سبحانه متصاغرة في التحقيق.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

-“আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন
যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।” [আ'রাফ : ৩৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঈআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা গাইরাত করেন, মু'মিনও গাইরাত
করে। মু'মিন বান্দা যখন আল্লাহর নিষিদ্ধকাজ করার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ
তা'আলার গাইরাত হয়।”

অন্যের সাথে সংমিশ্রণে ঘৃণাবোধকে গাইরাত বলে। গাইরাত যখন আল্লাহ তা'আলার
বৈশিষ্ট্য হবে, এর মর্ম হলো তাঁর ইবাদতে অপরকে শরীক করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন।
বর্ণিত আছে, হযরত সিররি সাকাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সম্মুখে এই আয়াতখানা
তिलाওয়াত করা হলো:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
مَسْتُورًا

-“যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে
অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই।” [বনী ইসরাঈল : ৪৫]

এসময় তিনি তাঁর শাগরিদেরকে বললেন, তোমারা জানো- এখানে কিসের পর্দা
উদ্দেশ্য? এটা হলো গাইরাতের পর্দা। আল্লাহ তা'আলার চেয়ে এতো বেশী
গায়রাতকারী আর কেউ নয়। [লেখক বলেন] এখানে ‘গাইরাতের পর্দা’ কথাটির অর্থ
হলো, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে দ্বীনের হাক্কিকাত বুঝার ক্ষমতা দান করেন
নি। হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যারা আল্লাহ
তা'আলার ইবাদতে অকর্মণ্য, তাদের পায়ে আল্লাহ তা'আলা অবশতার বোঝা

চাপিয়ে দেন। তাদের জন্য বিচ্ছিন্নতার দূরত্ব বেছে নেন। তাদেরকে দূরে রাখেন নৈকট্যের স্থান থেকে। আর এজন্যই তারা পেছনে পড়ে থাকে।” এ ক্ষেত্রে সুফিরা আবৃত্তি করতেন:

যার প্রতি প্রেমানুরাগ তার বিরহে তো কাতর; কিন্তু কিভাবে বাঁচিয়ে রাখি
নিজেকে [হিংসাতুর] ওসব বন্ধুদের তিরস্কার থেকে?

সুফিরা আরো বলতেন, “যে ব্যক্তিকে কেউ রোগি হিসাবে দেখতে আসে না- সে-ই প্রকৃত রোগি, আর যার জন্য অন্য কেউ ইরাদা করে না সে-ই প্রকৃত মুরীদ।” হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস যাওজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “[আল্লাহর পথে] আমার সূচনা ছিলো বেশ সুন্দর। মুরাদ পর্যন্ত পৌঁছতে কতটুকু বাকী আছে, আমি বুঝতাম। এরপর এক রাতে স্বপ্নে দেখি, আমি যেনো পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছি। আমি পুনরায় চূড়ায় আরোহণের ইরাদা করলাম। আমি গভীরভাবে চিন্তিত ছিলাম। তখন দেখলাম এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলছেন, ‘আব্বাস! আল্লাহ চান না, তুমি এখনই মাক্কামে মাকছুদে পৌঁছিয়ে যাও। তবে তোমার জন্য তিনি হিকমাতের দরোজা খুলে দিয়েছেন।’ এই স্বপ্ন দেখার পরই হিকমাতের ভাঙার আমাকে দান করা হয়।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একজন শায়খ ছিলেন। আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে তাঁর ‘হাল’ ও ‘কাল’ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন তিনি দরবেশদের থেকে দূরে লুকিয়ে থাকেন। এরপর যখন দরবেশদের সাথে পুনরায় মিলিত হলেন তখন ঐ পূর্বের হাল আর অবশিষ্ট থাকলো না। তাঁকে আগের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন: আহ! পর্দা পড়ে গেছে!”

উস্তাদ আবু আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আদব ছিলো, মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে উদাসীনতা আসছে দেখলে বলতেন, এটি আল্লাহ তা’আলার একটি গাইরাত। যুগের পরিচ্ছন্ন লোকদের কথা প্রকাশ হোক, তা নিতি চান না। সুফিগণ আবৃত্তি করত:

সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু আয়নায় নিজের মুখশ্রির সৌন্দর্য
অবলোকন হেতু, সে আর আসতে পারে নি।

একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কি আল্লাহকে দেখতে চান?’ জবাব দিলেন, ‘না!’ আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কেন?’ উত্তর দিলেন, ‘আমার মতো ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে এই সৌন্দর্যকে পবিত্র রাখতে চাই!’ সুফিগণ এ কথাটিই ব্যক্ত করতে যেয়ে আবৃত্তি করতেন:

আমি নিজের নয়নযুগলের প্রতি ইর্ষান্বিত হই, যখন এরা তোমা পানে তাকায়
তাই আমি ওগুলোর দৃষ্টিকে নিচু করি: তোমার সৌন্দর্যের চতুর্পার্শ্বে সদর্পে
পদচারণা আমাকে তোমার জন্যই তোমার প্রতি দীর্ঘান্বিত করে!

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কখন আপনার আরাম লাগে?’ জবাব দিলেন, “যখন আল্লাহর কোন স্মরণকারী আমি দেখি না!”। বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন লোকের নিকট থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট ক্রয় করলেন। বেদুঈন লোক এসে উটটি ফেরৎ নিতে চাইলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজী হলেন। লোকটি বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। বলুন, আপনি কে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আমি কুরাইশ গোত্রের একজন লোক। উপস্থিত একজন সাহাবী বেদুঈনকে বললেন, তোমার অন্তর কতো কঠোর! তুমি তোমার নবীকে চিনতে পাচ্ছে না! এ ব্যাপারে হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের লোক- তা মূলত গাইরাত হিসাবে বলেছেন। কারণ, তাঁর জন্য উটিং ছিলো আসল পরিচয় তুলে ধরা- কিন্তু তিনি তা ধরেন নি। তাই আল্লাহ তা’আলা নিজেই একজন সাহাবীর মাধ্যমে তাঁর নবীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কিছু কিছু সুফি বলেছেন, তরীকাতের পথে প্রাথমিক লোকদের ক্ষেত্রে গাইরাত একটি বৈশিষ্ট্য। নতুবা তাওহীদের স্তরে উপনীত ব্যক্তি গাইরাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁর মধ্যে নিজের ইচ্ছাশক্তিই বিলুপ্ত। আল্লাহর রাজ্যে যা কিছুই ঘটুক, তা নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো ভাবনা নেই। কারণ একমাত্র আল্লাহর অধিকার সবকিছুর উপর এবং তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কোনটা কিরূপ হবে।

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মুরীদদের কাজ হলো গাইরাত। কিন্তু হাক্কিকাতের অধিকারীদের জন্য গাইরাতের কোন কাজ নেই।”

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “গাইরাত দু’প্রকার। একটি হলো অন্তরের উপর মানবিক গাইরাত। আর অপরটি হলো অন্তরের উপর ইলাহী গাইরাত। ইলাহী গাইরাতের মর্ম হলো অন্তর থেকে গাইরুল্লাহর ধ্যান-খেয়াল একেবারে বিলুপ্ত করা।

[লেখক বলেন] এখানে শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘দু’প্রকার গাইরাত’ কথার মর্ম হলো, প্রথমত বান্দার উপর আল্লাহর গাইরাত। এটার অর্থ আল্লাহ এ বান্দাকে অপর কোনো মাখলুকের সম্ভৃষ্টির উদ্দেশ্য বানাবেন না। আর দ্বিতীয়ত আল্লাহর জন্য বান্দার গাইরাত। এর অর্থ বান্দা তার হাল ও নফসের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য কোনো কিছু রাখবে না। তাই এরূপ বললে চলবে না, ‘আমি আল্লাহর উপর গাইরাত করছি’ বরং বলতে হবে, ‘আমি আল্লাহর জন্য গাইরাত করছি’। প্রথম কথাটি মূর্থতা ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা দীন থেকে বেরিয়ে পড়ারও আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় কথাটি দ্বারা আল্লাহর সম্মান ও মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। কাজ-কর্ম একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

জেনে রেখো, আওলিয়াদের সঙ্গে আল্লাহ তা’আলার একটি আদত হলো, তাঁরা যখন গাইরুল্লাহর মধ্যে শান্তি পান কিংবা এর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তখন তিনি তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি করেন উদ্বিগ্নতা। তিনি তাঁদের অন্তরের উপর গাইরাত করেন। নিজের জন্য তাঁদেরকে খালিস করেন। তাঁরা যে বস্তুর মধ্যে প্রশান্ত পান তা থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করে দেন। যেমন, হযরত আদম আলাইহিসসালামের ঘটনা। তিনি যখন জান্নাতে চিরদিন থাকার জন্য মনস্ত করলেন, তখনই আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।

অনুরূপ ঘটনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালামের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তিনি যখন পুত্র ইসমাঈল আলাইহিসসালামকে দেখে আনন্দবোধ করলেন, তখনই আল্লাহ তা’আলা তাকে কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো অন্তর থেকে যেনো এই তৃপ্তিবোধ দূর হয়ে যায়। পিতা-পুত্র আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করলেন। পুত্রকে জবাইয়ের জন্য ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম যখন একদম প্রস্তুত হলেন তখনই তাঁর অন্তর গাইরুল্লাহ থেকে পরিশুদ্ধ হলো। এ মুহূর্তে আল্লাহ তা’আলা বিকল্প হিসাবে পশু (দুমা) কুরবানীর নির্দেশ দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি একদিন লেবাননের পাহাড়ে ঘুরছিলাম। এসময় সাক্ষাৎ ঘটলো এক যুবকের সাথে। লু হাওয়া ও প্রচণ্ড রৌদ্রে তার মুখমণ্ডল জ্বলে গিয়েছিল। আমাকে দেখেই তিনি পলায়ন করলেন। আমি তার পিছু পিছু ছুটে চললাম। বললাম, একটি কথা হলেও এর দ্বারা আমাকে উপদেশ দিন। বললেন, খুব সতর্ক থেকো! আল্লাহ তা’আলা গাইরাতের অধিকারী। তিনি তাঁর বান্দার অন্তরে নিজের সত্তা ছাড়া আর কাউকে দেখতে চান না।”

হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা গাইরাত করেন। গাইরাত হলো তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছতে তিনি নিজে ছাড়া আর কোনো রাস্তা রাখেন নি।” বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর একজন নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “আমার কাছে অমুক ব্যক্তির একটি প্রয়োজন আছে। তার নিকট আমারও একটি প্রয়োজন আছে। সে যদি আমারটি পূর্ণ করে, তাহলে আমিও তারটি পূরা করবো।” ঐ নবী এটা শোনে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহ! এই প্রয়োজনটি কী ধরনের?” আল্লাহ তা’আলা বললেন, “ঐ ব্যক্তি আমি ছাড়া অন্য কারো দ্বারা নিজের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করছে। সে যদি অন্য সব বস্তু থেকে নিজের অন্তরকে মুক্ত করে, তাহলে আমি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবো।”

হযরত আবু আলী বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নের মধ্যে হুরদের একটি দল দেখে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। ফলে দীর্ঘদিন আল্লাহর সাথে নৈকট্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। এরপর তিনি আবার ঐ হুরদেরকে স্বপ্নে দেখলেন। কিন্তু তাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করলেন না। তিনি বলেন, ওরা তো ব্যস্ততা সৃষ্টি করে। হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার অসুখের কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, অন্তর দিয়ে আমি জান্নাত দেখছিলাম। এজন্য আমাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে আমি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো না। হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দীর্ঘদিন যাবৎ আমি একজন বন্ধু খুঁজছিলাম। একদিন পাহাড়ী পথে হেটে যাচ্ছি। সাক্ষাৎ ঘটলো একদল অন্ধ-অসুস্থ লোকদের সাথে। আমি তাদেরকে এই অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তারা জবাব দিলেন, ঐ ওখানে একব্যক্তি বাস করেন। বছরে একবার মাত্র

বের হন। তিনি যাদের জন্য দু'আ করেন, তারা আরোগ্য হয়ে যায়। একথা শুনে আমিও ওখানে থেকে গেলাম। ঐ বুজুর্গের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একদিন তিনি বেরিয়ে আসলেন, সবার জন্য দু'আ করলেন। সত্যিই সকলে সুস্থ হলেন। আমি তাঁর পেছনে চললাম, খুব কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আমার একটি আত্মিক ব্যাধি আছে। এর চিকিৎসা কী হতে পারে বলুন? জবাব দিলেন, হে সিররি! আমার নিকট থেকে চলে যাও! আল্লাহ তা'আলা তো গাইরাত করেন। তিনি ছাড়া অন্য কারোর নিকট তুমি সান্ত্বনা পাও- এটা তাঁর কাছে পছন্দনীয় নয়। এরূপ যদি করো, তুমি তাঁর দৃষ্টি থেকে দূরে সরে পড়বে।”

আমার উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোনো কোনো সুফির গাইরাত ছিলো এই, তাঁরা যখন দেখতেন লোকজন আল্লাহকে স্মরণ করতে উদাসীনতা দেখাচ্ছে, তখন কষ্ট পেতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করে যখন এক বেদুঈন প্রস্তাব করলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম খুব তাড়াতাড়ি তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে উদ্যোত হলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, লোকটির এরূপ কার্মে মসজিদের সম্মানহানি হচ্ছে। কারণ এ দৃশ্য তাঁদেরকে কষ্ট দিচ্ছিলো। অনুরূপ কোনো বান্দা যখন আল্লাহর জালালের পরিচয় লাভ করে, আর সে লক্ষ্য করে কেউ আল্লাহর জিকির করতে গাফলতি করছে, তখন তার কষ্ট বোধ হয়।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র মারা গেলেন। তাঁর নাম ছিলো আবুল হাসান। পুত্রশোকের মা পাগলিনীর মতে হয়ে গেলেন। নিজের চুল কেটে ফেললেন। ওদিকে শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও গোসলখানায় ঢুকে দাড়ি ছাটতে শুরু করলেন। কেউ যখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসলো- তাঁর অবস্থা দেখে প্রশ্ন করলো, আবু বকর! এ আপনি কী করছেন? তিনি জবাব দিলেন, নিজের পরিবারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখছি! পরে একদিন কেউ জিজ্ঞেস করলো, আবু বকর! আপনি সেদিন ঐ কাজটি সত্যিই কোন্ কারণে করেছিলেন? তিনি জবাব দেন, আমি বুঝতে পারছিলাম বন্ধু-বান্ধব এসে আমাকে সান্ত্বনা দান করবেন। বলবেন, আল্লাহ তোমাকে বিনিময় দান করুন। তাই দাড়ির প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করে তাদের পক্ষ থেকে এরূপ বাক্য উচ্চারণ ভুলিয়ে দিলাম।

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে আজান দিতে শুনলেন। বললেন, এটা তো অভিশাপ! মৃত্যুর বিষ! এরপর একটি কুকুরের ঘেউ

ঘেউ ডাক শুনে বললেন, লাক্বাইক ওয়া সা'দায়িক (হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত)। লেকজন বললো, এরকম বলা কি ধর্মত্যাগ নয়? মু'মিনের শাহাদাতের বাক্যকে তিনি বলছেন অভিশাপ ও মৃত্যুর বিষ। অপরদিকে কুকুরের ডাক শুনে লাক্বাইক উচ্চারণ করছেন? বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দিলেন, ঐ লোকটি তো গাফলতির মধ্যে থেকে আল্লাহকে স্মরণ করছে। আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ সম্পর্কে তো পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই ইরশাদ করেছেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

-“এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না- কিন্তু [তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা] তোমরা অনুধাবন করতে পার না।”

একবার হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজান দিলেন। শাহাদাত পাঠকালে বললেন, যদি আপনি নির্দেশ না দিতেন অপরের সাথে আপনার নাম উচ্চারণ করার, তাহলে আমি করতাম না। একবার এক সুফি শুনলেন কেউ বলছেন, ‘জাল্লাল্লাহ’। তিনি উপদেশ দিলেন, আমি চাই তুমি এ থেকে উদাসীন হয়ে যাও! একজন দরবেশ বলেন, আবুল হাসান খাজাফানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসে অন্তরের ভেতর থেকে। ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ আসে কর্ণের গহ্বর থেকে। যে ব্যক্তি এই বাক্যের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করবে, সে মনে করবে শরীয়তকে ছোট করে দিচ্ছে। কিন্তু [খাজাফানী বলেন] এই ধারণা ভুলের। কারণ আল্লাহর শান অনুযায়ী অন্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণটাই ভুল।

باب الولاية

বাবুল ওয়ালায়া [আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব]

قال الله تعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي، رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد، قال: حدثنا محمد بن هارون المقرئ قال: حدثنا حماد الخياط، عن عبد الواحد بن ميمون مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: من آذى ولياً فقد استحل محاربي، وما تقرب إلى العبد بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما ترددت في شيء أنا فاعلة كتردد في قبض روح عبدي المؤمن؛ لأنه يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.

الوالي: له معنيان: أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمره؛ قال الله تعالى: "وهو يتولى الصالحين" فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق، سبحانه، رعايته.

والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتوالى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي، من غير أن يتخللها عصيان. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً: يجب قيامه بحقوق الله تعالى

على الاستقصاء والاستيفاء، ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء.
ومن شرط الولي: أن يكون محفوظاً، كما أن من شرط النبي أن يكون
معصوماً، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق رحمه الله، قصد أبو يزيد البسطامي بعض
من وصف بالولاية، فلما وافى مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل،
وتنخم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه. وقال: هذا رجل غير
مأمون على أدب من آداب الشريعة، فكيف يكون أميناً على أسرار الحق؟!
واختلفوا في أن الولي: هل يجوز أن يعلم أنه وليّ، أم لا؟ فمنهم من قال:
لا يجوز ذلك؛ وقال: إن الولي يلاحظ نفسه بعين التصغير، وإن ظهر عليه
شيء من الكرامات خاف أن يكون مكرراً، وهو يستشعر الخوف دائماً
أبدًا؛ لخوف سقوطه عما هو فيه، وأن تكون عاقبته بخلاف حاله، وهؤلاء
يجعلون من شرط الولاية: وفاء المآل.

وقد ورد في هذا الباب حكايات كثيرة عن الشيوخ، وإليه ذهب من شيوخ
هذه الطائفة جماعة لا يحصون، ولو اشتغلنا بذكر ما قالوا لخرجنا عن حد
الاختصار، وإلى هذا كان يذب من شيوخنا الذين لقيناهم الإمام أبو بكر
بن فورك، رحمه الله.

ومنهم من قال: يجوز أني علم الولي أنه وليّ، وليس من شرط تحقيق
الولاية في الحال الوفاء في المآل.

ثم إن كان ذلك من شرطه أيضاً فيجوز أن يكون هذا الوليُّ خُصَّ بكرامة هي: تعريف الحق إياه أنه مأمون العاقبة؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب، وهو وإن قارفه خوف العقابة، فما هو عليه من الهيبة والتعظيم والإجلال في الحال أتم وأشدّ؛ فإن اليسير من التعظيم والهيبة أهدأ للقلوب من كثير من الخوف.

ولما قال صلى الله عليه وسلم: " عشرة في الجنة من أصحابي " ، فالعشرة - لا محالة - صدّقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا سلامة عاقبتهم، ثم لم يقدح ذلك في حالهم.

ولأن من شرط صحة المعرفة بالنبوة: الوقوف على حدّ المعجزة، ويدخل في جملته العلمُ بحقيقة الكرامات، فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا يمكنه أن لا يميز بينها وبين غيرها، فإذا رأى شيئاً من ذلك علم أنه في الحال على الحق. ثم يجوز أن يعرف أنه في المآل يبقى على هذه الحالة، ويكون هذا التعريف كرامة له. والقول بكرامات الأولياء صحيح.

وكثير من حكايات القوم يدل على ذلك كما نذكر طرفاً من ذلك في باب كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى.

وإلى هذا القول كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم، الأستاذ أبو علي الدقاق، رحمه الله.

وقيل: إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل: أتحبُّ أن تكون لله ولياً؟ فقال:

نعم، فقال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة؛ وفرغ نفسك لله تعالى، وأقبل بوجهك عليه ليُقبل عليك ويواليك.

وقال يحيى بن معاذ في صفة الأولياء: هم عباد تسربلوا بالأنس بالله تعالى بعد المكابدة، واعتنقوا الروح بعد المجاهدة، بوصولهم إلى مقام الولاية.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: أولياء الله تعالى عرائس الله.. ولا يرى العرائس إلا المحرومون. وهم محذرون عنده في حجاب الأنس، لا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة.

سمعت أبا بكر الصيدلاني - كان رجلاً صالحاً - قال: كنت أصلح اللوح في قبر أبي بكر الطمستاني أنقر فيه اسمه في مقبرة الحيرة كثيراً، وكان يقلع ذلك اللوح ويُسرق!! ولم يقع مثله في غيره من القبور، فكنت أتعجب منه، فسألت أبا علي الدقاق، رحمه الله، يوماً عن ذلك فقال: إن ذلك الشيخ أثر الخلفاء في الدنيا، وأنت تريد أن تشهر قبره باللوح الذي تصلحه فيه، وإن الحق سبحانه يأبى إلا إخفاء قبره، كما أثر هو ستر نفسه. وقال أبو عثمان المغربي: الوئيُّ قد يكون مشهوراً، ولكن لا يكون مفتوناً..

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت

النصر اباذي يقول: ليس للأولياء سؤال؛ إنما هو الذبول والخمول.
قال: وسمعتة يقول: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء.

وقال سهل بن عبد الله: الوليّ هو الذي تواتل افعال علي الموافقة.
وكان يحيى بن معاذ: الولي لا يرأى، ولا ينافق، وما أقل صديق من كان هذا خلقه!! وقال أبو علي الجوزجاني: الولي هو الفاني في حاله، الباقي في مشاهدة الحق سبحانه، تولى الله سياسته فتواتل عليه أنوار التولي، لم يكن له عن نفسه إخبار ولا مع غير الله قرار.
وقال أبو يزيد: حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماء، وقيام كل فريق منهم باسم؛ وهو: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، فمتى فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام، فمن كان حظه من اسمه تعالى الظاهر لاحظ عجائب قدرته ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من أنواره. ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من أنواره. ومن كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما سبق، ومن كان حظه من اسمه الآخر كان مرتبطاً بما يستقبله، وكل كوشف علي قدر طاقته إلا من تولاه الحق، سبحانه ببره، وقام عنه بنفسه.

وهذا الذي قاله أبو يزيد يشير إلي أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه الأقسام، فلا العواقب هم في ذكرها، ولا السوابق هم في فكرها، ولا الطوارق هم في أسرها.. وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوياً عن نعوت

الخلائق كما قال الله تعالى: "وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود".

وقال يحيى بن معاذ: الولي ربحان الله، تعالى، في الأرض، يشمه الصديقون فتصل رائحته إلى قلوبهم فيشتاقون به إلى مولاهم، ويزدادون عبادة على تفاوت أخلاقهم.

وسئل الواسطي: كيف يُغذى الولي في ولايته؟ فقال: في بدايته بعبادته وفي كهولته بستره بلطافته، ثم يجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته، ثم بذيقة طعم قيامه به في اوقاته. *Khanqa-e-Aminia-Asghar*
وقيل: علامة الولي ثلاثة: شغلة بالله، وفراره إلى الله، وهمه إلى الله. *Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

وقال الخراز: إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجالس الأنس به، ثم أجلسه على كرسي التوحيد، ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية. *ALL RIGHTS RESERVED*
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

وكشف له عن الجلال والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ صار العبد زمناً فانياً، فوقع في حفظه سبحانه، وبريء من دعاوى نفسه.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروزباري يقول: قاب أبو تراب النخشي: إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الواقعة في أولياء الله تعالى.

وقالوا: من صفة الولي أن لا يكون له خوف؛ لأن الخوف ترقب مكروه
يحل في المستقبل، أو انتظار محبوب يفوت في المستأنف، والولي ابن وقته،
ليس له مستقبل فيخاف شيئاً.

وكما لا خوف له لا جراء له؛ لأن الرجاء انتظار محبوب يحصل أو مكروه
يُكشف، وذلك في الثاني من الوقت.

وكذلك لا حزن له؛ لأن الحزن من حزونة القلب، ومن كان في ضياء الرضا
وَبَرَدَ الموافقة فأنى يكون له حزن؟! قال الله تعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا
خوف عليهم ولا هم يحزنون".

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-“মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে না তারা
চিন্তাশ্রিত হবে।” [ইউনুস : ৬২]

হযরত আইশা রাডিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কষ্ট দেয় তার
সাথে যুদ্ধ বৈধ হয়ে যায়। বান্দা ফরয ইবাদত আদায় করে যেটুকু আমার কাছে
আসতে পারে অন্য কোনো আ'মল দ্বারা তা পরে না। বান্দা নফল আদায়ের মাধ্যমে
আমার কাছে আসতেই থেকে। অবশেষে আমি তাকে মুহাব্বাত করি। মু'মিন
বান্দার রুহ কবজ করতে আমি খুবই ইতস্ততঃ করি। কারণ মৃত্যুকে সে অপছন্দ করে
আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি। কিন্তু মৃত্যু ছাড়া কোনো পথ নেই।”

ওলী শব্দের দু'টি অর্থ: ১. ফা'ইল এর ওজনে মাফ'উলুরে অর্থে [বাহ্যিক দিক থেকে
সক্রিয় কিন্তু অর্থের দিক থেকে অক্রিয়]। এর ব্যাখ্যা হলো, সে এমন ব্যক্তি যার
কর্মের দায়িত্বশীল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

-“তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের।” [আ’রাফ : ১৯৬] তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন না। বরং তিনি তাঁর যাবতীয় হিফাজতের দায়িত্ব বহন করেন। ফা’য়িল এর ওজনে হবে, কিন্তু ফা-’য়িল থেকে মুবালাখ্বা হবে [আমলের দিক থেকে সক্রিয় থেকে আরো অধিক সক্রিয়]। অর্থাৎ তিনি সর্বদা ইবাদতের মধ্যে লেগে থাকেন। তাঁর এই ধারাবাহিক ইবাদতের মধ্যে কোনো প্রকার না-ফরমানী হয় না।

কাউকে ওলী হতে হলে উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া দরকার। একদিকে প্রয়োজন আল্লাহ তা’আলার হুকু আদায় করা। অন্যদিকে সুখে-দুঃখে তার প্রতি আল্লাহর হিফাজতের দৃষ্টিও দরকার। ওলীর শর্ত হলো, তাঁকে মাহফুজ হতে হবে। যেমনটি নবীর জন্য মা’সুম হওয়া শর্ত। যে ব্যক্তি শরীয়তের কোনো বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলে সে প্রতারণা।

উস্তাদ আবু আলী দাঈয়াক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একবার আবু ইয়াজীদ বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওলি হিসাবে খ্যাত এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর মসজিদের নিকটে যেয়ে তিনি অপেক্ষায় রইলেন। লোকটি তখন মসজিদের ভেতর অবস্থান করছিলেন। বেরিয়ে আসার সময় মসজিদের ভেতরে থাকতেই তিনি নাক ঝাড়লেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওলিকে সালাম না জানিয়েই চলে আসলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, যে ব্যক্তি শরীয়তের ক্ষেত্রে আদবে অসতর্ক সে আল্লাহ তা’আলার মা’রিফাতের কতটুকু আমানতদার হতে পারে?”

একজন মানুষের জন্য এটা জানা সম্ভব কি, তিনি ওলি কি না? এ প্রশ্নের উপর সুফিদের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা যায়। একদল বলেন, জানা সম্ভব নয়। সত্যিকার ওলি তো সর্বদাই নিজেকে ছোট্ট মনে করবেন। কোনো কারামত প্রকাশ পেলে অন্তরে ভয় বিরাজ করবে, এটি কোনো প্রতারণা নয় তো? তিনি যে আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে আছেন, তা যে কখন বিলুপ্ত হয়ে যায়- সে আশঙ্কায় তিনি সর্বদা উদগ্রীব। তাঁর জীবনের পরিণতি যদি বর্তমান হালের বিপরীত হয়ে যায়, সে ভয়ও তাঁর মধ্যে থাকে। এ ব্যাপারে মাশাইখদের থেকে অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সুফিদের বড়ো একটি দল এ মত পোষণ করেন। তাদের অভিমত পুরোপুরি বর্ণনা করলে

সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর সীমানা ছাড়তে হবে। এ মতাবলম্বী বর্তমান যুগের যেসব মাশাইখের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আবু বকর ইবনে ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আরেকদল সুফি উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, ওলি ব্যক্তি ওলি হয়েছেন কি না তা জানা সম্ভব। এসময় একটি বিশেষ কারামতের অধিকারী তিনি হতে পারেন। তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেবেন, তাঁর জীবনের শেষ হবে ঈমানের উপর।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “আমার দশজন সাহাবী জান্নাতী”। অবশ্যই তাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যবাদী বলেছেন। তাঁরা নিজেদের নিরাপদ পরিণতি সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তাঁদের বর্তমান জীবনেও শরীয়তের খেলাপ কোনো কিছু ঘটে নি। এ ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কিরাম থেকেও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। অচীরেই আমরা ‘কারামাতুল আউলিয়া’ অধ্যায়ে এসব বিষয়ের উপর আলোচনা করবো।

আমাদের যুগের অনেক মাশাইখ উপরোক্ত দ্বিতীয় মতটি পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু আলী দাক্বাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, “ওহে! তুমি কি আল্লাহর ওলি হতে ইচ্ছুক?” লোকটি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই!” তিনি উপদেশ দিলেন, “তাহলে ইহ-পরকালে কোনো বস্তুর প্রতি আগ্রহী হবে না। আল্লাহর জন্য নিজেকে মুক্ত করো। আল্লাহর দিকে নিজের মুখ ফিরিয়ে রাখো। তখন তিনিও তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবেন, তোমাকে তাঁর বন্ধু বানাবেন।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আউলিয়াদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, “তাঁরা এমন লোক, যারা মুজাহাদা করে আল্লাহর সাথে একাকীত্ব লাভ করেছেন। ওলায়াতের স্তরে পৌঁছিয়ে পবিত্রাত্মকে তাঁরা আলিঙ্গন করেছেন।” হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আউলিয়ারা হলেন, নববধুর মতো। নিজের পরিবারবর্গ ছাড়া অন্যরা তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। আল্লাহর একাকীত্বের পর্দায় তাঁরা আবৃত। দুনিয়া-আখিরাতে কেউই তাঁদের দেখতে পায় না।” হযরত আবু বকর সাইদালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন নেক মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি আবু বকর তিমিস্তানী রাহমাতুল্লাহি

আলাইহির কবরের শিলালিপিটি ঠিকঠাক করে রাখতাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এটা যখনই লাগাতাম কে বা কারা এটা চুরি করে নিয়ে যেতো। অন্য কারোর কবরে এরূপ হতে আমি দেখি নি। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুললো। হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, এই বুজুর্গ তো পৃথিবীতে তাঁর অনেক শাগরিদ রেখে গেছেন। তুমি চাচ্ছো কবরে শিলালিপি দিয়ে তাঁকে আরো খ্যাতিমান করে তুলতে। অপরদিকে আল্লাহ চান তাঁকে আরো লুকিয়ে রাখতে। কারণ, তিনি দুনিয়াতে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন।”

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ওলিআল্লাহরা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা প্রতারণিত হন না।”

আমি [লেখক বলেন] হযরত আবু আবদুর রাহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “আউলিয়াদের কোনো দাবী-দাওয়া থাকে না। তারা দুর্বল ও অজানা অবস্থায় থাকেন।” হযরত সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আউলিয়াদের সর্বোচ্চ স্তর থেকেই নবীদের স্তরের শুরু।” হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর বন্ধুদের কাজের সঙ্গে সর্বদাই আল্লাহর ইচ্ছার মিল ঘটে।” হযরত ইয়াহইয়া বিন মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ওলিরা কপটতা করেন না। লৌকিতাও করেন না। কী অল্পজনের মধ্যে এরূপ গুণাবলী বিদ্যমান!” হযরত আবু আলী জুযজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ওলি নিজের হালের মধ্যে বিলুপ্ত থাকেন। তিনি আল্লাহর মুশাহাদার মধ্যে ডুবজ্ঞ। আল্লাহ তা’আলাই তাঁদের সকল দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে নেন। ওয়ালায়াতের নূর তাঁদের মধ্যে চমকাতে থাকে। তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে গাফিল। আর গায়রুল্লাহর মধ্যে তাঁরা কোনো শান্তি পান না।”

হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলার বিপরীতধর্মী চারটি নামের সঙ্গে ওলিদের সম্পর্ক থাকে। ওলিদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই সকলে এসব নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। তাহলো, আল্লাহ তা’আলা হলেন আউয়াল, আখির, যাহির, বাতিন। যে ব্যক্তি এ চারটি নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিল সে-ই কামিল। যে ওলি আল্লাহ তা’আলার যাহির নামের সাথে সম্পর্ক করলেন, তিনি আল্লাহ তা’আলার কুদরতের অত্যাশ্চর্য অবস্থাবলী

দেখতে পাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাতিন নামের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি গোপন জগতে আল্লাহ তা'আলার চলমান নূর দেখতে সক্ষম হবেন। যার সম্পর্ক হবে আল্লাহর আউয়াল নামের সঙ্গে তিনি অতীতের ঘটে যাওয়া বিষয়-আশয় সম্পর্কে অবগত হবেন। আর যার সম্পর্ক হবে আল্লাহর আখির নামের সঙ্গে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।”

হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্ত কথাটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা এই চার স্তর পাড়ি দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের চিন্তা ও আলোচনায় কোনো বাঁধা নেই। মাখলুকের অবয়ব বর্ণনায়ও একদম উদাসীন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

—“তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত” [কাহাফ: ১৮]

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ওলি পৃথিবী জগতে আল্লাহর সুগন্ধি। সত্যবাদী লোকজন এই সুস্রাণ পান। অন্তরে তা অনুভব করেন। আর এ সুগন্ধি পেয়ে আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য তাঁরা উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আখলাক অনুসারে ইবাদতের মাত্রা বাড়াতে থাকেন।” হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওয়ালায়াত লাভের পর একজন ওলি কিভাবে খাবার গ্রহণ করেন? তিনি জবাব দেন, “প্রাথমিক সময়ে ইবাদতের মাধ্যমে তাঁদের খাবার হয়। প্রৌঢ় বয়সে নম্রতার আচ্ছাদন দ্বারা খাবার গ্রহণ করেন। এরপর তো আখলাক ও সিফাতের দিকে তাঁকে টেনে নেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে তিনি যে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হন, তাঁর জন্য এই দাঁড়ানো অবস্থাই খাদ্য।”

একজন ওলি বলেন, “ওলির পরিচয় তিনটি: ১. তাঁর ব্যস্ততা হবে আল্লাহকে নিয়ে [শুগল্]। ২. আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে পালাতে থাকবে [ফিরার]। ৩. আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য সে দৃঢ় সংকল্প করবে [হাম্ম]।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ওলি বানাতে চান, তার সামনে তিনি জিকিরের দরোজা খুলে দেন। যখন তিনি জিকিরের মধ্যে স্বাদ অনুভব করেন, তখন তার জন্য সান্নিধ্য লাভের দরোজাও খুলে দেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাতের মজলিসে উন্নীত করেন। তাওহিদের চেয়ারে বসিয়ে সকল

আবরণ উন্মোচন করেন এবং এককতের গৃহে তাকে প্রবেশ করান। আল্লাহ তা'আলার জালাল ও আজমত তার সামনে খুলে যায়। এসময় তিনি নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মভুলা হয়ে পড়েন। ঠিক এ মুহূর্তে তিনি আল্লাহ তা'আলার হিফাজতের আওতায় এসে যান ও নফসের সর্বপ্রকার দাবী-দাওয়া থেকে মুক্ত হন।”

ওলিগণ বলেন, ওলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর মধ্যে ভয়-ভীতি থাকবে না। ভয় তো তখনই হয় যখন ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। কিংবা প্রিয়জনকে হারানোর আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে ওলি হলেন সময়ের সঙ্গী। তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যাকে তিনি ভয় করবেন। এভাবে তার না আছে কোনো প্রত্যাশা। কারণ প্রত্যাশা হয় প্রিয়জনের অপেক্ষা হেতু। অনুরূপ তার না থাকে কোনো পেরেশানী। কারণ পেরেশানী হলো হৃদয়ের বোঝা। তাই যে রিদ্দা-বিল-কাযার আলোতে চলে তার তো পেরেশানী থাকার কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-“মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে না তারা চিন্তাশ্রিত হবে।” [ইউনুস : ৬২]

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الدعاء

বাবুদ-দু'আ [প্রার্থনা অধ্যায়]

قال الله تعالى: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية".

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أبو الحسين الصفار البصري قال: حدثنا محمد بن أحمد العودي قال: حدثنا كامل، قال: حدثنا بن لهيعة قال حدثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاء مخ العبادة".

والدعاء: مفتاح الحاجة، وهو مستروح أصحاب الفاقات، وملجأ المضطرين، ومتنفس ذوي المأرب، وقد ذم الله سبحانه وتعالى. قوماً تركوا الدعاء فقال: "ويقبضون أيديهم" قيل: لا يمدونها إلينا في السوائل. وقال سهل بن عبد الله: خلق الله تعالى الخلق وقال ناجوني، فإن لم تفعلوا فانظروا إليّ، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم بي.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: قال سهل بن عبد الله: أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال. ودعاءً لحال: أن يكون صاحبه مضطراً لا بد له مما يدعو لأجله.

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي، رحمه الله، قال سمعت أبا عبد الله المكناسي يقول: كنت عند الجنيد؛ فأتت امرأة إليه وقالت: ادع الله أني رد عليّ ابني: فإن ابناً لي ضاع فقال لها: اذهبي واصبري، فمضت، ثم عادة فقالت له مثل ذلك، فقال لها الجنيد: اذهبي واصبري، فمضت ثم عادت، ففعلت مثل ذلك مرات والجنيد يقول لها: اصبري، فقالت له: عيل صبري، ولمي بق لي طاقة عليه، فادع لي. فقال لها الجنيد: إن كان الأمر كما قلت فاذهبي، فقد رجع ابنك، فمضت، فوجدته، ثم عادت تشكر له فقيل للجني: بم عرفت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء".

وقد اختلف الناس في أن: الأفضل الدعاء، أم السكوت والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء في نفسه عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: "الدعاء مع العبادة" والإتيان بما هو عبادة أولى من تركه، ثم هو حق الله تعالى فإن لم يستجب للعبد، ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه؛ لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية: وقد قال أبو حازم الأعرج: لئن أحرم الدعاة أشد علي من أن أحرم الإجابة. وطائفة قالوا: السكوت والخمول تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق من اختيار الحق أولى، ولهذا قال الواسطي: اختيار ما جرى لك في الأزل خير لك من معارضة الوقت، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيراً عن الله تعالى.

" من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين " وقال قوم: يجب أن يكون العبد صاحب داء بلسانه وصاحب رضا بقلبه: ليأتي بالأمرين جميعاً.

والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة، ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت، وهو الأدب، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء، وهو الأدب، وإنما يعرف ذلك في الوقت، لأن علم الوقت إنما يحصل في الوقت فإذا وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له أولى. وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت له أولى.

ويصح أن يقال: ينبغي للعبد أن لا يكون ساهياً عن شهود ربه تعالى في حال دعائه. ثم يجب عليه أن يراعي حاله، فإن وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له أولى.. وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء شبه زجر ومثل قبض، فالأولى له ترك الدعاء في هذا الوقت، وإن لم يجد في قلبه زيادة بسط ول حصول زجر فالدعاء وتركه هاهنا سيان، فإن كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم، فالدعاء أولى؛ لكونه عبادة، وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة والحال والسكوت، فالسكوت أولى، ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه تصيب، أو للحق سبحانه فيه حق، فالدعاء أولى وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. وفي الخبر المروي " أن العبد يعو الله سبحانه وهو يحبه، فيقول: يا جبريل أخر حاجة عبي، فإني أحب أن

أسمع صوته، وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه فيقول: يا جبريل، إقض لعبدي حاجته، فإني أكره أن أسمع صوته " .

ويحكى عن يحيى بن سعيد القطان، رحمه الله تعالى، أنه رأى الحق، سبحانه في المنام، فقال: آلهي: كم أدعوك فلا تجيبني!! فقال يا يحيى؛ لي أحب أن أسمع صوتك.

وقال صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده، إنَّ العبد ليدعو الله تعالى وهو عليه غضبان، فيعرض عنه، ثم يدعوه، فيعرض عنه، ثم يدعوه، فيعرض عنه ثم يدعوه، فيقول الله تعالى لملائكته: أأي عبدي أن يدعو غيри فقد استجبت له " .

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بأبن السماك قال: أخبرنا محمد بن عبد ربه الحضرمي قال: أخبرنا بشر بن عبد الملك قال: حدثنا موسى بن الحجاج قال: قال مالك بن دينار: حدثنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّجر من بلاد الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى بلاد الشام، ولا يصحب القوافل توكلًا منه على الله، عز وجل، قال: بينما هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لصٌ على فرس.. فصاح بالتاجر: قف. قف!! فوقف له التاجر، وقال له: شأئك بمالي وخلّ سبيل. فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك.

فقال له التاجر: ما تريد بنفسى؟! شأنك والمال وخلّ سبيلي. قال: فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى، قال له التاجر: أنظرنى حتى أتوضأ وأصلي وأدعو ربي عزّ وجلّ.

قال أفعل ما بدالك. قال فقام التاجر، وتوضأ، وصلى أربع ركعات، ثم رفع يديه إلى السماء، فكان من دعائه أ، قال: يا ودود.. يا ودود.. يا ذا العرش المجيد، يا مبدىء يا معيد، يا فعّال لما يدرى أسألك بنور وجهك الذي ملاً أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا معيذ أعثني ثلاث مرات. فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب.. عليه ثياب خضر، بيده حربة من نور، فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس. فلما دنا منه شد الفارس على اللص، قطعنه طعنة أدراه عن فرسه.. ثم جاء إلى التاجر فقال له: قم فاقتله، فقال له التاجر: من أنت؟ فما قتلت أحداً قد ولا تطيب نفس بقتله!! قال، فرجع الفارس إلى اللص وقتله، ثم جاء إلى التاجر، وقال: أعلم أنيملك من السماء الثالثة، حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقة، فقلنا أمرٌ حدث!! ثم دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر النار، ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت ربي أن يوليني قتله، واعلم - يا عبد الله - أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة،

وكل شدة، وكل نازلة فرج الله تعالى عنه، وأعانه. قال وجاء التاجر سالماً غانماً حتى دخل المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة وأخبره بالدعاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد لقنك الله عزَّ وجلَّ، اسماؤه الحسنی التي إذا دُعِيَ بها أجاب، وإذا سئل بها أعطى . "

ومن أداب الدعاء: حضور القلب، وأن لا يكون ساهياً؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله تعالى، لا يستجيب دعاء عبد من قلب لاهٍ . "

ومن شرائطه: أن يكون مطعمه حلالاً؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: " اطب كسبك تُستجب دعوتك " .

وقد قيل: الدعاء: مفتاح الحاجة، وأسنانها: لقم الحلال. وكان يحيى بن معاذ يقول: إلهي، كيف أدعوك وأنا عاص؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟! وقيل: مر موسى، عليه السلام، برجل يدعو ويتضرع، فقال موسى عليه السلام: إلهي، لو كانت حاجته بيدي قضيتها؛ فأوحى الله، تعالى إليه: أنا أرحم به منك، ولكنه يدعوني، وله غنم وقلبه عند غنمه، وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري. فذكر موسى عليه السلام للرجل ذلك، فانقطع إلى الله تعالى بقلبه فقضيت حاجته.

وقيل لجعفر الصادق: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأنكم

تدعون من لا تعرفونه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيث الأطباء، فقالوا له: في ولايتك رجل صالح يسمى سهل بن عبد الله لو دعا لك لعل الله سبحانه يستجيب له؛ فاستحضر سهلاً وقال: ادع الله عز وجل لي. فقال سهل: كيف يستجاب دعائي فيك، وفي محبسك مظلومون؟ فأطلق كل من كان في حبسه، فقال سهل: اللهم كما رأيته ذل المعصية فأره عز الطاعة وفرج عنه. فعوفي، فعرض مالاً على سهل فأبى أن يقبله، فقليل له: لو قبلته ودفعته إلى الفقراء.

فنظر إلى الحصباء في الصحراء فإذا هي جواهر، فقال لأصحابه: من يُعطى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث؟! وقيل: كان صالح المري يقول كثيراً: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له. فقالت له رابعة: إلى متى تقول هذا؟ متى أغلق هذا الباب حتى يستفتح؟ فقال صالح: شيخ جهل وامرأة علمت.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الحارثي يقول: سمعت السري يقول: حضرت مجلس معروف الكرخي. فقال إليه رجل فقال: يا أبا محفوظ، ادع الله تعالى أن يرد عليّ كيسي؛ فإنه سرق وفيه ألف دينار. فسكت، فأعاد، فقال معروف: ماذا أقول؟ أقول ما زويته عن أنبيائك وأصفياك. فرده عليه.

فقال الرجل: فادع الله تعالى لي. فقال: اللهم خذ له.

وحكى عن الليث أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريراً، ثم رأيت بصيراً، فقلت له: بم رد عليك بصرك؟ فقال: أتيت في منامي، فقيل قل: يا قريب، يا محبيب، يا سميع الدعاء، يا لطيفاً لما يشاء، رد علي بصري. فقلتها، فرد الله عز وجل علي بصري.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: كان بي وجع العين ابتداء ما رجعت إلى نيسابور من مرو، وكنت مدة أيام لم أجد النوم، فتناعست صباحاً، فسمعت قائلاً يقول لي: أليس الله بكاف عبده؟ فانتبهت، وقد فارقتي الرمد، وزال في الوقت الوجع، ولم يصبني بعد ذلك وجع العين.

وحكى عن محمد بن خزيمة، أنه قال: لما مات أحمد بن حنبل كنت في الإسكندرية، فاغتمت.. فرأيت في المنام أحمد بن حنبل وهو يتبخر، فقلت: يا أبا عبد الله، أي مشية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام. فقلت: ما فعل الله عز وجل بك؟ فقال: غفر لي، وتوجني، وألبسني نعلين من ذهب، وقال: يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. ثم قال: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفیان الثوري وكنت تدعو بها في دار الدنيا. فقلت: يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء، ولا تسألني عن شيء. فقال: يا أحمد هذه الجنة، فادخلها، فدخلتها.

وقيل: تعلق شاب بأستار الكعبة، وقال: إلهي، لا شريك له فيؤتي، ولا وزير

لك فيرشي، ن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيتك فبجهلي ولك
الحجة عليّ، فبإثبات حجتك عليّ وانقطاع حجتي لديك إلا غفرت لي.
فسمع هاتفاً يقول: الفتى عتيق من النار.

وقيل: فائدة الدعاء: إظهار الفاقة بين يديه تعالى، إلا فالرب يفعل ما يشاء.
وقيل: دعاء العامة بالأقوال، ودعاء الزهاد بالأفعال، ودعاء العارفين
بالأحوال.

وقيل: خير الدعاء: ما هيئته الأحران.
وقال بعضهم: إذا سألت الله تعالى حاجة فتسهلت، فاسأل الله عقب ذلك
الجنة؛ فلعل ذلك يوم إجابتك.

وقيل ألسنة المبتدئين منطلقة بالدعاء، وألسنة المتحققين خرست عن
ذلك.

وسئل الواسطي أن يدعو، فقال: أخشى أني إن دعوت أن يُقال لي: إن
سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت
الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به في
الدهور.

وروي عن عبد الله بن منازل أنه قال: ما دعوت منذ خمسين سنة، ولا
أريد أن يدعولي أحد.

وقيل: الدعاء سلم المذنبين.

وقيل: الدعاء: المراسلة، وما دامت المراسلة باقية فالأمر جميل بعد.

وقيل لسان المذنبين دعاؤهم.

وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: إذا بكى المذنب فقد راسل الله عزَّ وجلَّ.

وفي معناه أنشدوا:

دموع الفتى عما يجنُّ تترجم... وأنفاسه يبدين ما القلب يكتم

وقال بعضهم: الدعاء ترك الذنوب.

Khanqa-e-Aminia, Sylhet
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

وقيل: الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب.

وقيل: الإذن في الدعاء خير للعبد من العطاء.

وقال الكتاني لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلا لفتح باب المغفرة.

وقيل: الدعاء يوجب الحضور، والعطاء يوجب الصرف، والمقام علي الباب أتمُّ من الانصراف بالمثاب.

وقيل: الدعاء مواجهة الحق، تعالى، بلسان الحياء.

وقيل: شرط الدعاء الوقوف مع القضا بوصف الرضا.

وقيل: كيف تنتظر إجابة الدعوة وقد سَدَدْتَ طريقها بالهفوة؟! وقيل لبعضهم: ادع لي. فقال: كفاك من الأجنبية أن تجعل بينك وبينه واسطة.

سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن

عبد الملك يقول: سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى تقي بن مخلد، فقالت: إن ابني قد أسره الروم، ولا أقدر على مال أكثر من دويرة، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فإنه ليس لي ليل ولا نهار، ولا نوم ولا قرار!! فقال لها: نعم، أنصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله تعالى.

قال: فأطرق الشيخ وحرك شفثيه، قال: فلبثنا مدة، فجاءت المرأة ومعها ابنها، وأخذت تدعوه وتقول: قد رجع سالمًا، وله حديث يحدثك به. فقال الشاب: كنت في يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم. فكان يخرجنا إلى الصحراء للخدمة، ثم يردنا علينا قيودنا. فبينما نحن نجيء من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظنا انفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض، وصف اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت فيه المرأة، ودعا الشيخ، قال: فنهض إلى الذي كان يحفظني وصاح عليّ وقال لي: كسرت القيد!! قلت: لا، إنه سقط من رجلي قال: فتحير.. وأحضر أصحابه، وأحضروا الحداد، وقيدوني.. فملا مشيت خطوات سقط القيد من رجلي، فتحيروا في أمري!! فدعوا رهبانهم، فقالوا لي: ألك والدة؟ قلت: نعم فقالوا: وافق دعاؤها الإجابة. وقد أطلقك الله عز وجل، فلا يمكننا تقييدك.

فزودوني، وأصبحوني بمن أوصلني إلى ناحية المسلمين.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

-“তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।”
[আ'রাফ : ৫৫]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঈআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “দু'আ ইবাতদের মগজ”। দু'আ হলো প্রয়োজনের চাবি। অভাবীদের আরামদাতা। বিপদগ্রস্তদের আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তা'আলা ওসব লোকদের নিন্দা করেছেন যারা দু'আ বর্জন করেছিল। ইরশাদ হয়েছে:

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

-“[মুনাফিকরা] নিজেদের মুঠো বন্ধ রাখে।” [তাওবাহ : ৬৭] -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা ভিক্ষা চাওয়ার সময় আমার দিকে হাত বাড়ায় নি। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করে বললেন, আমার সাথে কথা বলো! যদি তা না করো তাহলে আমার দিকে তাকাও! তাকাতেও না পারলে আমার কথা শ্রবণ করো! তা-ও না করতে পারলে আমার দরোজায় থাকো! এটাও না পারলে তোমাদের সব হাজত আমার নিকট পেশ করো!”

উস্তাদ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আরেকটি কথা শুনেছি, “হালের দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার খুবই কাছাকাছি।” হালের দু'আ মানে, মানুষ খুবই বিপদগ্রস্ত হবে যখন তাকে দু'আ করা ছাড়া উপায় নেই। হযরত আবু আবদুল্লাহ মুকানিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে ছিলাম। একজন মহিলা তাঁর নিকট এসে বললেন, আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহ যেনো আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। তিনি বললেন, যাও! সবার করো। মহিলা চলে গেলেন। কিন্তু পুনরায় এসে আবার একই আবেদন করলেন। তিনিও আবার বললেন, যাও! সবার করো। এরূপ কয়েকবার হলো। শেষে মহিলা বললেন, ধৈর্য ধারণ সম্ভব নয়। আমার আর ক্ষমতা নেই। আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি এবার জবাব দিলেন, যদি এরকমই হয় তাহলে চলে যাও। অচিরেই

তোমার ছেলে ফিরে আসবে। ঠিকই, মহিলা ঘরে গিয়ে দেখলেন তার ছেলেটি ফিরে এসেছে। এরপর মহিলা ফিরে এসে হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। এসময় হযরতকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিভাবে বুঝলেন মহিলার ছেলেটি ঘরে ফিরে এসেছে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

-“বল তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন?” [নামল : ৬২]”

দু'আ, সুকুন (নীরবতা) ও রিদ্দা (সম্ভৃষ্টি)- এ তিনটির মধ্যে কোন্টি উত্তম এ ব্যাপারে আউলিয়ায়ে কিরামের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। একদল বলেন, দু'আ স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘الدعاء مَخُ

العبادة’- “দু'আ ইবাদতের মগজ”। আর এটাই নিয়ম, ইবাদত বর্জনের চেয়ে ইবাদত পালনই উত্তম। এখন, যদি আল্লাহ তা'আলা বান্দার দু'আ কবুল না-ই করেন তাহলে একথা তো অন্তত বলা যায়, সে আল্লাহর দ্বারা দাঁড়িয়েছে, ইবাদতের চূড়ান্ত স্তর দু'আর মাধ্যমে সে প্রকাশ করেছে। হযরত আবু হাযিম আ'রাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর দরবারে আমার দু'আ কবুল না হওয়ার চেয়ে আরো জঘন্য জিনিস হলো তাঁর নিকট দু'আ প্রার্থনা না করা।”

অপর একদল বলেন, আল্লাহর নির্দেশের সামনে নীরবতা পালনই হলো পরিপূর্ণতা। তবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্ভৃষ্টি থাকাই উত্তম। এজন্য হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ভাগ্যের জগতে তোমার জন্য যা-ই নির্ধারিত হয়েছে তা বর্তমানে প্রকাশ পেলে এ ব্যাপারে কিছু না বলে গ্রহণ করাই উত্তম।” এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তি আমার জিকিরের মধ্যে ব্যস্ত থেকে আমার নিকট সওয়াল করতে পারে না। আমি তাকে সওয়ালকারী থেকেও উত্তম প্রতিদান দেবো।”

একদল ওলি বলেন, বান্দার জন্য উচিত হবে জবানে আবদার করেও অন্তরে সম্ভৃষ্টি থাকা। ফলে সে উভয় অবস্থার উপর বহাল থাকলো। আসল কথা হলো, এটা সময়

নির্ভর। কোনো সময় নীরব না থেকে দু'আ করা উত্তম। আবার কোনো সময় দু'আর চেয়ে নীরব থাকাই ভালো। কোন্ সময় কি করা লাগবে তা উপস্থিত কালে বুঝা যাবে। সময়ের জ্ঞান অর্জিত হয় সময় আসলে। অন্তরে যখন দু'আর প্রতি ইশারা মিলবে তখনই দু'আ করা এবং অন্তরে যখন নীরবতার প্রতি ইঙ্গিত আসবে তখন নীরব থাকাই উত্তম।

মূল কথা হলো, দু'আ করার সময় বান্দা যেনো তার রবের উপস্থিতির ধারণা থেকে গাফিল না হয়। এরপরও জরুরী হলো, সে তার নিজের হালের দিকে দৃষ্টি রাখবে। দু'আ করার সময় তার মধ্যে যদি প্রশস্ততার ভাব আসে, তবে দু'আ চালিয়ে যাওয়া উত্তম। পক্ষান্তরে এ সময় যদি তার অন্তরে কোনো প্রকার সংক্ষীর্ণতা এসে যায় তখন দু'আ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এখন, যদি সংক্ষীর্ণতা ও প্রশস্ততার মধ্যবর্তী অবস্থার উদ্ভব ঘটে তখন দু'আ করা না করা উভয়টিই সমান। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, দু'আর বেলা যদি ইলমের প্রাবল্য থাকে তখন দু'আ করা উত্তম। কারণ এসময় এটি ইবাদত। পক্ষান্তরে যদি মা'রিফাত ও হালের প্রাবল্য বিরাজ করে তখন নীরব থাকাই উত্তম। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, যে দু'আয় মুসলমানদের কিংবা আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিহিত থাকে, তাহলে দু'আ করা ভালো। আর যদি নিজের ব্যক্তিগত বিষয় জড়িত থাকে তখন নীরবতা পালনই শ্রেয়। একটি হাদীসে আছে, একজন বান্দা আল্লাহকে ডাকে। আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন। তখন আল্লাহ বলেন, হে জিব্রীল! আমার বান্দার প্রয়োজন বিলম্বে পূর্ণ করো। আমার কাছে তার আওয়াজ অত্যন্ত পছন্দনীয়। অন্যদিকে আরেক বান্দা আল্লাহকে ডাকে। আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ বলেন, হে জিব্রীল! আমার বান্দার প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও। আমি তার ধ্বনি পছন্দ করছি না।

বর্ণিত আছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কানুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি আরজ করলেন, হে মা'বুদ! আপনাকে কতো ডাকছি, কিন্তু সাড়া দিচ্ছেন না। আল্লাহ জবাব দিলেন, ইয়াহইয়া! আমি তো তোমার ডাক শোনতে পছন্দ করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহর কসম করে বলছি। একজন বান্দা আল্লাহকে ডাকছে, তিনি তাকে অপছন্দ করেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবার ডাকে। তিনি আবারো মুখ ফিরিয়ে নেন। সে বার বার ডাকতে

থাকে- আর বার বার প্রভু মুখ ফিরিয়ে নেন। অবশেষে আল্লাহ ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার বান্দা আমি ছাড়া আরো কারো দরবারে ডাকা অস্বীকার করছে। এখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম।”

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃরাঃ আল্লাহু আনহু বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একব্যক্তি শাম থেকে মদীনায বাণিজ্য করতেন। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন, তাই অন্যান্য ব্যবসায়ী কাফিলার সঙ্গী হতেন না। তিনি একবার শাম থেকে মদীনার পথ ধরে চলছেন। হঠাৎ অশ্বারোহী এক ডাকাত তার সামনে এসে হাজির হয়ে চিৎকার দিল, ওহে বণিক! থামো! তিনি থেমে বললেন, মাল-সামান সবকিছু নিয়ে যাও। আমার পথ ছাড়ো। সে বললো, মাল তো আমার আছেই। আমি চাচ্ছি তোমার জান! ব্যবসায়ী বললেন, জান দিয়ে করবে কি? মাল নিয়ে যাও এবং রাস্তা ছাড়ো। এভাবে কয়েকবার কথা হলো। প্রত্যেকবারই ডাকাত বণিকের আবদার প্রত্যাখ্যান করে। শেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমাকে একটু সময় দাও। অযু সেরে নামায পড়বো ও আল্লাহকে ডাকবো। সে বললো, ঠিক আছে- যা চাও করে নাও। তিনি অযু সেরে চার রাকআত নামায আদায় শেষে দু’হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালেন, “হে দয়াময়! হে মহান আরশের মালিক! হে সৃষ্টিকর্তা! হে পুনর্বীর জীবনদাতা! তুমি তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। তোমার সেই নূরের ওয়াসিলা নিয়ে বলছি যা তোমার আরশের পায়াল্লোকে আলোকিত করে রেখেছে। যে কুদরাত দিয়ে তুমি তোমার সৃষ্ট জগতের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করো। আমি তোমার সে কুদরাতের ওয়াসিলা নিয়ে বলছি। তোমার যে রাহমাত সবকিছুকে বেঁধে রাখে আছে, সেটার ওয়াসিলা নিয়ে বলছি, তুমি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। হে ফরিয়াদশোতা! তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।” এভাবে তিনি তিনবার দু’আ করলেন।

দু’আ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি দেখলেন, সাদা-কালো রঙের ঘোড়ায় এক আরোহী তাঁর সামনে উপস্থিত। তাঁর পরনে সবুজ কাপড়। হাতে নূরের তীর। ডাকাত এই অশ্বারোহীকে দেখে ব্যবসায়ীকে ছেড়ে তার দিকে ছুটে আসলো। আরোহী এক আঘাতে তাকে ঘোড়া থেকে ধরাশায়ী করলেন। এরপর ব্যবসায়ীকে বললেন, যাও! একে মেরে ফেলো! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আমি তো কখনো কাউকে হত্যা করি নি। এটা আমার নিকট খুব অপছন্দীয়। এরপর অশ্বারোহী নিজেই

ডাকাতকে হত্যা করলেন। তারপর বললেন, শুনুন! আমি হলাম তৃতীয় আকাশের ফিরিশতা। প্রথমবার আপনার দু'আ শেষে আকাশের দরজায় করাঘাত শুনলাম। বুঝতে পারলাম, একটা কিছু ঘটছে। দ্বিতীয়বার দু'আ শেষে আকাশের দরোজা খুলে গেল। দৃশ্যে ভেসে আসলো অগ্নি স্কুলিঙ্গের মতো কিছু একটা। তৃতীয়বার দু'আ শেষে জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালাম এসে ঘোষণা দিলেন, কে আছে এই মজলুমকে সাহায্য করার! আমি তখন আল্লাহর নিকট আরজ করলাম, এই লোকটিকে হত্যার দায়িত্ব যেনো তিনি আমাকে প্রদান করেন। শুনুন, হে আল্লাহর বান্দা! কোনো বিপদগ্রস্ত মানুষ যদি আপনার এই দু'আ পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করবেন ও সাহায্য করবেন। এরপর ব্যবসায়ী লোকটি মাল-সামানসহ বেশ নিরাপদে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন। যে দু'আটি পাঠ করেছিলেন তা-ও তিনি শুনালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ তোমাকে তাঁর আসমাউস হুসনা শিখিয়েছেন। কেউ যখন আসমাউল হুসনার মাধ্যমে ডাকে- তা কবুল করা হয়। কিছু চাইলে তা তাকে দেওয়া হয়।”

দু'আর আদব হলো হুজুরে কালব। দু'আকারী কখনো গাফিল হলে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, “আল্লাহ তা'আলা উদাসী অন্তরের দু'আ কখনো কবুল করেন না।” দু'আর শর্ত হলো খাদ্য হালাল হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রাড্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন: “তোমার উপার্জন হালাল করো। তবেই তোমার দু'আ কবুল হবে।”

বলা হয়ে থাকে, দু'আ প্রয়োজনের চাবি আর হালাল লুকমা এর দস্ত। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আমি কি করে তোমার দরবারে দু'আ করবো, আমি তো এক নাফরমান! আর দু'আ করবো না কেনো, তুমি তো মেহেরবান যাত!”

বর্ণিত আছে হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম একব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন খুব বিনয়ের সাথে দু'আ করছিলো। মুসা আলাইহিস্‌সালাম বললেন, হে আল্লাহ! আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তার প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করলেন, “হে মুসা! এই লোকটির প্রতি তোমার চেয়েও বেশী মেহেরবান আমি। কিন্তু সে যখন দু'আয় লিপ্ত আছে, তার

অন্তর তো ছাগলের পালের সঙ্গে ঘুরছে। যে ব্যক্তি তার অন্তর অন্যের কাছে রেখে আমার নিকট দু'আ করবে আমি তা কবুল করবো না।” মূসা আলাইহিস্‌সালাম সাথে সাথে ব্যাপারটি লোকটিকে অবগত করলেন। এবার সে আন্তরিকভাবে দু'আ করতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজনও পূরণ করে দিলেন।

হযরত জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা দু'আ করি কিন্তু তা কবুল হয় না। কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, “তোমরা যাকে ডাকছো, তাঁকে চিনতেই পারছো না।” উস্তাদ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, ইয়াকুব ইবনে লাইস রোগাক্রান্ত হলেন। সব চিকিৎসক রোগের চিকিৎসা প্রদানে অক্ষম হলেন। লোকজন বললো, এ রাজ্যে সাহাব ইবনে আবদুল্লাহ নামক একব্যক্তি আছেন। তিনি দু'আ করলে হয়তো আরোগ্য লাভ করবেন। তিনি তখন ইবনে আবদুল্লাহকে নিয়ে আসলেন। বললেন, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার দু'আ কবুল কি করে হবে, যেহেতু তোমার জেলখানায় অনেক মজলুম পড়ে আছে? সুতরাং তিনি সকল কয়েদীকে মুক্তি প্রদান করলেন। এরপর সাহাব বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে নাফরমানীর শাস্তি দেখিয়েছ, তদ্রূপ তাকে আনুগত্যের সম্মান দেখাও এবং সুস্থ করে দাও।” লোকটি তখনোই আরোগ্য লাভ করলেন। উপহার হিসাবে তিনি সাহাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কিছু সামগ্রী দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন। লোকজন বললো, আপনি এগুলো গ্রহণ করে লোকজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতেন। তিনি তখন মরুভূমির পাথর-বালুকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখা গেলো এতে পড়ে আছে অসংখ্য মণি-মুক্তা। লোকদেরকে বললেন, দেখো! যাকে এতোসব জিনিস দেওয়া হয়েছে, সে কী ইয়াকুব ইবনে লাইসের মালের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে?

বর্ণিত আছে, সালেহ মুররী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বার বার একটি কথা বলতেন, যে ব্যক্তি দরজায় বার বার কড়া নাড়ে অবশ্যই তা একদিন খুলে যাবে। হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা একদা এই বাক্যটি শুনে বললেন, “আপনি আর কতদিন কথাটি বলবেন? বলুন তো এই দরজা কখন বন্ধ হলো যে, এটা খোলা হবে?” তখন সালেহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই বললেন, “শায়খের জানা নেই-কিন্তু এই মহিলা জানেন।”

হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মারুফ খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এক লোক এসে আবদার করলো, আবু মাহফুজ! আমার জন্য দু’আ করুন। আল্লাহ যেনো আমার থলেটি ফিরিয়ে দেন। এটি চুরি হয়ে গেছে। এতে ছিলো হাজার দীনার। হযরত খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নীরব রইলেন। লোকটি আবার ফরিয়াদ করলো। তিনি নীরবই থাকলেন। তৃতীয়বার আবদার শুনে বললেন, ‘আমি কী দু’আ করবো? [হে প্রভু!] যে জিনিসটি তুমি তোমার নবী ও নির্বাচিতদের [আসফিয়া] থেকেও লুকিয়ে রেখেছো, এই লোকটির নিকট তা দান করবেন?’। সে তখনো আবদার করলো, আমার জন্য দু’আ করুন। তিনি এবার বললেন, ‘হে আল্লাহ! তার জন্য যা কল্যাণকর তা-ই তাকে দান করুন’।”

হযরত লায়স রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি উকবা ইবনে নাফেকে অন্ধ হিসাবে জানতাম। একদিন দেখলাম, তিনি দৃষ্টিসম্পন্ন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে দৃষ্টি ফিরে পেলেন? জবাব দিলেন, একদা আমি ঘুমন্ত ছিলাম। আমি দেখলাম কেউ আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, বলো! ইয়া কারীবু, ইয়া মুজীবু, ইয়া সামিয়াদু’আ! ইয়া লাতীফান্ লিমা ইয়াশা! আমার দৃষ্টি ফিরে দিন। আমি এই দু’আ কয়েকবার পাঠ করলাম। এরপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্বাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, নিশাপুর যাওয়ার সময় প্রথম অবস্থায় আমার চোখে ব্যথা ছিলো। দীর্ঘদিন চোখে ঘুম আসে নি। একদিন সকালে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম। এক ব্যক্তিকে তখন বলতে শুনলাম, ‘আল্লাহ কী তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?’ আমি জেগে ওঠলাম। চোখের মধ্যে ঔষধ লেগে আছে বলে অনুভব করলাম। এরপর থেকে আমি সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত হলাম। আর কোনদিন অসুবিধা হয় নি।

মুহাম্মদ ইবনে খুজায়মা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন ইত্তিকাল করেন আমি তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলাম। আমি খুব চিন্তাযুক্ত হলাম। স্বপ্নে হযরত হাম্বলকে দেখলাম, তিনি খুব গর্বভরে হাঁটছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আবু আবুদল্লাহ! এটা কোন্ ধরনের হাঁটা? জবাব দিলেন, “দারুস্ সালামের খাদিমরা এভাবেই চলাফেরা করেন!” জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা’আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? জবাব দিলেন, “আমাকে ক্ষমা করেছেন। মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। সোনার জুতা পরিয়ে দেন। এরপর

বললেন, হে আহমদ! তুমি যে বলতে কুরআন শরীফ আমার কালাম, তা-ই তোমাকে বিনিময় দিলাম। এখন, সুফিয়ান সওরী থেকে তোমার নিকট দু'আ পৌঁছিয়েছিল। এই দু'আ দ্বারা তুমি আমাকে ডাকতে থাকো। তখন আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! সবকিছুর উপর তুমি ক্ষমতাবান। আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করবেন না। একথা শুনে আল্লাহ বললেন, এই হচ্ছে জান্নাত, এতে প্রবেশ করো। আমি তখন জান্নাতে প্রবেশ করি।”

বর্ণিত আছে, এক যুবক কা'বার গিলাফে লটকে ধরে দু'আ করতে থাকেন, হে মা'বুদ! তোমার কোনো শরীক নেই, যার কাছে আমি যেতে পারি। তোমার কোনো সহকর্মী নেই, যাকে আমি কিছু দেবো। যদি তোমার আনুগত্য করি, তা তো তোমারই দয়া। সমস্ত প্রশংসা তোমারই। আর তোমার অবাধ্যতা করলে তার জন্য আমার মূর্খতাই দায়ী। আমার বিপক্ষে তোমার প্রমাণ থাকবেই। আমার বিরুদ্ধে তোমার প্রমাণ এবং আমার পক্ষে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তোমার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি। এটুকু বলার পর যুবক গায়েব থেকে আওয়াজ শ্রবণ করলেন, এই যুবকটি আগুন থেকে মুক্ত!

দু'আর ফায়দা হলো, আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তো যা ইচ্ছা তাই করেন। সাধারণ লোকদের দু'আ মুখের কথায় হয়। জাহিদরা দু'আ করেন কাজের মাধ্যমে। আর আরিফদের দু'আ হয় হালের দ্বারা। চিন্তা ও পেরেশানীর মাধ্যমে যে দু'আ হয়ে থাকে তা-ই হলো শ্রেষ্ঠ দু'আ। আল্লাহর কাছে যখন কিছু চাইবে, তখন শেষে এসে জান্নাতের জন্য সওয়াল করো। হতে পারে এটা তোমার দু'আ কবুলের দিন। একজন সুফি বলেন, আল্লাহর পথে প্রাথমিক যাত্রীরা দু'আ মুখের ভাষায় উচ্চারণ করে। আর চূড়ান্ত প্রান্তে উত্তীর্ণ পথিকদের মুখ দু'আ থেকে বোবা হয়ে যায়। হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো, দু'আ করুন। তিনি বলেন, আমি তো এই ভয়ে দু'আ করি না যে, যদি বলা হয়ে যায়, তুমি যদি আমার নিকট তোমার এমন জিনিস কামনা করো যা আমার নিকট রক্ষিত, তখন তো আমাকে অপবাদ দিলে! আর যদি এমন জিনিস চাও যা তোমার জন্য নির্দিষ্ট নয় তাহলে তো অতি প্রশংসা করলে। যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে ভাগ্যলিপিতে তোমার জন্য যাকিছু নির্দিষ্ট আছে তুমি তা-ই পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মানাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমি দু’আ করি নি। এটাও চাই নি কেউ আমার জন্য দু’আ করুক।” দু’আ হচ্ছে পাপী লোকদের জন্য সিঁড়ি। দু’আ সংবাদের আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদান যতদিন থাকবে, সব কাজে সৌন্দর্যও থাকবে। পাপীদের জন্য দু’আ ভাষ্য। উস্তাদ দাঈয়্যাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, পাপীরা যখন কাঁদে আল্লাহ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুফিরা আবৃত্তি করতেন:

যুবকটি যাকিছু লুকিয়ে রেখেছিল, অশ্রুতে তা প্রকাশ হয়ে গেছে
তার একেকটি দীর্ঘশ্বাস উন্মোচন করেছে যাকিছু গোপন ছিলো হৃদয়ে।

পাপ ছেড়ে দেওয়াই হলো দু’আ। বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভের ভাষাকে বলে দু’আ। বান্দার জন্য কিছু লাভের চেয়ে দু’আর অনুমতি পাওয়াই হলো কার্যকর। হযরত কান্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ যখন বান্দাকে ওজরখাহী করার মুখ খুলে দেন- তখন তার জন্য মার্গফিরাতের দরোজাও উন্মুক্ত করেন।”

দু’আর দ্বারা অন্তরের হুজুরী সৃষ্টি হয়। আর কিছু পেয়ে গেলে অন্তর ফিরে যায়। তাই বিনিময় নিয়ে ফেরার চেয়ে দরোজায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম। দু’আ হলো লজ্জার ভাষাসহ আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া। দু’আর শর্ত হলো রিদ্দা-বিল-কাযার উপর অটল থাকা। একজন সুফি বলেন, তোমার দু’আ কবুল হওয়ার আশা কিভাবে করো, নাফরমানি দ্বারা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার পরও? একজন সুফিকে কেউ আবদার করলো, আমার জন্য দু’আ করুন। তিনি জবাব দেন, তুমি তো তোমার ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম বানিয়ে অনেক দূরে চলে গেছো।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি। হযরত বাকী ইবনে মাখলাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট একজন মহিলা আসলেন। বললেন, আমার ছেলেকে রোমানরা ধরে নিয়ে গেছে। ছোট্ট একটি ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি এটি বিক্রি করার ক্ষমতাও রাখি না। আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তির কথা বলেন, যে কোনো জিনিসের বদলে আমার ছেলেকে মুক্তি দিতে পারে, তাহলে উপকৃত হতাম? আমার জন্য দিবারাত্র সমান হয়ে গেছে। আমার ঘুম আসছে না। তিনি জবাব দিলেন, ঠিক আছে। আপনি চলে যান। দেখি তার ব্যাপারে কিছু করা যায় কি না। বর্ণনাকারী বলেন, শায়খ মাথা নীচু করে

মুখ নাড়লেন। একটু সময় পরই দেখা গেল, ঐ মহিলাটি তার ছেলেকে নিয়ে আসলেন। তিনি শায়খের জন্য দু'আ করতে লাগলেন। বললেন, আমার ছেলেটি সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে। সে আপনার নিকট একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে চায়।

যুবক বললো, রোম সম্রাটের হাতে আমরা বন্দী হই। এক লোক আমাদেরকে পাহারা দিতে নিযুক্ত হলো। সে প্রত্যহ আমাদেরকে মরুভূমিতে নিয়ে যেতো কাজ করানোর জন্য। এরপর পায়ে লোহার বেড়ি লাগানো অবস্থায় আমাদেরকে ফিরিয়ে আনতো। একদা বাদ মাগরিব কাজ থেকে ফিরে আসছিলাম। লক্ষ্য করলাম আমার পায়ের বেড়ি খুলে মাটিতে পড়ে আছে। যুবক, পায়ের বেড়ি খুলে যাওয়ার ঠিক সময়টি বলে দিল। আর ঠিক এসময়ই মহিলার আবদারে শায়খ মাথা নীচু করে মুরাকাবা করছিলেন। যাক, সে বলতে লাগলো, বেড়ি খোলার পর দারোয়ান জিজ্ঞেস করলো, এটা কি তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ? আমি বললাম, না, এটা এমনিতেই খুলে পড়েছে। সে একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সে তখন সঙ্গীদের ডেকে একজন কামার নিয়ে আসলো। সবাই মিলে পায়ের মধ্যে পুনরায় বেড়ি বেঁধে দিল। আরো দু'এক পা অগ্রসর হতেই পুনরায় বেড়িটি খুলে পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে সকলে হতবাক! সবাই মিলে সংবাদ পাঠালো পাদীর নিকট। পাদী এসে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার মা জীবিত আছেন?” জবাব দিলাম “হ্যাঁ, আছেন”। পাদী বললেন, “তোমার মা এমন সময় দু'আ করেছেন, যখন দু'আ কবুলের সময় উপস্থিত ছিলো। আল্লাহই তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমাকে বন্দী রাখার ক্ষমতা আর আমাদের নেই।” এরপর তারা কিছু মাল-সামানসহ এক সহচর দ্বারা মুসলিম অঞ্চলের সীমানায় আমাদের পৌঁছে দেয়।

باب الفقراء

বাবুল ফুকরা [ফকিরী অধ্যায়]

قال الله تعالى: " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فن الله به عليم " .

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن الحسين بن موسى البزاز ببغداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسة عام:

نصف يوم " . Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري ببغداد، قال: حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزاز ببغداد، قال: حدثنا محمد بن غالب ابن حرب قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا محمد بن أبي الفرات. عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسكين ليس بالطواف الذي تردُّه اللقمة واللقمتان، والتمرّة والتمرتان " ، قال: قيل: مَنْ المسكين يا رسول الله؟ قال:

"الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفتن له فيتصدق عليه".

قال الأستاذ: معنى قوله: يستحي أن يسأل الناس: أي يستحي من الله، تعالى. أن يسأل الناس، لا أن يستحي من الناس.

والفقير شعار الأولياء؛ وحلية الأصفياء؛ واختيار الحق، سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء.

والفقراء: صفوة الله عز وجل من عباده، ومواضع أسرارهِ بين خلقه، بهم يصون الحق الخلق، وبركاتهم يبسط عليهم الرزق.

والفقراء الصبر جلساء الله تعالى، يوم القيامة؛ بذلك ورد الخبر عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد ابن رجاء الفزاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد

بن خشيش البغدادي قال: حدثنا عثمان بن معبد قال: حدثنا عمر بن راشد. عن مالك، عن نافع، عن أبي عمر، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

" لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة: حبُّ المساكين، والفقراء الصبر: هم جلساء الله تعالى يوم القيامة " .

وقيل: ن رجلاً أتى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها منه

وقال له: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم: لا أفعل!! وقال معاذ النسفي: ما أهلك الله، تعالى، قوماً ون عملوا ما عملوا حتى أهانوا الفقراء وأذلّوهم.

وقيل: لو لم يكن للفقراء إلى الله فضيلة غير إرادته وتمنيه سعة أرزاق المسلمين ورخص أسعارهم لكفاه ذلك؛ لأنه يحتاج إلى شرائها والغني يحتاج إلى بيعها. هذا لعوام الفقراء، فكيف حال خواصهم؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت أبا بكر بن سمرعان يقول: سمعت أبا بكر بن مسعود يقول: سئل يحيى بن معاذ عن الفقر، فقال: حقيقته: أن لا يستغنى العبد إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها.

وسمعت يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم القصار يقول: الفقر لباس يورث الرضا إذا تحقق العبد فيه.

وقدم على الأستاذ أبي علي الدقاق فقير في سنة: خمس، أو أربع وتسعين وثلاثمائة من زوزن وعليه مسح وقلنوسة مسح، فقال له بعض أصحابه: بكم اشتريت هذا المسح؟ على وجه المطاية.

فقال: اشتريته بالدنيا وطلب مني بالآخرة فلم أبعه بها!! سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: قام فقير في مجلس يطلب شيئاً، فقال: إني جائع منذ ثلاث: وكان هناك بعض المشايخ فصاح عليه وقال: كذبت!! إن الفقر سر

الله وهو لا يضع سره عند من يحمله إلى من يريد.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن الفراء يقول سمعت زكريا النخشي يقول: سمعت حمدون القصار يقول: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: رجل مؤمن قتل مؤمناً، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر.

وسمعتة يقول: سمعت عبد الله بن عطا. يقول: سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول: يا معشر الفقراء: إنكم تعرفون بالله، وتكرمون الله، فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلوتم به؟.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي. يقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: سمعت الجنيد، وقد سئل عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى: أو أتم أم الاستغناء بالله تعالى؟ فقال: إذا صحَّ الافتقار إلى الله عز وجل، فقد صحَّ الاستغناء بالله تعالى، وإذا صحَّ الاستغناء بالله تعالى كمل الغني به، فلا يقال: أيهما أتم الافتقار أم الغنى!! لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى.

وسمعتة يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفرًا يقول: سمعت رويما يقول وقد سئل عن نعت الفقير، فقال: "إرسال النفس في أحكام الله تعالى".

وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه، وصيانة فقره.

وقيل لأبي سعيد الخزاز: لم تأخر عن الفقراء رفقُ الأغنياء؟ فقال لثلاث خصال: لأن ما في أيديهم غير طيب، ولأنهم غير موفقين، ولأن الفقراء مرادون بالبلاء.

وقيل: أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى موسى، عليه السلام: إذا رأيت الفقراء فسائلهم، كما تسائل الأغنياء، فإن لم تفعل فاجمل كل شيء علمتك تحت التراب.

وروي عن أبي الدرداء، أنه قال: لأن أقع من فوق قصر فأتحطم أحبُّ إليَّ من مجالسة الغني؛ لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إياكم ومجالسة الموتى!! قيل: يا رسول الله، ومن الموتى؟ قال: الأغنياء؟. وقيل للربيع بن خيثم: قد غلا السعر!! فقال: نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أوليائه.

وقال إبراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن عليّ يقول: سمعت الحسن ابن علوية يقول: قيل ليحيى بن معاذ: ما الفقر؟ قال: خوف الفقر. قيل: ما الغنى؟ قال: الأمن بالله تعالى.

وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازيّ يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت ابن الكريني يقول: إن الفقير الصادق، ليحترز من الغنى حذراً أن

يدخله الغنى فيفسد عليه فقره، كما أن الغنيّ يحترز من الفقر حذراً أن يدخل عليه فيفسد عليه غناه.

وسئل أبو حفص: بماذا يقدم الفقير على ربه عز وجل؟ فقال: وما للفقير أن يقدم به على ربه تعالى سوى فقره.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس اجمع؟

قال: نعم.

قال عد المريض، وكن لثياب الفقراء فالياً، فجعل موسى، عليه السلام، على نفسه في كلّ شهر سبعة أيام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم ويعود المرضى.

وقال سهل بن عبد الله: خمسة أشياء من جوهر النفس: فقير يظهر الغنى، وجائع يظهر الشبع، ومحزون يظهر الفرح؛ ورجل بينه وبين رجل عداوة يظهر المحبة، ورجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يظهر ضعفاً.

وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات: اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر.

وقال ذو النون: علامة سخط الله على العبد: خوفه من الفقر.

وقال الشبلي: أدنى علامات الفقر: أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر بباله، أن لو أمسك منها قوت يوم ما صدق في فقره.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي يقول: سمعت

أبا محمد بن ياسين يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: وقد سألته عن الفقر، فسكت، حتى خلا، ثم ذهب ورجع عن قريب، ثم قال: كان عندي أربعة دوانيق فاستحييت من الله عز وجل، أن أتكلم في الفقر وأخرجتها ثم قعد وتكلم في الفقر.

وسمعه يقول: سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي، يقول: سمعت إبراهيم ابن المولد يقول: سألت ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. *Khanqa-e-Aminia-Asgar*
فقلت: كيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. *Ali Centre, Subidhazar, Sylhet*

وقيل: صحة الفقر: أن لا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. *ALL RIGHTS RESERVED*
وقال عبد الله بن المبارك: إظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي، يقول: سمعت هلال بن محمد يقول: سمعت النقاش يقول: سمعت بنانا المصري يقول: كنت بمكة قاعداً وشاب بين يدي، فجاءه إنسان وحمل إليه كيساً فيه دراهم ووضع بين يديه، فقال: لا حاجة لي فيه، فقال: فرّقه على المساكين، فلما كان العشاء رأيت في الوادي يطلب شيئاً لنفسه.

فقلت لو تركت لنفسك مما كان معك شيئاً؟

قال: لم أعلم أني أعيش إلى هذا الوقت!! سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت علي بن بندار الصيرفي، يقول: سمعت محفوظاً يقول:

سمعت أبا حفص يقول: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال.

وسمعه يقول: سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت فاطمة أخت أبي علي الروذباري تقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: كان أربعة في زمانهم: واحد: كان لا يقبل من الإخوان ولا من السلطان شيئاً، وهو: يوسف ابن أسباط، ورث من أبيه سبعين ألف درهم ولم يأخذ منها شيئاً وكان يعمل الخوص بيده.

وآخر: كان يقبل من الإخوان والسلطان جميعاً، وهو: أبو إسحاق الفرازي فكان ما يأخذه من الإخوان ينفقه في المستة رين الذي لا يتحركون، والذي يأخذه من السلطان كان يخرج به إلى مستحقه من أهل طرسوس .
والثالث كان يأخذ من الإخوان ولا يأخذ من السلطان وهو عبد الله ابن المبارك، وكان يأخذ من الإخوان ويكافئ عليه.

والرابع: كان يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان وهو: مخلد بن الحسين كان يقول: السلطان لا يمنّ والإخوان يمنون.
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: جاء في الخبر: " من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه " .

إنما كان ذلك؛ لأن المرء بقلبه ولسانه ونفسه؛ فإذا تواضع لغني بنفسه

ولسانه ذهب ثلثا دينه، فلوا اعتقد فضله بقلبه كما تواضع له بلسانه
ونفسه ذهب دينه كله.

وقيل: أقلّ ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه؛ وورع يحجزه؛
ويعين يحمله؛ وذكر يؤنسه.

وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً؛ ومن أراد الفقر لئلا يشتغل
عن الله تعالى مات غنياً.

وقال المزين: كانت الطرق الموصلة إلى الله أكثر من نجوم السماء، فما بقي
منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن يوسف القزويني يقول:
سمعت إبراهيم بن المولد يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت

النوري يقول: نعت الفقير: السكون عند العدم، والإيثار عند الوجود.
سئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال: ألا يستغني العبد بشيء دون الله عز
وجلّ.

وسمعتة يقول: سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: قال لي أبو سهل
الحشّاب الكبير: الفقر: فقر وذللّ، فقلت: لا بل فقر وعزّ، فقال فقر وثرى،
فقلت: لا، بل فقر وعرش.

سعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: سئلت عن معنى قوله صلى الله عليه
وسلم: "الفقر أن يكون كفراً".

قال: فقلت: آفة الشيء وضده على حسب فضيلته وقدره؛ فكلما كان في نفسه أفضل فضده وآفته أنقص: كالإيمان، لما كان أشرف الخصال كان ضده الكفر، فلما كان الخطر على الفقر الكفر بالله دلّ على أنه أشرف الأوصاف.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا نصر المروني يقول: سمعت المرتعش يقول: سمعت الجنيد يقول: إذا لقيت الفقير فالحقه بالرفق، ولا تلقه بالعلم؛ فإن الرفق يؤنس، والعلم يوحش، فقلت له: يا أبا القاسم وهل يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه علمك ذاب كما ذوب الرصاص على النار.

وسمعت يقول: سمعت أبا عبد الله الرازي، يقول: سمعت مظفر القرمسيني يقول: الفقير: هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال الأستاذ أبو القاسم: وهذا اللفظ فيه غموض لمن سمعه على وجه الغفلة عن مرمى القوم، وإنما شار قائله إلى سقوط المطالبات وانتقاء الاختيار، والرضا بما يجريه الحق سبحانه.

وقال ابن خفيف: الفقر: عدم الإملاك والخروج من أحكام الصفات. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواحد المعدم: إنما السخاء أن يعطي المعدم الواحد.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت الدقي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: لو لا شرف التواضع لله لكان حكم الفقير إذا مشى أن يتبختر.

وقال يوسف بن اسباط: منذ أربعين سنة ما ملكت قميصين. وقال بعضهم: رأيت كأن القيامة قد قامت، وقيل: أدخلوا مالك بن دينار، ومحمد بن واسع الجنة، فنظرت أيهما يتقدم: فتقدم محمد بن واسع، فسألت عن سبب تقدمه، فقليل لي: إنه كان له قميص واحد ولمالك قميصان.

وقال محمد المسوحي: الفقير: الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأسباب.

وسئل سهل بن عبد الله متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه.

وتذاكروا عند يحيى بن معاذ الفقر والغنى، فقال: لا يوزن غداً لا الفقير ولا الغني، وإنما يوزن الصبر والشكر؛ فيقال: يشكر ويصبر.

وقيل: أوحى الله تعالى، إلى بعض الأنبياء عليهم السلام؛ إن أردت أن تعرف رضاي عنك فانظر كيف رضا الفقراء عنك؟ وقال أبو بكر الزقاق: من لم يصحبه التقي في فقره أكل الحرام المحض.

وقيل: كان الفقراء في مجلس سفيان النوري: كأنهم الأمراء.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة في الدنيا، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته.

وأشد الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أنشدني عبد الله بن إبراهيم ابن العلاء قال: أنشدني أحمد بن عطاء لبعضهم؛ قال:

قالوا: غداً العيد ماذا أنت لا بسه؟ ... فقلت: خلقة سلق حبه جرجا

فقر وصبر، هما ثوباي تحتهما ... قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا

أحرى الملابس أ، تلقى الحبيب به ... يوم التزاور في الوثب الذي خلعا

الدهر لي مأتَم إن غبت يا أملي ... والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا

وقيل: إن هذه الأبيات لأبي علي الروذباري.

وقال أبو بكر المصري، وقد سئل عن الفقير الصادق، فقال: الذي لا يملك ولا يميل.

وقال ذو النون المصري: دوام الفقر إلى الله تعالى، من التخليط أحب إلى من دوام الصفا مع العجب.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي، يقول: سمعت عبد الواحد بن أمد، يقول:

سمعت أبا بكر الجوال، يقول: سمعت أبا عبد الله الحصري، يقول: مكث أبو

جعفر الحداد عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار، وينفقه على الفقراء، ويصوم

ويخرج بين المسلمين فيتصدق عليه من الأبواب.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا علي الحسين بن يوسف
الفزويني. يقول: سمعت إبراهيم بن المولد، يقول: سمعت الحسن بن علي،
يقول: سمعت النوري، يقول: نعت الفقير السكون عند العدم، والبذل
والإيثار عند الوجود.

وسمعتة يقول: سمعت منصور بن عبد الله، يقول: سمعت محمد بن علي
الكناني، يقول: كان عندنا بمكة فتى عليه أطمار رثة، وكان لا يداخلنا ولا
يجالسنا، فوَقعت محبته في قلبي، ففتح لي بمائتي درهم من وجه حلال،
فحملتها إليه، ووضعتها على طرف سجاده وقلت له. إنه فتح لي ذلك م
وجه حلال، تصرفه في بعض أمورك، فنظر إلى شرراً، ثم كشف عما هو
مستور غني، وقال: اشتريت هذه الجلسة مع الله تعالى، على الفراغ
بسبعين ألف دينار غير الضياع. والمنتغلات، تريد أن تخدعني عنها بهذه!!
وقام وبددها وقعدت التقطها فما رأيت كعزه حين مرّ، ولا كذليّ حين
كنت ألتقطها.

وقال أبو عبد الله بن خفيف: ما وجبت على زكاة الفطر أربعين سنة ولي
قبولٌ عظيم بين الخاص والعام.

سمعت الشيخ أبا عبد الله بن باكويه الصوفي، يقول: سمعت أبا عبد الله.
أبن خفيف يقول ذلك.

وسمعتة يقول: سمعت أبا أحمد الصغير، يقول: سألت أبا عبد الله بن

خفيف عن فقير يجوع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام. يخرج ويسأل مقدار كفايته: إيش يقال فيه؟! فقال: يقال فيه: مُكْدٌ.. كلوا واسكتوا، فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم.

سمت محمد بن الحسين، يقول: سمعت عبد الله بن علي الصوفي، يقول: سمعت الدقي يقول - وقد سئل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى، في أحوالهم - فقال: هو انحطاطهم من الحقيقة إلى العلم.

وسمعتة يقول: سمعت محمد بن عبد الله الطبري، يقول: سمعت خيراً النساج يقول: دخلت بعض المساجد وإذا فيه فقير، فلما رأيته تعلق بي..

وقال: أيها الشيخ تعطف عليّ؛ فإن محنتي عظيمة!! فقلت: وما هي؟ فقال: فقدت البلاء وقويت بالعافية. فنظرت فإذا قد فتح عليه شيء من الدنيا.

وسمعتة يقول: سمعت محمد بن محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا بكر الوراق، يقول: طوبى للفقير في الدنيا والآخرة.

فسأله عنه، فقال: لا يطلب للسلطان منه في الدنيا: الخراج، ولا الجبار في الآخرة: الحساب.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ*

-‘খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-
জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচনা না
করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা
চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ
ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।” [বাক্বারাহ : ২৭৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি এক লুকমা বা দুই
লুকমা কিংবা এক বা দু’টি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে, সে প্রকৃত
মিসকিন নয়।” সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তাহলে মিসকিন কে? ইয়া
রাসূলুল্লাহ! জবাব দিলেন, “যার কাছে পর্যাপ্ত জিনিসপত্র নেই এবং লজ্জার কারণে
মানুষের কাছে চায় না। সাদকা পাওয়ার জন্য সে কোনো বাহানাও করে না।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, লজ্জায় মানুষের
কাছে চায় না- এ কথার অর্থ সে আল্লাহর নিকট লজ্জাবোধ করছে, মানুষের কাছে
নয়। ফকর হলো ওলিদের ভূষণ। সুফিদের অলঙ্কার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর
নবী এবং মুত্তাকী ধরনের বিশেষ লোকদের জন্য এটি পছন্দ করেন।

ফকিররা হলেন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাহ। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের ক্ষেত্র।
তাঁদের ওয়াসিলায় আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাখলুককে হিফাজত করেন। তাঁদের
বরকতেই তিনি মাখলুককে রিজিক দান করেন। ধৈর্যশীল ফকিররা কিয়ামতের দিন
আল্লাহর কাছে বসবেন। এ সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্দীআল্লাহু আনহু
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রতিটি বস্তুর চাবি
আছে। জান্নাতের চাবি হলো মিসকিনদের মুহাব্বাত করা। ধৈর্যশীল ফকিররা
কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে বসবেন।”

এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ১০ হাজার
দিরহান দান করেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। বললেন, “দশ হাজার দিরহাম
দিয়ে ফকিরদের তালিকা থেকে কি আমার নাম মেটাতে চাও? আমি তা কখনো গ্রহণ
করবো না।” হযরত মুআজ নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে সম্প্রদায়
ফকিরদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এদেরকে আল্লাহ তা’আলা ধ্বংস করবেন।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ফকর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন, “বান্দা আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী হবে না। এর নিদর্শন হলো, সে সকল প্রকার উপায়-উপকরণকে বিলীন করবে।” হযরত ইব্রাহীম কাস্সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “বান্দা যখন ফকরের পোশাক পরিধান করে তখন তার মধ্যে রিদ্দার গুণাবলী সৃষ্টি হয়।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে এক দরবেশ আসলেন। তাঁর পরনে ছিলো পশমের তৈরী জামা ও টুপি। উপস্থিত এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, এই পোশাক কত টাকা দিয়ে আপনি খরিদ করেছেন? দরবেশ জবাব দিলেন, দুনিয়ার বিনিময়ে আমি এটা ক্রয় করেছি। আমাকে আখিরাতে বদলে এটা চাওয়া হয়েছে কিন্তু আমি তা বিক্রি করি নি। উস্তাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, একজন ফকির কোনো এক মজলিসে যেয়ে কিছু চাইলেন। বললেন, আজ তিনদিন হয় আমি ক্ষুধার্ত। এক শায়খ চিৎকার করে অভিযোগ করলেন, তুমি মিথ্যা বলছো! ফকর তো আল্লাহর একটি রহস্যের নাম। এটা তো যে কোনো স্থানে রাখার জিনিস নয়!

হযরত হামদুন কাস্সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ইবলিস এবং তার সৈন্যরা তিনটি বিষয়ের উপর এতো বেশী খুশী হয় যে, অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে তা অতুলনীয়। এগুলো হলো, এক. একজন মু’মিন যখন অপর কোনো মু’মিনকে হত্যা করে। দুই. একজন মানুষ যখন কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করে। তিন. একটি অন্তরে যখন দারিদ্র্যের ভয় থাকে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “হে ফকিররা! তোমরা আল্লাহর মা’রিফাত লাভ করেছো এবং তাঁকে সম্মান করছো। এবার যখন একাকীভাবে আল্লাহর সঙ্গে থাকবে তখন খুব সতর্ক থেকো।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর নিকট নিজের ফকিরী প্রকাশ করা, না তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী থাকা উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, একটা আরেকটার সম্পূরক। একটি ছাড়া অপরটির মধ্যে পূর্ণতা লাভ হবে না। হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফকীরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, “আল্লাহর বিধান পালনে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার নাম ফকিরী”।

ফকিরের বৈশিষ্ট্য তিনটি: ১. রহস্য ও গোপনীয়তা রক্ষা করা, ২. ফরয আদায় করা ও ৩. ফকিরী রক্ষা করা। আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ধনী লোকদের প্রতি ফকিরদের কোনো করুণা নেই কেনো? তিনি জবাব দিলেন, এর কারণ মোট তিনটি: প্রথমত তাদের মালিকানাধীন অর্থ-সম্পদ অপবিত্র। দ্বিতীয়ত তারা তাওফিক থেকে বঞ্চিত এবং তৃতীয়ত ফকিররা তো মূলত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দিলেন, ফকিরদের সাক্ষাৎ হলে তুমি এমনভাবে তাদের কাছে চাইবে যেভাবে ধনীদের নিকট চাও। যদি তুমি তা না করো তাহলে তোমাকে যে ইলম প্রদান করেছি তা মাটির গর্তে পুঁতে রাখো।

হযরত আবু দারদা রাহিমাতুল্লাহু আনহু বলেন, “ধনীদের সান্নিধ্য লাভ থেকে বালাখানা হতে পতিত হওয়াই আমার নিকট উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘খবরদার! মৃত লোকদের কাছেও যেয়ো না!’ জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত লোক কারা? তিনি জবাব দিলেন, ‘ধনীরা।’”

হযরত রাবি ইবনে খাইসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো, পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেছে। তিনি বললেন, “আমরা আল্লাহর নিকট এ পর্যায়ের হীন বা তুচ্ছ নই যে, তিনি ক্ষুধার্ত রাখবেন। আল্লাহ তো তাঁর ওলিদেরকে ক্ষুধার্ত রাখেনই।”

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা ফকিরী বা দরবেশী তালাশ করলাম, কিন্তু প্রায়শ্চন্দ্রে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো। আর মানুষ তো প্রাচুর্যের সন্ধানে লাগলো, তাই দারিদ্র্য তাদেরকে পেয়ে বসলো।”

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফকিরী কি? তিনি জবাব দিলেন, “ফকিরীকে ভয় করা”। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে ধনাত্মকতা কি? তিনি জবাবে বললেন, “আল্লাহর কাছে নিরাপদ থাকা”।

হযরত ইবনুল কারিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সত্যবাদী ফকির প্রাচুর্যকে এ কারণে ভয় করে যে, এটার কারণেই কি তার ফকিরী নষ্ট হয়ে যায়। যে রূপ ধনী লোক ফকিরীকে এমনভাবে ভয় করে, যার দ্বারা কি না তার প্রাচুর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।”

হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফকির আল্লাহর দরবারে কি নিয়ে উপস্থিত হবে? জবাবে বলেন, “সে তো ফকিরী ছাড়া আর কী বা পেশ করবে?”

আল্লাহ তা’আলা হযরত মূসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “তুমি কি চাও কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকজনের সমপরিমাণ নেকী তোমার হবে?” তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ।” আল্লাহ তা’আলা বললেন, “তাহলে রোগীদের সেবা করো, ফকিরদের কাপড়ের উকুন পরিষ্কার করো।” এজন্য মূসা আলাইহিসসালাম নিজেকে প্রতি মাসের ৭ দিন রোগীদের সেবা ও ফকিরদের কাপড় পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত রাখতেন।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “পাঁচটি বিষয় হলো খুব উন্নত গুণ: ১. ফকির প্রাচুর্য দেখাবে, ২. ক্ষুধার্ত পরিতৃপ্তি দেখাবে, ৩. উদ্ভিন্ন লোক আনন্দ দেখাবে, ৪. কারো প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে ভালোবাসা দেখাবে এবং ৫. দিনে রোযা ও রাতে কিয়াম করবে কিন্তু কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।”

হযরত বিশর ইবনে হারিছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কবর পর্যন্ত ফকিরীর উপর অটল থাকার বিশ্বাস হলো উচ্চ পর্যায়ের একটি মাকাম।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দার প্রতি আল্লাহর অসম্ভব একটি লক্ষণ হলো, সে ফকিরীকে ভয় করবে।” হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকিরীর সর্বনিম্ন স্তর হলো, কারো হাতে যদি গোটা দুনিয়াও এসে যায়, এরপর সব দান করে অন্তরে যদি এই অনুভূতির জন্ম নেয় যে, হায়! যদি অন্তত একদিনের জন্য কিছু জমা রাখতাম, তাহলে বুঝতে হবে তার অন্তরে প্রকৃত ফকিরী নেই।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “সুফিগণ ফকিরী ও প্রাচুর্যের মধ্যে কোনটি উত্তম? এ প্রশ্নের উপর আলোচনা করেন। আমি বলবো, এটাই উত্তম: কারো কাছে প্রয়োজনমাত্মক যা-ই থাকুক সে সবই ব্যয় করে ফেলবে।”

হযরত আবু মুহাম্মদ ইবনে ইয়াসীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ইবনুল জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, ফকিরী কি? তিনি নীরব থাকলেন, কোনো জবাব দিলেন না। আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে

বললেন, আমার কাছে চারটি মুদা ছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহর সামনে আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, কিভাবে আমি ফকিরীর উপর মন্তব্য করি। কাজেই বেরিয়ে গিয়ে এগুলো প্রথমে দান করে আসলাম। এরপর তিনি বসে গেলেন ও ফকিরীর উপর আলোচনা শুরু করলেন।”

হযরত ইব্রাহীম ইবনে মাওলিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ইবনুল জাল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম, একজন লোক কখন ফকির হওয়ার উপযুক্ত হয়? জবাবে বললেন, যখন তার মধ্যে ফকিরীর এক বিন্দুও অবশিষ্ট থাকবে না। বললাম, তা কি করে সম্ভব? জবাবে বললেন, যখন তার কিছু থাকবে না তখন ভাববে তার সবই আছে এবং যখন তার সবকিছু হবে তখন ভাববে তার কিছুই নেই।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকিরীর মধ্যে প্রাচুর্যের প্রকাশ ফকিরী থেকেও উত্তম।”

হযরত বিনান মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মক্কা শরীফ বসে আছি। সামনে এক যুবককে বসাবস্থায় দেখি। এসময় অন্য আরেক ব্যক্তি থলে ভরা দিরহাম তার সামনে রাখলো। যুবক বললেন, এসবের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি মিসকিনদের মধ্যে এগুলো বিলিয়ে দাও। এরপর ইশার সময় লক্ষ্য করলাম সে-ই যুবক ভিক্ষা করছেন! জিজ্ঞেস করলাম, আগে যেটুকু পেয়েছিলেন তার সামান্য একটুও নিজের জন্য রাখলে ভালো হতো না? যুবক জবাব দিলেন, এখন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো, তাহলে আমি জানতাম না!”

হযরত মাহফুজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, বান্দার জন্য মাওলার কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে উত্তম পথ হলো সর্বাবস্থায় ফকিরী অবলম্বন, সর্বদা সুন্নাত মেনে চলা ও হালাল উপায়ে খাদ্য অনুসন্ধান করা।”

হযরত মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ফকিরের জন্য উচিৎ হলো পদক্ষেপের আগে যেনো তার হিম্মাত অগ্রগামী না হয়।” হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাদের যুগে চার ব্যক্তি ছিলেন: ১. প্রথম জন বন্ধু ও বাদশাহর নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি হচ্ছেন ইউসূফ ইবনে আসবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নিজের বাবার সত্ত্বর

হাজার দিরহামের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এর একটিও গ্রহণ করেন নি। তিনি খেজুরপত্র ছেড়ার কাজ করতেন। ২. দ্বিতীয় জন বন্ধু ও বাদশাহ উভয়ের নিকট থেকেই গ্রহণ করতেন। তিনি হচ্ছেন আবু ইসহাক ফাজারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বন্ধুদের কাছ থেকে যা পেতেন তা অজ্ঞাত দুর্বল লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। আর বাদশাহর কাছ থেকে যা পেতেন তা তিনি তারসুস শহরের গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ৩. তৃতীয় ব্যক্তি বন্ধুদের নিকট থেকে গ্রহণ করলেও বাদশাহর কাছ থেকে কিছুই নিতেন না। তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়ে তিনি এর বিনিময় দিতেন। ৪. চতুর্থজন বাদশাহর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করলেও বন্ধুদের নিকট থেকে নিতেন না। তিনি হলেন মাখলাদ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলতেন, বাদশাহ দান করে খোঁটা দেন না- কিন্তু বন্ধুরা দেয়।”

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একটি হাদীসে আছে যে ব্যক্তি প্রাচুর্যের কারণে কোনো ধনীর সামনে বিনীত ভাব দেখালো, সে তার দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশ হারালো।” এর কারণ হলো, মানুষের অস্তিত্ব তার ক্বলব, মুখ ও নফসের দ্বারা নির্ধারিত। যখন ধনীকে মুখ ও নফসের দ্বারা সম্মান করবে তখন দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ চলে যাবে। পক্ষান্তরে এই বিনয়ভাব যদি ক্বলব থেকে হয়ে থাকে তাহলে পুরো দ্বীনই বিদায় নিলো।

ফকিরী অবস্থায় ফকীরের আবশ্যিক চারটি জিনিস খুব কমই থাকে: ১. এমন ইলম যা তাকে পরিচালিত করবে। ২. এমন তাকুওয়া যা তাকে ফিরিয়ে রাখবে। ৩. এমন ইয়াক্বীন যা তাকে বহন করবে। ৪. এমন জিকির যা তাকে প্রশান্তি দেবে।

যে ব্যক্তি ফকিরীর গর্বের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ফকিরী অবলম্বন করে সে ফকির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে গাফিল না থাকার উদ্দেশ্যে ফকিরী অবলম্বন করে সে ধনী হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

হযরত মুজাইয়িন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর কাছে পৌছার রাস্তার সংখ্যা আকাশের তারার চেয়েও বেশী ছিলো। এসবের কোনটাই অবশিষ্ট নেই। শুধু একটি আছে, সেটা হলো ফকিরী।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকীরের পরিচয় হলো নিঃস্ব অবস্থায় শান্ত থাকবে এবং প্রযুচের সময় অন্যকে

নিজের উপর প্রাধান্য দেবে।” হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ফকিরীর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দেন, “আল্লাহ ছাড়া মানুষ আর কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হবে না।” হযরত মানসুর ইবনে কালফ বলেন, আমাকে হযরত আবু সাহল খাশ্শাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ফকিরী ও হীনতা একই অর্থ। আমি বলি, না, বরং ফকিরী ও সম্মান হলো একই জিনিস। তিনি বললেন, ফকিরী ও প্রায়ুর্চ একই কথা। আমি বলি, না, ফকিরী ও আরশ মূলত একই অর্থবোধক।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস: “দারিদ্র্যতা অচিরেই মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।” এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। আমি জবাবে বললাম, বস্ত্রের অবস্থান অনুযায়ী তার বিপরীত দিকটাও অনুরূপ হয়ে থাকে। বস্ত্র যতো সম্মানী হবে তার বিপরীতটা ততো তুচ্ছ হবে। যেমন, ঈমানের বিষয়। এটা সর্বোত্তম গুণ। এর বিপরীত হলো কুফর। এখন, ফকিরীর মধ্যে যদি কুফরের আশঙ্কা হয় তাতেই বুঝা যাবে ফকিরী একটি উত্তম গুণ।”

হযরত মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, ফকিরের সঙ্গে বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করো। জ্ঞান নিয়ে তার সামনে যেয়ো না। কারণ, বিনয় ও নম্রতা তাকে প্রশান্তি দেয় আর জ্ঞান তাকে বিরক্ত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবুল কাসিম! জ্ঞানের দ্বারা কি ফকির বিরক্ত হয়? জবাব দেন, হ্যাঁ। সত্যিকার কোনো ফকিরের কাছে যখন জ্ঞান রাখা হয়, আগুনের মধ্যে যে রূপ শিশা গলে যায় তদ্রূপ এই জ্ঞানও জ্বলে যাবে।”

হযরত মুজাফফর কারমিসিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রকৃত ফকিরী হচ্ছে, আল্লাহর কাছে ফকিরের কোনো প্রয়োজন না থাকা।” উস্তাদ আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ কথায় কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। উদাসীনতার সাথে এটা শুনলে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হবে না। এর আসল মর্ম হলো, চাহিদা ও নিজের ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত করা। আল্লাহর কাছ থেকে যা-ই আসে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

হযরত ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকিরী হলো মালিকানা বিলুপ্ত করা ও গুণকীর্তন থেকে বেরিয়ে আসা।” হযরত আবুল হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একজন মানুষের কাছে গ্রহণ করার চেয়ে যতক্ষণ না প্রদানের

আকর্ষণ বেশী না আসবে ততক্ষণ ফরিকী অর্জন হবে না। ধনীর পক্ষ থেকে নিঃস্বকে কিছু দেওয়ার নাম দানশীলতা নয়। বরং নিঃস্বের পক্ষ থেকে ধনীকে প্রদানের নামই হলো প্রকৃত দানশীলতা।”

হযরত ইবনুল জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর কাছে বিনয়ের মর্যাদা যদি না থাকতো, তাহলে ফকিরকে অহঙ্কারের সাথে চলার নির্দেশ আসতো।” হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চল্লিশ বছর যাবৎ আমি দু’টি জামার মালিক হই নি।” একজন সুফী বলেন, “স্বপ্নে দেখি যেনো কিয়ামত কায়ম হয়ে গেছে। এসময় একটি নির্দেশ আসলো, হে মালিক ইবনে দীনার ও মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি’! তোমরা জান্নাতে চলে যাও। আমি চিন্তা করলাম, দেখি কে আগে জান্নাতে প্রবেশ করেন? দেখলাম, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি’ আগে চলে গেলেন। স্বপ্নের মধ্যেই জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আগে যাওয়ার কারণ কি? জবাব আসলো, তাঁর কাছে ছিলো একটি মাত্র জামা আর মালিক ইবনে দীনারের ছিলো দু’টি।”

মুহাম্মদ ইবনে মু’সিহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকির তো সে-ই, বস্ত্রের প্রতি যার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই।” সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফকির কখন প্রশান্তি অনুভব করে? তিনি জবাব দেন, “বর্তমান ছাড়া সে-তো আর কিছুই দেখে না!” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বসে সুফীগণ ফকিরী ও প্রচুর্য নিয়ে আলাপ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, “ফকিরী এবং প্রাচুর্যের মধ্যে পরিমাপ হবে না- পরিমাপ হবে সবর ও গুরুত্বের মধ্যে। এসময় বলা হবে, লোকটি সবর ও গুরুত্ব করেছে।” বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা’আলা একজন নবীর নিকট ওহী পাঠালেন, “তোমার প্রতি আমার সন্তুষ্টি কতটুকু তা যদি বুঝতে চাও, তাহলে তোমার প্রতি ফকিরদের সন্তুষ্টি কি পরিমাণ তা দেখে নাও।”

হযরত আবু বকর জাক্বাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যার ফকিরীর মধ্যে পরহেজগারী নেই সে সম্পূর্ণ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবে।” বর্ণিত আছে, হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারের ফকিররা রাজা-বাদশাহর মতো থাকতেন।

হযরত আবু বকর ইবনে তোয়াহির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকীরের তো দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকবে না। আর যদি থাকে, যা কিছু আবশ্যিক তার মধ্যেই সীমিত থাকবে।” হযরত আহমদ ইবনে আতা একজন সুফী থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন:

তারা [আমাকে] বললো: ‘আগামীকাল ছুটির দিন। আপনি কী পরিধান করবেন?
জবাব দিলাম: ‘অসংখ্য ঢোক পরিমাণ প্রেমসূরা যার থেকে আসে তার বস্ত্র পরবো!’

ফকিরী ও ধৈর্যশীলতা হলো আমার দু’টি ভূষণ, এদের নিচে আছে একটি হৃদযন্ত্র
যা দেখে তার একান্ত সাথীকে গুত্রবার ও ছুটির দিনে।

সর্বাধিক উত্তম বস্ত্র যা পরবে তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন,
তাহলো মহামূল্যবান যে পরিধেয় তিনিই তোমাকে দান করেছেন সেটি

তুমি বিনে সময় আমার জন্য [চিরন্তন] শোক ছাড়া কিছু নয়, ও আমার আশা!

আর আমার ছুটি তো তখন যখনই তোমাকে আমি দেখি বা তোমার কথা শুনি!

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত কবিতাটির রচনাকারী ছিলেন আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত আবু বকর মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, প্রকৃত ফকির কে? জবাব দিলেন, যে নাকি কোনো কিছুর মালিক নয় এবং কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ রাখে না। হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার দৃষ্টিতে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সর্বদা আল্লাহর প্রয়োজনীয়তাবোধ, আত্ম-অহঙ্কারে কলুষিত হৃদয়ে সর্বদা সচেতন অবস্থায় থাকার চেয়েও উত্তম।” হযরত আবু আবদুল্লাহ হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু জাফর হাদ্দাদ বিশ বছর এক দীনানের বিনিময়ে কাজ করেন। এই ১টি দীনার আবার ফকিরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন, রোযা রাখতেন, মাগরিব ও ইশার সময় ঘর থেকে বেরিয়ে দান করতেন।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “ফকির নিঃস্ব অবস্থায় শান্ত থাকেন। আর প্রাচুর্যের সময় দান করেন।”

মুহাম্মদ ইবনে কাভানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মক্কা শরীফে আমাদের কাছে এক যুবক ছিলেন। তিনি পুরনো তালিযুক্ত কাপড় পরতেন। তিনি আমাদের নিকটে

এসে বসতেন না। এক পর্যায়ে তার প্রতি আমার খুব আকর্ষণ লাগলো। এরপর আমি হালাল উপায়ে দু'শ দিরহামের মালিক হলাম। আমি সবগুলো তার কাছে নিয়ে গেলাম। জায়নামাযের কোণে রেখে বললাম, এগুলো হালাল উপায়ে আমি পেয়েছি। আপনি এগুলো ব্যয় করুন। তিনি এসময় বেশ ক্রোধ ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। নিজের সম্পর্কে অজানা বিষয়ও তিনি আমার নিকট উন্মুক্ত করলেন। বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে ৭০ হাজার দীনারের বিনিময়ে এই বৈঠক খরিদ করেছি। তুমি কি এখন এগুলো দিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে চাও? এটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন। তার চলার মধ্যে এতো সম্মানবোধ আমি আর কোনদিন উপলব্ধি করি নি। আর আমি যে দীনারগুলো তুলে নিচ্ছিলাম, তাতে যে পরিমাণ অপদস্ততা ছিলো তাও আমি আর কোনো দিন অনুভব করি নি।”

হযরত আবু আহমদ সগীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ফকির ৩ দিন উপবাস থাকে- ৩ দিন পর ঘর থেকে বের হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু চায়, তার সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তাতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তোমরা খাও-দাও কিন্তু নীরব থাকো! এরকম ফকিরী তোমাদের কাছে আসলে সবাই অপদস্ত হবে।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফকিররা কি আল্লাহর সাথে কোনো অসৌজ্যমূলক আচরণ করতে পারে? তিনি বলেন, “হ্যাঁ করে। যখন তারা হাক্কিকাত বিজর্সন দিয়ে ইলমের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।” হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “খাইরুন নাস্‌সাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, কোনো এক মসজিদে আমি একজন ফকিরকে দেখলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে বললেন, শায়খ! আমার উপর দয়া করুন। আমি তো এক বিরাট পরীক্ষায় পড়ে গেছি। জিজ্ঞেস করলাম, কিসের পরীক্ষা? বললেন, আমি কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে গেছি! শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করছি! আমি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম, আমার নিকট দুনিয়া এসে গেছে!”

হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ইহ-পরকালে ফকীরের জন্য মুকারকবাদ!” শাগরিদরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন,

রিসালাতুল কুশাইরী (রাহ.)

“দুনিয়ার জীবনে বাদশা কখনো ফকীরের নিকট ট্যাক্স চায় না। আর আখিরাতে
জাব্বার আল্লাহ তা’আলাও তার কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করবেন না।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب التصوف

বাবুত তাসাওউফ (আত্মশুদ্ধি অধ্যায়)

الصفاء محمود بكل لسان، وضدّه: الكدورة؛ وهي مذمومة.

أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا الحسين بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن نوفل قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير اللون فقال: " ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم ".
Khanqa-e-Aminia-Asgaria
All Centre, Subidbazar, Sylhet

ثم هذه التسمية غلبت علي هذه الطائفة؛ فيقال: رجلٌ صوفي، وللجماعة صوفيّة، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوف، وللجماعة: المتصوفة.

وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق. والأظهر فيه: أنه كاللقب، فأما قول من قال: إنه من الصوف، ولهذا يقال: تصوّف إذا لبس الصوف كما يقال: تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس: الصوف!! ومن قال: إنه مشتق من الصفاء، فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيدٌ في مقتضى الله.

وقول من قال: إنه مشتق من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم فالعنى صحيح، ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف.

ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق.

وتكلم الناس في التصوف: ما معناه؟ وفي الصوفي: من هو؟ فكلُّ عبر بما وقع له. واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجاز وسنذكر هنا بعض مقالاتهم فيه على حدِّ التلويح، إن شاء الله تعالى.

سمعت محمد بن أحمد بن يحيى الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي التيمي يقول: سئل أبو محمد الجريري عن التصوف، فقال: الدخول في كل خلق مني والخروج من كل خلق دني.

سمعت عبد الرحمن بن يسوف الأصبهاني يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عمار الهمداني يقول: سمعت أبا محمد المرعشي يقول: سئل شيخي عن التصوف، فقال: سمت الجنيد وقد سئل عنه فقال: هو أن يميّتك الحق عنك، ويحييك به.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الرحمن بن محمد الفارسي يقول: سمعت أبا الفانك يقول: سمعت الحسين بن منصور، وقد سئل عن الصوفي، فقال: وحداني الذات لا يقبله أحد، ولا يقبل أحدًا.

وسمعت يقول: سمعت عبد الله بن محمد يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت أبا علي الوراق يقول: سمعت أبا حمزة البغدادي يقول: علامة الصوفي الصادق: أن يفتقر بعد الغني، ويدلّ بعد العز، ويخفى بعد

الشهرة، وعلامة الصوفي الكاذب: أن يستغني بالدنيا بعد الفقر، ويعز بعد
الذلّ، ويشتهر بعد الخلفاء.

وُسئل عمرو بن عثمان المكيّ عن التّصوّف، فقال: أن يكون العبد في كل
وقت بما هو أولى به في الوقت.

وقال محمد بن علي القصاب: التّصوّف: أخلاق كريمة ظهرت في زمان
كريم من رجل كريم مع قوم كرام.

وُسئل سمنون عن التّصوف فقال: أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء.
وُسئل رويمٌ عن التّصوف فقال: استرسال النفس مع الله تعالى على ما
يريده.

وُسئل الجنيد عن التّصوف فقال: هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة.
سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا نصر السّراج
الطوسي يقول: أخبرني محمد بن الفضل قال: سمعت عليّ بن عبد الرحيم
الواسطي يقول: سمعت رويم بن أحمد البغدادى يقول: التّصوف مبني على
ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار إلى الله، والتحقق بالبذل
والإيثار، وترك التعرض والاختيار.

وقال معروف الكرخي: التّصوف: الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي
الخلّائق.

قال حمدون القصار: اصحب الصوفية؛ فإن للقبیح عندهم وجوهاً من

المعاذير.

وُسُئِلَ الْخِرَازُ عَنْ أَهْلِ التَّصَوُّفِ فَقَالَ: قَوْمٌ أُعْطُوا حَتَّى بَسَطُوا، وَمَنْعُوا حَتَّى فَقَدُوا، ثُمَّ نُوْدُوا مِنْ أَسْرَارِ قَرِيبَةٍ إِلَّا فَايَكُوا عَلَيْنَا.

وَقَالَ الْجَنِيدُ: التَّصَوُّفُ: عَنُودٌ لَا صَلَاحَ فِيهَا.

وَقَالَ أَيْضاً: هُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ، لَا يَدْخُلُ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ.

وَقَالَ أَيْضاً: التَّصَوُّفُ: ذِكْرٌ مَعَ اجْتِمَاعٍ، وَوُجُودٌ مَعَ اسْتِمَاعٍ، وَعَمَلٌ مَعَ اتِّبَاعٍ.

وَقَالَ أَيْضاً: الصَّوْفِيُّ كَالْأَرْضِ، يُطْرَحُ عَلَيْهَا كُلُّ قَبِيحٍ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَّا كُلُّ مَلِيحٍ.

وَقَالَ أَيْضاً: إِلَهٌ كَالْأَرْضِ؛ يَطْوِيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَكَالسَّحَابِ يَظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ وَكَالْقَطْرِ يَسْقِي كُلُّ شَيْءٍ.

وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الصَّوْفِيَّ يَعْنِي بَظَاهِرَهُ، فَاعْلَمْ أَنَّ بَاطِنَهُ خَرَابٌ.

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: الصَّوْفِيُّ: مَنْ يَرَى دَمَهُ هَدِراً، وَمَلِكَهُ مَبَاحاً.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: نَعَتْ الصَّوْفِيَّ السَّكُونَ عِنْدَ الْعَدَمِ، وَالْإِيثَارَ عِنْدَ الْوُجُودِ.

وَقَالَ الْكِنَانِيُّ: التَّصَوُّفُ خُلُقٌ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ فَقَدْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الصِّفَاءِ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ: التَّصَوُّفُ: الْإِنَاخَةُ عَلَى بَابِ الْحَبِيبِ وَنَ طَرْدُ عَنْهُ.

وَقَالَ أَيْضاً: صَفْوَةُ الْقَرَبِ بَعْدَ كَدِّ دَوْرَةِ الْبَعْدِ.

وقيل أقبح من كل قبيح صوفي شحسح.

وقيل: التصوف: كف فارغ، وقلب طيب.

وقال الشبلي: التصوف الجلوس مع الله بلاهم.

وقال أبو منصور: الصوفي: هو المشير عن الله تعالى؛ فإن الخلق أشاروا إلى الله تعالى.

وقال الشبلي: التصوف الجلوس مع الله بلاهم.

وقال أبو منصور: الصوفي: هو المشير عن الله تعالى؛ فإن الخلق أشاروا إلى الله تعالى.

وقال الشبلي: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق؛ كقوله تعالى: " واصطنعتك لنفسي " قطعه عن كل غير، ثم قال له: " لن تراني " .

وقال: الصوفية أطفالٌ في حجر الحق.

وقال أيضاً: التصوف برقة محرقّة.

وقال أيضاً: هو العصمة عن رؤية الكون.

وقال رويم: ما تزال الصوفية بخير ما تنافروا، فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم.

وقال الجريري: التصوف مراقبة الأحوال، ورومُ الأدب.

وقال المزين: التصوف: الانقياد للحق.

وقال أبو تراب النخشي: الصوفي لا يكدره شيء، ويصفو به كل شيء.

وقيل: الصوفي لا يتعبه طلب، ولا يزعجه سبب.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل ذو النون المصري عن أهل التصوف فقال: هم قوم آثروا الله، عز وجل، على كل شيء فآثرهم الله، عز وجل، على كل شيء.

وقال الواسطي رحمه الله: كان للقوم إشارات.. ثم صارت حركات.. ثم لم يبق إلا حسرات!! وسئل النوري عن الصوفي، فقال: من سمع السماع وآثر الأسباب.

سمعت أبا حاتم السجستاني، رحمه الله، يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: قلت للحصري: من الصوفي عندك؟ فقال: الذي لا نقله الأرض، ولا تظله السماء.

قال الأستاذ أبو القاسم: إنما أشار إلى حل المحو.

وقيل: الصوفي من إذا استقبله حالان، أو خلّقان كلاهما حسن، كان مع الأحسن منهما.

وسئل الشبلي: لم سميت الصوفية بهذه التسمية؟.

فقال: لبقية بقيت عليهم من نفوسهم؛ ولولا ذلك لما تعلقت بهم تسمية.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل ابن الجلاء: ما معنى قولهم صوفي؟ فقال: ليس نعرفه في شرط العلم، ولكن نعرف أن من كان فقيراً مجرداً من الأسباب، وكان مع الله تعالى بلا مكان، ولا يمنعه الحق سبحانه عن علم كل مكان يسمى صوفياً.

وقال بعضهم: التصوف: إسقاط الجاه، وسواد الوجه في الدنيا والآخرة.
وقال أبو يعقوب المزايلى: التصوف: حال تضحل فيها معالم الإنسانية.
وقال أبو الحسن السبروانى: الصوفى: من يكون مع الواردات لا مع الأوراد.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: أحسن ما قيل في هذا باب قول من قال: هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم مزابل؛ ولهذا قال رحمه الله يوماً: لو لم يكن للفقير إلا روح فعرضها على كلاب هذا الباب لم ينظر كلب إليها.

وقال الأستاذ أبو سهل الصعلوكى: التصوف: الإعراض عن الاعتراض.
وقال الحصرى: الصوفى لا يود بعد علمه؛ ولا يُعدم بعد وجوده.

قال الأستاذ القشيري: وهذا فيه إشكال. ومعنى قوله: لا يوجد بعد عدمه أي إذا فنيت آفاته لا نعود تلك الآفات. وقوله: ولا يعدم بعد وجوده، معنى: إذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق، فالحادثات لا تؤثر فيه.
ويقال: الصوفى: المصطلم عنه بما لا ح له من الحق.

ويقال: الصوفى: مقهور بتصریف الربوبية. مستور بتصرف العبودية.

ويقال: الصوفى لا يتغير، فإن تغير لا يتكرر.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت الحسين بن أحمد الرازى يقول: سمعت أبا بكر المصري يقول: سمعت الحرّاز

يقول: كنت في جامع قيروان يوم الجمعة، فرأيت رجلاً يدور في الصف ويقول.

تصدّقوا عليّ؛ فقد كنت صوفياً فضعت..

فرفقته بشيء. فقال لي. مر، ويلك!! ليس هذا من ذلك!! ولم يقبل الرفق.

অনুবাদ: প্রত্যেক ভাষায়ই ‘সাফা’ (পরিচ্ছন্নতা) প্রশংসনীয়। এর বিপরীত হলো ‘কুদুরা’ (আবর্জনা), যা হলো ঘৃণিত। হযরত আবু জুহাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর চেহারা মুবারক বেশ মলীন দেখাচ্ছিলো। বললেন, “পৃথিবী থেকে পরিচ্ছন্নতা [صفو] বিদায় নিলো আর কেবল আবর্জনাই [كدر] বাকী থাকলো। এখন মুসলমানের জন্য মৃত্যু একটি উপহার।” এরপর থেকে আত্মশুদ্ধিকারী জামাআতের উপর এই শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। এজন্য একজন ব্যক্তিকে বলা হয় ‘সুফি’। আর তাদের জামাতকে বলা হয় ‘সুফিয়্যা’। এ পথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে বলে ‘মুতাসাওয়িফ’। আর সম্পৃক্ত জামাআতকে বলে ‘মুতাসাওয়িফা’।

আরবী ভাষায় শব্দটি ব্যবহারের নিয়মে এটা পড়ে না। এরকম শব্দ অন্যটি থেকে উদ্ভূতও হয় না। সুন্দর কথা হলো, এটি ‘লাকাব’ শব্দের মতো। কেউ বলেন, ‘তাসাওউফ’ শব্দটি ‘সুফ’ (পশম) থেকে উদ্ভূত। সুফ পরিধানকারী ব্যক্তিকে বলে ‘তাসাওউয়াফা’ [সে পশমের বস্ত্র পরিধান করেছে]। যেমন নাকি কেউ কামিস পরিধান করলে তাকে বলে ‘তাক্বাম্বাসা’ [সে কামিস পরিধান করেছে]। সুতরাং এটি একটি ব্যাখ্যা। তবে সুফিগণ সুফ পরিধানের সাথে তাসাওউফকে সম্পৃক্ত রাখেন নি। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে যে সুফ্ফা ছিলো তার সাথে এটি সম্পৃক্ত। কিন্তু আরবী ভাষায় সুফ্ফা থেকে সুফি শব্দটি এরূপ ব্যবহৃত হয় না। যারা বলেছেন ‘সাফা’ থেকে শব্দটি উদ্ভূত, সে ক্ষেত্রেও এটি আরবী ভাষার নিয়মবহির্ভূত। কারণ সাফা শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি হয় না। যারা সাফ্ফুন (সারিবদ্ধতা) থেকে এটার উৎপত্তি বলেছেন, তারা বুঝাতে চেয়েছেন, আত্মিক দিক থেকে সুফিরা হলেন প্রথমসারির ব্যক্তিবর্গ। এ ব্যাখ্যা ঠিক আছে। তবে আরবী ভাষায় সাফ্ফুন শব্দ থেকে সুফি শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

এখন কথা হলো, শাদিক আইন-কানুন ও শব্দের উৎপত্তি কিংবা উৎস দ্বারা এদেরকে সনাক্তকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। এরা তো এমনিতেই প্রসিদ্ধ। মূল আলোচনার বিষয় হলো তাসাওউফ কি ও সুফি কারা? এর উত্তরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে জাগ্রত কথাটিই উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে পুরো আলোচনা যদি সংক্ষেপেও তুলে ধরি তাহলে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বো। তাই ইশারা-ইঙ্গিতে এ সম্পর্কিত অত্যল্প ব্যাখ্যা তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ!

আবু মুহাম্মদ জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ হচ্ছে উজ্জ্বল চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করা। দুশ্চরিত্র থেকে বের হওয়া।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তোমার অস্তিত্ব থেকে তোমার মৃত্যু ঘটাবেন আর তাঁর অস্তিত্ব দ্বারা তোমাকে জীবন দান করবেন।” হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফি মানে হলো একক সত্তার অধিকারী হওয়া। সে কাউকে গ্রহণ করবে না, তাকেও কেউ গ্রহণ করবে না।” হযরত আবু হামযা বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সত্যিকারের সুফির পরিচয় হলো, প্রাচুর্যের পর সে দরবেশী অবলম্বন করবে। সম্মান লাভের পর বিনয়ী হবে, খ্যাতি লাভের পর লুকিয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে মিথ্যুক সুফির পরিচয় হলো, দরবেশীর পর পার্থিব প্রচুর্যে ভরপুর হবে। বিনয়ের পর সম্মানবোধ করবে, লুকিয়ে থাকার পর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।”

হযরত আমর ইবনে উসমান মাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ হচ্ছে বান্দা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে আছে পরবর্তীতে সে উন্নত হবে।” হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী খাস্সাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ হলো উন্নত কিছু গুণাবলীর নাম। এগুলো প্রকাশ হয়েছে সম্মানজনক এক যুগে। ভদ্র সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত ভদ্র ব্যক্তির কাছ থেকে।” হযরত সাননুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে তুমি কোনো কিছুর মালিক হবে না, আর অন্য কিছুও তোমার উপর মালিকানা রাখবে না।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে আল্লাহর চাওয়ার সাথে নিজের নফসকে ছেড়ে দেওয়া।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়া তুমি আল্লাহর সঙ্গে থাকবে, এটাই তাসাওউফ।” তিনি আরো বলেছেন, “তিনটি বিষয় তাসাওউফের ভিত্তি: ১. দরবেশী অবলম্বন করা ও আল্লাহর মুখাপেক্ষী থাকা, ২. দান

ও ত্যাগে সর্বদা উদ্বুদ্ধ থাকা এবং ৩. অভিযোগ ও ইচ্ছা উভয়টি ছেড়ে দেওয়া।” হযরত মারুফ খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে হাক্কিকাতকে আকড়ে ধরা আর মাখলুকের কাছে যা-ই আছে তা থেকে নিরাশ হওয়া।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিরা হলেন একই ঘরের অধিকারী। তাদের কক্ষে অন্য কেউ প্রবেশ করে না। তাসাওউফ হলো, সম্মিলিতভাবে জিকির করা, আবেগের সাথে শ্রবণ করা আর আনুগত্যের সাথে আমল করা। সুফি হলেন মাটির মতো। তার উপর যাবতীয় নোংরা বস্তু নিষ্কিষ্ট হবে কিন্তু তার নিকট থেকে বেরিয়ে আসবে উজ্জ্বল সুন্দর জিনিষ। সুফি তো একখণ্ড ভূমির মতো, নেক ও বদলোক সকলেই এর উপর দিয়ে চলাচল করবে। তিনি তো মেঘমালা, প্রত্যেককে তিনি ছায়া দান করেন। তিনি একটি পানীয় ফোটা, এর দ্বারা প্রত্যেককে তিনি পরিতৃপ্ত করে পান করাবেন।” তিনি আরো বলেন, “যখন কোনো সুফিকে দেখবে, বাহ্যিকতা নিয়ে ব্যস্ত- তাতে বুঝে নেবে তার বাতিন দিক খুবই খারাপ।”

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফি ঐ ব্যক্তি যে তার রক্তকে নিরর্থক মনে করে। নিজের অর্থ-সম্পদকে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখে।” হযরত কান্ডানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ কিছু চরিত্রের নাম। যার কাছে তুমি যতো বেশী উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখবে তার কাছ থেকে তোমার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাবে।” তিনি আরো বলেছেন, “তাসাওউফ হলো দূরত্বের ময়লা-আবর্জনা দূর করা ও নৈকট্যের পরিশুদ্ধতা লাভ করা।”

একজন শায়খ বলেন, “কর্কষ সুফি হলো প্রত্যেক নোংরা জিনিস থেকেও চরম নোংরা। তাসাওউফ মানে খোলা হাত ও পবিত্র অন্তর।” হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে কোনো প্রকার কল্লনা ছাড়া আল্লাহর সাথে বসে থাকা।” হযরত আবু মনসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফি ঐ ব্যক্তি, যার দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা আসে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকলেই তো আল্লাহর দিকে নিজেরা ইশারা করে।” হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফি ব্যক্তি নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন ও আল্লাহর সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

–“এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি।” [তোয়া-হা : ৪১] অর্থাৎ সবকিছু থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে বললেন, ‘লান-তারানী’ (আমাকে কিছুতেই দেখবে না!)।” তিনি আরো বলেন, “সুফিরা হলেন আল্লাহর কোলের শিশু। তাসাওউফ হলো এক জ্বলন্ত দৃষ্টি।” তিনি আরো বলেছেন, “সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনই হলো তাসাওউফ।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিরা যতদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন তারা কল্যাণের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তারা যখন সন্ধি করে ফেললেন তখন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলেন।”

হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে হালের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও আদব অবলম্বন করা।” হযরত মুজাইয়াম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে আল্লাহর আনুগত্য।” হযরত আবু তুরাব নকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিকে কোনো ব্যক্তি মলিন, কলুষিত করতে পারে না। বরং অন্য সবকিছু তার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।” একজন শায়খ বলেন, “সুফি ব্যক্তি তলবের দ্বারা ক্লান্ত হয় না। উপায় উপকরণ তাকে পেরেশান করে না।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তারাই হলেন আহলে তাসাওউফ যারা সবকিছুর উপর আল্লাহ তাআলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আল্লাহও তাদেরকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।”

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিদের মধ্যে প্রথমে ইশারা-ইঙ্গিত ছিলো, তারপর নড়াচড়া এরপর তা আক্ষেপে পরিণত হয়েছে।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, সুফি কে? তিনি জবাব দিলেন “যে ব্যক্তি সামা’ শ্রবণ করে ও উপকরণকে প্রাধান্য দেয়।” হযরত হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার নিকট সুফির পরিচয় কি? জবাব দিলেন, “জমিন যাকে খোরাক দেয় না আর আকাশও যাকে ছায়া দান করে না।”

লেখক বলেন, এটার মর্ম হলো আত্মবিলুপ্তি। সুফির সংজ্ঞায় আরো বলা হয়ে থাকে, “যে ব্যক্তি দু’টি হাল অথবা দু’টি চরিত্রের সম্মুখীন হবে, তার মাধ্যে অধিকতর উত্তমটি সে গ্রহণ করবে।”

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, সুফি নামকরণের কারণ কি? জবাব দিলেন, “এসব লোকের একটা অংশ এখনো বেঁচে আছেন। এরা যদি না থাকতেন তাহলে নামকরণও থাকতো না।” হযরত ইবনুল জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, সুফি মানে কি? তিনি জবাব দিলেন, “জ্ঞানের আলোকে সংজ্ঞাদান সম্ভব নয়- তবে পরিচয় দিচ্ছি। ঐ ব্যক্তি সুফি যে নাকি ফকির এবং উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন। স্থানের সীমানা ছাড়াই তিনি আল্লাহর সাথে থাকেন। আল্লাহ তা’আলা তাকে কোনো স্থানের ইলম থেকে বারণ করেন না।” একজন শায়খ বলেন, তাসাওউফ মানে যশ-খ্যাতি ছেড়ে দেওয়া। দুনিয়া ও আখিরাতে মুখ কালো থাকা।

হযরত আবু ইয়াকুব মাজাইলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ এমন এক বৈশিষ্ট্য, মানবিক গুণাবলী তাতে একদম বিলুপ্ত হয়ে যায়।” হযরত আবুল হাসান সিরওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে লোক আওরাদ [সঙ্গীত প্রার্থনাকারী] নয় বরং ওয়ারিদাতের [সন্দর্শনের] সাথে, সে-ই হলো সুফি।” উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “এ অধ্যায়ে একজন শায়খ কী চমৎকারই না বলেছেন, তাসাওউফ এমন এক রাস্তা, যে পথে শুধু তারাই চলতে পারেন যাদের অন্তর দ্বারা আল্লাহ তা’আলা আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করে দেন।” এজন্যই আমার শায়খ বলতেন, “ফকীরের রুহ এমন হওয়া চাই, এটি যদি সুফিদের দরজার সামনে রাখা হয় তাহলে একটি কুকুরও এদিকে লক্ষ্য করবে না।”

হযরত আবু সাহল সা’লুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাসাওউফ মানে অভিযোগ-অনুযোগ থেকে বিমুখ থাকা।” হযরত হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফি ব্যক্তি বিলীন হওয়ার পর আর অস্তিত্ব লাভ করে না। আর অস্তিত্ব লাভের পর বিলীন হয় না।” লেখক বলেন, কথাটায় অস্পষ্টতা আছে। এর আসল মর্ম হলো, বিপদ ও আশঙ্কা দূরীভূত হলে তা আর ফিরে আসে না। বিলুপ্ত হওয়ার পর অস্তিত্ব লাভ করে না- কথাটি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন সে আল্লাহ তা’আলাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে, তখন সৃষ্টির বিলুপ্তি দ্বারা তার বিলুপ্তি হবে না। বস্তুর আবর্তন-বিবর্তনে সে প্রভাবিত হবে না। অস্তিত্ব লাভের পর বিলুপ্ত হবে না- কথাটি দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য।

একজন শায়খ বলেন, সুফি ব্যক্তি রবুবিয়াতের কর্মকাণ্ডে আতঙ্ক থাকেন। আর 'উবুদিয়াতের কাজকর্মে লুকিয়ে থাকেন। অপর আরেক শায়খ বলেন, সুফির মধ্যে পরিবর্তন আসে না। যদি এসেই যায় তাহলে তিনি কলুষিত হন না। হযরত খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি কিরওয়ানের জামে মসজিদে ছিলাম। জুমু'আর দিন দেখলাম এক ব্যক্তি মুসল্লিদের কাতারে কাতারে ঘুরছে আর বলছে, আমাকে সাদকা করুন। আমি একজন সুফি ছিলাম, এখন দুর্বল হয়ে গেছি! আমি তাকে কিছু দান করতে চাইলাম। তিনি বললেন, চলে যাও! আমি তো এটা চাই নি। একথা বলে আমার দেওয়া অনুদান অগ্রাহ্য করলেন।

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الأدب

বাবুল আদাব [শিষ্টাচার অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: " مازاغ البصر وما طغى " .

قيل: حفظ آداب الحضرة.

وقال تعالى: " قوا أنفسكم وأهليكم نارا " . جاء في التفسير عن ابن

عباس: فقهوهم، وأدبوهم.

أخبرنا: علي بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أبو الحسن الصفار البصري

قال: حدثنا غنام قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا عبد

الملك ابن الحسين، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن شيبة، عن

عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حق الولد على

والده: أن يسحن اسمه، ويحسن مرضعه، ويحسن أدبه " .

ويحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ل يعرف ما لله عزَّ وجلَّ، عليه

في نفسه، ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزلة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: " إن الله، عزَّ وجلَّ، أدبني

فأحسن تأديبي " .

وحقيقة الأدب: اجتماع جميع خصال الخير؛ فالأديب: هو الذي اجتمع فيه

خصال الخير ومنه أخذت المأدبة اسم للمجمع.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق، رحمه الله، يقول: العبد يصل بطاعته إلى الجنة، وبأدبه في طاعته إلى الله.

وسمعتة أيضاً يقول: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة بين يدي الله إلى أنفه، ليزيل ما به، فقبض على يده.

وكان الأستاذ أبو علي، رحمه الله، لا يستند إلى شيء، وكان يوماً في مجمع، فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره؛ لأنني رأيت غير مستند.. فتنحى عن الوسادة قليلاً.. فتوهمت أنه توقي الوسادة، لأنه لم يكن عليها خرقة أبو سجادة، فقال لا أريد الاستناد.

فتأملت بعده حاله؛ فكان لا يستند إلى شيء.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج، يقول: سمعت أحمد بن محمد البصري يقول: سمعت الجلالي البصري يقول: التوحيد موجب يوجب الإيمان؛ فمن لا إيمان له فلا توحيد له، والإيمان موجب يوجب الشريعة؛ فمن لا شريعة له فلا إيمان له ولا توحيد، والشريعة موجب يوجب الأدب؛ فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد.

وقال ابن عطاء: الأدب: الوقوف مع المحسنات، فقل: وما معناه؟ قال: أن تعامل الله بالأدب سرّاً وعلناً؛ فغذا كنت كذلك كنت أديباً وإن كنت أعجمياً.

ثم أنشد:

إذا نظقت جاءت بكل ملاحية... وإن سكتت جاءت بكل مليح
أخبرنا. محمد بن الحسين، قال: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت عبد
الله الجريري يقول: منذ عشرين سنة ما مددت رجلي وقت جلوسي في
الخلوة فإن حُسن الأدب مع الله أولى.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: من صاحب الملوك بغير
أجب أسلمه الجهل إلى القتل.

وروي عن ابن سيرين أنه سئل: أيّ الآداب أقرب إلى الله تعالى؟ فقال:
معرفة بربو بيته، وعمل بطاعته، والحمد لله على السراء، والصبر على
الضراء.

وقال يحيى بن معاذ: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع
الهالكين.

سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله، يقول: ترك الأدب موجب يوجب الطرد؛
فمن أساء الأدب على البساط ر إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب ردّ
إلى سياسة الدواب.

وقيل للحسن البصري: قد أكثر الناس فيعلم الأدب، فما أنفعها عاجلاً
وأوصلها آجلاً؟ فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله،
عز وجل عليك.

وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله

تعالى.

وقال سهل: القوم الذين استعانوا بالله، على أمر الله، وصبروا على آداب الله. وروي عن ابن المبارك أنه قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منّا إلى كثير من العلم.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال الوليد بن عتبة: قال: ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتتنا المؤديون: وقيل: ثلاث خصال ليس معهن غربة: مجانبه أهل الرّيب، وحسن الأدب. وكف الأذى: وأنشدنا الشيخ أبو عبد الله المغربي، رضي الله عنه، في هذا المعنى: يزين الغريب إذا ما اغترب ... ثلاث: فمنهن حسن الأدب

وثانيه: حسن أخلاقه ... وثالثه. اجتناب الرّيب ولما دخل أبو حفص بغداد قال له الجنيد: لقد أذبت أصحابك أدب السلاطين.

فقال له أبو حفص: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن.

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف. سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: قيل لبعضهم: ياسيء الأدب. فقال: لست بسيء الأدب، فقليل له: من أدبك؟ فقال: أدبني الصوفية

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا النصر الطوسي السراج يقول: الناس في الأدب علي ثلاث طبقات: أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار العرب.

وأما أهل الدين فأكثرهم آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات.

وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعات الأسرار والوفاء وبالعهود وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر، وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب.

وحكي عن سهل بن عبد الله أنه قال: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص.

وقيل: كمال الأدب لا يصفو إلا للأنبياء والصديقين.

وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس في الأدب، ونحن نقول: هو معرفة النفس.

وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الأدب.

وقال ذو النون المصري: أدب العارف فوق كل أدب؛ لأن معروفة مؤدب قلبه.

وقال بعضهم: يقول الحق، سبحانه: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فأختر

أيهما شئت: الأدب أو العطب.

وقيل: مدّ ابن عطاء رجله يوماً بين أصحابه وقال: ترك الأدب بين أهل الأدب أدب.

ويشهد لهذه الحكاية الخبر الذي روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو بكر، وعمر، فدخل عثمان فغطى فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة " نبه صلى الله عليه وسلم: أن حشمة عثمان، رضي الله عنه، وإن عظمت عنده، فالحالة التي بينه وبين أبي بكر وعمر كانت أصفى.

وفي قريب من معناه أنشدوا:

في أنفاض وحشمة فإذا ... جالست أهل الوفاء والكرم

أرسلت نفسي على سجيته ... وقلت ما قلت غير محتشم

وقال الجنيد: إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب.

وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكد علي المحب ملازمة الأدب.

وقال النوري: من لم يتأدب للوقت فوقته المقت.

وقال ذو النون المصري: إذا خرج المريج عن استعمال الأدب، فإنه يرجع عن حيث جاء.

سمعت الأستاذ أبا علي. رحمه الله، يقول في قوله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربّه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " قال: لم يقل ارحمني لانه حفظ

آداب الخطاب.

وكذلك عيسى عليه السلام حيث قال: " إن تعذبهم فإنهم عبادك " ، وقال: " إن كنت قلتة فقد علمته " ولم يقل: لم أقل؛ رعاية لآداب الحضرة. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الطيب بن الفرحان يقول: سمعت الجنيد يقول: جاءني بعض الصالحين يوم الجمعة فقال لي: أبعث معي فقيراً يُدخل عليّ سروراً، ويأكل معي شيئاً؛ فالتفت، فإذا أنا بفقير شهدت فيه الفاقة.. فدعوته.. وقلت له: امض مع هذا الشيخ وأدخل عليه سروراً، فلم ألبث أن جاءني الرجل فقال لي: يا أبا القاسم لم يأكل ذلك الرجل الفقير إلا لقمة، وخرج!! فقتل: لعلك قلت كلمة جفاء عليه، فقال لي: لم أقل شيئاً.

فالتفت فإذا أنا بالفقير جالس، فقلت له: لمّ لم تتم عليه السرور؟ فقال: يا سيدي، خرجت من الكوفة وقدمت بغداد ولم أكل شيئاً.. وكرهت أن يبدو سوء أدب مني من جهة الفاقة في حضرتك.. فلما دعوتني سررتُ إذ جرى ذلك ابتداء منك، فمضيتُ وأنا لا أرضى له الجنان... فلما جلست على مائدته سوى لقمة وقال لي: كل، فهذا أحب إليّ من عشرة آلاف درهم. فلما سمعت هذا منه علمت أنه دنيء الهمة، فتطرفت أن أكل طعامه، فقال الجنيد: ألم أقل لك إنك أسأت أدبك معه، فقال: يا أبا القاسم.. التوبة، فسأله أني مضي معه ويفرحه.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

-“তারা দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালঙ্ঘনও করে নি।” [নাজম : ১৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর দরবারে হাজিরীর আদব রক্ষা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

-“হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো।” [তাহরীম : ৬]

হযরত ইবনে আব্বাস রাহিআল্লাহু আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, “তোমরা তাদেরকে জ্ঞান দাও ও ভদ্রতা শেখাও।” হযরত আয়িশা রাহিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সন্তানের জন্য বাবার দায়িত্ব তার একটি সুন্দর নাম রাখা। ভালো একজন দুধ পানকারিনীর সন্ধান করা। আর তাকে উত্তম আদর্শের শিক্ষা দান।”

হযরত সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম বুঝলো না, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি সম্মান রাখলো না, সে ভদ্রতা থেকে একদম বঞ্চিত।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ আয-যা ওজাল্লাহ আমাকে ভদ্রতার শিক্ষা দিয়েছেন এবং খুব উত্তমভাবে শিখিয়েছেন।”

আদাব শব্দের মর্মার্থ হলো, সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো। যার মধ্যে এ সমাবেশ ঘটবে সে হবে আদাব। এ থেকে একটি হলো, ‘মা’দাবা’ যার অর্থ আদাবদের সমাবেশ স্থল। উস্তাদ আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “ইতাআ’ত বান্দা জন্মাত লাভ করে। আর ইতা’আতে ভদ্রতা রক্ষা করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে।” উস্তাদ একটি ঘটনা বলতেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, সে আল্লাহর সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে নাকের ময়লা দূর করলো। আল্লাহ তখন তার হাত ধরে ফেললেন! লেখক বলেন, এ ঘটনার দ্বারা তিনি নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কারণ, একজন মানুষ কোনো সময় কারো হাত আল্লাহ ধরেছেন, এটা কখনো দেখতে পারবে না। উস্তাদের একটি অভ্যাস ছিলো, তিনি কোনো কিছুতে হেলান দিতেন না। একবার এক বৈঠকে আমি তাঁর পেছনে একটি বালিশ রাখতে চাইলাম যাতে তিনি হেলান দিতে পারেন। কিন্তু তিনি এ থেকে সরে গেলেন। আমার মনে হলো, তিনি এজন্যই হয়তো হেলান দিতে চাচ্ছিলেন না, কারণ এ বালিশের কাভার ছিলো না। এরপর থেকে আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম, আসলে তিনি কোনো কিছুতেই হেলান দিতেন না।

হযরত জালাজিলি বাসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদ দ্বারা ঈমান আবশ্যিক। যার মধ্যে ঈমান নেই, তার মধ্যে তাওহীদ নেই। ঈমান দ্বারা শরীয়ত আবশ্যিক। যার মধ্যে শরীয়ত নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই শরীয়তও নেই। শরীয়ত দ্বারা ভদ্রতা আবশ্যিক। যার মধ্যে আদাব নেই তার মধ্যে না আছে শরীয়ত, না ঈমান, না আছে তাওহীদ।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আদাব মানে, সৌন্দর্যের সাথে স্থির থাকা।” জিজ্ঞেস করা হলো একথার মানে কি? জবাব দেন, “গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে আদাব রক্ষা করে আচরণ করবে। এমতাবস্থায় তুমি একজন আজমী হলেও আদিব হয়ে যাবে।” এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন:

সে যখন কথা বললো তখন দেখালো পরম বাগ্মীতা [মালাবা]

আর যখন সে নীরব রইলো তখন দেখালো পরম মার্জিতভাব [মালিহ]।

হযরত আবদুল্লাহ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবদুল্লাহ জারিরীকে বলতে শুনেছি, একাকীবস্থায় দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ আমি পা লম্বা করি নি। কারণ, আল্লাহর সাথে আদাব রক্ষা করা উত্তম।” হযরত আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “যে ব্যক্তি রাজা-বাদশাহর আদাব রক্ষা করে না সে তো মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়।” হযরত ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ প্রকারের ভদ্রতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়? তিনি জবাব দিলেন, “আল্লাহর রবুবিয়াতকে চেনা। তাঁর হুকুম অনুযায়ী কাজ করা। সুখের সময় তাঁর গুণগান করা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ যখন মারুফের সাথে ভদ্রতা রক্ষা করে না, ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে সে-ও তখন বিলীন হবে।”

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, লোকজন ইলমে আদাবে বেশ আগ্রহী। কোনটি দ্রুত কল্যাণকর? জবাব দিলেন, “দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন করা। তোমার উপর আল্লাহর প্রাপ্য কী আছে তা বুঝে নেওয়া।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আদাব রক্ষা করে, সে আল্লাহর মুহাব্বাতের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।” হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এরাই প্রকৃত লোক, যারা আল্লাহর হুকুম পালনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। আর আল্লাহর আদাব রক্ষার উপর অটল থাকে।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা ইলমের চেয়ে আদাবের বেশী মুখাপেক্ষী।” তিনি আরো বলেন, “আদাব শিক্ষাদানকারীরা চলে যাওয়ার পর আমরা আদাব শিক্ষায় নেমেছি!” একজন শায়খ বলেছেন, আদাব হলো তিনটি বৈশিষ্ট্যের নাম: ১. সংশয়বাদীদের থেকে দূরে থাকা, ২. উত্তম আচরণ করা ও ৩. কাউকে কষ্ট না দেওয়া। হযরত আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবৃত্তি করতেন:

যাযাবর পরিচিতিমুক্ত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অলঙ্কৃত করে:

আদাব, উত্তম চরিত্র ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা।

হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন বাগদাদে গমন করলেন, তখন হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, আপনি তো আপনার শাগরিদদেরকে রাজা-বাদশাহর ভদ্রতা শিখিয়েছেন। তিনি জবাবে বললেন, “প্রকাশ্য সুন্দর আচরণ হলো, গোপন সুন্দর আদাবের আলামত।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “পাপী লোকের জন্য তাওবাহ যেমন জরুরী, আরিফের জন্য আদাবও তেমন জরুরী।” হযরত মানসুর ইবনে খালফ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “একজন সুফিকে কেউ বললো, হে অভদ্র! তিনি জবাব দিলেন, আমি অভদ্র নই! জিজ্ঞেস করা হলো আপনাকে কে আদাব শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, সুফিরা আমাদের আদাব শিখিয়েছেন।”

হযরত আবু নসর তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আদাবের ক্ষেত্রে মানুষের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি হলো দুনিয়াদার লোকদের। তাদের আদাব হলো ভাষা,

সাহিত্য, বাগ্মীতা, রাজা-বাদশাহদের কেছা-কাহিনী এবং আরবী কবিতায়। দ্বিতীয় দীনদার লোকদের। তাদের আদাব হলো নফসের সংশোধন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিক্ষায়, সীমারক্ষায় ও খাহিশাত বর্জনের মধ্যে। তৃতীয়টি হলো বিশেষ লোকদের আদাব। তাদের আদাব হলো অন্তরের পবিত্রতা, অন্তরের-অন্তস্থলের প্রতি বিশেষ নজরদারি, আল্লাহর ওয়াদাসমূহ পূরণ, সময় রক্ষা করা, কল্লনা-বিলাসের প্রতি কম দৃষ্টিপাত, আল্লাহর তবল ও তাঁর দরবারে হাজিরী আর তাঁর নৈকট্যের মাক্বামাতের আদাব রক্ষা করা।”

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি নিজেকে আদাব দ্বারা প্রভাবিত রাখতে পারে সে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে।” একজন শায়খ বলেন, আদাবের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় একমাত্র নবী ও সিদ্দীকীন দ্বারা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “লোকজন আদাব নিয়ে কথাবার্তা বলে। আমরা বলি নিজেকে চেনার নামই আদাব।” হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফের আদাব হলো সকল আদাবের উর্ধ্বে। কারণ, যিনি তার মা’রুফ তিনি তার অন্তরের আদাব শিক্ষা দেন।”

ALL RIGHTS RESERVED

একজন শায়খ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা’আলা হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে বলেছেন, “আমি যে ব্যক্তিকে আমার নাম ও সিফাতের সামনে দাঁড়ানোর জন্য বাধ্য করি, তার জন্য আদাবও বাধ্য করি। পক্ষান্তরে যার সামনে আমার সত্তার হাক্কিকাত খুলে দিই, তার ধ্বংস অনিবার্য। এখন তুমি কোন্টা নেবে? আদাব না ধ্বংস?” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার তার শাগরিদদের সামনে পা লম্বা করলেন। এসময় বললেন, “ভদ্র লোকদের সামনে ভদ্রতা ত্যাগ করাও এক ধরনের ভদ্রতা!”

এ বিষয়ে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাডিআল্লাহু আনহুমা বসা ছিলেন। এসময় হযরত উসমান রাডিআল্লাহু আনহুও সেখানে উপস্থিত হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উরু মুবারক ঢেকে দিলেন। এরপর বললেন, “যার সামনে ফিরিশতাও লজ্জাবোধ করেন, আমি কেনো তার সামনে লজ্জাবোধ করবো না?” এ মর্মে সুফিরা আবৃত্তি করেন:

আমি নিয়ন্ত্রণ ও বিনয়ের সাথে চলি; তবে, যখন নিজেকে বিশ্বাস্য ও সম্মানিতজনদের সাথী হিসাবে দেখতে পাই তখন

আমাকে আমি মুক্ত করি ও স্বাভাবিকভাবে চলি; কথা বলি যাকিছু বলার লজ্জাশীলতা ছাড়াই।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুহাব্বাত যখন সঠিক হয় তখন আদাবের শর্ত বিলুপ্ত হয়।” হযরত আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুহাব্বাত যখন পরিশুদ্ধ হয় তখন প্রেমিকের জন্য উচিৎ হলো আদাবকে আকড়ে ধরা।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে লোক সময়ের আদাব রক্ষা করে না, সময় তার জন্য অভিশাপে পরিণত হয়।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মুরীদ যখন আদাব ছেড়ে দেয়, তখন যেখান থেকে যাত্রা করেছে সেখানে সে ফিরে যায়।” উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলার কথা: Sylhet

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

“এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।” [আম্বিয়া : ৮৩]

এখানে তিনি ‘আমাকে দয়া করো বলেন নি, সন্তোষের আদাব রক্ষা করার জন্য’। অনুরূপ হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম বলেছেন:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ * وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।” [মাইদাহ : ১১৮] এবং:

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ

“যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত।” [মাইদাহ : ১১৬] আল্লাহর সামনে হাজিরীর আদাব রক্ষার্থে তিনি এরূপ বলেছেন।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার কাছে জুমু’আর দিন এক নেক লোক এসে বললেন, আমার সাথে একজন ফকির পাঠান। যার দ্বারা আমি আনন্দবোধ করবো। তার সাথে পানাহার করবো। এসময় আমি এক ফকিরকে দেখলাম, তার মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন ছিলো। তাকে ডেকে বললাম, আপনি ঐ শায়খের সাথে যান, তিনি খুশী হবেন। একটু পরই ঐ শায়খ ফিরে এসে বললেন, আবুল কাসিম! ঐ ফকির তো মাত্র এক লোকমা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি বললাম, হয়তো আপনি তাকে কষ্টদায়ক কোনো কথা বলেছেন। তিনি বললেন, আমি তাকে কিছুই বলি নি। তখন লক্ষ্য করলাম ঐ ফকির বসে আছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি শায়খকে খুশী করে আসলেন না কেন? তিনি জবাব দিলেন, হে সরদার! আমি কুফা থেকে বের হয়েছি। বাগদাদ এসে এখনো কিছু খাই নি। আপনার দরবারে এসে ক্ষুধার প্রকাশ ব্যক্ত করা আমার জন্য অভদ্রতা! আপনি যখন আমাকে ডাকলেন, আমি আমার ক্ষুধার জ্বালা লুকিয়ে রাখতে চাইলাম। আমি তাঁর সাথে গিয়েছি, দস্তরখানে বসার পর তিনি আমার জন্য এক লোকমা তৈরী করে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ছোট দিলের মানুষ। এজন্য তার সাথে খাবার গ্রহণ না করেই ফিরে এসেছি।” জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন ঐ শায়খকে বললেন, আমি তো আগেই বলেছি, নিশ্চয় আপনি কোনো অসুন্দর আচরণ করেছেন! এ সময় ঐ শায়খ বললেন, আবুল কাসিম! আমি তাওবাহ করলাম। এরপর জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ ফকিরকে পুনরায় শায়খের সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

باب أحكامهم في السفر

বাব আহকামিহিম ফিস-সাফর (সফরের অবস্থায় তাদের আচার-আচরণ)

قال الله عزّ وجلّ: " هو الذي يسيركم في البر والبحر.. " الآية.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا محمد بن الفرّج الأزرق قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو أزيير: أن عليّاً الأزدی أخبره: أن ابن عمر أعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على البعير خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: " سبحان الذي سخر لنا هذا. وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون " ثم يقول: اللَّهُمَّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهُمَّ هون علينا سفرنا.

اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر والخيفة في الأهل.. اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل، وإذا رجع قاهن، وزاد فيهن: " آيئون.. تائبون.. لربنا حامدون " .

ولما كان رأى كثير من أهل هذه الطائفة اختيارُ السفر أردنا لذكر السّفر في هذه الرسالة باباً؛ لكونه من أعظم شأنهم، وهذه الطائفة مختلفون: فمنهم من آثر الإقامة على السفر، ولم يسافر غلا لفرض، كحجة الإسلام، والغالب عليهم الإقامة، مثل: الجنيد، وسهل بن عبد الله، وأبي يزيد

البسطامي، وأبي حفص، وغيرهم.

ومنهم من أثر السفر، وكانوا على ذلك، إلى أن أخرجوا من الدنيا، مثل: أبي عبد الله المغربي، وإبراهيم بن أدهم، وغيرهم.

وكثير منهم سافروا، وكانوا على ذلك، إلى أن أخرجوا من الدنيا، مثل: أبي عبد الله المغربي، وإبراهيم بن أدهم، وغيرهم.

وكثير منهم سافروا في ابتداء أمورهم في حال شبابهم أسفاراً كثيرة ثم قعدوا عن السفر في آخر أحوالهم، مثل: أبي عثمان الخيري، والشبلي، وغيرهم، ولكل منهم أصول بنوا عليها طريقتهم.

واعلم أن السفر على قسمين: سفر بالبدن: وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة.

وسفر بالقلب: وهو الارتقاء من صفة إلى صفة؛ فترى ألفاً يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله، يقول: كان بفَرَحَك. قرية بظاهر نيسابور شيخ من شيوخ هذه الطائفة، وله على هذا اللسان تصانيف، سأله بعض الناس: هل سافرت أيها الشيخ؟ فقال: سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لا. وسفر السماء، بلى.

وسمعت، رحمه الله، يقول: جاءني بعض الفقراء يوماً، وأنا بمرو، فقال لي: قطعت إليك شقة بعيدة، والمقصود لقاءك.

فقتل له: كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك.

وحكاياتهم في السفر تختلف عن ما ذكرنا من أقسامهم وأحوالهم.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن علي العلوي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أحنف الهمذاني يقول: كنت في البادية وحدي، فأعييتُ، فرفعت يدي وقلت: يارب، إني ضعيف زمن، وقد جئت إلى ضيافتك، فوقع في قلبي أن يقال لي: من دعاك؟ فقلت يا رب هي مملكة تحتل الطفيلي.. فإذا أنا بهاتف من ورائي.. فالتفت إليه فإذا أعرابي على راحلة، فقال: يا أعجمي، إلى أين؟.. قلت: إلى مكة، قال: أو دعاك؟ قلت: لا أدري، فقال: أليس قال: "من أستطاع إليه سبيلاً"؟ فقلت: المملكة واسعة تحتل الطفيلي، فقال: نعم الطفيلي أنت، يمكنك أن تخدم الجمل؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته وأعطانيها، وقال: سر عليها.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت الكتاني يقول؛ وقد قال له بعض الفقراء: أوصني: أوصني، فقال: اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، وأن لا تموت إلا بين منزلين.

ويحكى عن الحصري أنه كان يقول: جلسة خير من ألف حجة.

وإنما أراد جلسة تجمع الهمَّ على نعت الشهود.

ولمري، إنها أتم من ألف حجة، على وصف الغيبة عنه.

سمعت محمد بن أحمد الصوفي، رحمه الله، يقول: سمعت علي بن عبد الله التميمي يقول: حكى عن محمد بن إسماعيل الفرغاني أنه قال: كنا نساfer مقدار عشرين سنة أنا وأبو بكر الزقاق، والكتاني، لا نختلط بأحد، ولا نعاشر أحداً، فإذا قدمنا بلدًا؛ فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه، وجالسناه إلى الليل.. ثم نرجع إلى مسجد، فيصلي الكتاني من أول الليل إلى آخره ويختم القرآن؛ ويجلس الزقاق مستقبل القبلة؛ وكنت استلقي متفكراً، ثم نصبح ونصلي صلاة الفجر على وضوء العتمة، فإذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت عيسى القصار يقول: سئل رويم عن أدب السفر. فقال: أن لا يجاوز همهم قدمه؛ وحيثما وقف قلبه يكون منزله.

وحكى عنمالك بن دينار أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتخذ نعلين من حديد، وعصاً من حديد، ثم سح في الأرض، فاطلب الآثار والعبر، حتى تنخرق النعلان وتنسكر العصا.

وقيل: كان أبو عبد الله المغربي يسافر أبداً ومعه أصحابه، وكان يكون محرماً: فإذا تحلل من إحرامه ثانياً، ولم يتسخ له ثوب، ولا طال له ظفر ولا شعر.

وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه. فكان إذا حاد أحدهم عن الطريق، يقول: يمينك يا فلان. يسارك يا فلان، وكان لا يمد يده إلى ما وصلت إليه يد الأدميين، وكان طعامه أصل شيء من النبات يؤخذ فيُقْلَع لأجله. وفي معناه أنشدوا:

إذا استسجدوا لم يسالوا عن دعاهم... لأية حرب أم لأبي مكان
وحكي عن أبي علي الرباطي قال: صحبت عبد الله المروزي، وكان يدخل
البادية قبل أن أصحابه بلا زاد ولا راحلة. فلما صحبتته، قال لي: أيما
أحبُّ إليك، أن تكون أنت الأمر أم أنا؟ فقلت: لا، بل أنت؛ فقال:
وعليك الطاعة؟ فقلت: نعم.

فأخذ مخلاة، ووضع فيها زادا، وحملها على ظهره، فإذا قلت: أعطني حتى
أحملها.

قال: الأمير أنا وعليك الطاعة.

قال: فأخذنا المطر ليلة.. فوقف إلى الصباح على رأسي وعليه كساء يمنع
عني المطر، فكنت أقول في نفسي: يا ليتني متُّ ولم أقل له أنت الأمير.
ثم قال لي: إذا صحبت إنساناً فاصحبه كما رأيتني صحبتك.

وقد شاب علي أبي عليّ الروذباري، فلما أراد الخروج، قال: يقول الشيخ
شيئاً، فقال: يا فتى كانوا لا يجتمعون عن موعد، ولا يتفرقون عن مشورة.

وعن المزين الكبير قال: كنت يوماً مع إبراهيم الخواص في بعض أسفاره،

فإذا عقرب تسعى على فخذيه، فقمتم لأقتلها، فمنعني وقال: دعها. كلُّ شيء مفتقر إلينا. ولسنا مفتقرين إلى شيء.

وقال أبو عبد الله النصيبني: سافرت ثلاثين سنة ما خطت قط خرقة على مرقعتي، ولا عدلت إلى موضع علمت أن لي فيه رفيقاً، ولا تركت أحداً يحمل معي شيئاً.

واعلموا أن القوم استوقوا آداب الحضور من المجاهدات، ثم أرادوا أن يضيفوا إليها شيئاً، فاضافوا أحكام السفر إلى ذلك؛ رياضة لنفوسهم، حتى أخرجوها عن المعلومات، وحمروها على مفارقة المعارف، كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا واسطة، فلم يتركوا شيئاً من أورادهم في أسفارهم.

وقالو: الرُّخص لمن كان سفره ضرورة، ونحن لا شغل لنا ولا ضرورة في أسفارنا علينا.

سمعت أبا صادق بن حبيب قال: سمعت النصرا باذي يقول: ضعفت في البادية مرة، فأيست من نفسي، فوقع بصري على القمر، وكان ذلك بالنهار، فرأيت مكتوباً عليه: فسيكفيكم الله فاستقللت، وفتح عليّ من ذلك الوقت هذا الحديث.

وقال أبو يعقوب السوسي: يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء في سفره: علم يسوسه: وورع يحجزه، ووجد يحمله، وخُلُق يصونه.

وقيل: سُمي السفر سفراً؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال.

وكان الكتاني إذا سافر الفقير إلى اليمن ثم رجع فاستقللت، وفتح عليّ من ذلك الوقت هذا الحديث.

وقال أبو يعقوب السوسي: يحتاج المسافر إلى أربعة أشياء في سفره: علم يسوسه: وورع يحجزه، ووجد يحمله، وخُلُق يصونه.

وقيل: سُمي السفر سفرًا؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال.

وكان الكتاني إذا سافر الفقير إلى اليمن ثم رجع إليه مرة أخرى يأمر بهجرانه؛ وإنما كان يفعل ذلك؛ لأنهم كانوا يسافرون إلى اليمن ذلك الوقت لأجل الرفق.

وقيل: كان إبراهيم الخواص لا يحمل شيئاً في السفر، وكان لا يفارق الإبرة والركوة أما الأبرة فلخياطة ثوبه إن تمزق سترًا للعبادة، وأما الركوة فللطهارة، وكان لا يرى ذلك علاقة ولا معلوماً.

وحكي عن أبي عبد الله الرازي قال: خرجت من طرسوس حافياً، وكان معي رفيق، فدخلنا بعض قرى الشام، فجاءني فقير مجذوء فامتنعت من قبوله؛ فقال لي رفيق: البس هذا، فقد عيبتُ، فإنه قد فتح عليك بهذا النعل بسبي. فقلت: مالك؟ فقال: نزعت نعلي موافقة لك، ورعاية لحق الصحبة.

وقيل: كان الخواص في سفر، ومعه ثلاثة نفر، فبلغوا مسجداً في بعض المفارز وباتوا فيه، ولم يكن عليه باب. وكان برد شديد فناموا، فلما أصبحوا رأوه واقفاً على الباب، فقالوا: له في ذلك فقال: خشيت أن تجدوا

البرد.

وكان قد وقف طول ليلته.

وقيل: إن الكتاني استأذن أمه في الحج مرة فأذنت له، فخرج، فأصاب ثوبه البول في البادية، فقال: إن هذا لخلل في حالي، فانصرف. فلما دق باب داره أجابته أمه، ففتحت.. فرآها جالسة خلف الباب.. فسألها عن سبب جلوسها فقالت: مذ خرجت أعتقدت أن لا أبرح من هذا الموضع حتى أراك.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول: سمعت إبراهيم بن المولد يقول: سمعت إبراهيم القصار يقول: سافرت ثلاثين سنة أصلح قلوب الناس للفقراء.

وقيل: زار رجل داود الطائي فقال: يا أبا سليمان، كنت نفسي تنازعين إلى لقاءك منذ زمان، فقال: لا بأس إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة فالتلاقي أيسر.

سمعت أبا نصر الصوفي، وكان من أصحاب النصرأبادي، يقول: خرجت من البحر بعمان وقد أثر فيّ الجوع، فكنت أمرّ في السوق.. فبلغت حانوت حلاوي.. فرأيت فيه حملاناً مشوية، وحلواء.. فتعلقت برجل وقلت: اشتر لي من هذه الأشياء.

فقال: لماذا؟ ألك عليّ شيء، أو عليّ دين؟ فقلت: لا بد أن تشتري لي من

هذا.

فرآني رجل فقال: خله يا فتى إن الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أنا لا هو، اقترح علي، وأحكم بما تريد.
ثم اشترى لي ما أردت، ومضى.

وحكي عن أبي الحسين المصري قال: انفقت مع الشجري في السفر من طرابلس. فسرنا أياماً لم نأكل شيئاً، فرأيت قرعاً مطروحاً.. فأخذت آكله، فالتفت إليّ الشيخ ولم يقل شيئاً، فرميت به، وعلمت أنه كره ذلك.. ثم فتح علينا بخمسة دنانير.. فدخلنا قرية، فقتل: يشتري الشيخ لنا شيئاً لا محالة.

فمر.. ولم يفعل.. ثم قال: لعلك تقول نمشي جيعاً ولم يشتر لنا شيئاً، هو ذا. فوافي اليهودية قرية على الطريق، وثم رجلٌ صاحب عيال إذا دخلناها يشتغل بنا، فادفعها إليه؛ لينفقها علينا وعلى عياله.

فوصلنا إليه، ودفع الدنانير إلى الرجل فأنفقها، فلما خرجنا قال لي: إلى أين يا أبا الحسين؟ فقلت: أسير معك. فقال: لا، إنك تحونني في قرعة وتصحبني، لاتفعل وأبي أن أصحابه.

سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا أحمد الصغير يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: كنت في حال حدائتي استقبلني بعض الفقراء.. فرأى في أثر الضرّ والجوع، فأدخلني داره وقد لي

لَمَّا طَبَخَ بِالْكَشْكِ وَاللَّحْمَ مَتَغِيرَ. فَكَنتَ آكِلَ الثَّرِيدِ وَأَتَجَنَّبُ اللَّحْمَ لِتَغْيِيرِهِ
فَلَقَمَنِي لَقْمَةً، فَأَكَلْتُهَا بِجَهْدٍ.. ثُمَّ لَقَمَنِي ثَانِيَةً فَبَلَغْتَنِي مَشَقَّةً.. فَرَأَى ذَلِكَ
فِيَّ، وَخَجَلَ، وَخَجَلْتُ لِأَجَلِهِ، فَخَرَجْتُ وَانْزَعَجْتُ فِي الْحَالِ لِلْسَفَرِ.
فَأَرْسَلْتُ إِلَى وَالِدَتِي مِنْ يَخْبَرُهَا وَيَحْمِلُ إِلَيَّ مَرْقَعَتِي. فَلَمْ تَعَارِضْنِي الْوَالِدَةَ..
وَرَضِيَتْ بِمَخْرُوجِي، فَارْتَحَلْتُ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ.. فَهَنَّا..
وَنَفَذَ مَا كَانَ مَعْنَاهُ.. وَأَشْرَفْنَا عَلَى التَّلَفِ، فَوَصَلْنَا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ،
وَلَمْ نَجِدْ شَيْئاً فَاضْطَرَرْنَا إِلَى أَنْ أَشْتَرَيْنَا مِنْهُمْ كَلْبًا بِدَنَانِيرَ، وَشَوْوَهُ،
وَأَعْطَوْنِي قِطْعَةً مِنْ لَحْمِهِ.. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَكْلَهُ فَكَّرْتُ فِي حَالِي، فَوَقَعَ لِي أَنَّهُ
عَقُوبَةُ خَجَلِ ذَلِكَ الْفَقِيرِ. فَتَبْتُ فِي نَفْسِي.. فَدَلُّونَا عَلَى الطَّرِيقِ.. فَمَضَيْتُ..
وَحَجَجْتُ.. ثُمَّ رَجَعْتُ مُعْتَذِراً إِلَى الْفَقِيرِ.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

—[তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে।] [ইউনুস : ২২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঈআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে উঠের উপর সাওয়ার হতেন, তখন তিনবার তাকবীর দিতেন। এরপর পাঠ করতেন:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

—“পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।” [যুখরুফ : ১৩-১৪] এরপর পাঠ করতেন: “হে আল্লাহ! আমাদের

এই সফরে আপনার কাছে কল্যাণ ও তাকুওয়া কামনা করছি। যে কাজ দ্বারা আপনি সম্ভ্রষ্ট হন তা-ই করার তাওফিক দিন। হে আল্লাহ! আমাদের সফরকে সহজ করুন। হে আল্লাহ! এ সফরে আপনি আমাদের साथী, পরিবার-পরিজনের জন্য আপনি অভিভাবক। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও দুর্ঘটনা এবং অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কোনো খারাপ পরিণতি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি।” সফর থেকে ফেরার পর অনুরূপ দু’আ করতেন এবং সাথে সাথে পাঠ করতেন: “আমরা ফিরে এসেছি তাওবার সাথে এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করে।”

সুফিদের অধিকাংশই সফরের গুরুত্ব দিতেন। তাই এই গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে অত্র রিসালায় সফরের উপর একটি অধ্যায়ে আলোচনা করছি। এ ক্ষেত্রে সুফিদের মধ্যে ভিন্ন মত আছে। একদল স্থির থাকাতে প্রাধান্য দিতেন। হভজ্জের মতো ফরজ ইবাদত ছাড়া তারা সফর করতেন না। যেমন জুনাইদ, সহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী, আবু ইয়াজিদ বিস্তামী এবং আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুজুর্গান। আরেকদল সুফি সফরের উপর প্রাধান্য দিতেন। এরা দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত সফরেই জীবন কাটিয়েছেন। যেমন আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী ও ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা প্রমুখ সুফি। আরেকদল সুফি জীবনের প্রাথমিক সময় অনেক সফর করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে গৃহে অবস্থানে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আবু উসমান হিরী ও আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা প্রমুখ। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র চিন্তা ও মতামত আছে।

জেনে রাখুন, সফর দু’প্রকার। এক. শরীরের সফর। এর অর্থ, এক স্থান থেকে অপর কোনো স্থানে চলা। দুই. কালবী সফর। এর অর্থ হলো এক সিফাত থেকে অন্যটিতে উন্নীত হওয়া। তাই আপনি দেখবেন হাজারো লোক দেহের সফর করছে কিন্তু সামান্য মানুষ কালবী সফরে ব্যস্ত আছে। আমার উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, নিশাপুরের ফারাখ্কা নামক গ্রামে একজন শায়খ বাস করতেন। তাসাওউফের উপর তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শায়খ! আপনি কি সফর করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, পৃথিবীর জমিনে সফর না আকাশের সফর। যদি পৃথিবীর সফর নিয়ে প্রশ্ন করে থাকো তবে বলবো, না। আর যদি আকাশের সফর নিয়ে প্রশ্ন করে থাকো তাহলে বলবো, হ্যাঁ। উস্তাদ আরো বলেন, আমার নিকট একদা এক ফকির

আসলেন, তখন আমি মারুতে ছিলাম। তিনি বললেন, অনেক দূর-দূরান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমার মাকসাদ আপনার সাথে দেখা করা। বললাম, তুমি যদি কুলবের সফর করতে তবে তো একটি মাত্র পদক্ষেপই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। সুফিদের প্রকার ও বিভিন্ন হাল অনুসারে তাদের সফরের কাহিনীও ভিন্ন।

হযরত আহনাফ হামযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি এক মরুভূমিতে একাই ছিলাম। হাত উঠিয়ে বললাম, হে রব! আমি দুর্বল। তোমার আপ্যায়নে আমি যাত্রা করেছি। তখন মনে হলো, কে যেনো জিজ্ঞেস করছে, তোমাকে কে দাওয়াত করলো? জবাব দিলাম, হে রব! এটা তো এমন এক রাজ্য যেখানে যেতে দাওয়াতের প্রয়োজন হয় না। এর একটু পর পেছন থেকে এক আওয়াজ শুনি। ফিরে চেয়ে দেখি একজন বেদুঈন একটি উটের উপর বসে আছেন। আমাকে তিনি বললেন, হে অনাবর! যাচ্ছে কোথায়? জবাব দিলাম, মক্কা মুকাররমায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে? জবাব দিলাম, জানি না। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ কী ইরশাদ করেন নি?

ALL RIGHTS RESERVED مَنِ اسْتَظَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

–“যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার?” [আলে ইমরান : ৯৭]

আমি বললাম, এতো এক বিরাট রাজ্য! আমার মতো লোক বিনা দাওয়াতে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তিনি বললেন, বেশ! এই উটে আরোহণ করা কি সম্ভব আপনার জন্য? জবাব দিলাম, অবশ্যই। তিনি উট থেকে নেমে আমাকে বললেন, এই উটে আরোহণ করে চলে যাও।”

হযরত কান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি এক ফকিরকে বললাম, আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক রাত কোনো এক মসজিদের মেহমান হওয়ার চেষ্টা করো। আর দু’টি বাড়ির মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া মতুবরণ করো না।” হযরত হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “হাজার হাজ্জ থেকে একটি বৈঠক উত্তম।” একথার মর্ম হলো, গুহদের অবস্থায় এরূপ বৈঠক উত্তম।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ফারগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি, আবু বকর যাক্বাক ও কান্দানী প্রায় বিশ বছর সফরে ছিলাম। তবে আমরা কেউই

একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করি নি। হঠাৎ কোনো এক শহরে আমরা উপস্থিত হলাম। জানতে পারলাম এখানে একজন শায়খ আছেন। তার দরবারে পৌঁছে সালাম জানালাম। রাত পর্যন্ত তার নিকট বসে থেকে মসজিদে চলে যাই। কান্ডানী রাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে নামায পড়লেন ও খতম আদায় করলেন। যাক্বাক ক্বিবলামুখী হয়ে বসে রাত কাটালেন। আর আমি ফিকির করতে করতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম। ফজরের ওয়াক্ত হলে পরে সকলে মিলে রাতের অযু দ্বারাই জামাআতে নামাজ পড়ি। এসময় এক ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি সারারাত মসজিদে ঘুমন্ত ছিলেন। তবে আমাদের মতে তিনিই ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।”

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, সফরের আদব কি? জবাব দেন, “তোমার পদক্ষেপের আগে যেনো তোমার পরিকল্পনা এগিয়ে না যায়। যেখানেই থামবে সেখানেই তোমার ঠিকানা বানিয়ে নেবে।” হযরত মালিক ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, অল্লাহ তা’আলা মুসা আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দিলেন, “লোহা দ্বারা এক জোড়া জুতা বানাও এবং লোহার একটি লাঠি হাতে লও। পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। ভ্রমণ করে করে শিক্ষার্জন করো যতক্ষণ না তোমার জোতা ফেটে পড়ে ও লাঠি না ভাঙ্গে।”

বর্ণিত আছে আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সব সময় সফর করতেন। সাথে তার সাগরিদরাও থাকতেন। তিনি মুহরিম অবস্থায় থাকতেন। ইহরামের অবস্থা শেষ হলে পুনরায় ইহরাম পরতেন। তাঁর কাপড় ময়লা হতো না, নখ-চুল লম্বা হতো না। রাতের বেলা তাঁর সঙ্গীরা সাথেই থাকতেন। কোনো সাথী এদিক-সেদিক চলে গেলে বলতেন, ডানে বা বামে আসো, হে অমুক। সাধারণত মানুষের হাত যতটুকু লম্বা থাকে তাঁর হাত ততটুকু ছিলো না। তিনি কাঁচা শাক-শজি খেতেন। সুফিরা এ ধারণা অন্তরে পোষণ করে আবৃত্তি করতেন:

যখন কেউ [যুদ্ধের ময়দানে] তাদের সাহায্য কামনা করে, তারা কখনো আবদারকারীকে প্রশ্ন করে না:

‘কোন্ যুদ্ধে?’ কিংবা ‘কোন্ জায়গায়?’

আবু আলী রেবাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবদুল্লাহ মারওয়াজির সান্নিধ্যে গেলাম। তাঁর সাথে আমার সন্নিধ্যলাভের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা জঙ্গলে কোনো

প্রকার সামান বা সওয়ারী ছাড়াই ঘুরে বেড়াতেন। আমি তাঁর সুহবত প্রার্থী হলাম। তিনি বললেন, তোমার কাছে কোন্টি পছন্দ, আমি আমীর হবো না তুমি হবে? আমি বললাম, আপনিই আমীর হবেন। জবাবে বললেন, তাহলে তুমি আমাকে মেনে চলবে। বললাম, অবশ্যই। এরপর তিনি একটি থলের মধ্যে কিছু সামান ভরলেন ও তা নিজের পিঠে ওঠালেন। আমি বললাম, এটা আমার নিকট দিন- আমি তা বহন করবো। জবাবে বললেন, আমীর তো হলাম আমি- তুমি আমাকে মেনে চলবে। জঙ্গলে এক রাতে প্রবল বৃষ্টি হলো। এসময় তিনি সকাল পর্যন্ত আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে একটি থলে দ্বারা বৃষ্টি আটকে রাখলেন। মনে মনে বললাম হায়! ‘আপনি আমীর’, কথাটি না বলে মরে যাওয়াই ছিলো আমার জন্য উত্তম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন কোনো মানুষের সাথে থাকবে, ঠিক আমি যেক্রপ আচরণ করেছি সেরূপ আচরণ তুমিও তাদের সাথে করবে।”

হযরত আবু আলী রুজবারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এক যুবক আসলেন। যখন যুবক বিদায় চাইলেন, তখন শায়খ কিছু বললেন। এরপর পরিষ্কার করে বললেন, হে যুবক! সুফিগণ তো ওয়াদা ছাড়া সমবেত হতেন না আর পরামর্শ ছাড়া প্রস্থানও করতেন না। হযরত মুজাইয়াম কাবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি একবার ইব্রাহীম খাওয়াসের সাথে সফরে ছিলাম। একটি বিচ্ছু তার উরুতে কামড় মারলো। আমি এটিকে মেরে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করে বললেন, ছেড়ে দাও! প্রত্যেক বস্তুতো আমাদের মুখাপেক্ষী- আমরা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নই।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ নাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “দীর্ঘ ত্রিশ বছর সফর করেছি। কাপড়ের তালিতে কোনো সেলাই দেই নি। যখন জানতে পেরেছি কোথাও আমার বন্ধু আছেন, সেখানে যাই নি। এমন কোনো ব্যক্তিকে সাথে নেই নি যে আমার বোঝা বহন করবে।”

জেনে রাখুন, সুফিগণ মুজাহাদার মাধ্যমে হুজুরীর আদাবসমূহ পূর্ণ করেছেন। এই আদাবগুলোকে আরো বৃদ্ধি করতে সফরের আদাবও তার সঙ্গে যুক্ত করেন। এর উদ্দেশ্য হলো নফসের সংশোধন সাধন। নফস যেনো সর্বপ্রকার অর্জিত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য থেকে বেরিয়ে যায়। তারা আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার মাধ্যম কিংবা বন্ধন ছাড়া থাকতেন। তাই সফরের মধ্যেও কোনো অজিফা ও আমল বর্জন করতেন না।

একদল সুফি বলেন, যার জরুরত আছে সে সফর করবে। আমাদের সফরের কোনো প্রয়োজন নেই। আবু সাদিক ইবনে হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, জঙ্গলে একবার আমি দুর্বল হয়ে গেলাম। নিজেকে নিরাশ বোধ করি। এসময় চাঁদের উপর আমার দৃষ্টি পড়ে। কিছ্র তখন দিনের বেলা ছিল। এরপরও তাতে লেখা দেখলাম,

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ

–“আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট।” [বাক্বারাহ : ১৩৭] এটা দেখে আমি চিন্তামুক্ত হলাম।”

হযরত আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সফরের সময় মুসাফির চারটি জিনিসের মুখাপেক্ষী থাকে: ১. এমন ইলম যা তাকে পরিচালিত করবে, ২. এমন পরহেজগারী যা তাকে ফিরিয়ে রাখবে, ২. এমন আবেগ যা তাকে বহন করবে এবং ৪. এমন চরিত্র যা তাকে রক্ষা করবে।” একজন শায়খ বলেন, সফরকে ‘সফর’ এজন্য বলা হয়, কারণ এর দ্বারা মানুষের আখলাক থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সফরের সময় তার সাথে কিছুই নিতেন না। কেবল একটি সুঁই ও পানির বদনা তার সাথে রাখতেন। সুঁই রাখার উদ্দেশ্য কাপড় সেলাই করা ও সতরে আওরাত হওয়া। আর বদনা রাখার উদ্দেশ্য পবিত্রতা অর্জন। এগুলো রাখার মধ্যে তিনি কোনো বন্ধন মনে করতেন না। আবু আবদুল্লাহ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তারসুস থেকে খালি পায়ে বেরিয়ে যাই। সাথে ছিলেন এক বন্ধু। শামের এক গ্রামে আমরা প্রবেশ করলাম। সেখানে এক ফকির এক জোড়া জুতা নিয়ে আসলেন কিছ্র আমি তা গ্রহণ করি নি। বন্ধু বললেন, আপনি তা পরিধান করুন। আমি তো অক্ষম হয়ে গেছি। কারণ, আমার কারণেই আপনি এই জুতা জোড়া পেয়েছেন। আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে? জবাব দিলেন, আমি তো আপনার অনুসরণ ও সুহবতের হক আদায়ের উদ্দেশ্যে জুতা খুলে ফেলেছিলাম।

বর্ণিত আছে, হযরত খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা এক সফরে ছিলেন। সাথে ছিলেন আরো ত্রিশজন। সকলে একটি মসজিদে পৌঁছুলেন। মসজিদের কোনো দরোজা ছিলো না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো। এরই মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে

সাথীরা লক্ষ্য করলেন, হযরত খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওয়ালের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, আমি আশঙ্কা করছিলাম তোমরা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হবে। সুতরাং সারারাত এভাবে তিনি দাঁড়িয়ে কাটালেন।

বর্ণিত আছে, হযরত কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাজ্জে গমনের জন্য মায়ের নিকট অনুমতি চাইলে মা তাকে অনুমতি দিলেন। একটু দূরে যাওয়ার পর তিনি প্রস্রাব করলেন। কিছু প্রস্রাব তার কাপড়ে লেগে গেলো। তিনি মনে মনে বললেন, হয়তো আমার মধ্যে কোনো দ্রুটি আছে তাই ফিরে গেলেন। যখন দরজায় ডাক দিলেন, মা এসে দরজা খুললেন। লক্ষ্য করলেন মা দরজার পাশেই বসা ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে কেনো বসে আছেন, মা? জবাব দিলেন, তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি পুনরায় তোমাকে না দেখা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না- তাই বসে ছিলাম।

হযরত ইব্রাহীম কাস্‌সার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ত্রিশ বছর এজন্য সফর করেছি যে, ফকিরদের জন্য মানুষের অন্তর সংশোধন করে দেবো।” এক ব্যক্তি হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, আবু সুলাইমান! দীর্ঘদিন যাবৎ মন চাচ্ছিলো আপনার সাথে দেখা করি। দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাবে বললেন, কোনো অসুবিধে নেই। শরীর যখন স্থির ও আত্মা প্রশান্ত থাকে তখন সাক্ষাৎ খুব সহজেই হয়।

হযরত আবু নসর সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি ওমানের সমুদ্র সৈকতে ঘুরছিলাম। খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমার চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন বিরাজমান। এরপর একটি বাজারে গিয়ে ঘুরাফেরা শুরু করলাম। একটি মিষ্টির দোকানে গেলাম। সেখানে কিছু ভুনা ভেড়ির মাংস ছিলো। এক ব্যক্তিকে বারবার অনুরোধ করলাম, আমার জন্য কিছু খাবার কিনে দিন, দয়াকরে। তিনি জবাব দিলেন, কেনো দেবো? আমার উপর কি তোমার কোনো প্রাপ্য কিংবা পাওনা আছে? আমি বললাম, নেই। এরপরও অবশ্যই আমাকে কিছু কিনে দিন। এক যুবক এসে বললেন, তাকে না বলে আমার নিকট প্রস্তাব করুন। এরপর তিনি আমার জন্য কিছু খাবার ক্রয় করে চলে গেলেন।”

হযরত আবুল হাসান মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি সাজারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তারাবুল শহরে সফরে ছিলাম। দীর্ঘ সময় চলার পরও কিছু ভক্ষণ করি নি। এসময় রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু খাবার দেখে তা হাতে তুলে খেতে চাইলাম। শায়খ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি তা পছন্দ করেন নি- তাই ফেলে দিলাম। একটু পর আমরা পাঁচটি দীনার হাদিয়া পেলাম। এরপর এক গ্রামে প্রবেশ করলাম। ভাবলাম, হয়তো শায়খ এখন কিছু খাবার ক্রয় করবেন। কিন্তু না, কিছু না কিনে তিনি চলতে থাকেন। এরপর বললেন, তুমি ভাবছো আমরা উপোস অবস্থায় হাঁটছি, কিছুই ক্রয় করছি না। চিন্তার কারণ নেই- এখনই আমরা কিছু খেয়ে নোবো। এরপর ইয়াহুদিয়া নামক একটি গ্রামে প্রবেশ করি। শায়খ বললেন, এখানে একটি পরিবার আছে। এর প্রধান ব্যক্তি আমাদেরকে মেহমান করে খুব বেশী আপ্যায়ন করাবেন। শায়খ আরো বললেন, এই দীনারগুলো তাকেই হাদিয়া দেবো। তিনি আমাদের জন্য এবং তার পরিবারের জন্য এ অর্থ ব্যয় করবেন। একটু পরই আমরা ঐ বাড়িতে পৌঁছলাম। পরিকল্পনা মূতাবিক দীনারগুলো তাকে তিনি হাদিয়া হিসাবে প্রদান করলেন। ঐ ব্যক্তি এর সবই খরচ করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে যখন বেরিয়ে পড়ি, শায়খ আমাকে বললেন, আবুল হুসাইন! তুমি কোথায় যাবে? জবাব দিলাম, আপনার সাথেই থাকবো। তিনি বললেন, রাস্তায় পতিত খাদ্য তুলে নিয়ে আমার সাথে খেয়ানত করবে এবং আমার সাথে সফরও করবে- এটা হবে না। এ বলে তিনি আমাকে সাথে নিতে পুরোদমে অস্বীকৃতি জানালেন।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার যৌবনকালে এক দরবেশ আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমার মধ্যে ক্ষুধা ও কষ্টের প্রভাব লক্ষ্য করে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। আমার সামনে রুটি-মাংসের খাবার দিলেন। মাংস বাসি ছিলো তাই শুধু রুটি খেলাম এবং বাসি হওয়ার কারণে মাংস থেকে পরহেজ করি। দরবেশ তখন এক লুকমা মাংস আমার মুখে তুলে দিলেন। বেশ কষ্টে তা খেয়ে নিলাম। এরপর আরেক লুকমা দিলেন। আমার কষ্ট বেড়ে গেলো। আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি লজ্জা পেলেন। এতে আমিও লজ্জা বোধ করছিলাম। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে সফরের জন্য ব্যস্ত হলাম। এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমার আন্নার নিকট সফরে যাওয়ার সংবাদ পাঠিলাম। তিনি এতে দ্বিমত পোষণ করলেন না বরং এতে সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর কাদিসিয়া থেকে একদল

দরবেশের সাথে যাত্রা শুরু করি। পথে আমাদের নিকট মওজুদ সব সামান শেষ হয়ে গেলে, সকলেই উপোস অবস্থায় প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। এরপর আরবের একটি গ্রামে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে কিছুই পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কয়েক দীনারের বিনিময়ে একটি কুকুর খরিদ করলাম। সাথীগণ এটি ভুললেন। এরপর আমার হাতে একখণ্ড মাংস দিলেন। আমি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত, হঠাৎ মনে পড়লো সে-ই দরবেশের বাড়িতে খাওয়া ও তিনি লজ্জিত হওয়ার কথা। তিনি আমার জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। আর আজকের এই ঘটনা তারই শাস্তি। আমি মনে মনে তাওবাহ করে সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে যাই। মক্কা শরীফ গিয়ে হজ্জ আদায় করলাম। ফিরে গিয়ে ঐ দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الصحبة

বাবুস সুহবাত [সান্নিধ্য অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: "ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا".

لما أثبت الله سبحانه للصدِّيق الصحبة بين أنه أظهر عليه الشفقة: فقال تعالى: "إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا".

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

Ali Centre, Subidbazal, Sylhet

فالحر شفيقٌ على من يصحبه. أخبرنا علي بن أحمد الإهوازي، رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدثنا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي، عن نعيم بن سالم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "متى ألقى أحبابي؟ فقال أصحابه: بأبيننا أنت وأمننا. أو لسنا أحبابك؟ فقال: أنتم أصحابي، أحبابي: قوم لم يروني، وآمنوا بي، وأنا إليهم بالأشواق أكثر".

والصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة منع من فوقك: وهي في الحقيقة خدمة، وصحبة مع من دونك وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة، وعلى التابع بالوفاق والحرمة.

وصحبة الأكفاء والنظر: وهي مبنية على الإيثار والفتوة؛ فمن صحب

شیخاً فوقه فی الرتبة، فأدبه ترك الاعتراض، وحمل ما يبدو منه علی وجه جمیل، وتلقى أحوال بالإیمان به.

سمعت منصور بن خلف المغربي وسأله بعض أصحابنا: كم سنة صحبت أبا عثمان المغربي؟ فنظر إليه شزراً وقال: إني لم أصحبه، بل خدمته مدة. وأما إذا صحبتك من هو دونك، فالخيانة منك في حق صحبتك أن لا تنبهه علی ما فيه م نقصان في حالته؛ ولهذا كتب أبو الخير التيناني إلى جعفر بن محمد بن نصير: وزر جهل الفقراء علیكم؛ لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم، فبقوا جهلة.

وأما إذا صحبت من هو في درجتك، فسبيلك النعامي عن عيوبه، وحمل ما ترى منه علی وجه من التأويل جمیل، ما أمكنك، فإن لم تجد تأويلاً عدت إلى نفسك بالتهمة وإلى التزام اللائمة.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق. رحمه الله، يقول: قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني: إن فلاناً لا يقع من قلبي!! فقال أبو سليمان: وليس يقع أيضاً من قلبي، ولكن يا أحمد، لعلنا أتينا من قبلنا، لسنا من جملة الصاحلين؛ فلسنا نحبه.

وقيل: صحب رجل إبراهيم بن أدهم، فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل: إن رأيت في عيباً فنبه عليه. فقال إبراهيم: إني لم أر بك عيباً؛ لأنني لاحتك بعين الوداد؛ فاستحسن منك ما رأيت، فسل غيري عن عيبك.

وفي معناه أنشدوا:

وعين الرضا عن كل عيب كيلة... ولكن عن السخط تبدي المساويا

وحكى عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: كنا لا نصحب من يقول نعلي.

سمعت أبا حاتم الصوفي، يقول: سمعت أبا نصر السراج، يقول: قال أبو

أحمد القلانسي، وكان من أستاذي الجنيد: صحبت أقواماً بالبصرة

فأكرموني.. فقلت مرة لبعضهم: أين إزارى؟ فسقطت من أعينهم.

وسمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت الدقي يقول:

سمعت الزقاق يقول: منذ أربعين سنة أصبح هؤلاء: فما رأيت رفقا

لأصحابنا إلا من بعضهم لبعض، أو ممن يحبهم، ومن لم يصحبه التقوى

والورع في هذا الأمر أكل الحرام النص.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: قال رجل لسهل بن عبد الله: أريد أن

أصحبك يا أبا محمد. فقال: إذا مات أحدنا فمن يصحبه الباقي؟ فقال: الله.

فقال له: فليصحبه الآن.

وصحب رجل رجلاً مدة، ثم بدا لأحدهما المفارقة، فاستأذن صاحبه،

فقال: بشرط ألا تصحب أحداً إلا إذا كان فوقنا وإن كان أيضاً فوقنا فلا

تصحبه؛ لأنك صحبتنا أولاً، فقال الرجل: زال من قلبي إرادة المفارقة.

سمعت أبا حاتم الصوفي، يقول: سمعت أبا نصر السراج، يقول: سمعت

الدقي يقول: سمعت الكناني يقول: صحبني رجل، وكان على قلبي ثقيلاً،

فوهبت ل شيئاً، ليزول ما في قلبي، فلم يُزل!!! فحملته إلى بيتي، وقلت له: ضع رجلك على خدي. فأبى، فقلت: لا بدّ. ففعل، واعتقدت أن لا يرفع رجله من خدي حتى يرفع الله من قلبي ما كنت أجده، فلما زال عن قلبي ما كنت أجده، قلت له: أرفع رجلك الآن.

وكان إبراهيم بن أدهم يعمل في الحصاد وحفظ البساتين وغيره، وينفق على أصحابه.

وقيل: كان مع جماعة من أصحابه، فكان يعمل بالنهار وينفق عليهم، ويجمعون بالليل في موضع وهم صيام، فكان يبطن في الرجوع من العمل، فقالوا ليلة: تعالوا نأكل فطورنا دونه، حتى يعود بعد هذا أسرع، فأفطروا، وناموا، فلما رجع إبراهيم وجدهم نياماً، فقال: مساكين، لعلهم لم يكن لهم طعام؛ فَعَمِدَ إلى شيء من الدقيق كان هناك، فعجنه، وأوقد على النار، وطرح الملة، فانتبهوا، وهو ينفخ في النار واضعاً محاسنه على التراب، فقالوا له في ذلك، فقال: قلت لعلكم لم تجدوا فطوراً.. فنتمتم.. فأحببت أن تستيقظوا والملة قد أدركت.

فقال بعضهم لبعض: انظروا ما الذي عملنا، وما الذي به يعاملنا. وقيل: كان إبراهيم بن أدهم إذا صاحبه أحد شارطه على ثلاثة أشياء: أن تكون الخدمة والأذان له، وأن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيدهم.

فقال له يوماً رجل من أصحابه: أنا لا أقدر على هذا؟ فقال: أعجبني صدقك.

وقال يوسف بن الحسين: قلت لذي النون: مع من أصحب؟ فقال: مع من لا تكتمه شيئاً يعلمه الله تعالى منك.

وقال سهل بن عبد الله لرجل: إن كنت ممن يخاف السباع فلا تصحبني. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن الحسن العلوي يقول: حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال: حدثنا أبو القاسم بن منبه قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار.

وحكى الجنيد قال: لما دخل أبو حفص بغداد كان معه إنسان أصلع لا يتكلم بشيء.. فسألت أصحاب أبي حفص عن حاله، فقالوا: هذا رجل أنفق عليه مائة ألف درهم، واستدان مائة ألف درهم أنفقها عليه، ولا يُرخص له أبو حفص أن يتكلم بحرف.

وقال ذو النون: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. وقال رجل لذي النون: مع من أصحب؟ فقال: مع من إذا مرضت عادك، وإذا أذنت تاب عليك.

سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول: الشجر إذا نبت بنفسه ولم يستنبتة أحد يورق ولكنه لا يثمر، كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ

يتخرج به لا يجيء منه شيء.

وكان الأستاذ أبو علي، يقول: أخذت هذا الطريق عن النصراباذي،
والنصراباذي عن الشبلي، والشبلي عن الجنيد، والجنيد عن السري،
والسري عن معروف الكرخي، ومعرف الكرخي عن داود الطائي، وداود
الطائي لقي التابعين.

وسمعه يقول: لم أختلف إلى مجلس النصراباذي قط إلا اغتسلت قبله.
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: ولم أدخل أنا على الأستاذ أبي علي في
وقت بدايتي إلا صائماً، وكنت أغتسل قبله، وكنت أحضر باب مدرسته
غير مرة فأرجع من الباب؛ احتشاماً منه أن أدخل عليه، فإذا تجاسرت مرة
ودخلت المدرسة كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبني شبه خدرٍ، حتى
لو غرزني إبرة - مثلاً - لعلني كنت لا أحسن بها، ثم إذا قعدت لواقعة
وقعت لي لم أحتج أن أسأله بلساني عن المسألة، فكما كنت أجلس كان
يبتدئ بشرح واقعتي، وغير مرة رأيت منه هذا عياناً، وكنت أفكر في
نفسي كثيراً أنه لو بعث الله في وقتي رسولاً إلى الخلق هل يمكنني أن أزيد
من حشمتي على قلبي فوق ما كان منه، رحمه الله، فكان لا يتصور لي أن
ذلك ممكن، ولا أذكر أنني في طول اختلافي إلى مجلسه، ثم كوني معه بعد
حصول الوصلة، أن جرى في قلبي أو خطر ببالي عليه قط اعتراض، إلى أن
خرج رحمه الله من الدنيا.

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني، رحمه الله، قال: أخبرنا محمد ابن أحمد العبدی، قال: أخبرنا أبو عوانة، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا خلف بن تميم أبو الأحوص، عن محمد بن النضر الحارثي، قال: أوحى الله سبحانه، إلى موسى عليه السلام: كن يقظاناً.. مرتاداً لنفسك أخذاناً. وكل خدن لا يؤثيك على. مسرة فاقصه. ولا تصحبه؛ فإنه يقسى قلبك، وهو لك عدو، وأكثر من ذكرى تستوجب على شكري والمزيد من فضلي. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت عبد الله.. ابن المعلم يقول: سمعت أبا بكر الطمستاني يقول: اصحبوا مع الله، فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله، لتوصكم بركات صحبتهم إلى صحبة الله عز وجل.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

—“তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” [তাওবাহ : ৪০]

যেভাবে আল্লাহ তা'আলা সিদ্দীকের জন্য সুহবত প্রমাণিত করলেন, তদ্রূপ তাঁর জন্য করুণাও প্রকাশ করলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কবে যে আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করবো!” সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি আপনার বন্ধু নই? তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তোমরা আমার সাথী। তবে যারা আমাকে না দেখে ঈমান এনেছে, তারা হলো আমার বন্ধু। তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি উদগ্রীব।”

সুহবত তিন প্রকার: ১. নিজ থেকে উচ্চ স্তরের ব্যক্তির সাথে সুহবত। আসলে এটা এক প্রকার খিদমাত। ২. নিজ থেকে নীচ স্তরের লোকদের সুহবত। এ সুহবতের দাবী হলো, তুমি তাদেরকে করুণা ও দয়া করবে। আর তারা তোমাকে সম্মান করবে ও মেনে চলবে। ৩. সমবয়সী ও সমপর্যায়ের লোকদের সুহবত। এ সুহবতের ভিত্তি হলো উদারতা, বদান্যতা এবং আত্মবিলুপ্তি। তাই যে ব্যক্তি তার চেয়ে উঁচু স্তরের কোনো শায়খের সুহবতে থাকবে, এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অভিযোগ না করাই তার আদব। তার কাছ থেকে কোনো অপছন্দীয় কাজ প্রকাশ পেলে তা হাসিমুখে সহ্য করা। পক্ষান্তরে তার মধ্য থেকে যেসব হালের প্রকাশ ঘটবে তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা।

আমাদের এক বন্ধু মানসুর ইবনে খালফ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কতো বছর আবু উসমান মাগরিবীর সুহবতে ছিলেন? তিনি একটু রাগের সুরে জবাব দিলেন, আমি তাঁর সুহবতে থাকি, নিঃসন্দেহ এককালে খিদমতে ছিলাম।”

তুমি যখন তোমার নীচ স্তরের কোনো লোকের সান্নিধ্যে থাকো তখন তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবে। যদি না দাও তবে খিয়ানত হবে। এজন্য হযরত আবুল খায়ির তাইনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জাফর বিন মুহাম্মদের নিকট পত্র লিখলেন, মূর্খ দরবেশদের ত্রুটির জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তাদেরকে আদব-কায়দা না শিখিয়ে নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত-অপরদিকে ওরা মূর্খই থেকে গেলো। তুমি যখন সমপর্যায়ের লোকের সুহবতে থাকবে, তখন তার ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে যাবে। যতদূর সম্ভব তার কাজ-কর্মের সুন্দর ব্যাখ্যা মেনে নেবে। কোনো ব্যাখ্যা না পেলে নিজেকে তিরস্কার করবে।

হযরত আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু সুফিয়ান দারানীকে জিজ্ঞেস করলাম, অমুক শায়খের কোনো প্রভাব আমার মধ্যে কেনো পড়ে না? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমার অন্তরেও প্রভাব পড়ে না। তবে হে আহমদ! জেনে রেখো আমরা বোধহয় একই স্থান থেকে এসেছি। আমরা নেক লোকের অন্তর্ভুক্ত নয়- তাই তাঁদেরকে আমাদের পছন্দ হয় না।”

এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলেন। বিদায়ক্ষণে তিনি ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকলে, আমাকে সংশোধনের উপদেশ দিন। তিনি বললেন, “আমি তোমার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখি নি। বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তোমাকে দেখেছি। তোমার আচার-আচরণকে আমি ভালো বলে গ্রহণ করেছি। তাই দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অন্যকে জিজ্ঞেস করো।” এ বিষয়ে সুফিগণ আবৃত্তি করতেন:

পরিতৃপ্ত চোখ কোন ভুল-ত্রুটি দেখে না,
অপরদিকে অসম্ভব চোখে প্রতিটি ভুলই ভেসে আসে।

ইব্রাহীম ইবনে শায়বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “কোনো শায়খ যখন বলতেন, ‘আমার জুতা’- তখন আমরা তাঁর সুহবতে আর থাকতাম না।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ হযরত আবু আহমদ কালানিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বসরায় একদল সুফির সাথে ছিলাম। তাঁরা আমাকে বেশ সম্মান করলেন। এক সময় একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমার’ লুঙ্গি কোথায়? তখন সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিপাত থেকে দূরে পড়ে যায়।”

হযরত জাক্কাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “চল্লিশ বছর যাবৎ আমি এসব সুফিদের সাথে ছিলাম। আমি তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব দেখেছি। তাঁরা তো একে অন্যকে খুব ভালোবাসতেন। আসলে এ পথের পথিকের মধ্যে যদি তাকুওয়া ও পরহেজগারী না থাকে তাহলে তো সে হারাম খেয়ে ফেলবে!” একব্যক্তি হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, আবু মুহাম্মদ! আমি আপনার সুহবত কামনা করছি। তিনি বললেন, “আমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ মারা যান, তখন বাকী লোকগণ কার সুহবতে থাকবেন?” তখন লোকটি উত্তর দিলেন, “আল্লাহর সুহবতে”। সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও সাথে সাথে বললেন, “তাহলে এম্মুণি তাঁর সুহবত গ্রহণ করো।”

এক সুফি অপর আরেকজন সুফির সুহবতে ছিলেন দীর্ঘদিন। এক সময়, একজন সাথী বিদায় নিতে চাইলেন। অপরজন জবাব দিলেন, এক শর্তে আপনি বিদায় নিতে পারেন। আমাদের উপরের স্তরের কোনো ব্যক্তি ছাড়া কারো সুহবতে থাকবেন না। আসলেই যদি কেউ আমাদের উপরের স্তরের হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সুহবতে

যাবেন না। তখন ঐ সাথী বললেন, আপনার কথার দ্বারা অন্তর থেকে বিচ্ছেদের জ্বালা দূর হলো।

হযরত কান্দানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমার সুহবতে এক ব্যক্তি আসলেন। লোকটি সম্পর্কে আমার মধ্যে বিরূপ ভাব জন্মালো। এ ভাবটি চলে যাওয়ার জন্য আমি তাকে কিছু উপহার দিলাম। কিন্তু কাজে আসলো না। আমি আগের মতোই ছিলাম। এরপর একদিন তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলাম। বললাম, আপনার পা আমার গালে রাখুন! তিনি অস্বীকার করলেন। বললাম, আপনাকে এ কাজ করতেই হবে। তিনি পা রাখলেন। আমি স্থির করলাম, যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা এই বিরূপ ভাব আমার অন্তর থেকে ওঠাবেন, তার পা আমার গাল থেকেও সরাবো না। যখন অনুভব করলাম, অন্তর থেকে এই খারাপ ভাবটি বিলুপ্ত হয়েছে, তখন আমি বললাম, এবার আপনার পা সরান।”

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লাকড়ি সংগ্রহ ও বাগানে মালির কাজ করতেন। এ থেকে যা আয় হতো সাথীদের জন্য ব্যয় করতেন। এক সময় একদল সাথীর সাথে ছিলেন। দিনের বেলা কাজ করে রাতে এসে উপার্জিত অর্থ তাদের জন্য ব্যয় করতেন। তারা দিনে রোজা রাখতেন ও রাতে ইফতারের জন্য সমবেত হতেন। কাজ থেকে ফিরে আসতে ইব্রাহীমের প্রায়ই দেরী হতো। এক রাতে সাথীরা বললেন, আজ আমরা তাকে ছাড়াই ইফতার করে নিই। সুতরাং ইফতার সেরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিরে এসে দেখলেন, তারা ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন। বললেন, মিসকিনদের দল! বোধ হয় তাদের কাছে কোনো খাবার নেই। তারপর তিনি নিজেই কিছু আটা পিষলেন। এরপর আগুন ধরালেন। গরম অঙ্গারের প্রভাবে সব সাথী ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সবাই লক্ষ্য করলেন, ইব্রাহীম অগ্নিতে ফুঁৎকার দিচ্ছেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মনে হলো তোমাদের নিকট খাবার নেই- তাই না খেয়ে ঘুমিয়ে আছো। তাই তোমাদেরকে সজাগ করতে চাইলাম। এ কথা শুনে তারা পরস্পরের সাথে বলাবলি করতে লাগলো, দেখো! ইব্রাহীম আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করছেন, আর আমরা তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করছি?

কোনো মানুষ যখন হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবত কামনা করতো তিনি তাকে তিনটি শর্ত দিতেন: ১. খিদমত তিনি নিজে করবেন। ২.

আযানের দায়িত্ব তাঁরই থাকবে। ৩. এছাড়া খরচও তিনি বহন করবেন। একবার তাঁর এক শিষ্য বললেন, হযরত! আমি এসব শর্ত মানতে পারবো না। তিনি বললেন, তোমার এরূপ বন্ধুত্বে আমি স্তম্ভিত!

হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, কার সুহবতে থাকবো? তিনি জবাব দিলেন, যার কাছে তুমি তোমার ব্যক্তিগত বিষয়-আসয় লুকিয়ে রাখো না- যেগুলো শুধু আল্লাহ তা’আলা জানেন।” হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরেক ব্যক্তিকে বললেন, “যদি হিংস্র প্রাণীর প্রতি তোমার ভয় থাকে তাহলে আমার সুহবতে আসবে না।”

হযরত বিশর ইবনে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মন্দ লোকদের সুহবতে থাকলে ভালো মানুষদের প্রতি অহেতুক কুধারণার জন্ম নেয়।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, “হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন বাগদাদে আসলেন, তাঁর সাথে ছিলেন এক বোবা ব্যক্তি। আমি আবু হাফসের সাথীদেরকে এ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তারা বললেন, এ ব্যক্তি আবু হাফসের জন্য ১ লক্ষ দিরহাম ব্যয় করেছেন। এজন্য আবু হাফস তাঁকে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন। আসলে তিনি বোবা নন।”

হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহর সুহবতে থাকলে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। মাখলুকের সাথে থাকবে কল্যাণকামিতার মানসিকতা নিয়ে। নফসের সাথে থাকবে তার সঙ্গে বিরোধিতা করে। আর শয়তানের সাথে থাকবে শত্রুতা পোষণ করে।” এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কার সুহবতে থাকবো? জবাব দিলেন, “যিনি তোমার অসুস্থতার সময় সেবা করেন ও গোনাহ করলে তাওবাহ করার তাওফিক দেন।”

উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে গাছ কারো সহযোগিতা ছাড়াই নিজে নিজে উৎপন্ন হয়, এটি পল্লবিত হয় ঠিকই কিন্তু ফলবান হয় না। এভাবে মুরীদের জন্য যখন কোন মুরশিদ থাকবেন না, তার কাছ থেকে কল্যাণ প্রকাশ পাবে না। তিনি আরো বলেন, আমি এ পথে এসেছি হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

থেকে, তিনি জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত মারুফ খারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত দাউদ তায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাবিঈনের সাথে।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে কোনদিনই গোসল না করে যাই নি।” লেখক কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি প্রাথমিক দিনে উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাতের সময় রোযা রাখতাম এবং গোসল করতাম। তাঁর মাদ্রাসার দোয়ারে পৌঁছিয়ে পুনরায় পেছনে সরে যেতাম এবং পুনরায় আগে বাড়তাম। যখন ভেতরে প্রবেশ করতাম তখন লজ্জা ও ভয়ে নীরব থাকতাম। শরীরে সুঁই বিদ্ধ হলেও হয়তো আমি টেরই পেতাম না। কোনো বিষয় জানতে চাইলে মুখ খুলে জিজ্ঞেস করার সাহস পেতাম না হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় তিনি নিজেই বিষয়টি সম্পর্কে বলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো দীর্ঘদিনের। দুনিয়া থেকে বিদেয় হওয়ার পূর্ব অবধি কোনো প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ পর্যন্ত করি নি।”

ALL RIGHTS RESERVED

মুহাম্মদ ইবনে নজর হারিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলা মুসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: জাঘ্রত থাকো! বন্ধুদের সাথে থাকো! তবে যার বন্ধুত্বে তুমি আনন্দ পাও না, তার সান্নিধ্যে যাবে না। কারণ, এতে তোমার অন্তর কঠোর হবে- সে তো তোমার শত্রু। বেশী বেশী করে আমাকে স্মরণ করো। তাহলে আমার শুকুর আদায় করতে পারবে এবং অধিক দয়া ও করুণা লাভের অধিকারী হবে।”

হযরত আবু বকর তিমিসতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লাহ তা’আলার সুহবতে থাকো। যদি এর ক্ষমতা না রাখো তাহলে যারা আল্লাহর সুহবতে থাকেন তাঁদের সুহবতে যাও। তাঁদের সাহচর্যের বরকতে আল্লাহর সাহচর্যের মাক্বামে পৌঁছতে পারবে।”

باب التوحيد

বাবুত তাওহীদ [একত্ববাদ অধ্যায়]

قال الله عزَّ جَلَّ: " وإلهكم إله واحد . "

أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك، رضي الله عنه، قال حدثنا أحمد بن محمود بن خرزاذ قال: حدثنا مسيح بن حاتم العكلي قال: حدثنا الحجي عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن سعد ابن حاتم العتكي، عن ابن أبي صدقة: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

" بينا رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد، فقال لأهله: إذا متَّ فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروا نصفي في البرِّ ونصفي في البحر في يوم ريح. ففعلوا.. فقال الله عزَّ وجلَّ للريح: أدِّي ما أخذت، فإذا هو بين يديه، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أستحياء منك، فغفر له .. "

التوحيد: هو الحكم بأن المله واحد، والعلم بأن الشيء واحد أيضاً توحيد، ويقال: وحدته: إذا وصفته بالوحدانية، كما يقال: شجعت فلاناً إذا نسبته إلى الشجاعة، يقال في اللغة: وَحَدَ يحد فهو واحد وَوَحَدٌ، ووَحِيدٌ؛ كما يقال: فرد فهو فارد، وفَرْدٌ، وفريد.

وأصل أحد وحد فقلبت الواو همزة، والواو المفتوحة قد تقلب همزة، كما

تقلب المكسورة والمضمومة، ومنه امرأة أسماء، بمعنى وسما، من الوسامة، ومعنى كونه، سبحانه، واحداً على لسان العلم، قيل: هو الذي لا يصحّ في وصفه الوضع والرفع، بخلاف قولك: إنسان واحد؛ لأنك تقول إنسان بلا يد ولا رجل، فيصح رفع شيء منه، واسحق، سبحانه، إحدى الذات، بخلاف الأسم الجملة الحاملة.

وقال بعض أهل التحقيق في معنى أنه واحد: نفى التقسيم لذاته، ونفى التشبيه عن حقه وصفاته، ونفى الشريك معه في أفعاله ومضنوعاته. والتوحيد ثلاثة: توحيد الحق للحق، وهو علمه بأنه واحد وخيره عنه بأنه واحد.

والثاني: توحيد الحق، سبحانه، للخلق، وهو حكمه، سبحانه، بأن العبد موحد، وخلقه توحيد العبد. والثالث: توحيد الخلق للحق، سبحانه، وهو علم العبد بأن الله، عز وجل، واحد، وحكمه وإخباره عنه بأنه واحد.

فهذه جملة في معنى التوحيد على شرط الإيجاز والتحديد. واختلفت عبارات الشيوخ عن معنى التوحيد: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: وقد سئل عن التوحيد. فقال: أن تعلم أن قدرة المله تعالى في الأشياء بلا

مزاج، وصنعه للأشياء بلا علاج، وعلّة كلّ شيء صنعه ولا علة لصنعه، ومهما تصور في نفسك شيء فالله بخلافه.

وسمعتة يقول: سمعت أحمد بن محمد بن زكريا يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت عبد الله بن صالح يقول: قال الجريري: لبس لعلم التوحيد إلا لسان التوحيد.

وسئل الجنيد عن التوحيد فقال: إفراد الموحّد بتحقيق وحدا نيته بكمال أحديته أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الأضداد والأنداد والأشياء بلا تشبيه ولا تكيف ولا تصوير ولا تمثيل: " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .

وقال الجنيد: إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد تناهت إلى الحيرة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين بن مقسم يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول ذلك، وسئل الجنيد عن التوحيد، فقال: معنى تضمحل فيه الرسوم، وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل وقال الحصري: أصولنا في التوحيد خمسة أشياء.

رفع الحدث وإفراد القدم، وهجر الإخوان، ومفارقة الأوطان، ونسيان ما غُلم على وجْه.

سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: كنت في صحن الجامع ببغداد يعني جامع المنصور والحصري يتكلم في التوحيد، فرأيت ملكين يعرجان

إلى السماء، فقال أحدهما لصاحبه: الذي يقول هذا الرجل علم التوحيد والتوحيد غيره، يعني كنت بين اليقظة والنوم.

وقال فارس التوحيد هو إسقاط الوسائط عند غلبة الحال والرجوع إليها عند الأحكام، وأن الحسنات لا تغير الأقسام من الشقاوة والسعادة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر بن شاذان يقول: سمعت الشبلي يقول: التوحيد: صفة الموحّد حقيقة وحلية الموحّد رسماً.

وسئل الجنيد عن توحيد الخاص فقال: أن يكون العبد شبحاً بين يدي الله، سبحانه، تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته، في لجج بحار توحيده، بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته، في حقيقة قربيه بذهاب حسنه وحركته. لقيام الحق، سبحانه له فيما أراد منه، وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله، فيكون كما كان قبل أن يكون.

وسئل البوشنجي عن التوحيد فقال: غير مشبه الذوات ولا منفي الصفات. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسين العنبري يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول، وقد سئل عن ذات الله، عزّ وجلّ. فقال: ذات الله تعالى موصوفة بالعلم، غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حدّ ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقي

ظاهراً في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته؛ فالقلوب تعرفه، والعقول لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالآبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.

وقال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد: ما قاله أبو بكر الصديق، رضي الله عنه.

سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. قال الأستاذ أبو القاسم: ليس يريد الصديق، رضي الله عنه، أنه لا يعرف؛ لأن عند المحققين: العجز عجز عن الموجود، دون المعدوم، كالمقعد عاجز عن قعوده؛ إذ ليس بكسب له ولا فعل، والقعود موجود فيه، كذلك العارف عاجز عن معرفته، والمعرفة موجودة فيه؛ لأنها ضرورية.

وعند هذه الطائفة المعرفة به سبحانه في الانتهاء ضرورية. فالمعرفة الكسبية في الابتداء، وإن كانت معرفة على التحقيق، فلم يعدّها الصديق رضي الله عنه شيئاً بالإضافة إلى المعرفة الضرورية، كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شعاعها عليه.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن سعيد البصري بالكوفة يقول: سمعت ابن الأعرابي يقول: قال الجنيد: التوحيد الذي انفرد به الصوفي هو: إفراذ القدم عن الحدث والخروج عن الأوطان، وقطع المحاب وترك ما علم وجهل، وأن يكون الحق، سبحانه، مكان الجميع.

وقال يوسف بن الحسين: من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على ممر الأوقات إلا عطشاً.

وقال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مفارق لعلمه.
وقال الجنيد أيضاً: علم التوحيد طوى بساطه منذ عشرين سنة، والناس يتكلمون في حواشيه!! سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد الأصبهاني يقول: وقف رجل علي الحسين بن منصور، فقال: من الحق الذي يشيرون إليه؟ فقال: معل الأنام ولا يعتل.

وسمعت يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول: من اطلع على ذرة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمله.
سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل الشبلي؛ فقليل له أخبرنا عن توحيد مجرد وبلسان حق مفرد.

فقال: ويحك!! من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، ومن أشار إليه فهو ثنوي، ومن أوماً إليه فهو عابد وثن، ومن نصدق فيه فهو غافل، ومن سكت عنه فهو جاهل، ومن توهم أنه واصل فليس له حاصل، ومن رأى أنه قريب فهو بعيد، ومن تواجد فهو فاقد، وكل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتوه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود إليكم، محدث مصنوع مثلكم.

وقال يوسف بن الحسين: توحيد الخاصة أن يكون بسر ووجده وقلبه

كأنه قائم بين يدي الله تعالى يجري علي تصارييف تدبيره وأحكام قدرته في
بجار توحيدده بالفناء عن نفسه وذهاب حسه، بقيام الحق سبحانه له في
مراه منه، فيكون كما هو قيل أن يكون في جريان حكمه سبحانه عليه.
وقيل: التوحيد للحق سبحانه، والخلق طفيلي.

وقيل: التوحيد: إسقاط الياءات؛ لا تقول لي وبني ومني وإلي.
وقيل: لأبي بكر الطمستاني: ما التوحيد؟ فقال: توحيد، وموحد، وموحد،
هذه ثلاثة.

قال رويم: التوحيد هو آثار البشرية وتجرد الألوهية.
سمت أبا علي الدقاق يقول في آخر عمه، وكان قد اشتدت به العلة، فقال:
من أمارات التأييد حفظ التوحيد فيأوقات الحكم، ثم قال؛ كالمفسر لقوله
مشيراً إلى ما كان من حاله، هو: أن يقرضك بمقاريض القدرة في إمضاء
الأحكام قطعةً وأنت شاكر حامد.

وقال الشبلي: ما شم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد.
وقال أبو سعيد الخراز: أول مقام لمن وجد علم التوحيد، وتحقيق بذلك،
فناء ذكر الأشياء عن قلبه، وانفراده بالله عزَّ وجلَّ.
وقال الشبلي لرجل: أتدري لم لا يصح توحيدك؟ فقال: لا!! فقال: لأنك
تطلبه بك.

وقال ابن عطاء: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد، وهو أن يكون

القائم به واحداً.

ويقال من الناس من يكون مكشفاً بالأفعال، يرى الأحداث بالله تعالى، ومنهم من هو مكشف بالحقيقة، فيضمحل إحساسه بما سواه، فهو يشاهد الجمع سرّاً بسرّ، وظاهره بوصف التفرقة.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت علي بن محمد القزويني يقول: سمعت القنفذ يقول: سئل الجنيد عن التوحيد، فقال سمعت قائلاً يقول:

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

وغنى لي من قلبي

وغنيت كما غنّيت

ALL RIGHTS RESERVED

وكنا حينما كانوا

وكانوا حينما كنا

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

فقال السائل: أهلك القرآن والأخبار؟! فقال: لا، ولكن الموحد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

-“তোমাদের উপাস্য একই মাত্র উপাস্য।” [বাক্বারাহ : ১৬৩]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পূর্বেকার যুগের এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি জীবনে কোনো নেক কাজ করেন নি, তবে তাওহীদের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তার পরিবারকে বললেন, মৃত্যুর পর আমাকে জ্বালিয়ে অঙ্গারে

পরিণত করবে। যেদিন প্রবল বাতাস হবে, অঙ্গারের একাংশ স্থলভূমিতে বাতাসে ও অপরাংশ সাগর জলে ফেলে দেবে। লোকটির মৃত্যুর পর পরিবার পরিজন অনুরূপই করলো। আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা সাগর ও বাতাসকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাকিছু গ্রহণ করেছো তা সামনে উপস্থিত করো। তখন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য মৃত্যুর সময় এভাবে ওসিয়ত করেছিলে? সে বললো, হে প্রভু! আপনার সামনে উপস্থিত হতে আমার ভীষণ লজ্জাবোধ হয়েছিল। একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।”

তাওহীদের অর্থ হলো, আল্লাহ যে এক, একথা বিশ্বাস করা। তত্ত্ববিদদের মতে ‘তিনি এক’ কথাটির মর্ম হলো, তাঁর সত্তাকে বণ্টন না করা। তাঁর জাত ও সিফাতের তুলনা না করা। তাঁর কাজ-কর্মে কাউকে শরীক না করা।

তাওহীদ তিন প্রকার: ১. আল্লাহর জন্য আল্লাহর তাওহীদ। এর মানে, এটা জ্ঞান রাখা, তিনি এক। আর তিনি যে এক, এ সংবাদ স্বয়ং তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। ২. মাখলুকের জন্য আল্লাহর তাওহীদ। এর মানে, আল্লাহর নির্দেশ হলো, বান্দা আল্লাহকে এক মানবে। ৩. আল্লাহর জন্য মাখলুকের তাওহীদ। এর মানে হলো, আল্লাহ যে এক, মাখলুক এটা বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর একত্বের সংবাদ প্রচার করবে। তাওহীদ সম্পর্কে সারসংক্ষেপ কথা এখানে উল্লেখ করলাম।

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, “তুমি বিশ্বাস করবে, বস্তুর মধ্যে আল্লাহর যে ক্ষমতা আছে তাতে কোনো মিশ্রণ নেই। বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহর যে কর্ম আছে তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। প্রতিটি বস্তুর কারণে আল্লাহর কার্য নিহিত। কিন্তু কার্যে কোনো কারণ নিহিত নেই। তোমার অন্তরে যে বস্তুর চিত্রই ফুটে উঠুক না কেনো, আল্লাহ এর বিপরীত থাকেন।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন, “এর অর্থ হলো আল্লাহর একত্বের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি প্রদান। তিনি একক, তিনি কাউকে জন্ম দেন না- তাঁকেও কেউ জন্ম দেন নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই এবং সমপর্যায়েরও নেই। কারো সাথে তাঁর তুলনা চলে না। তিনি কেমন, তা বর্ণনাভীত। তাঁর কোনো আকৃতি বা উপমা দেওয়া যায় না:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

–“তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি।” [ইখলাস : ৩]”

তিনি আরো বলেন, “তাওহীদের মধ্যে কোনো রিওয়াজ-রীতি অবশিষ্ট থাকে না, সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে যায়। সব ধরনের জ্ঞান বিজ্ঞান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র আদি সত্তা আল্লাহ তা’আলাই থাকেন।”

হযরত হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদের ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচটি উসূল আছে: ১. আল্লাহর ব্যাপারে নতুনত্বের ধারণা না করা। ২. তিনি চিরন্তন তা বিশ্বাস করা। ৩. বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে দেওয়া। ৪. বাড়ি ঘর ত্যাগ করা। ৫. জানা ও অজানা সকল জ্ঞান ভুলে যাওয়া।”

হযরত মানসুর ইবনে খালফ মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বাগদাদের জামে মসজিদের আঙ্গিনায় বসা ছিলাম। হযরত হিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমার মধ্যে তন্দ্রার ভাব আসলো। দেখলাম, আকাশ থেকে দু’জন ফিরিশতা অবতরণ করলেন। এক সাথী অপরজনকে বলছেন, এ ব্যক্তি তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তবে তাওহীদ তো ভিন্ন জিনিস।”

হযরত হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদ মানে হালের সময় সর্বপ্রকার মাধ্যম ফেলে দেওয়া। হুকুম পালনে পুনরায় মাধ্যমের কাছে ফিরে যাওয়া। নেক কাজসমূহ সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে খাস লোকের তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাব দেন, “আল্লাহর সামনে নিস্তেজ বসে থাকা। এমন বান্দার উপর আল্লাহর নির্দেশ ওলট-পালট হয়ে জারি হবে। সে তাওহীদের সাগরের ঢেউয়ে ভাসতে থাকবে। নিজেকে ফানা করে দেবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা হেতু নিজের অনুভব ও চলনশক্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হবে। তার অনুভব হবে, শেষ হয়েও সে সৃষ্টির শুরু। এরপর, সে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে যেরূপ ছিলো ঠিক সেরূপ হয়ে যাবে।”

হযরত বুশঞ্জী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদ মানে আল্লাহর যাতের তুলনা না করা এবং তাঁর কোনো সিফাতকে অস্বীকার না করা।” হযরত সাহল

ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আল্লাহর যাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন, “আল্লাহ তা’আলার যাত জ্ঞানের দ্বারা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বেষ্টনী ও সীমানা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার জীবনে চর্মচক্ষে তাঁকে দেখা যায় না। কোনো প্রকার সীমানা-বেষ্টনী ও মিশ্রণ ছাড়া ঈমানের হাক্কিকাত দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় মাত্র। আখিরাতের জীবনে প্রকাশ্যে তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতার সাথে চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর অস্তিত্বের জ্ঞানান্বেষণ থেকে মাখুলককে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নিদর্শন দিয়ে তাঁকে চিনতে বলা হয়েছে। তাই, অন্তর তাঁকে ঠিকই চিনতে পারে কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে তিনি ধরা দেন না। কোনো প্রকার সীমানা ও শেষ ছাড়াই মু’মিনরা তাঁকে দেখতে থাকে। তাইতো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কী সুন্দর বলেছেন, ‘তাঁর যাত কতো পবিত্র! মাখলুকের জন্য তাঁকে চেনার কোনো রাস্তা বলে দেন নি। তবে তাঁকে চেনার অক্ষমতাই হচ্ছে একমাত্র পথ।’ সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু আনহুর এ কথার অর্থ নয় যে, তাঁকে চেনা যাবে না। এর মর্ম হলো, অস্তিত্বশীলের সামনেই প্রকৃত অক্ষমতা প্রকাশ পায়। অস্তিত্বহীনের সামনে এই অক্ষমতার প্রকাশ পায় না। যেমন, যে ব্যক্তি বসতে পারে না তাকে ‘মুকুঈদ’ বলে। সে কাজ করতে পারে না- উপার্জনে অপারগ। কিন্তু বসার ইচ্ছা ও প্রকৃতি তার মধ্যে বিদ্যমান। অনুরূপ, আরিফ ব্যক্তি আল্লাহর মা’রিফাত অর্জনে অক্ষম কিন্তু তার মধ্যে মা’রিফাত আছে।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সুফিদের ভাষায় তাওহীদ হলো, চিরন্তন বিশ্বাসকে ক্ষয়শীল বিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখা। জানা-অজানা সব জ্ঞান ভুলে যাওয়া। সব জায়গায় আল্লাহ আছেন এ বিশ্বাস রাখা।” হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদের সাগরে যে পড়ে যাবে, সময় যতো চলবে তার পিপাসা ততো বাড়তে থাকবে।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদের জ্ঞান আল্লাহর উজুদ (অস্তিত্ব) এর বিপরীত। আবার আল্লাহর অস্তিত্ব ইল্ম বা জ্ঞানের বিপরীত।”

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এক ব্যক্তি হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলো, সুফিগণ যে হকের দিকে ইশারা করেন, সে হক কে? তিনি জবাব দিলেন, লোকজন তাতে ডুববে এবং আর উঠবে না।” হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

বলেন, “যে ব্যক্তি ইলমে তাওহীদের একটি কণার উপর অবগত হলো, সে এই ইলমের বিশাল অংশকে বহন করতে অক্ষম হবে।”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, তাওহীদ সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করুন। তিনি জবাব দিলেন, “তোমার ধ্বংস হোক! যে ব্যক্তি তাওহীদ সম্পর্কে মুখের ভাষায় বর্ণনা দেবে সে তো, মুলহিদ! যে ইঙ্গিতে কথা বলবে সে দ্বিত্ববাদী কিংবা পৌত্তলিক। যে এ সম্পর্কে কথা বলবে সে গাফিল। আবার যে নীরব থাকবে সে মূর্খ। যে ব্যক্তি ধারণা করবে, আল্লাহ কাছে আসেন কিংবা আল্লাহর সাথে মিলন ঘটে- তবে সে তাওহীদের জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হবে। তাঁকে নিকটে ভাবলে তিনি দূরে আছেন। যে অস্থির হয়ে গেলো সে তো তাঁকে হারালো। তোমরা তোমাদের জ্ঞান, কল্পনা ও ধারণা দ্বারা তাঁকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করো, তা গ্রহণ হবে না। কারণ, সংজ্ঞাটা তোমাদেরই সৃষ্টি।”

হযরত ইউসুফ ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “খাস লোকদের তাওহীদ হলো, সে নিজেকে অন্তরে একথা ভাবে যে, সে সর্বদা আল্লাহর সামনে হাজির আছে। তার উপর দিয়ে বয়ে যাবে আল্লাহ তা’আলার বিভিন্ন হুকুম। সে তাওহীদের সাগরে ডুবে থাকবে- বিলীন হয়ে যাবে। তার কোনো অনুভূতি থাকবে না। কারণ সে হলো আল্লাহর মুরাদ। এমতাবস্থায় তার উপর আল্লাহর হুকুম হওয়ার পূর্বাবস্থা ও পরের অবস্থা সমান হবে।” একজন শায়খ বলেছেন, তাওহীদ মানে সব ধরনের ‘ইয়া’ [হে!] ফেলে দেওয়া। তুমি কখনো বলবে না ‘লী’ [-আমার জন্য], ‘বি’ [-আমার সাথে], ‘মিন্নি’ [-আমার থেকে], ‘ইলাইয়্যা’ [-আমি পর্যন্ত]।

হযরত আবু বকর তিমিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাওহীদ কি? জবাব দিলেন, “এটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ের নাম: তাওহীদ [একত্ববাদের ঘোষণা], মুয়াহহিদ [একত্ববাদ ঘোষণাকারী] ও মুয়াহহাদ [যাকে ঘোষণা করা হয়েছে।]” হযরত রুয়াইম বিন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তাওহীদ মানে মাখলুকের বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শন আর আল্লাহর উলুয়িয়াতের একাকীত্ব।” হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে ব্যক্তি তাওহীদের কোনো প্রকার অনুভব পেলো সে তাওহীদের সুন্ধান থেকে বঞ্চিত হলো।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

“তাওহীদের প্রথম স্তর হলো, অন্তর থেকে বস্তুর আলোচনা বিলুপ্ত হওয়া। এই অন্তর কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া।”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে বললেন, “তুমি কি জানো তোমার তাওহীদ কেনো শুদ্ধ হয় না?” লোকটি জবাব দিলেন, না। তিনি বললেন, “এর কারণ হলো নিজের মাধ্যমে আল্লাহকে অনুসন্ধান করছো।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “তাওহীদের হাক্কিকাত লাভের নিদর্শন হলো তাওহীদ ভুলে যাওয়া! অর্থাৎ সর্বদা একক সত্তার সামনে থাকা।” একজন শায়খ বলেন, যে সমস্ত লোক কাজ-কর্মের দিকে লক্ষ্য করে তারা চোখে দেখতে সক্ষম হয় কিভাবে আল্লাহর কার্যাদি সম্পাদন হচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা হাক্কিকাত অবলোকন করে, তাদের অস্তিত্ব ও অনুভূতি আল্লাহর সামনে একদম বিলীন হয়ে যায়।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাওহীদ কি? তিনি জবাব দেন, “আমি এক ব্যক্তিকে আবৃত্তি করতে শুনেছি:

তিনি আমার কাছে আমার হৃদয় থেকে গীত করলেন এবং আমি তার কাছে গীত করলাম তারই মতো

যেখানে তারা ছিলো আমরা ওখানে ছিলাম এবং তারা ছিলো সেখানে যেখানেই আমরা ছিলাম।”

প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি কুরআন ও হাদিস শেষ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, “অবশ্যই না। তবে তাওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে সহজভাবে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরবে।”

باب الخروج من الدنيا

বাবুল খুরাজ মিনাদ দুনিয়া [দুনিয়া থেকে বিদায়ের অধ্যায়]

باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا قال الله تعالى: " الذين تتوفاهم الملائكة طيبين " .

يعنى: طيبة نفوسهم، ببذلهم مُهْجهم لا يثقل عليهم رجوعهم إلى مولاهم. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال: حدثنا أبو هذبة، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت، وإن مفاصله ليسلم بعضها علي بعض؛ تقول: عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة "

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال: حدثنا سوار قال: حدثنا جعفر. عن ثابت، عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وأمنه مما يخاف " .

واعلم أن أحوالهم في حال النزع مختلفة؛ فبعضهم الغالب عليه الهيبة، وبعضهم الغالب عليه الرجاء، ومنهم من كشف له في تلك الحالة ما أوجب له السكون، وجميل الثقة.

حكى أبو محمد الجريري قال: كنت عند الجنيد في حال نزعه، وكان يوم الجمعة، ويوم نيروز، وهو يقرأ القرآن، فختمه، فقلت: في هذه الحالة يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتي.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول بلغني عن أبي محمد اهروي أنه قال: مكثت عند الشبلي الليلة التي مات فيها فكان يقول طول ليلته هذين البيتين:

ALL RIGHTS RESERVED

كلُّ بيت أنت ساكنه ... غير محتاج إلى السُّرُج

وجهك المأمول حجتنا ... يوم يأتي الناس بالحجج

وحكى عن عبد الله بن منازل أنه قال: إن حمدون القصار أوصى إلى أصحابه أن لا يتركوه في حال الموت بين النسوان.

وقيل لبشر الحافي، وقد احتضر كأنك يا أبا نصر تحب الحياة؟ فقال: القدوم على الله، عزَّ وجلَّ، شديد.

وقيل: كان سفيان الثوري إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر: أأتمر بشغل؟؟..

يقول: إن وجدت الموتَ فاشتره لي! فلما قربت وفاته كان يقول: كنا نتمناه..

فإذا هو شديد!! وقيل: لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب الوفاة بكى فليل له: ما يبكيك؟ فقال: أقدم على سيد لم أره.

ولما حضرت بلالاً الوفاة قالت امرأته: واحزنانه!! فقال: بل واطرباه.. غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه.

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون.

وقيل: كان مكحول الشامي الغالب عليه الحزن، فدخلوا عليه في مرض موته وهو يضحك، فليل له في ذلك، فقال: ولام لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت أحذره، وسرعة القدوم على ما كنت أرجوه وآمله.

وقال رويم: حضرت وفاة أبي سعيد الخراز، وهو يقول في آخر نفسه:

حينئذٍ قلوب العارفين إلى الذكر... وتذكّارهم وقت المناجاة للسرّ
أديرت كؤوس للمنايا عليهم... فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي السكر
هُمُوهُم جِوَالَة بِمَعْسَكِرٍ... به أهل ودّ الله كالأنجم الزهر

فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه... وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري

فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم... وما عرّجوا عن مسر بؤس ولا ضر

وقيل للجنيّد: إنّ أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت. فقال: لم يكن بعجيب أن تظير روحه اشتياقاً.

وقال بعضهم وقد قربت وفاته: يا غلام اشدّد كتافي وعفر خدي، ثم قال:

دنا الرحيل ولا براءة لي من ذنب، ولا عذر أعذر به، ولا قوة أنتصر بها..
أنت لي، أنت لي..

ثم صاح صيحة ومات، فسمعوا صوتاً: "استكان العبد لمولاه، فقبله".
وقيل لذي النون المصري عند موته: ما تشتهي؟ قال أن أعرفه قبل موتي
بلحظة.

وقيل لبعضهم وهو في النزاع: قل الله، فقال: إلى متى تقولون: قل الله، وأنا
محترق بالله؟! وقال بعضهم: كنت عند ممشاد الدينوري، فقدم فقير وقال
السلام عليكم، فردوا عليه السلام، فقال: هل هنا موضع نظيف يمكن
الإنسان أن يموت فيه؟ فأشاروا عليه بمكان، وكان ثمَّ عين ماء.. فجدد
الفقير الوضوء وركع ما شاء الله تعالى، ومضى إلى المكان الذي أشاروا إليه..
ومد رجله، ومات.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: كان أبو العباس الدينوري
يتكلم يوماً في مجلسه.. فصاحت امرأة تواجداً، فقال لها: موتي.. فقامت
المرأة فلما بلغت باب الدار التفتت إليه وقالت: قدُمتُ. ووقعت ميتة.
وقال بعضهم: كنت عند ممشاد الدينوري عند وفاته، فقيل له: كيف تجد
العلة؟! فقال سلوا العلة عني كيف تجدني، فقيل له. قل لا إله إلا الله،
فحول وجهه إلى الجدار وقال: أفنيت كُلَّ بكلك هذا جزاء من يحبك.
وقيل لأبي محمد الديلمي، وقد حضرته الوفاة، قل: لا إله إلا الله.

فقال هذا شيء قد عرفناه، وبه نفى، ثم أنشأ يقول:
تسربل ثوبُ النية لما هويته ... وَصَدَّ ولم يرض بأن أكُ عبده
وقيل للشبلي عند وفاته: قل لا إله إلا الله. فقال:
قال سلطان حبه ... أنا لا أقبل الرِّشا
فسلوه بحقه ... لم بقتلي تحرَّشا

سمعت محمد بن أحمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي التميمي
يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت بعض الفقراء يقول: لما مات
يحيى الاصطخري جلسنا حوله، فقال له رجل منا: قل أشهد أن لا إله إلا
الله، فجلس مستويًا.. ثم أخذ بيد واحد منا، وقال له: قل أشهد أن لا إله
إلا الله.. ثم أخذ بيد آخر.. حتى عرض الشهادة على جميع الحاضرين، ثم
مات.

ويحكى عن فاطمة أخت أبي علي الروذباري، أنها قالت: لما قرب أجل أخي
أبي الروذباري، وكان رأسه في حجري، فتح عينيه، وقال: هذه أبواب السماء
قد فتحت.. وهذه الجنان قد زُينت، وهذا قائل يقول لي: يا أبا علي قد
بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها.. ثم أنشأ يقول:

وحقَّك لا نظرتُ إلى سواك ... بعين مودة حتى أراك
أراك معذَّبِي بفتورٍ لحظ ... وبالحد المورد من جناك
ثم قال: يا فاطمة، الأول ظاهر، والثاني فيه إشكال.

سمعت بعض الفقراء يقول: لما قربت وفاة أحمد بن نصر، رحمه الله تعالى، قال له واحد: قل أشهد أن لا إله إلا الله فنظر إليه وقال له: لا تترك الحرمة بالفراسية بي حرمتي مكن.

وقال بعضهم: رأيت فقيراً يجود بنفسه غريباً.. والذباب على وجهه، فجلست أذب الذباب عن وجهه.. ففتح عينيه، وقال: من هذا؟ أنا منذ كذا سنة في طلب وقت يصفو لي فلم يتفق إلا الآن.. جئت أنت توقع نفسك فيه، مرّ؛ عافاك الله.

وقال أبو عمران الاضطخري: رأيت أبا تراب في البادية قائماً ميتاً لا يمسكه شيء.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: كان سبب وفاة أبي الحسين النوري أنه سمع هذا البيت.

لا زلت أنزل في ودادك منزلاً... تتحير الألباب عند نزوله فتواجد النودي وهام في الصحراء... فوق في أجمه قصب قد قطعت وبقي أصولها مثل السيوف، فكان يمشي عليها ويعيد عليها ويعيد هذا البيت إلى الغداة والدم يسيل من رجليه. ثم وقع مثل السكران، فتورمت قدماءه ومات.

وحكي أنه قيل له عند النزاع: قل لا إله إلا الله، فقال أليس إليه أعود.

وقيل: مرض إبراهيم الخواص في المسجد الجامع: بالري وكنت به علة

بالإسهال، فكان إذا قام مجلساً يدخل الماء.. ويتوضأ، فدخل الماء مرة فخرجت روحه.

سمعت منصوراً المغربي يقول دخل عليه يوسف بن الحسين عائداً له بعد ما أتى عليه أيام لم يعبه، ولم يتعهده، فلما رآه، قال للخواص: أتشتي شيئاً؟ قال: نعم، قطعت كبد مشوي.

قال الأستاذ أبو القاسم: لعل الإشارة فيه أنه أراد: أشتي قلباً يرقى لفقير، وكبداً تشتوي وتحترق لغريب؛ لأنه كالمستجنى ليوسف بن الحسين؛ حيث لم يتعهده.

وقيل: كان سبب موت بن عطاء أنه أدخل مرة على الوزير، فكلمه الوزير بكلام غليظ.

فقال له ابن عطاء: أهدأ يا رجل!! فأمر.. فضُرب بخفه على رأسه فمات منه. سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول: سمعت عبدالله بن علي التميمي يقول: سمعت أبا بكر الدقي يقول: كنا عند أبي بكر الزقاق بالغداة، فقال: إلهي: كم تبقيني ها هنا فما بلغ الغداة الأولى حتى مات. وحكي عن أبي علي الروذباري أنه قال: رأيت في البادية حدثاً، فلما رأيته قال: أما يكفيه أ، شغفني بحبه حتى علني، ثم رأيته يجود بروحه، فقلت له: قل لا إله إلا الله، فأنشأ يقول:

أيا من ليس لي عنه ... وإن عذبني بد

ويا من نال من قلبي ... منالاً ما له حد
وقيل للجنيذ: قل لا إله إلا الله، فقال: ما نسيته فأذكره!! وقال:

حاضر في القلب يعمره ... لست أنساه فأذكره
فهو مولاي ومعتدي ... ونصبي منه أوفر

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول: سألت جعفر بن نصير بكران الدينوري، وكان يخدم الشبلي، ما الذي رأيت منه؟ فقال: قال لي عليّ درهم مظلمة، وقد تصدّقت عن صاحبه بالوف، فما على قلبي شغل أعظم منه، ثم قال: وضئي للصلاة، ففعلت، فنسيت تحليل لحيته، وقد أمسك علي لسانه، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته، ثم مات، فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يفته حتى في آخر عمره أدب من آداب الشريعة.

سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا الحسن بن عبد الله الطرسوسي يقول: سمعت علوشاً الدينوري يقول: سمعت المزين الكبير يقول: كنت بمكة - حرصها الله تعالى - فوقع بي انزعاج، فخرجت أريد المدينة. فلما وصلت إلى بئر ميمونة إذا أنا بشاب مطروح؛ فعدلت إليه وهو ينزع؛ فقلت له: قل لا إله إلا الله.. ففتح عينيه؛ ما نشأ يقول:

أنا إن مت فالهوى حشو قلبي ... وبداء الهوى تموت الكرام
فشهق شهقة، ثم مات، فغسلته، وكفنته، وصليت عليه، فلما فرغت من

دفنه سكن ما كان بي من إرادة السفر، فرجعت إلى مكة.
وقيل لبعضهم: أتحبُّ الموت؟ فقال: القدوم على من يرجى خيره خير من
البقاء مع من يئو من شره.

وحكي عن الجنيد أنه قال: كنت عند أستاذي ابن الكرني، وهو يجود
بنفسه، فنظرت إلى السماء فقال: بعد، ثم نظرت إلى الأرض فقال: بعد،
يعني: أنه أقرب إليك من أن تنظر إلى السماء أو إلى الأرض، بل هو وراء
المكان.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت
الوجيهي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: دخلت مصر فرأيت الناس
مجتمعين، فقالوا: كنا في جنازة فتى سمع قائلاً يقول:

كبرت همة عبد ... طمعت في أن تراكا

فشهق شهقة ومات.

وقيل: دخل جماعة علممشاد الدينوري في مرض موته، فقالوا: ما فعل الله
بك وما صنع؟ فقال: منذ ثلاثين سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها
طرفي، وقالوا له عند النزع: كيف تجد قلبك؟ فقال: منذ ثلاثين سنة
فقدت قلبي.

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن التميمي
يقول: قال الوجهي: كان سبب موت ابن بنان أنه ورد على قلبه شيء، فهام

على وجهه، فلدحوقه في وسط متاهة بني إسرائيل في الرمل، ففتح عينيه وقال: ارتع، فهذا مرتع الأحباب. وخرجت روحه.

وقال أبو يعقوب النهرجوري: كنت بمكة، فجاءني فقير معه دينار، فقال: إذا كان غداً فأنا أموت، فأصلح لي بنصف هذا قبراً، والنصف الثاني لجهازي. فقلت في نفسي: ودخل الشاب؛ فإنه قد أصابته فاقة الحجاز، فلما كان الغد جاء؛ ودخل الطواف، ثم مضى وامتد على الأرض، فقلت: هو ذا يتماوت، فذهبت إليه، فحركته فإذا هو ميت. فدفنته كما أمر.

وقيل: لما تغيرت الحال على أبي عثمان الحيري مزق ابنه أبو بكر قميصاً ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني إن خلاف السنة في الظاهر من رياء في الباطن.

وقيل: دخل ابن عطاء على الجنيد، وهو يجود بنفسه؛ فسلم. فأبطأ في الجواب، ثم رد، وقال: أعذرني، فلقد كنت في وردي ثم مات.

وحكى أبو علي الروذباري قال: قدم علينا فقير، فمات، فدفنته وكشفت عن وجهه لأضعه في التراب ليرحم الله عز وجل غربته. ففتح عينيه وقال: يا أبا علي، أتدللني بين يدي من دللني؟! فقلت: يا سيدي أحياء بعد موت؟ فقال لي: بلى أنا حي، وكل محب لله، عز وجل، حتى لأنصرك غداً بجاهي يا روذباري.

ويحكى عن ابن سهل الأصفهاني أنه قال: أترون أني أموت كما يموت

الناس، مرض وعيادة، وإنما أدعى، فيقال: يا عليّ، فأجيب.
فكان يمشي يوماً، فقال: " لبيك ". ومات.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف
يقول: سمعت أبا الحسن المزين قال: لما مرض أبو يعقوب النهرجوري
مرض وفاته، قلت له، وهو في النزع: قل لا إله إلا الله، فتبسم إلي وقال:
إيائي تمني؟ وعزة من لا يذوق الموت ما بيني وبينه إلا حجاب العزة.
وانطفأ من ساعته، فكان المزين يأخذ بلحيته ويقول: حجام مثلي يلقي
أولياء الله الشهادة، وأخجلته منه!! وكان يبكي إذا ذكر هذه الحكاية.

وقال أبو حسين المالكي: كنت أصحب خيرا النساء سنين كثيرة، فقال لي
قبل موته بثمانية أيام: أنا أموت يوم الخميس وقت المغرب، وأدفن يوم
الجمعة قبل الصلاة، وستنسى هذا، فلا تنس.

قال أبو الحسين: فأنسيته إلى يوم الجمعة فلقيني من أخبرني بموته،
فخرجت لأحضر جنازته، فوجدت الناس راجعين يقولون: يدفن بعد
الصلاة.

فلم أنصرف، وحضرت، فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال،
فسألت من حضر وفاته، فقال: إنه غشي عليه، ثم أفاق، ثم التفت إلى
ناحية البيت وقال: قف عافاك الله، وإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور،
الذي أمرت به لا يفوتك، والذي أمرت به يفوتني؛ فدعا بماء فجدد وضوءه

وصلی، ثم تمدد، وغمض عينيه، فرؤي في المنام بعد موته، فقيل له: كيف حالك؟ فقال: لا تسأل، ولكني تخلصت من دنيا الوضرة.

وذكر أبو الحسين الحمصي مصنف كتاب بهجة الأسرار أنه لما مات سهل بن عبد الله انكبَّ الناس على جنازته، وكان في البلد يهودي نيف على السبعين، فسمع الضجة، فخرج لينظر ما كان، فلما نظر إلى الجنازة صاح وقال: أترون ما أرى؟ فقالوا: لا، ماذا ترى؟ فقال أرى أقواماً ينزلون من السماء يتسحون بالجنازة، ثم إنه تشهد، وأسلم، وحسن إسلامه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر بن قيس - بمصر - يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: كنت بمكة فجزت يوماً ببابني شيبة فرأيت شاباً حسن الوجه ميتاً، فنظرت في وجهه فتبسم في وجهي وقال لي: يا أبا سعيد، أما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتوا، وإنما ينقلون من دار إلى دار.

وسمعت يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجريري يقول: بلغني أنه قيل لذي النون المصري عند النزاع: أوصنا. فقال: لا تشغلوني فإني متعجب من محاسن لطفه.

وسمعت يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: سئل أبو حفص في حال وفاته: ما الذي تعظنا به؟ فقال: لست أقوى على القول، ثم رأى من نفسه قوة، فقلت له: قل حتى أحكي

عنك.

فقال: موعظتي: الانكسار بكل القلب على التقصير.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

-“ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকাবস্থায়।” [নাহল : ৩২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো: তাদের আত্মা পবিত্র। কারণ তারা অন্তরের রক্ত আল্লাহর রাস্তায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই তাদের মাওলার কাছে ফিরে যাওয়াটা তাদের জন্য কষ্টকর হয় না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “বান্দা মৃত্যুর অস্থিরতা ও বেহুঁশি অনুভব করতে পারে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অন্যকে বলে, তোমাকে সালাম জানাচ্ছি। কিয়ামত পর্যন্ত আমি তোমা থেকে এবং তুমি আমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে।”

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মৃত্যুপথযাত্রী যুবককে দেখতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী অনুভব করছো? যুবক বললেন, আল্লাহর রহমতের আশা রাখছি ও নিজের গুনাহ-খাতা নিয়ে খুব আতঙ্কিত আছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, “যে মু'মিন বান্দার অন্তরে মৃত্যুকালীন সময় এ দু'টি বিষয় থাকবে, আল্লাহ তাকে তা-ই দান করবেন যে জিনিসের উপর সে প্রত্যাশা করে। আর যে জিনিসকে সে ভয় করে তা থেকে তিনি তাকে নিরাপদ রাখবেন।”

জেনে রাখুন, মৃত্যুকালীন সময় আউলিয়াদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কারোর মধ্যে ভয়ের ছাপ বেশী থাকে। আর কারোর মধ্যে থাকে আশার প্রভাব প্রবল। কারোর সামনে যখন কোনো দৃশ্য প্রকাশ হয়, তখন অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। হযরত আবু মুহাম্মদ জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম।

সেদিন ছিলো শুক্রবার, নওরোজ। তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করলেন, পুরো খতম দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবুল কাসিম! আপনি কি অনুভব করছেন? জবাব দিলেন, “এটা আর কার জন্য উত্তম হতে পারে, একটু পরই যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে!”

হযরত আবু মুহাম্মদ হারাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে রাত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্তিকাল করেন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। সারারাত তিনি কবিতার এই দু’টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন:

যে ঘরের বাসিন্দা আপনি, সে ঘরের জন্য সূর্যের আলোর প্রয়োজন নেই।

যেদিন মানুষ দলীল-প্রমাণসহ হাজির হবে, সেদিন আপনার কাঙ্ক্ষিত চেহারাই হবে আমাদের দলীল।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মানাজির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হামদুন কাসসার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্তিকালের সময় সাথীদেরকে বললেন, আমার মৃত্যুর সময় নারীদেরকে কাছে রেখে যেনো না।”

হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মৃত্যুকালীন সময় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসেন? জবাব দিলেন, “আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া কতো কঠিন!”

হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন কোন সাথী জিজ্ঞেস করতেন, ‘আমি সফরে যাচ্ছি। আপনার জন্য কি কোনো হাদিয়া আনবো?’ তিনি জবাব দিতেন, “যদি কোথাও মউত পাও তাহলে তা আমার জন্য কিনে নিয়ে এসো!” যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো, তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমরা এর আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। কিন্তু এটা তো খুব কঠিন!”

হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যু যখন আসন্ন তিনি কাঁদলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেনো? জবাব দেন, “যে মালিককে কোনোদিন দেখি নি, সেই মালিকের সামনে যাচ্ছি!”

হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী বলে ওঠলেন, হায় আক্ষেপ! হায় আফসোস! তখন বিলাল বললেন, “না! তুমি বরং বলো, কী

অনন্দ! আগামীকাল আমরা বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করবো।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর সময় চোখ খুললেন। হাসি দিয়ে কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

-“এরূপ বিনিময়ের জন্য কর্মীদেরকে কাজ করে যাওয়া উচিত।” [সাফ্ফাত : ৬১]

হযরত মাকহুল শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বদা চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন থাকতেন। মৃত্যুর সময় সাথীরা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে হাসতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী ব্যাপার- হাসছেন যে? তিনি বললেন, “কেনো হাসবো না, যা থেকে আমি দূরে থাকার চেষ্টা করতাম, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। আর যার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করতাম তিনি তো দ্রুত এগিয়ে আসছেন।”

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় আমি তাঁর নিকটে হাজির হলাম। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শুধু আবৃত্তি করলেন:

আরিফদের অন্তর শান্ত থাকে আল্লাহর জিকির দ্বারা
আর শান্ত থাকে যখন তারা আল্লাহর সাথে কানকথা বলেন
তারা সদা ব্যস্ত সির [সূক্ষ্মতা] নিয়ে
তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সূরা-পাত্র যা নিয়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যু
তাই তারা এ জগৎ থেকে বিলুপ্ত হন যেনো মাতালের মতো
তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ ঘুরে বেড়ায় সৈনিকদের শিবিরে
যেখানে প্রভুর প্রেমাস্পদ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চমৎকার তারার মতো
এদিকে তাদের নশ্বর দেহ ইতোমধ্যে তাঁর প্রেম হেতু ধ্বংস হয়েছে
তাদের আত্মা, পর্দাবৃত হয়ে, স্বর্গারোহণ করেছে
তারা কিন্তু স্থির হবে না, যতক্ষণ না প্রেমাস্পদের নৈকট্য লাভ করে
না তারা পিছিয়ে যাবে, বিপর্যয় বা ক্ষতির সম্মুখীন হলে।”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো, হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর সময় বার বার অজ্ঞান হচ্ছিলেন। তিনি জবাব দেন, “এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। হয়তো আল্লাহর সাক্ষাতে তাঁর রূহ বার বার উড়ে যাচ্ছিলো।”

একজন শায়খের মৃত্যুর সময় ঘনি়ে আসলে তাঁর খাদিমকে নির্দেশ দিলেন, আমার মুখ বেঁধে দাও। এরপর বললেন, সফর খুবই নিকটে। কিন্তু আমি এখনো পাপমুক্ত হই নি। আমার সামনে এমন কোনো ওজর নেই যার মাধ্যমে আমি অপারগতা পেশ করবো। এমন কোনো শক্তি নেই যা থেকে সাহায্য নেবো। হে আল্লাহ! তুমিই হয়ে যাও আমার জন্য! তুমি আমার জন্য হয়ে যাও! এরপর চিৎকার দিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। উপস্থিত লোকজন গায়েব থেকে আওয়াজ শুনলেন, “বান্দা তার মাওলার নিকট আশ্রয় চেয়েছিল, তাই তিনি তাকে গ্রহণ করে নিলেন”।

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার ইচ্ছা কি? জবাব দেন, “আহ! মৃত্যুর এক মুহূর্ত পূর্বেও যদি তাঁকে চিনতে পারতাম!” একজন শায়খকে মৃত্যুর সময় লোকজন বললেন, বলুন আল্লাহ! তিনি বললেন, “তোমরা আর কতকাল বলবে ‘বলুন আল্লাহ, বলুন আল্লাহ!’ আমি তো আল্লাহর দ্বারা দক্ষ হয়ে গেছি।”

একজন শায়খ বলেন, আমি মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক দরবেশ এসে আসসালামু আলাইকুম বললেন। সকলে সালামের জবাব দিলেন। এরপর তিনি বললেন, এখানে কি পাক-পবিত্র জায়গা আছে যেখানে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে? লোকজন একটি জায়গার দিকে ইশার করলেন। ঐ জায়গার পাশে একটি ঝরণা ছিলো। দরবেশ সেখানে যেয়ে নতুন করে ওয়ু সারলেন। আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দিলেন নামায আদায় করলেন। এরপর সেখানে পা লম্বা করে শুয়ে পড়লেন ও মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত আবুল আব্বাস দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার এক মজলিসে বয়ান করছিলেন। এ সময় এক মহিলা অস্থির হয়ে চিৎকার দিলেন। দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি তাকে বললেন, মরে যাও! একথা শুনে মহিলা উঠে দাঁড়ালেন ও নিজের ঘরের দরজার নিকটে যেয়ে শায়খের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমি

মরে গেলাম! একথা বলেই তিনি জমিনের উপর ঢলে পড়লেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

একজন শায়খ বলেন, আমি মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটে ছিলাম যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যন্ত্রণা কিরূপ হচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, যন্ত্রণাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও, সে আমাকে কিরকম পেলো? আরেকজন বললেন, বলুন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, “আপনার সবকিছুর তরে আমার সর্বশক্তি বিলিয়ে দিয়েছি। আপনাকে যে ভালোবাসে এটাই তো তার বিনিময়।” এ কথা দু’টি উচ্চারণ করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

হযরত আবু মুহাম্মদ দুবাইলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মৃত্যুর সময় বলা হলো, বলুন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি জবাবে বললেন, “এটা এমন একটি জিনিস যার পরিচয় ইতোমধ্যে আমরা পেয়েছি। এর উপরই তো আমাদের মৃত্যু হয়।” এরপর আবৃত্তি করলেন:

আমি যখন তাঁর বিরহে কাতর তিনি পরে নিলেন বিষণ্ণতার বস্ত্র
তিনি দূরে চলে গেলেন আমি থেকে, কারণ তিনি চাননি আমি হয়ে যাই
তাঁর গোলাম।

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ওফাতের সময় বলা হলো, বলুন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি আবৃত্তি করলেন:

তার প্রেমের রাজা বললেন: ‘আমি কোনো উৎকোচ গ্রহণ করি না!’
জিজ্ঞেস করো, আমি কী তার মুক্তিপণ হতে পারি- তিনি কেনো আমাকে
হত্যা করতে এতোই উদগ্রীব!

হযরত আহমদ ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি একজন দরবেশকে বলতে শুনেছি, ইয়াহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর সময় আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন, ‘আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন। একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। উপস্থিত একজনের হাত ধরে বললেন, তুমি বলো ‘আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। এরপর আরেক ব্যক্তির হাত ধরে একই কথা বললেন। এভাবে উপস্থিত সবাইকে কালিমা শাহাদাত পাঠ করিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বোন ফাতিমা বর্ণনা করেন: আমার ভাই আবু আলীর মৃত্যুর সময় ঘনি়ে আসলে তাঁর মাথা আমার কোলে রাখলেন। উভয় চোখ খুললেন। এরপর বললেন, “ঐ তো, আকাশের দরজা খুলে গেছে! এই তো বাগ-বাগিচা সাজিয়ে রাখা হয়েছে! এই তো একজন ঘোষক আমাকে ডেকে বলছে, হে আবু আলী! তোমাকে আমরা চূড়ান্ত স্তরে এবার পৌঁছে দেবো যদিও তুমি ইতোমধ্যে সেখানে উপস্থিত হও নি।” এরপর তিনি আবৃত্তি করলে:

তোমার মহাসত্যের কসম! তুমি ছাড়া আর কারো পানে তাকাই নি
আবেগপূর্ণ চক্ষু দ্বারা, যতক্ষণ না আমি অবশেষে তোমাকে দেখেছি
আমার দুর্বল হওয়া আঁখির দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে পাই কিরূপ যন্ত্রণা তুমি
দিচ্ছ আমায়
এবং কিভাবে [তোমার] কপোল নিজেকে উন্মোচন করে তোমার মিষ্ট নবান্ন
থেকে।

একজন শায়খ বলেন, আহমদ ইবনে নসর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় এক ব্যক্তি তাকে বললেন, আপনি ‘আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন। তিনি তার দিকে চেয়ে বললেন, “হুরমত [মর্যদাশীলতা] ত্যাগ করো না!”। আবু ইমরান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমি দেখেছি। তিনি জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দাঁড়ানো ছিলেন। হযরত আবু নসর সাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর কারণ ছিলো, এই কবিতাটি। এটা আবৃত্তি করতে শুনলেন:

তোমার প্রেমের কারণে আমি গিয়েছি বার বার একটি স্থানে
যেখানে স্থায়ী প্রেমমত্ত হৃদয়গুলো হতভম্ব হয়ে যায়।

শ্রবণ করে তিনি অস্থির হয়ে জঙ্গলে ছুটে গেলেন। তলোয়ারের মতো ধারালো থাকা একটি বাঁশের ঝোপের উপর পড়ে গেলেন। এরপর বার বার ঝোপের উপর ওঠানামা করতে থাকেন। এদিকে যখম হেতু রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এরপর এক পর্যায়ে বেহুঁশ হয়ে যান। তাঁর উভয় পা ফুলে ওঠে। কিছুক্ষণ পরই তিনি ইন্তিকাল করলেন।” আরেক বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর সময় তাঁকে এক ব্যক্তি বললেন, লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি কি তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছি না?

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “[একজন শায়খ] রায় নামক শহরের জামে মসজিদে থাকাবস্থায় পেটের অসুখে অসুস্থ হলেন। তিনি মজলিসে উপস্থিত হতেন ও বার বার ওযুখানায় যেতেন। একবার অযু করতে গেলেন, আর তখনই তাঁর রুহ বের হয়ে গেল।”

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর ঘটনায় বর্ণিত আছে, তাঁকে মন্ত্রীরা কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বললেন। তিনি বললেন, আস্তে কথা বলো! এ ধমক শুনে মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, তাঁর মাথায় একটি চামড়ার মুজা নিক্ষেপ করো! এটা নিষ্কিণ্ত করার পরই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত আবু বকর দুক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমরা আবু বকর জাক্বাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে একদিন ভোরে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, হে মা’বুদ! আর কতকাল আমাকে এখানে রাখবে? এর পরদিন সকালে তিনি ইত্তিকাল করলেন।” হযরত আবু আলী রুজবাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জঙ্গলে আমি এক যুবকের সাক্ষাৎ পেলাম। আমাকে দেখে বললেন, এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তাঁর মুহাব্বতে আসক্ত হয়েছি। এরপর রোগাক্রান্ত হলেন। দেখলাম, তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত। বললাম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি আবৃত্তি করলেন:

হে একক! যার কাছ থেকে [আমি এসেছি], যদিও তিনি আমায় কষ্ট দিচ্ছেন, আমার তো পলায়নের সুযোগ নেই
হে একক! যিনি নিজেকে আমার হৃদয়ব্যাপী জড়িয়ে আছেন চিরকালের জন্য!”

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি জবাব দিলেন, কেনো? আমি কি তাঁকে ভুলে গেছি যে, এখন স্মরণ করবো? এরপর আবৃত্তি করলেন:

তিনি তো আমার হৃদয়ে উপস্থিত আছেন, তাঁর বাসস্থান সেথায়
আমি তাঁকে ভুলি নি যে, তাঁর কথা আমাকে স্মরণ করে দিতে হবে?

তিনি আমার শায়খ এবং সম্বল

তঁার থেকে আমার অংশটি বিরাট, অবশ্যই বিরাট!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি হযরত জাফর দিনাওয়ারী [তিনি ছিলেন শিবলী রাহ.-এর খাদিম] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুকালে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা কিরূপ ছিলো? তিনি জবাব দিলেন, হযরত শিবলী বললেন, আমার নিকট একবাক্তি ১ দিরহাম পাবেন। তঁার পক্ষ থেকে আমি হাজার হাজার দিরহাম সাদকা দিয়েছি। এরপরও এই এক দিরহাম আমার অন্তরকে ভারী করে তুলে। এরপর বললেন, আমাকে অযু করাও। আমি অযু করলাম কিন্তু দাড়ি খিলাল করতে ভুলে যাই। তিনি আমার হাত ধরে নিজের দাড়ি খিলাল করালেন। এরপর মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি বর্ণনা করে হযরত জাফর দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদতে লাগলেন, যঁার জীবনে শরীয়তের একটি আদবও ছুটে নি, এমন মানুষ সম্পর্কে আপনারা কী বলবেন?”

হযরত মুজাইয়ান কাবীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মক্কা শরীফে ছিলাম। হঠাৎ করে আমার অন্তরে অস্থিরতা শুরু হলো। বের হলাম মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে। বীরে মাইমুনের নিকট পৌঁছিয়ে দেখলাম এক যুবক মাটিতে শুয়ে আছেন। মনে হলো তঁার অন্তিম অবস্থা। বললাম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তিনি চোখ খুলে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন:

যদি মরে যাই, হৃদয়ে প্রেমের প্রাবল্য নিয়ে,

মহান ব্যক্তির তো মরে প্রেমের রোগে।

এরপর একটি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। আমি তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরালাম। সালাতুল জানাযা আদায় করি। দাফন কার্য শেষ করে বুঝতে পারলাম আমার অন্তরের অস্থিরতা দূর হয়ে গেছে। আমি মক্কা শরীফে ফিরে গেলাম।”

একজন শায়খকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি মৃত্যুকে ভালোবাসেন? জবাব দেন, “যার কাছে থাকলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায় না, এরচেয়ে উত্তম হলো তঁার কাছেই চলে যাওয়া, যঁার কাছে কল্যাণ নিহিত।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আমার উস্তাদ ইবনুল কারনবী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটে ছিলাম। তিনি তখন খুব মেহনত-মুজাহাদায় লিপ্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি একবার আকাশের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, তা দূরে আছে। এরপর জমিনের দিকে তাকালাম। তিনি এবার বললেন, তা-ও দূরে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করা থেকেও তিনি তোমার নিকটে আছেন।”

হযরত আবু ইয়াজীদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর সময় বলেন, “হে আল্লাহ! উদসীনতার মধ্যে তোমাকে স্মরণ করছি আর এই উদসীনতার মাঝেই আমার মৃত্যু দিচ্ছে।” হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মিশরে প্রবেশ করে দেখলাম প্রচুর মানুষের সমাগম। উপস্থিত লোকজন বললেন, আমরা এক যুবকের জানাযায় ছিলাম। যুবক কারো মুখ থেকে এই পংক্তিটি শুনলেন:

ভূত্যের প্রেমাসক্তি বিরাট, যার আকাঙ্ক্ষা হলো তোমা পানে এক পলকের জন্য তাকানো।

এর পরই তিনি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।”

বর্ণিত আছে হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুকালে একদল লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অবস্থা কি বলুন? তিনি জবাব দিলেন, “আজ ত্রিশ বছর যাবৎ আমাকে জান্নাতের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। আমি এ থেকে দৃষ্টি সরাই নি।” তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অন্তরের অবস্থা কি? তিনি জবাব দেন, “অন্তর তো ত্রিশ বছর পূর্বেই হারিয়ে ফেলেছি।”

হযরত ওয়াজিহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত ইবনে বানান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর কাহিনী হলো: তাঁর অন্তরে একটি ভাবের উদ্বেক হলে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর চোখ খুলেন। বললেন, তুমি চষে বেড়াও! এটি তো বন্ধুদের চারণভূমি। এরপরই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো।”

হযরত আবু ইয়াকুব নহরজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মক্কা মুকাররমায় ছিলাম। একদা আমার নিকট এক দরবেশ আসলেন। তাঁর সাথে ছিলো এক দীনার। আমাকে বললেন, আগামীকাল আমি মরে যাবো। এই এক দীনার দ্বারা আপনি আমার কবরের ব্যবস্থা করবেন। আমি মনে মনে ভাবলাম,

সম্ভবত লোকটির মাথা খারাপ হবে! অবশ্য হিজায়ে তখন প্রবল দুর্ভিক্ষ চলছিলো। পরদিন তিনি ফিরে আসলেন। প্রথমে তাওয়াফ করলেন। এরপর এক জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ভাবলাম, তিনি মৃত্যুর ভান ধরেছেন! কাছে গিয়ে শরীরে নাড়া দিলাম। কিন্তু না, তিনি তো ঠিকই মারা গেছেন! এরপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে দাফন করলাম।”

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমাদের কাছে একজন দরবেশ আসেন ও কিছুক্ষণ পর ইন্তিকাল করলেন। তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করে দাফন করলাম। কবরস্থ করার আগ মুহূর্তে মুখ থেকে কাপড় সরালাম। এসময় তিনি চোখ খুললেন! আমাকে বললেন, আবু আলী! যিনি আমাকে রাস্তা দেখিয়েছেন তাঁর সামনে কী তুমি আমাকে রাস্তা দেখাচ্ছে? বললাম, হযরত! মরেও কী আপনি জীবিত? তিনি জবাব দিলেন, না। আমি তো জীবিতই আছি! আল্লাহকে যে মুহাব্বাত করে সে তো জীবিতই থাকে।”

বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে সাহাল ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন বললেন, “তোমরা কী মনে করো, অন্যরা যেভাবে মৃত্যু যন্ত্রণায় পতিত হয়ে মারা যায়, আমিও সেভাবে মারা যাবো? আমাকে তো তিনি ডাক দেবেন, হে আলী বলে! আর আমি এতে সাড়া দেবো। একদিন তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি উচ্চারণ করলেন, লাক্বাইক! এরপরই তিনি ইন্তিকাল করেন।”

হযরত আবুল হাসান মুজাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আবু ইয়াকুব নহরজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট গেলাম। তিনি তখন অস্তিম অবস্থায়। আমি বললাম, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করুন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, তুমি আমাকে কী বলছো? মৃত্যুর স্বাধ এখনও পাই নি। তবে আল্লাহ ও আমার মধ্যে তাঁর ইজ্জতের পর্দা রয়ে গেছে। একথা বলেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন [মারা গেলেন]।”

হযরত মুজাইয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলতেন, আমার শিঙ্গা লাগানেওয়ালা ব্যক্তি আল্লাহর ওলিদেরকে কালিমায়ে শাহাদাত পড়াচ্ছে! কী আক্ষেপ! তিনি যখনই উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন, তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তো।

হযরত আবুল হুসাইন মালিকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি দীর্ঘদিন খাইরুন নাস্‌সাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলাম। মৃত্যুর আট দিন পূর্বে আমাকে বললেন, বৃহস্পতিবার মাগরিবের সময় আমি মারা যাবো। জুমু’আর দিন নামাযের পূর্বে দাফন হবে। তুমি এ কথাগুলো এখনই ভুলে যাবে! বর্ণনাকারী বলেন, ঠিকই জুমু’আর দিন পর্যন্ত কথাটি আমি ভুলে যাই। অন্য এক ব্যক্তি আমাকে এসে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। আমি তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, লোকজন তাঁকে দেখে ফিরে আসছেন এবং বলছেন, নামাযের পরে দাফন হবে। আমি পথ থেকে না ফিরে সেখানে হাজির হলাম। দেখলাম, নামাযের পূর্বেই তাঁর লাশ বের করে আনা হয়েছে। মৃত্যুকালীন সময় যিনি উপস্থিত ছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হঠাৎ তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। পুনরায় হুঁশ ফিরে আসলো। ঘরের এক কোণের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, থামো! আল্লাহ তোমার কল্যাণ দান করুন। তুমি একজন বান্দা, তাঁর নির্দেশে চলো এবং আমিও একজন বান্দা তাঁর নির্দেশে চলি। তোমার প্রতি যে নির্দেশ এসেছে তা লঙ্ঘন হবে না আর আমার প্রতি যে নির্দেশ এসেছে সেটাও লঙ্ঘন হবে না। এরপর পানি আনালেন, নতুন করে অয়ু করলেন ও নামায পড়লেন। হাত-পা লম্বা করে শুয়ে চোখ বন্ধ করে দিলেন।”

তাঁর ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি জবাব দিলেন, “আমাকে আর সান্ত্বনা দেবে না! তোমাদের দুর্গন্ধময় দুনিয়া থেকে আমি মুক্তি পেয়ে গেছি।”

বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের লেখক, আবু হুসাইন হিমসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের পর লোকজন তাঁর জানাযায় প্রচণ্ড ভিড় জমালো। শহরে সত্তর বয়সোখর এক ইয়াহুদী বৃদ্ধ বসবাস করতেন। তিনি মানুষের হাউমাউ আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। জানাযার দিকে চেয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠলেন। বললেন, “আমি যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো?” লোকজন বললেন, না। আপনি কি দেখছেন? জবাব দেন, “একদল লোক আকাশ থেকে নামছে আর জানাযা মুছে দিচ্ছে।” একথা বলেই বৃদ্ধ কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করে একজন খাঁটি মু’মিন হয়ে গেলেন।”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি মক্কা শরীফে গেলাম। বনী শাইবাহ ফটক দিয়ে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করছিলাম। দেখতে পেলাম মৃত এক যুবককে। তাঁর চেহারা খুব সুন্দর। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। দেখলাম তিনি মুচকি হাসি দিচ্ছেন! বললেন, আবু সাঈদ! তুমি কি জানো না, আল্লাহর বন্ধুগণ জীবিত থাকেন। তাঁরা মরেন না। তাঁরা তো এক ঘর থেকে অপরটিতে ফিরে যান মাত্র।”

হযরত জারিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইস্তিকালের সময় উপস্থিত হলে লোকজন বললেন, আমাদেরকে নসিহত করুন। তিনি বললেন, আমাকে তোমরা এখন ব্যস্ত করো না। আমি তো আল্লাহর করুণা ও দয়ার সৌন্দর্য অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে গেছি!”

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদেরকে আপনি কী উপদেশ দেবেন? জবাব দিলেন, আমি তো কথা বলতে পারছি না। এরপর কিছুটা শক্তি অনুভব করলেন। আমি তখন বললাম, আপনি যদি উপদেশ দেন- তা আমি আপনার পক্ষ থেকে বর্ণনা করবো। তিনি বললেন, আমার উপদেশ হলো ক্রটি-বিচ্যুতির উপর অন্তরকে পুরোপুরি ভেঙ্গে বিনয়্যাবনত করবেন।”

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب المعرفة بالله

বাবুল মা'রিফাতু বিল্লাহ [আল্লাহর পরিচিতি অধ্যায়]

قال الله تعالى: "وما قدرُوا الله حق قدره". جاء في التفسير: وما عرفوا الله حق معرفته. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل، قال: حدثنا محمد بن القاسم العتكي، قال: حدثني محمد بن أشرس، قال: حدثنا سليمان بن عيسى الشجري عن عبا بن كثير، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن دعامَةَ البيت أساسه، ودعامَةُ الدين المعرفة بالله تعالى، واليقينُ والعقل القامع فقلت: بأبي أنت وأمي ما العقل القامع؟ قال الكف عن معاصي الله، والحرص على طاعة الله".

قال الأستاذ: المعرفة على لسان العلماء هو: العلم؛ فكل علم معرفة؛ وكل معرفة علم؛ وكل عالم بالله عارف؛ وكل عارف عالم وعند هؤلاء القوم المعرفة: صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائِ وصفاته؛ ثم صدق الله تعالى في معاملاته: ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وأفاهه؛ ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكاف فحظي من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله في جميع أحواله؛ وانقطع عنه هواجس نفسه؛ ولم يضع بقلبه إلى خاطر يدعوهُ إلى غيره؛ فإذا صار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه برياً؛ ومن المساكنات والملاحظات نقياً؛ ودام في السر مع الله تعالى مناجاته، وحق في كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسرارهِ فيما يجريهِ من تصاريِف أقداره يسمي عند ذلك عارفاً وتسمى حالته

معرفة.

وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه. وقد تكلم المشايخ في المعرفة، فكل نطق بما وقع له؛ وأشار إلى ما وجده في وقته.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله يقول: من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. وسمعت يقول: المعرفة توجب السكينة في القلب كما أ، العلم يوجب السكون فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السبلي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن زيد يقول: سمعت الشبلي يقول: ليس لعارف علاقة ولا لمحِب شكوى، ولا لعبد دعوى، ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار. وسمعت يقول: سمعت محمد بن محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت الشبلي يقول، وقد سئل عن المعرفة، فقال: أولها الله تعالى، وآخرها ما لا نهاية له.

وسمعت يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا العباس الدينوري يقول: قال أبو حفص: مذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل. قال الأستاذ أبو القاسم: وهذا الذي أطلقه أبو حفص فيه طرف من الإشكال، وأجل ما يحتمله: أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفس، لإستيلاء ذكر الحق؛ سبحانه، عليه، فلا يشهد غير الله، عز وجل، ولا يرجع إلى غيره، فكما أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فيما يسنح له من أمر، أو يستقبله من حال؛ فالعارف رجوعه إلى ربه. فإذا لم

يكن مشغلاً إلا بربه لم يكن راجعاً إلى قلبه. وكيف يدخل المعنى قلب من لا قلب له. وفرق بين من عاش بقلبه وبين من عاش بربه عز وجل.

وسئل أبو يزيد عن المعرفة، فقال: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة".

قال الأستاذ: هذا معنى ما أشار إليه أبو حفص.

وقال أبو يزيد: للخلق أحوال، ولا حال للعارف؛ لأنه محيت رسومه. فنيت هويته بهوية غيره، وغيب آثاره بآثار غيره.

وقال الواسطي: لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه.

قال الأستاذ: أراد الواسطي بهذا: أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو العبد وبقاء رسومه؛ لأنهما من صفاته، والعارف محو في معرفة، فكيف يصح له ذلك، وهو لاستهلاكه في وجوده، أو لاستغراقه في شهوده إن لم يبلغ الوجود محتطف عن إحساسه بكل وصف هو له.

لهذا قال الواسطي أيضاً: من عرف الله تعالى انقطع، بل خرس وانقمع. قال صلى الله عليه وسلم: "لا أحصي ثناء عليك".

هذه صفات الذين بعد مرماهم، فأما من نزلوا عن هذا الحد فقد تكلموا في المعرفة وأكثروا.

أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا عياش بن حمزة قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف.

وقال بعضهم: من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء، وضائق عليه الدنيا

بسعتها.

وقيل: من عرف الله صفا له العيش، وطابت له الحياة، وهابه كل شيء،
وذهب عنه خوفُ المخلوقين، وأنس بالله تعالى.

وقيل: من عرف الله ذهب عنه رغبة الأشياء، وكان بلا فصل ولا وصل.
وقيل: المعرفة توجب الحياء والتعظيم، كما أن التوحيد يوجب الرضا
والتسليم.

وقال رويم: المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيها تجلى له مولاه.
وقال ذو النون المصري: ركضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة فسبقت
روحُ نبينا، صلى الله عليه وسلم، أرواح الأنبياء عليهم السلام إلى روضة
الوصال.

وقال ذو النون المصري: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى يحتملك
ويحلم عنك، تخلقاً بأخلاق الله.

وشئل بن يزدانيار: متى يشهد العارف الحقَّ سبحانه؟ فقال: إذا بدا الشاهد
وفنى الشواهد وذهب الحواس واضمحل الإخلاص.

وقال الحسين بن منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله إليه
بخطاياه، وحرس سرّه أن يسنح فيه غير خاطر الحق.
وقال علامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والآخرة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول:
سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول:
سمعت ذا النون المصري يقول: أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيراً فيه.
وسمعتة يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمر الأنطاكي

يقول: قال رجل للجنيـد: من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك الحركات من باب البر والتقوى!! فقال الجنيـد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا؛ فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى، وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة.

وقيل لأبي يزيد: بماذا وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عار. وقال أبو يعقوب النهرجوري: قلت لأبي يعقوب السوسي هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل؟ فقال: وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟! قلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟ فقال: بعين الفناء والزوال. وقال أبو يزيد: العارف طيار، والزاهد سيار.

وقيل: العارف تبكي عينه ويضحك قلبه. وقال الجنيـد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤه البر والفاجر، وكالسحاب بطل كل شيء، وكالمطر، يسقى ما يجب، وما لا يجب. وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه، وثنائؤه على ربه، عز وجل.

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت يوسف بن علي يقول: لا يكون العارف عارفاً حقاً حتى لو أعطي مثل ملك سليمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين. وسمعته يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة، والحياء، والأنس.

وسمعتہ يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: قيل لذي النون المصري: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي.

وقيل: العالم يقتدي به، والعارف يهتدي به. وقال الشبلي: العارف لا يكون لغيره لاحظاً، ولا بكلام غيره لا فظاً، ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً.

وقيل: العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذلل له تعالى فأعزه في خلقه.

وقال أبو الطيب السامري: المعرفة طلوع الحق على الأسرار بمواصلة الأنوار.

وقيل: العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي.

وقال الجنيد: العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت.

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله تعالى.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت الوحيي يقول: سمعت أبا علي الرُّوذباري يقول: سمعت رويماً يقول: رياء العارفين أفضل من أخلاص المريدين.

وقال أبو بكر الوراق: سكوت العارف أنفع، وكلامه أشهى وأطيب. وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين.

وسئل الجنيد عن العارف، فقال: لون الماء لون إنائه يعني أنه يحكم وقته.
وسئل أبو يزيد عن العارف، فقال: لا يرى في نومه غير الله، ولا في يقظته
غير الله، ولا يوافق غير ألمه، ولا يطالع غير الله تعالى.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول:
سئل بعض المشايخ: بمَ عرفت الله تعالى؟ فقال: بلمعة لمعت بلسان مأخوذ
عن التمييز المعهود، ولفظة جرت على لسان هالك مفقود يشير إلى وجد
ظاهر ويخبر عن سر سائر هو بما أظهره، وغيره بما اشكله ثم أنشد:

نطقْتُ بلا نطق هو النطق إنه... لك النطق لفظاً أويبين عن النطق

تراءيت كي أخفى وقد كنت خافياً... وألمعت لي برقاً فانضفت بالبرق

وسمعت يقول: سمعت علي بن بندار الصيرفي يقول: سمعت الجريري يقول:
سئل أبو تراب عن صفة العارف، قال: الذي لا يكدره شيء، ويصفو به
كلُّ شيء.

وسمعت يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: العارف تضيء له أنوار
العلم فيبصر به عجائب الغيب.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: العارف مستهلك في بحار التحقيق؛
كما قال قائلهم: المعرفة أمواج تغطّ. ترفع وتخطّ.

وسئل يحيى بن معاذ عن العارف، فقال: رجل كائن بائن، ومرة قال: كان
فبان.

وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفىء نور معرفته نور ورعه، ولا
يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم، ولا تحمله كثرة
نعم الله عز وجل، عليه على هتك أستار محارم الله.

وقيل: ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة، فكيف عند أبناء الدنيا؟؟ وقال أبو سعيد الخراز: المعرفة تأتي من عين الجود وبذل المجهود. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت بن عبد الله يقول: سمعت جعفرًا يقول: سئل الجنيد عن قول ذي النون المصري في صفة العارف. كان ها هنا فذهب فقال الجنيد: العارف: لا يحصره حال عن حال، ولا يحجبه منزل ن التنقل في المنازل، فهو مع أهل كل مكان يمثل الذي هو فيه يجد مثل الذي يجدون، وينطق فيها بمعالمها لينتفعوا بها. وسمعت يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت حم بن الفضل يقول: المعرفة حياة القلب مع الله تعالى. سمعت يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الكتاني يقول: سئل أبو سعيد الخراز: هل يصير العارف إلى حال يحفو عليه البكاء؟ فقال: نعم، إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالى، فإذا نزلوا إلى حقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره زال عنهم ذلك.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

[আনআম : ৯১] “তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে নি।”

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়, তারা আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পারে নি। হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ঘরের মূল হলো তাঁর খুঁটি আর দ্বীনের মূল হলো আল্লাহর মা'রিফাত, ইয়াকীন ও মূলোৎপাটনকারী আক্বল।” আমি বললাম, আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান হোন! মূলোৎপাটনকারী আক্বল কী? তিনি

জবাব দেন: “আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি লোভাতুর হওয়া।”

লেখক ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রাহিমাতুল্লাহি বলেন, “সারকথা, নিজের সাথে যতো বেশী অপরিচিতি ভাব হবে ততো বেশী আল্লাহর মা’রিফাত অর্জিত হবে। মাশাইখে কিরাম মা’রিফাত সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। প্রত্যেকেই নিজের অন্তরে যা প্রকাশ পেয়েছে তা-ই বর্ণনা করেছেন।”

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আল্লাহর মা’রিফাতের নিদর্শন হলো আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করা। মা’রিফাত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভীতির মাত্রাও বাড়তে থাকে।” তিনি আরো বলতেন, “মা’রিফাতের দ্বারা অন্তরে সাকীনা আসে। মা’রিফাত যতো বাড়বে সাকীনাও ততো বাড়তে থাকবে।”

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আরিফের কোনো বন্ধন নেই। প্রেমিকের কোনো অভিযোগ নেই। বান্দার কোনো দাবী-দাওয়া নেই। ভীতু ব্যক্তির কোনো স্থিতিশীলতা নেই। আর আল্লাহর কাছ থেকে কেউই পলায়ন করতে পারবে না।” তাঁকে মা’রিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন, “এর সূচনাই হলো আল্লাহ তা’আলা। আর শেষের কোনো পরিসীমা নেই।”

হযরত আবু হাফস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যে পর্যন্ত আমার অন্তরে সত্য-মিথ্যার আনাগোনা বিলুপ্ত না হয়েছে সে পর্যন্ত আমি আল্লাহকে চিনতে পারি নি।” লেখক বলেন, উল্লেখিত কথায় অস্পষ্টতা আছে। এর আসল মর্ম হলো, একদল মাশাইখের মতে মা’রিফাত এমন এক অবস্থা, অন্তরে আল্লাহ তা’আলার উপস্থিতির কারণে বান্দা নিজেকে ভুলে যায়। সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেখবেও না, কারো কাছে ফিরবেও না। মানুষের আকুল যেভাবে অন্তরের দিকে ফিরে কোনো অবস্থা বা নির্দেশনাকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আরিফ আল্লাহর কাছে ফিরে থাকে। তাই যে যখন আল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হয় না- তখন সে তার অন্তর নিয়েও ভাবে না। আসলে যে অন্তর অন্তরই নয় তাতে আবার মা’রিফাত কিভাবে আসবে? যে অন্তর একা একা বেঁচে থাকে, আর যেটি আল্লাহকে নিয়ে বেঁচে থাকে- উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মা'রিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন:

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً

-“রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে।” [নামল: ৩৪]

আসলে আবু হাফস যা বলেছেন আবু ইয়াজিদের উদ্দেশ্য তা-ই বলা। সৃষ্ট জীবের বিভিন্ন অবস্থা আছে। কিন্তু আরিফের কোনো অবস্থা নেই। তার তো সকল অবস্থা ছিল-ভিন্ন হয়ে মিটে গেছে। আল্লাহর পরিচয়ে তার পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দার অন্তরে যদি আল্লাহর প্রতি বে-নিয়াজী ও মুখাপেক্ষিতার ভাব থাকে তবে মা'রিফাত অর্জন হবে না।” ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এ কথার মর্ম হলো, এ দু'টো বৈশিষ্ট্য তখনই প্রকাশ পায় যখন বান্দা সজাগ থাকে ও তার হালের কোনো বিলুপ্তি ঘটে না। আরিফ তো আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহর মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার কারণেই তার যাবতীয় অনুভূতি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্যই ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আল্লাহকে চেনার পর বান্দা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বরং সে বোবা বনে যায়।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে আল্লাহ! তোমার গুণগান করে শেষ করতে পারবো না।” হযরত আহমদ আস্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আল্লাহকে যে যতো বেশী চিনে সে পরিমাণ ততো বেশী আল্লাহর ভীত থাকে।” একজন শায়খ বলেন, “আল্লাহকে চেনার পর বান্দা চিরন্তন হয়ে যায়। দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য তা সংক্ষীর্ণ হয়ে ওঠে।” আল্লাহকে যে চিনে নিলো, তার জীবন স্বচ্ছ ও পবিত্রময় হয়ে ওঠলো। সৃষ্ট জীব তাকে ভয় পায়। কিন্তু তার অন্তরে সৃষ্ট জীবের প্রতি কোনো ভয় অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক হয়ে ওঠে প্রেমময়।

আল্লাহর পরিচয় পেয়ে গেলে বস্তুপ্রীতি ওঠে যায়। মা'রিফাতের দ্বারা হায়া ও তা'জিম সৃষ্টি হয়। যেভাবে তাওহীদের দ্বারা রেজা ও তাসলীম পয়দা হয়। হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “আরিফের জন্য মা'রিফাত একটি

আরশি। যখনই সে এতে লক্ষ্য করে তখনই সে দেখতে পায় তার মাওলা এতে প্রকাশ হয়েছেন।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা’রিফাতের ময়দানে নবীগণের রূহ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। তখন আমাদের নবীর রূহ মুবারক আল্লাহর সাক্ষাতের বাগানে অগ্রগামী হলো।”

হযরত ইবনে ইয়াজদানিয়াত রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরিফ কখন আল্লাহর দীদার লাভ করে? তিনি জবাব দেন, “যখন সবকিছুর উপস্থিতি বিলীন হয়, অনুভূতি চলে যায় এবং ইখলাসের অনুভূতিও থাকে না।” হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বান্দা যখন মা’রিফাতের স্তরে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তার অন্তরে চুপিচুপি কথা বলেন। তিনি তার অন্তরের পাহারাদারী করেন যেনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো কল্পনা অন্তরে না আসে। আরিফের পরিচয় হলো সে দুনিয়া-আখিরাতে সবকিছু থেকে মুক্ত থাকবে।”

Khairu-e-Aminia Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা’রিফাতের শেষ স্তর দু’টি: ১. দাহাশ [বিভ্রান্তি] এবং ২. হাইরাত [হতভম্বতা]।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, “মানুষের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে, সে আল্লাহর বেশী পরিচয় লাভ করেছে।” এক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন, মা’রিফাতের অধিকারী একদল লোক বলে থাকেন, নড়াচড়া [হরকত] ছেড়ে দেওয়া তাকুওয়ার পরিচয়। একথা শুনে জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “এসব লোক যে বলছেন, নড়াচড়া এবং কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়া- এটা আমার কাছে মারাত্মক কথা। তাদের এ কথা থেকে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে চুরি ও ব্যভিচার করে! আল্লাহর আরিফরা তাঁরই কাছ থেকে আমলের তাওফিক লাভ করেন। আমল করে তাঁরা আল্লাহর কাছে ফিরে যান। তারা যদি হাজারো বছর বেঁচে থাকেন, তাদের আমলের একটি কণাও কমবে না।”

হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিভাবে মা’রিফাত অর্জন করলেন? জবাব দেন, “ক্ষুধার্ত পেট ও নগ্ন শরীর দ্বারা।” হযরত আবু ইয়াকুব নাহারজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম, আরিফ ব্যক্তি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু নিয়ে আক্ষেপ বোধ করবে? তিনি

জবাব দিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কী আছে, যেটির উপর সে আক্ষেপ অনুভব করবে? আমি বললাম, তাহলে আল্লাহকে দেখার পর সে কোন্ চক্ষু দ্বারা অন্যান্য বস্তুর দিকে তাকাবে? তিনি জবাব দিলেন, ‘ফানার চোখ দিয়ে।’”

হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ আকাশে উড়ে বেড়ায় এবং জাহিদ জমিনে চরে বেড়ায়।” একজন শায়খ বলেন, “আরিফ চোখ দিয়ে কাঁদে ও অন্তর দিয়ে হাসে।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রকৃত আরিফ হতে হলে মাটি বনে যেতে হবে, যার উপর নেকলোক-বদলোক সকলে চলাফেরা করবে। নিজেকে ছায়াদানকারী মেঘমালা বানাতে হবে। এমন বৃষ্টি হতে হবে যা থেকে পছন্দের-অপছন্দের সকল লোককে পান করাবে।”

ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ দুনিয়া থেকে বিদায়ের বেলায়ও দু’টি কাজীকৃত আশা পূরণ হয় না: ১. নিজেকে নিয়ে কাঁদা এবং ২. আল্লাহর গুণগান গাওয়া।” হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তারা তো মা’রিফাত লাভ করেছেন নিজেদের কাছে যা আছে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর ভরসা করে।” হযরত ইউসুফ ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তিনি-ই প্রকৃত আরিফ, সুলায়মান আলাইহিসসালামের রাজত্ব যদি তাকে দেওয়া হয় তবুও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ থেকে গাফিল হন না।” হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা’রিফাতের ভিত্তি তিনটি: ভয়, লজ্জা ও প্রেম।” যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিভাবে আল্লাহকে চিনলেন? জবাব দেন, “আল্লাহকে আল্লাহর মাধ্যমে চিনেছি। আল্লাহ না হলে আল্লাহকে চিনতাম না।” একজন শায়খ বলেন, “আলিমের অনুসরণ করা হয় আর আরিফের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ হয়।”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ অন্যের প্রতি দৃষ্টি দেন না, অন্যের সুরে কথা বলেন না। গাইরুল্লাহকে নিজের হিফাজতকারী মনে করেন না।” একজন শায়খ বলেন, “আরিফ আল্লাহর জিকিরের ভালোবাসায় সিক্ত হন। সৃষ্ট জীবের প্রতি এক প্রকার দূরত্ব ও পরিচিতি আসে। তিনি আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হন। আল্লাহ তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বে-নিয়াজ বানিয়ে দেন। তিনি কেবল আল্লাহর জন্য হীনতা অবলম্বন করেন কিন্তু আল্লাহ তাকে সম্মানিত

করেন।” হযরত আবু তাইয়িব সামিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা’রিফাত মানে অন্তরস্থলে আলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সুদৃষ্টি পড়া।” একজন শায়খ বলেন, “আরিফ যা বলেন, তিনি এর উপরে থাকেন এবং আলিম যা বলেন, তিনি এর নীচে থাকেন।” হযরত আবু সূলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে থাকলেও আল্লাহ তা’আলা তার অন্তর খুলে দেন। এমনভাবে দেন যে, অন্য ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আল্লাহ তা’আলা অন্তর অনুরূপ খুলে দেন না।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ তো তিনি, যার অন্তরস্থলে আল্লাহ তা’আলা কথা বলেন এবং তিনি নীরব থাকেন।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “প্রত্যেক জিনিষের ক্ষেত্রে শাস্তি আছে। আরিফের শাস্তি হলো আল্লাহর জিকির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।” হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফদের লৌকিকতা মুরীদদের ইখলাস থেকে উত্তম।” হযরত আবু বকর ওয়াররাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফের নীরবতা খুবই উপাদেয়। আর তার কথা অত্যন্ত সুস্বাদু ও উত্তম।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “জাহিদরা হলেন আখিরাতের বাদশাহ।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরিফ কে? জবাব দেন, “পাত্রের রঙই তো পানির রঙ।” হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরিফ কে? জবাব দেন, “যে ঘুমোও সজাগে গাইরুল্লাকে দেখে না গাইরুল্লাহর সাথে একমত পোষণ করে না এবং গাইরুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ দামেস্কী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আল্লাহর মা’রিফাত অর্জন করলেন কিভাবে? জবাব দিলেন: “জিস্হায় অনুপ্রবেশকৃত একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে, যার ফলে বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের গুণটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর একটি শব্দ দ্বারা যা জিস্হায় আবির্ভূত হলো, যার ফলে বিলুপ্তি সাধন হলো ও পৃথিবীতে হারিয়ে গেলাম।” বক্তা এখানে আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের কথা বলছেন। একই সময় নিজেকে যে পর্দা দ্বারা আবৃত করেছেন তা-তেই ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছেন। তিনি হলেন ‘তিনি’- ওটার মধ্যে যাতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ‘তিনি

নন'- যাতে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। [ঐ সুফি] এরপর নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

তুমি বলেছো কোনো শব্দ উচ্চারণ না করেই, অথচ এটাও কথা ছাড়া আর কিছু নয়

তোমার কথায় আছে শব্দাবলী, অথচ তা [সাধারণ] কথা থেকে ভিন্ন

তুমি নিজেকে আমার দৃষ্টির সামনে হাজির করেছো, যাতেকরে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারি, তুমি লুকিয়ে থাকার পর

তুমি আমারদিকে ছুড়ে দিয়েছো বিদ্যুৎ চমক, অর্থাৎ, তুমি কথা বললে যেনো বর্জপাত ছুড়ে মেরে!

হযরত আবু তুরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরিফের বৈশিষ্ট্য কি? জবাব দিলেন, “যাকে কোনো জিনিষ মলীন করে না এবং প্রত্যেক জিনিস তার দ্বারা পরিচ্ছন্ন লাভ করে।” হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফের সামনে ইলমের অংশুজাল ফুটে ওঠে। এই আলো দ্বারা তিনি অদৃশ্য জগতের আশ্চর্য বস্তু অবলোকন করেন।” উস্তাদ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ তাহকীকের সমূদ্রে বিলীন হয়ে যায়। যেমন এক শায়খ বলতেন, মা’রিফাত হলো কিছু ঢেউয়ের নাম। এতে ওলট-পালট হচ্ছেই।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফ তো অস্তিত্ব লাভ করেছেন ও এরপর আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছেন।” হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আরিফের তিনটি নিদর্শন: ১. মা’রিফাতের নূর তার পরহেজগারী নূরকে নিভায় না, ২. তিনি বিশ্বাস করেন না যে, বাতিনী ইলম জাহিরী কোনো বিধানকে বিলুপ্ত করে এবং ৩. আল্লাহর নিয়ামতের প্রাচুর্যে তিনি আল্লাহর হারামের পর্দা লঙ্ঘন করেন না।” একজন শায়খ বলেন, “আরিফ ব্যক্তি তো আখিরাতের লোকদেরকেও মা’রিফাত বুঝিয়ে দিতে পারবেন না। সুতরাং তিনি কিভাবে দুনিয়ার লোকদেরকে বুঝাবেন?”

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “বদান্যতার চোখ দিয়ে আর প্রচেষ্টার মাধ্যমে মা’রিফাত অর্জন হয়।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরিফের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেছিলেন: ‘আরিফ এখানে ছিলেন, এরপর চলে গেছেন!’

তার মর্ম কি? তিনি জবাব দিলেন, “এর মর্ম হলো, আরিফের হাল স্থির থাকে না। স্তর পরিবর্তনে তাঁর মধ্যে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। তিনি সর্বত্র থাকেন। তিনি এমন কিছু কথা বলেন যার দ্বারা লোকের উপকার হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আল্লার সাথে আত্মার জীবনই হলো মা’রিফাত।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আরিফ কি এমন হালের মধ্যে পতিত যার ফলে তাঁর জন্য ক্রন্দন কঠিন হয়ে পড়ে? জবাব দিলেন, “হ্যাঁ। আরিফ যখন আল্লাহর দিকে যাত্রা করেন তখন ক্রন্দন করা কঠিন হয়ে যায়। যখন নৈকট্য লাভ করেন এবং এর স্বাদ উপভোগ করেন তখন ক্রন্দনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب المحبة

বাবুল মুহাব্বাত [প্রেম অধ্যায়]

قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " .

أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه " .
أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار البصري قال: حدثنا عبد الله بن أيوب قال: حدثنا الحسين بن موسى قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الحسن بن يحيى عن صدقة الدمشقي، عن هشام الكتاني، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن ربه سبحانه وتعالى قال: " من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء كترددني في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بدّ له منه، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداؤً ومؤيداً " .

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد ابن شريك قال: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن سهيل بن أبي

صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحبَّ الله، عز وجل، العبد قال لجبريل: يا جبريل، إني أحب فلاناً فأحبه؛ فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك " .

والمحبة: حالة شريفة شهد الحق، سبحانه، بها للعبد، وأخبر عن محبته للعبد، فالحق: سبحانه، يوصف بأنه يحب العبد، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه.

والمحبة على لسان العلماء: هي الإرادة، وليس مراد القوم بالمحبة الإرادة؛ فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم، اللهم إلا أن تُحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم له.

ونحن نذكر من تحقيق هذه المسألة طرفاً إن شاء الله تعالى؛ فمحبة الحق سبحانه، للعبد إرادته لإِنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته له إرادة الإِنعام، فالرحمة أخص من الإرادة، والمحبة أخص من الرحمة، فإرادة الله تعالى لأن يوصل إلى العبد الثواب والإِنعام تسمى رحمة وإرادته لأن يخصه بالقربة والأحوال العلية تسمى محبة.

وإرادته، سبحانه، صفة واحدة، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها، فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً، وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة.

وقوم قالوا: محبة الله، سبحانه، للعبد، مدحه ل، وثناؤه عليه بالجميل، فيعود معنى محبته له، على هذا القول، إلى كلامه، وكلامه قديم.

وقال قوم: محبته للعبد: من صفات فعله، فهو إحسان مخصوص يلقي الله العبد به، وحالة مخصوصة برقية إليها، كما قال بعضهم: إن رحمته بالعبد نعمة معه، وقوم من السلف قالوا: محبته من الصفات الخبرية، فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير.

فأما ما عدا هذه الجملة مما هو المعقول من صفت محبة الخلق؛ كالليل إلى الشيء، والاستئناس بالشيء، وكحالة يجدها المحب مع محبوبه من المخلوقين، فالقديم، سبحانه. يتعالى عن ذلك.

وأما محبة العبد لله: فحالة يجدها من قلبه. تلتطف عن العبارة.

وقد تحمله تلك الحالة علي التعظيم له، وإيثار رضاه، وقلة الصبر عنه. والاهتياج إليه، وعدم القرار من ونه، ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه. وليست محبة العبد لـ سبحانه. متضمنة سبباً، ولا أخطاطاً. كيف. وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك والإحاطة. والمحب بوصف الاستهلاك في المحبوب، أولى منه بأن يوصف بالاختطاط. ولا توصف المحبة يوصف ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم والاستقصاء في المقال عند حصول الإشكال؛ فإذا زاد الاستعجاب والاستبهام سقطت الحاجة إلى الاستغراق في شرح الكلام.

وعبارات الناس عن المحبة كثيرة. وتكلموا في أصلها في اللغة؛ فبعضهم قال: الحب اسم لصفاء الموجة؛ لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حب الأسنان.

وقيل: الحباب: ما يعلو الماء عند المطر الشديد؛ فعلى هذا المحبة: غليان القلب وثورانه عند العطش والاهتياج إلى لقاء المحبوب.

وقيل: إنه مشتق من حباب الماء بفتح الحاء وهو: معظمه. فسمي بذلك:
لأن المحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات.
وقيل: اشتقاق من اللزوم والثبات، يقال: أحب البعير. وهو: أن يبرك فلا
يقوم فكأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه.
وقيل: الحب مأخوذ من الحب. وهو القرط قال الشاعر:
تبينت الحية النضاض منه ... مكانّ الحب تستمع السرار
وسمي القرط حبا؛ إما للزومه للأذن، أو لقلقه. وكلا المعنيين صحيح في
الحب.

وقيل: هو مأخوذ من الحبّ جمع حبة وحبّة القلب: ما به قوامه؛ فسمي
الحب حباّ باسم محله.

وقيل: الحب، والحبّ كالعمر والعمر.
وقيل: هو مأخوذ من الحبة بكسر الحاء وهي بذور الصحراء: فسمي الحب
حبا، لأنه لباب الحياة، كما أن الحب لباب النبات.
وقيل: الحب: هي الخشبات الأربع التي توضع عليها الجرة، فسميت المحبة
حباّ لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذلّ.

وقيل: هو من الحب الذي فيه الماء، لأنه يمسك ما فيه، فلا يسع فيه غير
ما امتلأ به، كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساع فيه لغير محبوبه.
وأما أقويل الشيوخ فيه، فقال بعضهم: المحبة: الميل الدائم بالقلب الهائم.
وقيل: المحبة: إثارة المحبوب على جميع المصحوب.
وقيل: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب.
وقيل: نحو المحب لصفاته، وإثبات المحبوب بذته.

وقيل: مواطأة القلب لمرادات الرب.

وقيل: خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة.

وقال أبو يزيد البسطامي: المحبة: استقلال الكثير من نفسك، واستكثار قليل من حبيبك.

وقال سهل: الحبُّ: معانقة الطاعة ومباينة المخالفة.

وسئل الجنيد عن المحبة، فقال: دخول صفات المحبوب على البذل من صفات المحب.

أشار بهذا إلى استيلاء ذكر المحبوب، حتى لا يكون الغالب على قلب المحب إلا ذكر صفات المحبوب، والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها.

وقال أبو علي الروذباري: المحبة: الموافقة.

وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب كتلك لمن أحببت، فلا يبقى لك منك شيء.

وقال الشبلي: سميت المحبة محبة؛ لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب.

وقال ابن عطاء: المحبة: إقامة العتاب على الدوام.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله يقول: المحبة: لذة، ومواضع الحقيقة دهش.

وسمعه يقول: العشق: مجاوزة الحد في المحبة، والحقُّ، سبحانه؛ لا يوصف بأنه يجاوز الحدَّ، فلا يوصف بالعشق، ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق سبحانه، فلا يقال: إن عبداً جاوز

الحد في محبة الله. فلا يوصف الحق. سبحانه بأنه يعشق، ولا العبد في صفته سبحانه بأنه يعشق، فنفى العشق، ولا سبيل له إلى وصف الحق، سبحانه، لا من الحق للعبد، ولا من العبد للحق، سبحانه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول: المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. وسمعته يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول، وقد سئل عن المحبة. فقال: أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول.

وسمعته يقول: سمعت النصراباذي يقول: محبة توجب حقن الدماء، ومحبة توجب سفك الدماء.

وسمعته يقول: سمعت محمد بن علي العلوي يقول: سمعت جعفرًا يقول: سمعت سمنونًا يقول: ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرء مع من أحب " ؛ فهم مع الله تعالى: وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة مالا ينقص بالجفاء، ولا يزيد بالبر، وقال ليس بصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده.

وقال الجنيد: إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب، وفي معناه نشد الأستاذ أبو علي:

إذا صفت المودة بين قوم ... ودام ودادهم سمج الشناء
وكان يقول: لا ترى أبا شفيقاً يبجل ابنه في الخطاب والناس يتكفون في مخاطبته والأب يقول: يا فلان.

وقال الكتاني: المحبة: الإيثار للمحبوب.

وسمعت محمد بن الحسيني قول: سمعت ابا سعيد الأرجاني يقول: سمعت
بندار بن الحسين يقول: روى مجنون بني عامر في المنام، فقيل له: ما فعل
الله بك؟ فقال: غفر لي، وجعلني حجة على المحبّين.
وقال أبو يعقوب السوسي: حقيقة المحبة: أن ينسى العبد حظه من الله
وينسى حوائجه إليه.

وقال الحسين بن منصور: حقيقة المحبة: قيامك مع محبوبك بخلع وصافك.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: قيل النصراباذي: ليس لك
من المحبة شيء؟ فقال: صدقوا؛ ولكن لي حسراتهم، فهوذا احترق فيه.
وسمعه يقول: قال النصراباذي: المحبة: مجانبة السلو على كلّ حال. ثم
أُنشد:

ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة... فإني من ليلي لها غير ذائق
وأكثر شيء نلت من وصالها... أمني لم تصدق كلمحة بارق
وقال محمد بن الفضل: المحبة: سقوط كل محبة من القلب إلا محبة
الحبيب.

وقال الجنيد: المحبة: إفراط المسيل بلا نيل.
ويقال: المحبة: تشويش في القلوب يقع من المحبوب.
ويقال: المحبة: فتنة تقع في الفؤاد من المراد.
وأُنشد ابن عطاء:

غرس لهل الحبّ غصناً من الهوى... ولم يك يدري ما الهوى أحدٌ قبلي
فأورق أغصاناً، وأينع صبوة... وأعقب لي مرّاً من الثمر المحلى
كل جميع العاشقين هواهم إذا نسوه كان من ذلك الأصلي

وقيل: الحب أوله ختل وآخره قتل.

سمعت الأستاذ أبا علي، رحمه الله، يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "حبك للشيء يعنى ويُصم".

فقال يعنى عن الغير غيرة وعن المحبوب هيبة، ثم أنشد:

إذا ما بد لي تعاظمته ... فأصدر في حال من لم يرد

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت الحارس المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك وما لك، ثم موافقتك له سرّاً وجهراً، ثم علم بتقصيرك في حبه.

وسمعتة يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت عباس بن عصام يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: يا أنا.

وقال الشبلي. المحب إذا سكت هلك، والعارف إن لم يسكت هلك.

وقيل: المحبة: نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب.

وقيل: المحبة: بذل المجهود والحبيب يفعل ما يشاء.

وقال النوري: المحبة: هتك الأستار وكشف الأسرار.

وقال أبو يعقوب السوسي: لا تصح المحبة إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب بفناء علم المحبة.

وقال جعفر: قال الجنبي: دفع السريّ إلى رقعة، وقال: هذه لك خير من سبعمائة قصة أو حديث يعلو، فإذا فيها:

ولما ادّعيْتُ الحبَّ قالت: كذبتني ... فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا ... وتذبل حتى لا تجيب المناديا
وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى ... سوى مقلة تبكي بها وتناجيا
وقال ابن مسروق: رأيت سمنونا يتكلم في المحبة فتكسرت قناديل المسجد
كلها.

سمعت محمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم
ابن فانك يقول: سمعت سمنوناً، وهو جالس في المسجد يتكلم في المحبة إذ
جاء طير صغير فقرب منه، ثم قرب.. فلم يزل يدنو حتى جلس على يده..
ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال منه الدم، ثم مات.
وقال الجنيد: كل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك المحبة.
وقيل: حبس الشبلي في المارستان فدخل عليه جماعة: فقال: من أنتم؟
قالوا: إنا محبوبك يا أبا بكر، فأقبل يرميهم بالحجارة، ففروا، فقال: إن
ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي.
وأشد الشبلي:

أيها السيد الكريم ... حبك بين الحشا مقيم
يا رافع النوم عن جفوني ... أنت بما مربى عليم
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله
يقول: سمعت النهرجوري يقول: سمعت علي بن عبيد يقول: كتب يحيى
بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب
إليه أبو يزيد: غيرك شرب بحور السموات والأرض وما روي بعد، ولسانه
خارج ويقول: هل من مزيد.

وَأُنْشِدُوا:

عجبت لمن يقول ذكرت إلفي ... وهل أنسى فأذكر ما نسيت
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ... ولولا حسن ظني ما حييت
فأحيا بالمني وأموت شوقاً ... فكم أحيا عليك وكم أموت
شربت الحبّ كأساً بعد كأس ... فما نفذ الشراب وما رويت
وقيل: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني إذا اطلعت علي قلب
عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملائمة من حبي.
ورأيت بخط الأستاذ أبي علي الدقاق، رحمه الله: في بعض الكتب المنزلة "
عبدى، أنا وحقك لك محب، فبحقي كن لي محباً".
وقال عبد الله بن المبارك: من أعطى شيئاً من المحبة ولم يعط مثله من
الخشية فهو مخدوع.
وقيل: المحبة: ما يمحو أترك.

وقيل: المحبة: سُكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه.
ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف، وأنشدوا:
فأسكر القومَ دَوْرُ كَأْسٍ ... وكان سكري من المدير
وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيراً:
لي سكرتان، وللندمان واحدة ... شيءٌ خصصت به من بينهم وحدي
وقال ابن عطاء: المحبة: إقامة العتاب على الدوام.
وكان للأستاذ أبي عليّ جارية تسمى فيروز وكان يحبها؛ إذ كانت قد خدمته
كثيراً، فسمعه يقول: كانت فيروز تؤذيني يوماً وتستطيل عليّ بلسانها،
فقال لها أبو الحسن القارىء لم تؤذين هذا الشيخ؟ فقالت: لأنى أحبه.

وقال يحيى بن معاذ: مثقالُ خردلة من الحب أحب إليَّ من عبادة سبعين سنة بلا حب.

وقيل: إن شاباً أشرف على الناس في يوم عيد وقال:
من مات عشقاً فليمت هكذا ... لا خير في عشق بلا موت
وألقى نفسه من سطح عال فوق ميتاً.

وحكي أن بعض أهل الهند عشق جارية، فرحلت الجارية، فخرج الرجل في وداعها، فدمعت إحدى عينيه دون الأخرى، فغمض التي لم تدمع أربعاً وثمانين سنة. ولم يفتحها، عقوبة لها؛ لأنها لم تبك على فراق حبيبته، وفي معناه أنشدوا:

بكت عيني غداة البين دمعاً ... وأخرى بالبكا بخلت علينا
فعاقت التي بخلت بدمع ... بأن غمضتها يوم التقينا

وقال بعضهم: كنا عند ذي النون المصري: فتذاكرنا المحبة، فقال ذو النون: كفوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. ثم أنشأ يقول:
الخوف أولى بالمسي ... ء إذا تأله والحزن
والحبُّ يجمل بالتقي ... وبالنقي من الدرّ

وقال يحيى بن معاذ: من نشر المحبة عند غير أهلها فهو في دعواه دعيّ.
وقيل: ادّعى رجل الاستهلاك في محبة شخص، فقال له الشاب: كيف هذا، وأخي أحسن مني وجهاً وأتمّ جمالاً؟ فرفع الرجل رأسه يلتفت، وكنا على سطح فالقاه من السطح وقال: هذا أجر من يدعي هواناً وينظر إلى سوانا.
وكان سمنون يقدم المحبة على المعرفة، والأكثرون يقدمون المعرفة على المحبة.

وعند المحققين: المحبة: استهلاك في لذة، والمعرفة: شهود في حيرة، وفناء في هيبة.

وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة، بمكة، أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سناً، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفا شربه منكأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيب؛ فإن تكلم فبالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله والله ومع الله فبكر الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرّمت على القلوب أن يدخلها حي وحب غيري فيها.

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا هيثم بن همام قال: أخبرنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثني عبد الرحمن ابن عفان قال: حدثني محمد بن أيوب قال: حدثني أبو العباس خادم الفضيل ابن عياض قال: احتبس بول الفضيل، فرفع يديه وقال: اللهم بحبي لك إلا أطلقته عني، فما برحنا حتى شفي.

وقيل المحبة: الإيثار كامرأة العزيز لما تناهت في أمرها قالت: " أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين " .

وفي الابتداء قالت: " ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلى أن يسجن أو عذاب أليم " ، فوركت الذنب في الابتداء عليه، وفي الانتهاء نادى على

نفسها بالخيانة.

سمعت الأستاذ أبا علي يقول ذلك.

وحكي عن أبي سعيد الخراز أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله أعذرني، فإن محبة الله شغلتنى عن محبتك.. فقال: يا مبارك، من أحب الله تعالى فقد أحبني.

وقيل: قالت رابعة في مناجاتها: إلي، أتحرق بالنار قلباً يحبك؟ فهتف بها هاتف: ما كنا نفعل هكذا، فلا تظني بنا ظن السوء!! وقيل: الحب، حرفان: حاء وباء، والإشارة فيه: أن من أحب فليخرج عن روحه وبدنه.

وكالإجماع من إطلاقات القوم: أن المحبة: هي الموافقة، وأشد الموافقات: الموافقة بالقلب، والمحبة توجب انتفاء المباينة؛ فإن المحب أبداً مع محبوبه، وبذلك ورد الخبر: "حدثنا الإمام أبو بكر بن فورك، رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا القاضي أحمد بن محمود بن حرزاذ قال: حدثنا الحسين بن حماد بن فاضلة قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وأثل، عن أبي موسى الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: "إن الرجل ليحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب".

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان الحيري يقول. سمعت أبا حفص يقول: أكثر فساد الأحوال من ثلاثة، فسق العارفين، وخيانة المحبين، وكذب المريدين.

قال أبو عثمان: فسق العارفين: إطلاق الطرف واللسان والسمع إلى أسباب الدنيا ومنافعها.

وخيانتة المحبين: اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فيما يستقبلهم.
وكذب المرادين: أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب عليهم على ذكر الله عز وجل.

وسمعه يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا القاسم الجوهري يقول: سمعت أبا علي ممشاد بن سعيد العكبري يقول: رواد خطاف خطابة في قبة سليمان، عليه السلام، فامتنعت عليه، فقال لها: لِمَ تمتنعين عليّ وإن شئت قلبت القبة على سليمان!! فدعاه سليمان، عليه السلام، وقال له: ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا نبي الله، إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم! فقال: صدقت.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে।” [মাইদাহ : ৫৪]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাঁর সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহর সাক্ষাৎকে যে অপছন্দ করে, আল্লাহও তাঁর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।”

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: “যে ব্যক্তি আমার অলিকে অপদস্থ করলো, সে আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আমার

মু'মিন বান্দাহ যখন মৃত্যুকে অপছন্দ করে তখন আমি তার রুহ কব্জ করতে ইতঃস্তত বোধ করি, কিন্তু তা করতে হবে। বান্দা ফরয ইবাদতের দ্বারা যেটুকু আমার নিকটে আসে অন্য কোন প্রিয় ইবাদত দ্বারাও আমার কাছে সেরূপ আসতে পারে না। বান্দা নফল ইবাদতের দ্বারা আমার কাছে আসতেই থাকে- শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালোবাসি। এ ভালোবাসার ফলে আমি তার কান, দৃষ্টিশক্তি, হাত ও সহায়তে পরিণত হয়ে যাই।”

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালামকেও বলেন, হে জিব্রাঈল! তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালাম তাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি আকাশবাসীর প্রতি ঘোষণা দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও ভালোবাসো। তখন তারাও এই বান্দাকে ভালোবাসেন। এরপর, পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা এসে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন এর বিপরীতার্থক ঘোষণা দেন।”

মুহাব্বাত হলো উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য। বান্দার প্রতি যে আল্লাহর মুহাব্বাত বিদ্যমান তা আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করলেন। আল্লাহর প্রতিও যে বান্দার মুহাব্বাত আছে তা-ও আল্লাহ সাক্ষ্য দিলেন। সুতরাং এটা বলা যায়, আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন এবং বান্দাও আল্লাহকে ভালোবাসে।

ভাষাবিদদের মতে মুহাব্বাত হলো ইরাদা। তবে সুফিদের ভাষায় মুহাব্বাত দ্বারা সাধারণ ইরাদা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইরাদা। ইনশাআল্লাহ! আমরা বিষয়টি সবিস্তার তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বান্দার প্রতি আল্লাহর মুহাব্বাতের অর্থ হলো, আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আল্লাহর রাহমাতের মা'না হলো, পুরস্কার প্রদানের ইরাদা করা। আর রাহমাত হলো ইরাদা থেকেও খাস। আর মুহাব্বাত হলো রহমত থেকেও খাস। সুতরাং আল্লাহ বান্দাকে পুরস্কার ও বিনিময় প্রদান করবেন, এর অর্থ হলো তিনি তার উপর রাহমাত বর্ষণ করবেন। কিন্তু আল্লাহ যখন বান্দাকে তাঁর নৈকট্যদান ও উচ্চ পর্যায়ের হাল প্রদানের ইচ্ছা করেন, তখন এর মা'না হলো আল্লাহ তাকে মুহাব্বাত করছেন। ইরাদা হলো, আল্লাহর একটি

সিফাত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পার্থক্য দ্বারা নামও ভিন্ন ভিন্ন হয়। শান্তির সাথে এটা সম্পর্কিত হলে এর নাম হয় গজব। দয়া-করুণার সাথে সম্পর্কিত হলে তার নাম হয় রাহমাত। আর বিশেষভাবে সম্পর্কিত হলে তা হবে মুহাব্বাত।

একদল সুফি বলেন: বান্দাকে আল্লাহ মুহাব্বাত করেন- এর মা'না হলো আল্লাহ বান্দার প্রশংসা ও গুণগান করেন। তাদের এ কথার অর্থ, মুহাব্বাত হবে এক ধরনের কালাম, আর আল্লাহর কালাম হলো চিরন্তন। আরেকদল সুফি বলেন: বান্দার প্রতি আল্লাহর মুহাব্বাতের মা'না হলো, আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ করুণা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে উন্নীত করছেন। অপর আরেকদল বলেন: মুহাব্বাত হলো আল্লাহর সিফাতে খবরী। তারা এটুকু বলে ব্যাখ্যা প্রদান থেকে নীরব রয়েছেন।

সৃষ্টির মধ্যে মুহাব্বাতের যে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়- যেমন কোনো বস্তুর প্রতি বৃক্কে পড়া ও এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করা কিংবা এমন এক হালত যার দ্বারা প্রেমিক তার প্রেমস্পদ থেকে উপভোগ করে-এগুলো আল্লাহর মুহাব্বাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র। তিনি চিরন্তন জাত।

আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বাতের অর্থ হলো বান্দা তার অন্তর দ্বারা একটি বিষয় উপলব্ধি করবে। এ অনুভূতি প্রকাশে সে আনন্দ পাবে। এর প্রকাশ হবে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর সন্তুষ্টিতে প্রাধান্য দান, তাঁকে ছাড়া ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করা এবং অন্তর দিয়ে সর্বদা তাঁর জিকির দ্বারা শান্তি উপভোগের মাধ্যমে।

‘মুহাব্বাত’ শব্দের ব্যাখ্যায় সুফিয়ায়ে কিরামের অনেক কথা আছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ও এর উৎপত্তি সম্পর্কেও তাঁদের অনেক কথা আছে। যেমন:

১. ‘আল-হাবাব’: শব্দটির অর্থ হলো ‘প্রবল বৃষ্টিপাতের সৃষ্ট শোতে কোনো বস্তু ভেসে যাওয়া’। সুতরাং, মুহাব্বাতের অর্থ দাঁড়ালো, প্রেমস্পদের প্রতি অন্তরে প্রচণ্ড পিপাসা সৃষ্টি হওয়া।
২. ‘আহাব্বাল বায়িরু’: শব্দটির আভিধানিক অর্থ- উট এমনভাবে বসলো যে, সে আর উঠতে ইচ্ছুক নয়। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং মুহিব্বের অন্তর তার মাহবুবের চিন্তা-চেতনা থেকে কখনো গাফিল হবে না।

৩. ‘হাব্বুন’: এর অর্থ কানের দোল। এটি কানের সাথে লেগে থাকে। মুহাব্বাতের মাঝেও অনুরূপ অর্থ নিহিত। কবি বলেন:

সর্পটি ভয়ঙ্করভাবে তার জিহ্বা নাড়ছে, তার নিকটে আছে
যেনো একটি কানের দোল, গোপন কথাগুলো শ্রবণ করছে।

৪. ‘হাব্বা’।

৫. ‘হাব্বুন, হুব্বুন’। এটা আমরুন, উমরুন।

৬. ‘হিব্বা’: এর অর্থ মরুভূমির বালুকণা।

৭. ‘হাব্বুন’: অর্থ, চার কাষ্ঠবিশিষ্ট পাত্র রাখার বস্ত্র যার উপর পানির কলস রাখা হয়। সুতরাং এর দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে, ঠিক পাত্রের মতো মাহবুবের শোক-দুঃখকে মুহিব্ব বহন করে।

৮. ‘হাব্বুন’: এ শব্দের অপর অর্থ পানির পাত্র। এতে পানি ছাড়া আর কোনো বস্তুর স্থান হয় না। অনুরূপ অন্তর যখন মাহবুবের প্রেমে বিভোর হবে তখন সেখানে আর কারো স্থান থাকবে না।

‘মুহাব্বাতের’ মর্ম সম্পর্কেও মাশাইয়ে কিরামের অনেক কথা আছে। আমরা এখন এগুলো তুলে ধরছি। যেমন:

১. হৃদয়ের অস্থিরতাসহ কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকে পড়া।

২. সাথীদের উপর মাহবুবকে প্রাধান্য দেওয়া।

৩. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাহবুবের সাথে মিল রেখে চলা।

৪. নিজের গুণাবলী [সিফাত] ভুলে যাওয়া। আর মাহবুবের সত্তার সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা।

৫. আল্লাহর উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে অন্তরে মতৈক্য পোষণ করা।

৬. খিদমাতের সাথে সাথে বে-হুরমতির আশঙ্কা করা।

হযরত আবু ইয়াজিদ বায়েজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “নিজের বেশী জিনিসকে কম মনে করা আর হাবীবের অল্পকেও বেশী ভাবার নাম মুহাব্বাত।” হযরত সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আনুগত্যের আলীঙ্গন ও বিরুদ্ধাচরণ বর্জন হলো মুহাব্বাত”। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মাহবুবের সিফাত দ্বারা নিজের সিফাত মিটিয়ে ফেলা হলো মুহাব্বাত।” তাঁর একথার অর্থ হলো, মাহবুবের জিকির সর্বদা জারী থাকবে।

সুতরাং অন্তরে কেবল মাহবুবের সিফাত অবশিষ্ট থাকবে এবং নিজের সিফাত ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করে দেবে। হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা'না সামঞ্জস্য বজায় রাখা।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “তুমি তোমার মাহবুবকে সবকিছু বিলিয়ে দেবে। নিজের জন্য কিছুই রাখবে না। এটার নামই হলো মুহাব্বাত।” হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাতের নামকরণের কারণ হলো, অন্তরে মাহবুব ছাড়া বাকী সবকিছু মুছে যায়।” ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা'না সর্বদা তিরস্কারের মধ্যে থাকা।” হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত হলো একটি স্বাদ, তবে এর ক্ষেত্রসমূহে ভয়-ভীতি আছে।” তিনি আরো বলেন, “মুহাব্বাতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করাকে বলে ইশ্ক। সুতরাং আল্লাহর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্য নয়। কারণ এরূপ হলে আল্লাহ তা'লা মুহাব্বাতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হবেন যা অসম্ভব। সুতরাং ইশ্ক শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, আর আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বাতের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা যাবে না।”

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাতের অর্থ হলো মাহবুব যদি অপরকে মুহাব্বাত করেন তাহলে ঈর্ষান্বিত হওয়া।” হযরত ইবনে আ'তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত এমন কিছু ডাল-পালা যা অন্তর থেকে গাঁজে ওঠে। আর জ্ঞান ও বিবেকের মাত্রানুসারে তা ফলবান হয়।” হযরত নাসরাবাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা'না রক্তপাত ঘটান।” হযরত সামনুন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আল্লাহর প্রেমিকরা দুনিয়া-আখিরাতে মর্যাদা লাভে ধন্য। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথেই থাকবে। সুতরাং মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহর সাথেই থাকবে।” হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “কষ্ট ও দুঃখের দ্বারা প্রকৃত মুহাব্বাতের মধ্যে কোনো কমতি হয় না। আর দয়ার দ্বারা তাতে কোনো প্রকার বৃদ্ধিও হয় না। যে ব্যক্তি মুহাব্বাতের দাবী করে অথচ এর সীমানা রক্ষা করে না, সে প্রকৃত প্রেমিক নয়।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত যখন নিখাদ

এবং খাঁটি হয় তখন আদবের কোনো শর্ত অবশিষ্ট থাকে না।” এ মর্মে হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবিতা আবৃত্তি করতেন:

ব্যক্তিদের মধ্যকার প্রেম যখন পবিত্র এবং তাদের আকর্ষণ হয় স্থায়ী
[একে অন্যের প্রতি] তাদের প্রশংসা হয়ে ওঠে কদাকার।

তিনি [আবু আলী দাঈক রাহ.] আরো বলতেন: “তুমি এমন করুণাশীল পিতা পাবে না, যে তার নিজের সন্তানকে [অতিবেশি] সম্মান প্রদর্শন করবে কথা বলার সময়। যখন অন্যরা তাকে [পুত্রকে সম্মানের সাথে] সম্বোধন করে, তখন পিতা শুধু বলে, ‘ও, এটা ওটা!’।”

হযরত কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত হলো মাহবুবের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করা।” হযরত বুন্দার ইবনে হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “বনী আমীরের এক মৃত মাজনুনকে কেউ একদা স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে আল্লাহ তাঁ’আলা কিরূপ আচরণ করেছেন? জবাব দিলেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং প্রেমিকদের বিরুদ্ধে আমাকে প্রমাণস্বরূপ রেখেছেন।” হযরত আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা’না বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে কী পাবে তা-ও ভুলে যাবে। তার প্রয়োজনও তার থেকে বিস্মৃত হবে।”

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনার মধ্যে কি মুহাব্বাতের কিছু আছে? জবাব দিলেন, “বিশ্বাস করো, সুফিদের আক্ষেপ ও বিলাপ আমার কাছে আছে। আল্লাহ তো এমন সত্তা, তাঁর মধ্যেই তাঁর প্রেমিকরা জ্বলে যায়!” তিনি আরো বলতেন, “মুহাব্বাত হলো সর্বদা সান্ত্বনা থেকে দূরে থাকা।” তিনি আবৃত্তি করতেন:

দীর্ঘমেয়াদী বিরহ হেতু অনেকে হয়তো পথবিচ্যুতির স্বাদ নেবে
আমি কিন্তু, লায়লার কারণে তার স্বাদ কখনো নেই নি
তার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সর্বাধিক যাকিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি
তাহলো আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যা বাস্তব নয়, শুধুমাত্র স্ফুলিঙ্গ যেনো।

মুহাম্মাদ ইবনে ফজল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা’না অন্তরে হাবীব ছাড়া আর কারো প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকবে না।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত হলো কোনো প্রকার প্রাপ্তির

আশা ছেড়ে কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া।” একজন শায়খ বলেছেন: “মুহাব্বাত হলো অন্তরের অস্থিরতা। মাহবুবের কারণে তা সৃষ্টি হয়।” আরেক শায়খ বলেন: “মুহাব্বাত অন্তরে একটি পরীক্ষা। মুরাদের কারণে তা সৃষ্টি হয়।” হযরত ইবনে আ’তা রাহমাতুল্লাহি আবৃত্তি করতেন:

আমি প্রোথিত করেছি অনুরাগের চারা প্রেমিকদের জন্য
কারণ প্রেমগ্নি কী তাতো আমার পূর্বে কেউ বুঝে নি!
এটা চারাকে আবৃত করেছি পত্রাদি দ্বারা এবং ঘিরে রেখেছে তার বাঁকানো
শাখাগুলো
তারপর তা উৎপন্ন করেছে আমার জন্য মিষ্ট ফলের তিজ্ঞতা
[জগতের] সকল প্রেমিকের প্রেমানুরাগ, যদি তারা খুঁজে দেখে তাহলে
বুঝবে
সবই এসেছে এই [আমার অনুরাগের চারা] সূত্র থেকে।

একজন শায়খ বলেছেন: “মুহাব্বাতের প্রথম স্তর হলো ধোঁকাবাজি আর সবশেষে হত্যাকাণ্ড!” উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি “বস্তুর প্রতি মুহাব্বাত অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়।” এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতেন: “মুহাব্বাতের দ্বারা অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও মাহবুবের প্রতি ভয় সৃষ্টি হয় [যদি তিনি অপরকে ভালোবেসে ফেলেন!]।” তিনি আবৃত্তি করতেন:

যখন [বেরিয়ে আসলাম] তিনি আমার সম্মুখে হাজির হলেন, আমি ভীষণ ভয়
পেলাম তার [বিরিট] আকৃতি দেখে
আমি ফিরে গেলাম ঐ ব্যক্তির মতো যে কখনো বেরুতে চয় নি।

হযরত হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা’না কারো প্রতি নিজের সর্বস্ব নিয়ে ঝুঁকে পড়বে। তার জন্য আপন জান-মাল ও অস্তিত্ব বিলীন করবে। গোপনে ও প্রকাশ্যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। এরপর তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে যেসব ক্রটি হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কেও সতর্ক থাকবে।”

হযরত সিররি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “দু’জনের মধ্যে মুহাব্বাত তখনই পরিশুদ্ধ হবে যখন একে অন্যকে সম্বোধন করে বলবে, ‘হে আমি!’”। হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “প্রেমিক ব্যক্তি নীরব থাকলে

ধ্বংস হয়ে যায়। আর আরিফ নীরব না থাকলে ধ্বংস হয়।” একজন শায়খ বলেছেন: “মুহাব্বাত হলো অন্তরের আগুন। এ অগ্নিতে মাহবুবের চাহিদা ছাড়া বাকী সবকিছু ভষ্মিভূত হবে।” আরেক শায়খ বলেছেন: “মুহাব্বাতের অর্থ হলো মাহবুবের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া। মাহবুব যা চায় তা-ই করবে।” হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত মা’না পর্দান্মোচন ও রহস্য বিলীন করা।” হযরত আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত তখনই হবে খাঁটি যখন মাহবুবের প্রতি দৃষ্টিপাতও বিলুপ্ত হবে।” হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার নিকট পত্রযোগে বললেন, এটি ৭ শত কেচ্ছা-কাহিনী থেকেও তোমার জন্য উত্তম। এতে ছিলো নিম্নোক্ত কবিতাগুলো:

আমি যখন তাকে বললাম, তোমাকে ভালোবাসি, সে জবাব দিল: ‘তুমি আমাকে মিথ্যা বলছো! আমি কি তা বুঝি না,
(তোমার দেহের) অংশগুলো এখনো (মাংসে) আবৃত?’

এটা (সত্যিকার) প্রেম নয় যদি না তোমার হৃদয় নাড়িছুঁড়ির সাথে মিশে না যায়

এবং যতক্ষণ না এমন কৃশ হয়েছো যে, তুমি কারো ডাকে সাড়া দিতে অপারগ

এবং যতক্ষণ না তুমি নিশ্চিহ্ন হয়েছো যে, তোমার প্রেমাসক্তি তোমাকে কিছুই অবশিষ্ট রাখে নি

একমাত্র উন্মুক্ত চোখের তারা ছাড়া, যদ্বারা তুমি উপাসনা এবং সন্ধান করো
[তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে] অন্তরঙ্গতা।

হযরত ইবনে মাশরুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত সামনুনকে মুহাব্বাত সম্পর্কে বলতে শুনেছি; তিনি যে মসজিদে বসে বলছিলেন সেখানকার সকল বাতি ভেঙ্গে যায়! একটি ছোট পাখি তাঁর নিকটবর্তী হলো। কাছে থেকে কাছে গেলো। অবশেষে মাতা নত করে ঠোঁট দ্বারা মেঝের উপর আঘাত করতে লাগলো। ঠোঁট ফেটে রক্ত বরলো। এরপর পাখিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “প্রত্যেক মুহাব্বাতের উদ্দেশ্যবস্তু আছে। যখন সে উদ্দেশ্যবস্তু বিলুপ্ত হয় মুহাব্বাতও এর সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়।” হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি

পাগলাগারদে অবস্থান করছিলেন। কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কারা?” তারা জবাব দিলেন, “হে আবু বকর! আমরা তারা যারা আপনাকে ভালোবাসে!” একথা শ্রবণ করে তিনি তাদের প্রতি পাথর ছুড়ে মারলেন! তারা সেখান থেকে ছুটে পালালো। তিনি মন্তব্য করলেন, “তোমরা যদি আমার প্রতি মুহাব্বাতের দাবী সম্পর্কে সত্যবাদী হতে, তাহলে আমার থেকে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করতে!” এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন:

হে আমার সদয় মালিক! তোমার [প্রতি আমার] মুহাব্বাত আমার অন্তঃনিগূঢ়ে

ও তুমি! যে আমার চোখের পাতা থেকে নিদ্রা কেড়ে নিয়েছো, তুমিই তো ভালো জানো আমার কী হয়েছে।

হযরত মনসুর আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট পত্র লিখলেন: “তাঁর মুহাব্বাতের পিয়ালো থেকে অতিরিক্ত পান করে আমি মাতাল হয়ে গেছি।” হযরত বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিউত্তরে লিখলেন: “অন্য একজন পৃথিবী ও আকাশের সকল সাগর থেকে [মুহাব্বাতের সূরা] পান করেছে, অথচ তার পিপাসা মিটে নি। তার জিহ্বা [মুখ থেকে] বের হয়ে আছে এবং উচ্চারণ করছে: আরো কি [সূরা] আছে?” তারা আবৃত্তি করেন:

আমি বিস্মিত হই ওর প্রতি যে বলে: ‘আমি আমার একান্ত বন্ধুকে স্মরণ করি।’ আমি কি [তাঁকে] ভুলে গেলাম, তাই যা বিস্মৃত ছিলাম তা স্মরণ করতে হবে?

আমি যখন তোমায় স্মরণ করি, মরে যাই- শুধু পুনরায় ফিরে পেতে জীবন শীঘ্রই

এবং তোমার প্রতি যদি আস্থা না থাকতো তাহলে পুনর্জীবন আর কখনো ফিরে পেতাম না

[তোমার প্রতি] আমার উচ্চাভিলাষ থাকায় আমি জ্যান্ত এবং [আমার] আবেগময় বিরহের কারণে আমি মৃত

কতোবার আমি জীবিত ও মৃত থেকেছি শুধু তোমার কারণে!

আমি পান করেছি মুহাব্বাত [এর সূরা] একটার পর আরেকটি পিয়ালো ভর্তি

অথচ, সূরা কখনো শেষ হয়ে যায় নি এবং হয় নি নিঃশেষ আমার পিপাসাও!

বলা হয়ে থাকে, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহি প্রেরণ করলেন: “নিশ্চয়ই, আমার কোনো বান্দার হৃদয়ে যদি দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রতি মুহাব্বাতের কোনো নিশানা না পাই, তাহলে সে হৃদয়কে আমার ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেই।” আমার শায়খ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বহস্তে লিখে রাখতে দেখেছি: “একটি আসমানী কিতাবে লিখা আছে: ‘ও আমার বান্দাহ! আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য দান করি তোমায় ভালোবেসে, সুতরাং তুমিও আমাকে আমার প্রাপ্য দান করো আমায় ভালোবেসে!’” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যাকে [ঐশি] মুহাব্বাতের কিছুটা অংশ দান করা হয়েছে, অথচ দান করা হয় নি [প্রভু] ভীতি, সে ভ্রমে আছে।”

বলা হয়ে থাকে: “মুহাব্বাত সেটি যা আপনার অস্তিত্বকেও মুছে দেয়।” আরো বলা হয়ে থাকে: “মুহাব্বত হলো একটি নেশা, আর এ নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তি কখনো অপ্রমত্ত হবে না যতক্ষণ না সে তার প্রেমস্পদের দীদার লাভ করবে।” মুহাব্বাতের অনুভূতির সময় যেরূপ নেশাগ্রস্ততা আসে, তার ব্যাখ্যাদান সম্ভব নয়। নেশাগ্রস্তরা আবৃত্তি করেন:

[প্রেম সূরার] পেয়ালার ঘূর্ণন আমার সাথীদেরকে মত্ত করেছে,
তখন আমি ছিলাম নেশাগ্রস্ত ওর প্রতি যে ঐ পেয়লা নিয়ে ঘুরছিলো।

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করতে খুব অনুরাগী ছিলেন:

আমার নেশার স্বরূপ দু'টি, অপরদিকে আমার অনুগ্রহ-সাথীদের ছিলো মাত্র
একটি

আর এ কারণেই আমি তাদের থেকে ভিন্ন।

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুহাব্বাত হলো চিরন্তন [স্ব]-প্রত্যাভিযোগ।” শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফাইরুয নান্নী এক দাসী ছিলো। তার একনিষ্ঠ খিদমাতের কারণে তিনি তাকে মুহাব্বাত করতেন। এই দাসী সম্পর্কে তাঁকে বলতে শুনেছি: “একদিন ফাইরুয আমার

খিদমাত করছিলো, এতে বিরক্ত বোধ করলাম। আবুল হাসান ক্বারী তাকে এই বলে তিরস্কার করলেন: ‘ওহে, তুমি শায়খকে কেনো বিরক্ত করছো?’ সে জবাব দিলো: ‘কারণ আমি তাকে মুহাব্বাত করি!’”

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার মতে, সরষে দানা পরিমাণও [এরশী] মুহাব্বাতের মূল্য মুহাব্বাত ছাড়া সত্তর বছর ইবাদতের মূল্যের চেয়েও বেশি।”

একদা এক উৎসবে নিম্নের পংক্তিদ্বয় একজন যুবকের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিলো:

যে কেউ মুহাব্বাতের উত্তেজনা হেতু মরতে চায়, তাকে মরতে দাও!

কারণ মৃত্যু ছাড়া মুহাব্বাতের উত্তেজনার কোনো মূল্য নেই!

এপর ঐ যুবক উঁচু ইমারতের ছাদ থেকে লাফ মেরে ভূমিতে পড়ে গেল। তার জীবনের ইতি ঘটলো।

ভারতের কোনো এক স্থানে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একটি দাসী মেয়েকে খুব বেশি মুহাব্বাত করতেন। মেয়েটি সে স্থান থেকে বিদায় হওয়ার প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত হলেন। তার একটি চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো কিন্তু অপরটি শুকনো রইলো। তার প্রেমিকার বিদায়ক্ষণে অশ্রুসিক্ত না হওয়ার শাস্তিস্বরূপ পরবর্তী ৮৪ বছর যাবৎ এ চোখটি তিনি বন্ধ রেখে দিলেন। তারা এ সম্পর্কে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে থাকেন:

আমার একটি চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরেছে বিরহের প্রাতঃকালে,

আর অপরটি ক্রন্দনে কৃপণতা করেছে

সুতরাং আমি একে শাস্তি দিয়েছি বন্ধ রেখে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন আমাদের মিলন আবারো [মরণ পরে] ঘটেছে।

একজন সুফি বলেন: “একদা আমরা হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলাম। মুহাব্বাত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ‘এই বিষয় নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকো! তোমাদের রুহসমূহ যদি এটা সঠিকভাবে বুঝতে না পারে, তাহলে তারা এর উপর দাবী করে বসতে পারে।’” এরপর তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

মন্দ কর্মীর জন্য ভয় ও দুঃখ উত্তম, যখন সে আনুগত্যের আমল করে, অপরদিকে মুহাব্বাত ঐ ব্যক্তির জন্য খাঁটে যে প্রভুকে ভয় করে এবং সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকে।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যে কেউ [ঐশি] মুহাব্বাত নিয়ে কথা বলে, সে জানে, যারা এটা বুঝে না তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করে।” কথিত আছে, এক ব্যক্তি দাবী করলো সে কারো সঙ্গে গভীর ভালোবাসায় লিপ্ত। সে প্রশ্ন করলো, কিভাবে এটা সম্ভব যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, যেখানে আমার ভ্রাতার মুখমণ্ডল আরো সুন্দর ও উজ্জ্বল? এরপর দাবীদারকে নিয়ে সে গৃহের ছাদে দাঁড়ালো এবং দাবীদারকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিল। বললো: ‘এটা হলো সমুচিত প্রতিদান যে দাবী করে আমাদেরকে ভালোবাসে অথচ অপরের চেহারার দিকে তাকায়!’

হযরত সামনুন মুহিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাব্বাতকে মা’রিফাতের উপর প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ সুফি মা’রিফাতকে মুহাব্বাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মুহাব্বিক ব্যক্তিদের মতে, মুহাব্বাত হলো মহানন্দে ডুব দেওয়া, অপরদিকে মা’রিফাত হলো হতবুদ্ধির [হাইরা] মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভ। তাঁর ভীতির মাঝে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করা [ফানা]।

হযরত আবু বকর কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “পবিত্র হজ্জ পালনের সময় মক্কা মুকাররমায় মুহাব্বাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। আলোচকরা ছিলেন সুফি শায়খবৃন্দ। জুনাইদ বাগদাদী ছিলেন বয়সে সবার ছোট। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘হে ইরাকী! আপনি কী মনে করেন, আমাদেরকে বলুন?’ তিনি মাথা নত করলেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। এরপর তিনি উচ্চারণ করলেন: “যখন আল্লাহর বান্দা নিজেকে ভুলে যায়, সে তখন তাঁর প্রভুর অনুস্মরণের সঙ্গে মিশে পড়ে। তাঁর প্রাপ্য তাঁকে প্রদান করে, এবং তাঁকে হৃদয়নেত্রে দেখে। তারপর তাঁর নির্ধাসের তাজাল্লি এসে বান্দার হৃদয় দক্ষ হয়। আকর্ষণের পেয়ালা থেকে পান করা হয়ে ওঠে নিষ্কলুষ এবং মহান এক, তাঁর গোপন রহস্যের পর্দা উত্তোলন করে দেন বান্দার সম্মুখে। এরপর ঐ বান্দা যখন বলে- তখন আল্লাহর মাধ্যমে বলে; সে যদি একটি শব্দ উচ্চারণ করে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়; সে যদি নড়াচড়া করে, আল্লাহর নির্দেশে নড়াচড়া করে; যদি সে বিশ্রাম নেয়, আল্লাহর সাথে বিশ্রাম নেয়; সুতরাং সে হয়ে যায়,

আল্লাহর মাধ্যমে, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাথে।' সুফি শায়খরা এসব কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। বললেন: 'এসব কথার সঙ্গে কিছুই যুক্ত করার নেই। হে মা'রিফাতপন্থীদের মুকুট! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমতাশীল করুন।' কথিত আছে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আলাইহিস্‌সালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন: "হে দাউদ! একমাত্র আমি ছাড়া মানব হৃদয়ে অন্যের প্রতি মুহাব্বাত নিষিদ্ধ করেছি।"

হযরত ফুযাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম আবুল আব্বাস বলেন: "যখন হযরত ফুযাইলের প্রশ্নব বন্ধ হয়ে গেলো, তিনি উপরের দিকে হাত তুলে দু'আ করলেন: 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার মুহাব্বাতের খাতিরে এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন!' আমরা নড়াচড়া করার পূর্বেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।" বলা হয়ে থাকে, 'মুহাব্বাত হলো [নিজের থেকে] বেশি গুরুত্ব দেওয়া, ঠিক যেভাবে আজিজের স্ত্রী [জুলায়খা] তার মুহাব্বাতে ভুল করে, স্বীকার করেছিলেন, 'আমিই তাকে আমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু তিনি [ইউসুফ আ.] ছিলেন সত্যবাদী।' অথচ শুরুতে তিনিই বলেছিলেন, 'এমন ব্যক্তির জন্য জেলের সাজা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক সংশোধনমূলক শাস্তি ছাড়া কী হতে পারে, যিনি নিজেই কুকর্মে লিপ্ত হতে আমন্ত্রণ জানায়?' সুতরাং শুরুতে তিনি [জুলায়খা] তাঁকে পাপী বলে দাবী করলেন, কিন্তু অবশেষে [তার বোধোদয় হওয়ায়] নিজেকেই দোষী বলে স্বীকৃতি দিলেন।'

[ইমাম কুশাইরী বলেন] আমি হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: "আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: 'আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমায় ক্ষমা করুন, আল্লাহর প্রতি মুহাব্বাতের কারণে আপনার প্রতি মুহাব্বাত পোষণ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি জবাব দিলেন: 'হে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি! যে কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলাকে মুহাব্বাত করলো, সে তো আমাকেও মুহাব্বাত করলো!'"

হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যক্ষেপে একদা বললেন: "হে প্রভু আমার! তুমি কি সে হৃদয়কে [জাহান্নামের] অগ্নিতে জ্বালিয়ে দেবে, যেটি তোমার মুহাব্বাতে বিভোর?" তিনি এক গায়েবী আওয়াজ শুনলেন: "আমি তা করি নি! আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না!" তারা [সুফিরা]

বলেন: হুব [মুহাব্বাত] শব্দে দু'টি অক্ষর আছে- 'হা' এবং 'বা'। যে কেউ মুহাব্বাতে আক্রান্ত সে দু'টি জিনিষ পরিত্যাগ করে: তার আত্মা [রুহ] এবং তার দেহ [বাদান]।

মুহাব্বাত সম্পর্কে সুফিদের মধ্যে যে মতৈক্য হয়েছে তাহলো: মুহাব্বাত হলো নিজেকে [আল্লাহর ইচ্ছার উপর] বিলিয়ে দেওয়া, আর সর্বাধিক শক্তিশালী বিলীনতা হলো হৃদয়ের। মুহাব্বাতের শর্ত হলো প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যখ্যান করা; প্রেমিক সর্বদাই তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে থাকে। ব্যাপারটি এই হাদিস থেকে প্রমাণিত: ইমাম আবু বকর ফুরাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদেরকে বলেছেন: তিনি কাজী আহমদ বিন মাহমুদ বিন খুররাজা থেকে, তিনি হাসান বিন হাম্মাদ বিন ফাদালা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন হাবিব থেকে, তিনি মারহুম বিন আবদুল আজিজ থেকে, তিনি হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি হযরত আ'মাশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি ওয়াইল রাহিমাতুল্লাহি আনহু থেকে, এবং তিনি হযরত আবু মুসা আশআরী রাহিমাতুল্লাহি আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কেউ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলো: কেউ কি অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে, নিজেকে সে ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত না রেখে? তিনি জবাব দিলেন, “যে মানুষ যাকে ভালোবাসে সে [সর্বদাই] তার সঙ্গে থাকে।”

হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সুফিদের আধ্যাত্মিক অবস্থার সর্বাধিক ক্ষতির কারণ তিনটি: ১. মা'রিফাতপন্থীদের পাপ, ২. প্রেমিকদের অবিশ্বাস এবং ৩. উচ্চাভিলাষীদের মিথ্যাবাদিতা।” আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘মা'রিফাতপন্থীদের পাপ’ কথাটির অর্থ হলো, তারা তাদের দৃষ্টি, জিহ্বা ও শ্রবণকে গাইরুল্লাহর আল্লাদে নিমজ্জিত রেখেছে; ‘প্রেমিকদের অবিশ্বাস’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে কোনো অবস্থায় তারা তাদের পরিতৃপ্তিকে আল্লাহর বদলে প্রেমাকাজ্ঞার প্রতি অগ্রাধিকার দেয়; এবং ‘উচ্চাভিলাষীদের মিথ্যাবাদিতা’ কথাটির অর্থ হলো, তারা সৃষ্ট জীব-জন্তুকে প্রভু অপেক্ষা বেশি স্মরণ করে।

হযরত আবু আলী মুমশাদ বিন সাঈদ উকবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত সুলাইমান আলাইহিসসালামের প্রাসাদের গম্বুজের নীচে একটি পুরুষ চড়ুই পাখি আরেকটি মেয়ে চড়ুই পাখির আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোটোছুটি করছিলো।

কিন্তু মেয়ে পাখিটি অগ্রাহ্য করায় পুরুষটি জিজ্ঞেস করলো: ‘তুমি কেনো আমাকে গ্রহণ করছো না? [বাহাদুরী দেখাতে যেয়ে বললো] যদি চাও তো সুলাইমানের এই গম্বুজকে তাঁর উপর ফেলে দিই!’ [যেহেতু তিনি পাখিদের কথোপকথন বুঝতেন] সুলাইমান আলাইহিসসালাম ঐ পুরুষ চড়ুইকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আরে, তোমার তো সাহস কম না! কোন্ কারণে এরূপ কথা বললে?’ সে জবাব দেয়, ‘হে আল্লাহর নবী! প্রেমিকদের [ভাবোদ্দীপ্ত] কথার জন্য তাদের প্রতি অভিযোগ আনতে নেই!’ সুলাইমান আলাইহিসসালাম মন্তব্য করলেন: ‘তুমি সত্য কথা বলেছো!’।

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الشوق

বাবুশ শওক [আবেগপ্রবণ বিরহ অধ্যায়]

قال الله عز وجل: "من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت". أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: أخبرنا ابن أبي قماش قال: أخبرنا إسماعيل بن زرارة، عن حماد ابن يزيد، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبيه، قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة، فأوجز فيها، فقلت: ففت أبا اليقظان!! فقال: وما عليّ من ذلك، ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات، فقال: "اللَّهُمَّ بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحبني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي".

اللَّهُمَّ إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيماً لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرّد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، وشوقاً إلى لقائك في غير ضواء مضرّة ولا فتنة مُضلة.

"اللَّهُمَّ زينا بزينة الإيمان.. اللَّهُمَّ اجعلنا هداة مهتدين .."

قال الأستاذ الشوق: اهتمّاج القلوب إلى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون الشوق.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق، ويقول: الشوق

يسكن باللقاء والرؤية، والاشتياق لا يزول باللقاء. وفي معناه أنشدوا:

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته ... حتى يعود إليه الطرف مشتاق

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت النصراباذي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق، وليس لهم مقام الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار.

وقيل: جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فقال: رأيت في المنام أنك تموت إلى سنة، فلو استعددت للخروج؟ فقال له عبد الله بن منازل: لقد أجلتنا إلى أمد بعيد أأعيش أنا إلى سنة!! لقد كان لي أنس بهذا البيت الذي سمعته من هذا الثقيفي يغني أبا علي:

يا من شكا شوقه من طول فرقته ... اصبر لعلك تلقى من تحب غدا
وقال أبو عثمان: علامة الشوق: حب الموت مع الراحة.

وقال يحيى بن معاذ: علامة الشوق: فطام الجوارح عن الشهوات.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: خرج داود عليه السلام يوماً إلى بعض الصحارى منفرداً، فأوحى الله تعالى إليه: مالي أراك يا داود وحدانياً؟ فقال يا إلهي، استأثر الشوق إلى لقاءك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. فأوحى الله تعالى إليه: أرجع إليهم؛ فإنك إن أتيتني بعد أبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذاً.

وقيل: كانت عجوز قدّم بعض أقاربها من السفر فأظهر قومها السرور، والعجوز تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله تعالى.

وسئل ابن عطاء عن الشوق فقال: أحترق الأحشاء وتلهب القلوب

وتقطع الأكباد.

وسئل أيضاً عن الشوق، ف قيل له: الشوق أعلى أم المحبة؟ فقال: المحبة؛ لأن الشوق منها يتولد.

وقال بعضهم: الشوق لهيب ينشأ بين أثناء الحشى، يسبح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفء، وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة المحبوب لم يطررها الشوق.

وقيل لبعضهم: هل تشتقا؟ فقال: لا، إنما الشوق إلى غائب، وهو حاضر. سمعت الأستاذ أبي علي الدقاق يقول: في قوله عز وجل: وعجلت إليك رب لترضي قال: معناه: شوقاً إليك، فستره يلفظ الرضا.

وسمعت رحمته الله تعالى يقول: من علامات الشوق: تمنى الموت على بساط العوافي، كيوسف عليه السلام لما القي في الحب لم يقل توفي؛ ولما أدخل السجن لم يقل توفي؛ ولما دخل عليه أبواه وحرّ له الإخوة سُحداً وتم له الملك والنعم قال: توفي مسلماً. وفي معناه أنشدوا:
من سرّ العيد الجيد ... فقد عذمت به السرورا

كان السرور يثمّ لي ... لو كان أحبائي حضورا

وقال ابن خفيف: الشوق: ارتياح القلوب بالوجد، ومحبة اللقاء بالقرب. وقال أبويزيد: إن لله عبداً لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لا ستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار.

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: أخبرنا أبو العباس الهاشمي بالبيضاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا عبد الله الأنصاري قال: سمعت الحسين الأنصاري يقول: رأيت في النوم كأن

القيامة قد قامت وشخص قائم تحت العرش فيقول الحق، سبحانه: يا ملائكتي، من هذا؟ فقالوا: الله أعلم فقال هذا معروف الكرخي سكر من حي فلا يفيق بلقائي.

وفي بعض الحكايات في مثل هذا المنام أنه قيل: هذا معروف الكرخي خرج من الدنيا مشتاقاً إلى الله، فأباح الله عز وجل له النظر إليه.

وقال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالى، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: عزلاً المشتاقون إليّ... أشهدكم أنني إليهم أشوق..

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: " أسألك الشوق إلى لقائك " قال: كان الشوق مائة جزء، تسعة وتسعون له، وجزء متفرق في الناس، فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاً، فغار أن يكون شطية من الشوق لغيره.

وقيل: شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين؛ ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوماً... إذا دنت الخيام من الخيام

وقيل: إن المشتاقين يتحسون حلاوة الموت عند وروده؛ لما قد كشف لهم من رُوح اوصول أحلى من الشهد.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت جعفرأ يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام المعارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عن يشتاق إليه.

وقال أبو عثمان الخيري في قوله تعالى: " فإن أجل الله لآت " : هذا تعزية

المشتاقين، معناه: أني أعلم أن اشتياقكم إلى غالب. وأنا أجلت للقائكم أجلاً، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه.

وقيل: أوحى الله تعالى لداود عليه السلام: قل لشبان بني إسرائيل لم تشغلون أنفسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم، ما هذا الجفاء!! وقيل: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: لو يعلم المديرون على كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إليّ، وانقطعت أوصالهم من محبتي، يا داود هذه برادتي للمديرين علي، فبكيف إرادتي للمقبلين إليّ؟ وقيل: مكتوب في التوراة: شوقناكم فلم تشتاقوا، وخوفناكم فلم تخافوا، نحن لكم في تنوحوا.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: بكى شعيب حتى عمي، فرد الله عز وجل بصره عليه، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عز وجل بصره عليه. ثم بكى حتى عمي، فأوحى الله تعالى إليه: إن كان هذا البكاء لأجل الجنة فقد أبحثها لك، وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها، فقال لا، بل شوقاً إليك. فأوحى الله إليه: لأجل ذلك أخدمتك نبي وكليمي عشر سنين. وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء.

وفي الخبر: "اشتأقت الجنة إلى ثلاثة: علي، وعمار، وسلمان". سمعت الأستاذ أبا علي يقول: قال بعض المشايخ: أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إليّ، وأنا عن جميعها حُر.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت محمد بن عمر الرملي يقول: حدثنا محمد بن جعفر الإمام قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: حدثنا مرحوم قال: سمعت مالك بن

দিনার يقول: قرأت في التوراة: شوقنا كم فلم تشتاخوا، وزمّرنا لكم فلم ترقصوا.

স্মত محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن فرحان يقول: سمعت الجنيد، وقد سئل من أي شيء يكون بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال: إنما يكون ذلك سروراً به، ووجداً من شدة الشوق إليه، ولقد بلغني أن أخوين تعانقا، فقال أحدهما: وأشواقه، وقال الآخر: وأوجداه!!

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

Khanqa-e-Aminia-Asqaria
Ali Centre, Shibpur, Sylhet

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
অর্থ: “যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে।” [আনকাবুত : ৫]

আ'তা বিন সাঈব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একদা আমার বিন ইয়াসির রদ্বিআল্লাহু আনহু আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করছিলেন। তিনি তা সংক্ষিপ্ত করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু ইয়াক্বজান! আপনি কেনো এই নামাজ এতো সংক্ষেপ করলেন? তিনি জবাব দিলেন: ‘এতে আমার কোনো ক্ষতি হয় নি। কারণ আমি আল্লাহর উপাসনা করেছি যেভাবে [নাওফিল] নামায পড়তে দেখেছি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।’

নামায শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সে-ই নামায সম্পর্কে আরো বলুন। তিনি বললেন: “[এই দুয়াটি ছিলো] হে আল্লাহ! আপনার গায়েবের জ্ঞানের মাধ্যমে এবং স্বীয় সৃষ্ট জীবীদের উপর আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে আমার জীবনটি সেভাবে অতিক্রান্ত করতে দিন, যেভাবে আপনি জানেন আমার জন্য সর্বাধিক উত্তম। আমাকে মৃত্যু দিন যেভাবে আপনি জানেন আমার জন্য সর্বাধিক উত্তম। হে আল্লাহ! আমার অভ্যন্তর ও বাইরে আপনার প্রতি ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দিন। আমি আপনাকে আবদার জানাচ্ছি, আমি যেনো রাগ ও পরিতৃপ্তি এ উভয় সময়ে সত্য কথা বলতে দৃঢ় থাকি। আমি আপনাকে আবদার জানাচ্ছি, আমি যেনো ধনী ও গরীব এই উভয় অবস্থায় ন্যায়পরায়ণ থাকি। আমি আপনার নিকট

আবদার জানাচ্ছি, আপনি আমাকে অফুরন্ত সুখ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দান করুন! আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি, আপনি আমাকে আপনার বিচারের প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন এবং আমার পরকালের জীবনকে সুখময় করুন। আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি যে, আপনি আমাকে দান করুন আপনার পবিত্র দীদার ও আপনার সাথে সাক্ষাতের আবেগপ্রবণ বিরহ, যাতে থাকবে না ক্ষতিকর কোনো মানসিক ক্লেশ, না থাকবে কোনো প্রতারণামূলক প্রলোভন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের রঙে রঞ্জিত করুন! আমার প্রভু! যারা সঠিক পথে অধিষ্ঠিত আছেন আমাদেরকে তাদের সাথী করুন।’

শায়খ [কুশাইরী রাহ.] বলেন: “আবেগপ্রবণ বিরহ হলো প্রেমাস্পদের মিলনাকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব হৃদয়; এটা প্রেমের মাত্রার সমপরিমাণ। শায়খ আবু আলী দাক্কাককে শওক [আবেগপ্রবণ বিরহ] এবং ইশতিয়াক [ব্যাকুল প্রেমাকাঙ্ক্ষা] এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বলতে শুনেছি: ‘প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন ও দর্শনের ফলে শওক এর প্রাবল্য নেমে যায়। কিন্তু ইশতিয়াক মিলনক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ‘তারা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করে থাকেন:

তার দৃষ্টির কারণে নিরবচ্ছিন্ন চাহনি অতি শীঘ্র প্রতিবিশ্ব হয়ে আসে
এটা ফিরে যায় তার কাছে মহা আবেগসহ।

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সকল জীবীর মধ্যেই আবেগপ্রবণ বিরহ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে উদ্গ্রীবতা নেই, কারণ যে কেউ উদ্গ্রীবের স্তরে পৌঁছে যায় সে তার মনকে হারিয়ে ফেলে। সে পেছনে কোনো রেখা বা নিত্যতা [ক্বারার] অবশিষ্ট রাখে না।” কথিত আছে হযরত আহমদ বিন হামিদ আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা হযরত আবদুল্লাহ বিন মুনাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে বললেন: ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি এক বছরের মধ্যে মারা যাবেন। আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেবেন না?’ তিনি জবাবে বললেন, ‘তুমি তো আমাকে বেশ লম্বা সময় দিয়েছ! আমি কি এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবো? আমি আবু আলী তাক্বাফির কর্তৃক রচিত এই পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাই:

ও হে, যে অভিযোগ করে তার আবেগপ্রবণ বিরহকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা হেতু,
ধৈর্য্য ধরো, হয়তো বা তোমার মুহাব্বাতের পাত্রের সঙ্গে কালই সাক্ষাৎ
পেয়ে যাবে!’

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আবেগময় বিরহের একটি নিদর্শন হলো, মৃত্যুকে সানন্দে স্বাগত জানানো।” ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আবেগময় বিরহের একটি লক্ষণ হলো, প্রলোভনের [শাহাওয়াত] নেশা থেকে মুক্ত হওয়া।” শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম একাকী মরুভূমিতে চলে গেলেন। আল্লাহ তাঁকে ওহির মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন, হে দাউদ! তোমাকে কেনো আমি একাকী দেখছি? তিনি জবাব দিলেন, হে প্রভু! আমার হৃদয় তার নিজের থেকে তোমার সঙ্গী হওয়ার জন্য বিরহে বিভোর। সুতরাং হৃদয়টি অন্য কোনো জীবীর সঙ্গ লাভ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। আল্লাহ তা’আলা নির্দেশ দিলেন, ‘হে দাউদ! তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও! তুমি আমার নিকট একজন পলাতক গোলাম হিসাবে এসেছো। অথচ আমি তোমাকে একজন বড় বীরপুরুষ হিসাবে সুরক্ষিত ফলকে [লাওহে মাহফুজে] লিপিবদ্ধ করে রেখেছি!’”

কথিত আছে, একদা এক বুড়ির একজন আত্মীয় ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরলেন। এতে পরিবার-পরিজন [তার আগমনে] আনন্দিত হলেও বুড়ি কাঁদতে লাগলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কাঁদছেন কেনো?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘এই যুবকের আগমন আমাকে সেদিনের কথা স্মরণ করে দিয়েছে, যেদিন আমরা আমাদের মহান প্রভুর দরবারে হাজির হবো।’

হযরত ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ প্রশ্ন করলো শওক সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন: “[এটা হলো] নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাওয়া, হৃদয়ের প্রদাহ এবং যকৃৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া।” তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো: ‘কোনটি বড়: মুহাব্বাতের উত্তেজনা, না কি মুহাব্বাত?’ জবাব দিলেন: “মুহাব্বাত। কারণ হলো, মুহাব্বাত থেকেই মুহাব্বাতের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।”

একজন সুফি বলেছেন: ‘মুহাব্বাতের উত্তেজনা একটি প্রদাহ যার শুরু নাড়িভুঁড়ির ভাঁজ থেকে। এটা বিচ্ছিন্নতার ফলে আরম্ভ হয়। ক্রমে তা নিশ্চিহ্ন হয় যখন মিলন নিকটস্থ হতে থাকে। যখন সর্বাধিক অভ্যন্তরস্থ নিজ প্রেমাস্পদের ধ্যানে প্রভাবশীল হয়ে পড়ে, তখন সে নিজ আর আবেগময় বিরহের কবলে থাকে না।’ একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি আবেগপ্রবণ বিরহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? জবাব দিলেন: ‘না। কারণ আবেগপ্রবণ বিরহ তার

জন্য যিনি অনুপস্থিত। কিন্তু তিনি তো সর্বদাই উপস্থিত।” আমার শায়খ হযরত আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কুরআন শরীফের এই আয়াত:

قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

-“তিনি [মূসা] বললেন: এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।” [ত্বোয়া হা : ৮৪] এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি: ‘[তিনি] তাড়াতাড়ি কাছে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য আবেগময় বিরহের কারণে।’ কিন্তু এ কথাটি তিনি ‘যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও’ উক্তি দ্বারা ঢেকে ফেলেন।

আমি শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আরো বলতে শুনেছি: ‘শওক্কের একটি নিদর্শন হলো, যে কেউ কল্যাণের গালিচায় [‘আওয়াফি] দাঁড়িয়েও মৃত্যু কামনা করে, ঠিক যেভাবে ইউসূফ আলহিসসালামের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যখন তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করা হলো, তিনি তখন বলেন নি: হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যু দিন! যখন তাঁকে ফেরাউনের জেলখানায় ঢুকানো হলো তখনো তিনি এ কামনা করেন নি। কিন্তু যখন তাঁর পিতা-মাতা আসলেন, তাঁর ভাইগণ তাঁকে [সম্মানের] সিজদা করলেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরম সুখের অধিকারী হলেন, তখন তিনি বললেন: ‘[মৃত্যুর পর] আপনি আমাকে কাছে নিয়ে যান, সত্যিকার আত্মসমর্পণকারী হিসাবে।’ তাঁরা [অর্থাৎ সুফিরা] যখন (নিম্নলিখিত) কবিতাটি আবৃত্তি করেন তখন তাদের অন্তরে [উপরোক্ত] কথাটিই থাকে:

আমরা মাহনন্দ অনুভব করি; তবে, শুধুমাত্র তোমার মাধ্যমেই আমাদের আনন্দে পূর্ণতা লাভ করে

এই অবস্থার জন্য ধিক্কার আমাদের উপর, হে আমার প্রিয় মানুষ! তোমরা তো অনুপস্থিত আর আমরা উপস্থিত।

তাঁরা এই পংক্তিদ্বয়ও আবৃত্তি করে থাকেন:

কেউ একজন উল্লসিত হলো নতুন উৎসবে, কিন্তু এতে নেই আনন্দ আমার জন্যে

আমার আনন্দ পূর্ণতা লাভ করবে, শুধুমাত্র আমার প্রেমাস্পদ উপস্থিত থাকলে।

হযরত ইবনে খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “[প্রভু] মিলনের মহানন্দ ক্ষণে [ওয়াজ্‌দ] মুহাব্বাতের উত্তেজনা হলো হৃদয়ের বিশ্রাম এবং একান্ত সাক্ষাতের মুহাব্বাত।” হযরত আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছেন, যাদেরকে তিনি যদি বেশেতের ভেতর দেখা না দেন, তাহলে তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে অগ্রসর হবেন, যেভাবে দোষখীরা আগুন থেকে পলায়ন করতে উদগ্রীব হয়।”

হযরত হুসাইন আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত দিবস এসে গেছে। এক ব্যক্তি আল্লাহর আরশের নীচে দাঁড়ানো ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে ফিরিশতারা! এ লোকটি কে?’ তারা জবাব দিলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনিই ভালো জানেন।’ তিনি তখন বললেন, ‘সে হলো মা’রুফ খারকী। সে আমার মুহাব্বাতে বিভোর এবং একমাত্র আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসবে।’” এ স্বপ্নের অন্য এক বর্ণনামতে, আল্লাহ বলেন, ‘এ হচ্ছে মা’রুফ খারকী। সে ইহলোক ত্যাগ করেছে আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাসহ। আর আল্লাহ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতের অনুমতি তাকে দিয়েছেন।’

হযরত ফারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যাদের হৃদয় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আবেগময়ভাবে বিভোর থাকে, তাদের হৃদয়কে আল্লাহ তা’আলার তাজাল্লি দ্বারা আলোকিত করা হয়। যখন তাদের আবেগপূর্ণ মিশলনাকাঙ্ক্ষা কম্পিত হয়ে ওঠে, তখন এই আলোতে সমগ্র আকাশ ও জমিন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তখন তাদেরকে ফিরিশতাদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন এই বলে, ‘এরা আবেগ-আপ্ত হয়ে আমার মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিভোর। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমিও তাদের মিলনাকাঙ্ক্ষায় আরো বেশি বিভোর।’”

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, ‘আমি আবদার জানাচ্ছি যে, আপনার সঙ্গে মিলনের আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণা আমার অন্তরে সৃষ্টি করে দিন’, সম্পর্কে বলতে শুনেছি: “আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণার একশটি অংশ আছে। এর নিরানব্বইটিই তাঁর [আল্লাহর] নিকট। একটি মাত্র অংশ মানবজাতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। তিনি এই অংশটিও রেখে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি চাচ্ছিলেন না, একবিন্দু পরিমাণ আবেগপূর্ণ বিরহের অধিকারী অন্য কেউ হোক!” বলা হয়ে থাকে: ‘যারা

আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য তাদের আবেগময় বিরহ ওদের তুলনায় অধিক শ্রেয় যারা এখনও [তাঁর থেকে] পর্দার আড়ালে আছেন।’ তাই তারা এই পংক্তিটি আবৃত্তি করেন:

নিকটতম যন্ত্রণা হলো আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণার সেই দিনটি যেদিন [প্রেমিকদের] তাঁবুগুলো একটি আরেকটির নিকটবর্তী।

বলা হয়ে থাকে: “যারা আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণা অনুভব করে তারা কোৎ করে গিলে ফেলেছে মৃত্যুর মিষ্টতা যখন তা আসে। কারণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিতির মহানন্দ উন্মোচন হওয়াটা তাদের নিকট মধু থেকেও মিষ্টি।”

হযরত সিররি সাকাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “মা’রিফাতপন্থীদের জন্য সর্বোচ্চ মাকাম হলো আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণা, যখন সে এর সত্যিকার হাক্কিকাত [তাহক্কুক] উপলব্ধি করে। আর এটা অনুভব করার পর, একজনের জন্য বিরহের বিভোরতা থেকে কোনো কিছুই তাকে অন্যমনস্ক করতে পারে না।” আল্লাহ তা’আলার বাণী:

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

অর্থাতঃ “যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে।” [আনকাবুত : ৫] এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি বলেন: “এই সাক্ষাৎ হলো ওদের জন্য প্রযোজ্য, যারা তাঁর জন্য আবেগপূর্ণ বিরহে বিভোর।”

হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট আল্লাহ তা’আলা ওহি প্রেরণ করলেন: “ইসরাঈলের যুবকদেরকে বলো, ‘কেনো তোমরা আমি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? আমি তো তোমাদের জন্য আবেগপূর্ণ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করছি। এ কেমন রক্ষতা?’” আল্লাহ তা’আলা দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট আরোও ওহি প্রেরণ করেছেন: ‘আমার থেকে যারা ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে তারা যদি জানতো আমি তাদের উপর কিরূপ উচ্চাশা করি, আমি তাদের সাথী হতে কতো আগ্রহী এবং কী পরিমাণ আবেগময়তা রাখি তাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি আনুগত্য লাভের, তাহলে তারা আমাকে পেতে আবেগময় বিরহযন্ত্রণায় মারা যেতো এবং তাদের দেহের কঙ্কালসারের জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো আমার প্রতি মুহাব্বাতের কারণে। যারা আমার থেকে ঘাড় ফিরিয়ে

নিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই আমার ইচ্ছা। তাহলে যারা আমার দিকে ফিরে আসে তাদের ব্যাপারে কি হতে পারে [ভেবে দেখো]?!”

তাওরাত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে: “তোমাদের জন্য আমাদের আবেগময় বিরহ আছে, অথচ তোমরা আমাদের জন্য বিরহবোধ করো না; আমরা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তোমরা [আমাদের প্রতি] ভীত নও; আমরা তোমাদের জন্য বিলাপ করি, অথচ তোমরা আমাদের জন্য বিলাপ করো না।”

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “শুয়াইব আলাইহিসসালাম কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পুনরায় অঝোর ধারায় কাঁদলেন। ক্রমে তিনি আবারো অন্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা’আলা এবারও তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। শুয়াইব আলাইহিসসালাম ক্রন্দন থামালেন না। পুনরায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা’আলা ওহি প্রেরণ করলেন: “তুমি যদি বেহেশত লাভের আশায় ক্রন্দন করে থাকো, তাহলে জেনে রাখো আমি তোমার জন্য বেহেশতে স্থান নির্ধারণ করে রেখেছি; যদি তুমি দোষখের ভয়ে ক্রন্দন করে থাকো তাহলে মনে রেখো আমি তোমাকে দোষখ থেকে মুক্তি দিয়েছি।” হযরত শুয়াইব আলাইহিসসালাম আরজ করলেন, ‘হে আমার মা’বুদ! আমি তো এসব কারণে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি তোমাকে পাওয়ার আশায়।’ আল্লাহ তা’আলা ওহি পাঠালেন: “এ জন্যই আমি আমার নবী ও আমার সাথে কথোপকথনকারীকে [মূসা আ.] পাঠিয়েছিলাম দীর্ঘ দশ বছরের জন্য তোমার খেদমতে।”

বলা হয়ে থাকে: “যে কেউ আল্লাহকে পওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়, সবকিছু তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়।” হাদিস শরীফে আছে: “তিন ব্যক্তিকে পেতে বেহেশত ব্যাকুল আছে: আলী বিন আবি তালিব, আম্মার বিন ইয়াসির ও সালমান ফারসী [রাডিআল্লাহু আনহুম]।” শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “একজন সুফি শায়খ বলেন, আমি বাজারে আসলাম। সেখানকার সবকিছু আমাকে পেতে উদ্গ্রীব, কিন্তু আমি তাদের থেকে মুক্ত থাকি।”

হযরত মালিক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি তাওরাত কিতাবে এ কথাগুলো দেখেছি: ‘তোমাদের জন্য আমাদের আবেগপ্রবণ বিরহ আছে, কিন্তু আমাদের জন্য তোমাদের কোনো আবেগপ্রবণ বিরহ নেই; আমরা

তোমাদের জন্য বাঁশি বাজাই, কিন্তু তোমরা এতে নৃত্য করো না।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনক্ষণে কেনো ক্রন্দন করে? তিনি জবাব দিলেন: “এটা [তার কাঁদা] মিলনের সময়কার আনন্দের ক্রন্দন। আমি শুনেছি দু’জন ভাই সাক্ষাৎ পেয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলো। একজন চিৎকার দিলো: ‘অহ, আবেগময় বিরহ!’, অন্যজন পাঁটা চিৎকার দিলো: ‘অহ, [বেদনাদায়ক] মহানন্দ!’”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم

[কিভাবে সুফি শায়খদের হৃদয় সংরক্ষিত থাকে এবং তাদের
আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা হয় না]

قال الله تعالى في قصة موسى مع الخضر، عليهما السلام: "هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً".

قا الإمام: لما أراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب، فاستأذن أولاً في الصحبة، ثم شرط عليه الخضر أن لا يعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حكم، ثم لما خالفه موسى عليه السلام تجاوز عنه المرة الأولى والثانية، فلما صار إلى الثالثة، والثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة، سلمته الفرقة؛ فقال: هذا فراق بيني وبينك. أخبرنا أبو الحسين الإهوازي قال: حدثنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا أبو سالم القزاز قال: حدثنا يزيد عن بيان قال: حدثنا أبو الرجال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكرم شاب شيخاً لسنّه إلا قبض الله تعالى له من يكرمه عند سنه".

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله يقول: بدء كل فرقة المخالفة. يعني به: أن من خالف شيخه لم يبق على طريقته وانقطعت العلقة بينهما وإن جمعتهم البقعة؛ فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة، ووجبت عليه التوبة، على أن الشيوخ قالوا: عُقوق الأستاذين لا توبة عنها.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: خرجت إلى مرو في حياة

شیخی الأستاذ أبی سهل الصعلوکی، وكان له قبل خروجی أيام الجمعة بالغدوات مجلس دَوْر القرآن والحتم، فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المسجد، وعقد لأبی الغفانی فی ذلك الوقت مجلس القول، فأدخلني من ذلك شيء؛ فكنت أقول فی نفسي: قد استبدل مجلس الحتم بمجلس القول، فقال لي فكنت أقول فی نفسي: قد استبدل مجلس الحتم بمجلس القول: فقال لي يوماً: یا أبا عبد الرحمن، ما يقول الناس فی؟ فقلت: يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول!! فقال: من قال لأستاذہ لِم؟ لا يفلح أبداً، ومن المعروف أن الجنید قال: دخلت علی السريّ يوماً، فأمرني شيئاً، فقضيت حاجته سريعاً، فلما رجعت ناولني رقعة وقال: هذا المكان قضائك لحاجتي سريعاً، فقرأت الرقعة، فإذا فيها مكتوب سمعت حادياً يحدو فی البادية:

ALL RIGHTS RESERVED

أبكي، وهل يدريك ما يبکيني ... أبكي جداراً أن تفارقيني وتقطعي حبلی وتهجريني ويحكى عن أبی الحسن الهمداني العلوي قال: كنت ليلة عند جعفر الخلدی، وكنت أمرت فی بيتي أن يُعلّق طير فی التنور، وكان قلبي معه، فقال لي جعفر: أقم عندنا الليلة، فتعللت بشيء، ورجعت إلى منزلي، فأخرج الطير من التنور، ووضع بين يدي، فدخل كلب من الباب، وحمل الطير عند تغافل الحاضرين، فأثى بالجواذب الذي تحته، فتعلق به ذيل الخادمة، فانصب.. فلما أصبحت دخلت علی جعفر، فحين وقع بصره عليّ قال: من لم يحفظ قلوب المشايخ سلّط عليه كلب يؤذيه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أبا عبد الله الدينوري يقول: سمعت الحسن

الدامغاني يقول: سمعت عمي البسطامي يحكي عن أبيه: أن شقيقاً البلخي، وأبا تراب النخشي، قدما على أبي يزيد، فقدمت السفرة، وشاب يخدم أبا يزيد، فقالا له: كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد: تدعوا من سقط من عين الله تعالى!! فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة، فقطعت يده!! سمعت الأستاذ أبا علي يقول: وصف سهل بن عبد الله رجلاً بالولاية خبازاً بالبصرة.. فسمع رجل من أصحاب سهل بن عبد الله ذلك، فاشتاق إليه، فخرج إلى البصرة، فأتى حانوت الخباز.. فرآه يخبز وقد تنقب لمحاسنه على عادة الخبازين، فقال في نفسه. لو كان هذا ولياً لم يحترق شعره بغير نقاب. ثم إنه سلم عليه وسأله شيئاً، فقال الرجل: إنك استصغرتني، فلا تنتفع بكلامي، وأبي أن يكلمه.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الرحمن الرازي أبا عثمان الحيري يصف محمد بن الفضل البلخي ويمدحه، فاشتاق إليه، فخرج إلى زيارته، فلم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقد، فرجع إلى أبي عثمان وسأله، فقال: كيف وجدته؟ فقال: لم أجد أحداً إلا حُرماً فائدته، ارجع إليه بالحرمة. فرجع إليه عبد الله، فانتفع بزيارته.

ومن المشهور أن عمر بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور يكتب شيئاً، فقال. ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن، فدعا عليه وهجره؛ قال الشيوخ إن ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، رحمه الله تعالى، يقول: لما نفى أهل بلخ محمد بن الفضل من البلد؛ دعا عليهم وقال: اللهم امنعهم الصدق. فلم

يُخْرِجُ مِنْ بَلْعٍ بَعْدَ صَدِيقٍ.

سمعت أحمد بن يحيى الأبيوري يقول: من رضي عنه شيخه لا يكافأ في حال حياته: لئلا يزول عن قلبه تعظيم ذلك الشيخ. فإذا مات الشيخ أظهر الله عز وجل عليه ما هو جزاء رضاه ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكافأ في حال حياة ذلك الشيخ، لئلا يرقق له، فإنهم مجبولون على الكرم، فإذا مات ذلك الشيخ، فحينئذ يجد المكافأة بعده.

অনুবাদ: আল্লাহ সুবানাহু ওয়তা’আলা হযরত মুসা ও হযরত খিজির আলাইহিসসালামের বর্ণনায় ইরশাদ করেন:

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مَا عُلِّمْتُ رَسُولًا

অর্থাৎ: “[মুসা তাঁকে বললেন] আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?” [কাহাফ : ৬৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় [শায়খ কুশাইরী] বলেন: “যখন তিনি [মুসা আ.] খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে কামনা করলেন, তখন সুহবতের সঠিক আদব রক্ষা করতে সম্মত হন। প্রথমে তিনি সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইলেন। খিজির আলাইহিসসালাম এই শর্তে রাজী হলেন যে, তিনি [মুসা আ.] তাঁর কোনো কাজের বিরোধিতা কিংবা বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন না। কিন্তু মুসা আলাইহিসসালাম ভিন্নমত পোষণ করলেন। খিজির আলাইহিসসালাম প্রথমবার ক্ষমা করলেন। কিন্তু মুসা আলাইহিসসালাম পুনরায় অভিযোগ করলেন। এবারও তাঁকে ক্ষমা করা হলো। কিন্তু তিনি যখন তৃতীয়বার খিজির আলাইহিসসালামের সঙ্গে ইখতিলাফ করলেন, তখন [সংখ্যা ৩ ছোট এর শেষ ও বড় এর শুরু হওয়ায়] তিনি আলাদা হওয়ার কথা বললেন:

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

অর্থাৎ: “[তিনি বললেন] এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল।” [কাহাফ : ৭৮]”

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্দিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “একজন যুবক কোনো বৃদ্ধকে সম্মান প্রদর্শন করে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা ঐ যুবক বৃদ্ধ হওয়ার পর আরেকজন যুবককে তাকে সম্মানের জন্য নির্বাচিত করেন।”

আমার শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “প্রত্যেক বিচ্ছিন্নতার শুরুতে আছে বাদানুবাদ [মুখালাফা]।” তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যে কেউ স্বীয় মুর্শিদের বিরোধিতা করবে সে তার আধ্যাত্মিক রাস্তা [তরীকা] থেকে বঞ্চিত হবে। শায়খ ও মুরিদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে তা ভেঙ্গে পড়বে, যদিও না তারা একই স্থানে অবস্থান করেন। যে কেউ কোনো সুফি শায়খের সঙ্গী থাকে এবং পরে অন্তর থেকে তাঁর বিরোধিতা করে, সে সুহবতের উসূলে বিঘ্ন ঘটালো। একমাত্র তাওবা [ক্ষমা প্রার্থনা] ছাড়া ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে না। একই সঙ্গে কিছু মশাইখে আজম বলেছেন, “নিজের মুর্শিদের সঙ্গে বেআদবি করার পর তাওবাও [শায়খের নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাওয়া] প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যথেষ্ট নয়।”

শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি মার্ভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তখনও আমার শায়খ আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত দেখেছি তিনি কুরআন তিলাওয়াতের দারস্ দিতেন প্রত্যেক শুক্রবারে। ফিরে এসে দেখলাম তিনি কুরআনের দারস্ বন্ধ করে দিয়েছেন। এর বদলে হযরত আবুল গাফানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজ মাহফিল শুরু করেছেন। আমি এতে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, তিনি কিভাবে কুরআনের দারসের বদলে ওয়াজ মাহফিল শুরু করলেন! একদিন তিনি [সাহল রাহ.] আমাকে বললেন, ‘আবদুর রহমান! মানুষ আমার সম্পর্কে কি বলে?’ আমি জবাব দিলাম, ‘তারা বলে, আপনি দারসে কুরআন বন্ধ করে ওয়াজ মাহফিল শুরু করেছেন!’ তিনি বললেন, ‘যে কেউ তার মুর্শিদকে প্রশ্ন করে ‘কেনো?’ সে লাভবান হবে না।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: “একদা [আমার মুর্শিদ] হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে থাকাকালে কিছু করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন। বললেন,

‘আমার কাজটি তাড়াতাড়ি করার বিনিময় হিসাবে এটা তোমাকে দিলাম’। আমি কাগজে কি আছে পাঠ করতে লাগলাম। এতে লিখা ছিলো: ‘আমি একজন উটের রাখালকে মরুভূমিতে এই গজলটি গাইতে শ্রবণ করেছি:

আমি কাঁদি, এবং তুমি জানো কি কেনো কাঁদি? আমি কাঁদি এ ভয়ে, হয়তো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, তোমার সঙ্গে আমার যে একাত্মতা সৃষ্টি হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন হবে এবং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে।”

হযরত আবুল হাসান হামদানী আলাওয়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি এক রাতে জাফর খুলদির সঙ্গে ছিলাম। [এর পূর্বে] আমি বাড়িতে থাকাকালে নির্দেশ দিয়েছিলাম একটি মুরগি রান্নার জন্য। আমি [জাফর খুলদির] সঙ্গে থাকাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম। তিনি আমাকে রাত্রি যাপনের আমন্ত্রণ জানালেন। আমি অযুহাত দেখিয়ে তাঁর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে বাড়ি ফিরলাম। উনুনের মুরগিটি রান্না হয়ে যাওয়ায় আমার সম্মুখে আনা হলো। কোথেকে এক কুকুর এসে দরজা দিয়ে কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলো এবং মুরগিটি নিয়ে পালিয়ে গেল। উপস্থিত সবাই হতবাক হলো এবং শেষ পর্যন্ত মুরগির তরকারীর ঝোল আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হলো। হঠাৎ ঝোলের বাটিটি খাদিমের পরনের কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে উল্টে গেল। সব ঝোল মেঝের উপর পড়ে গেল। পরদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে হযরত জাফরের নিকট ছুটে গেলাম। আমার প্রতি তাঁর নজর পড়তেই বললেন: ‘কেউ যখন তাঁর মুর্শিদের হৃদয়কে নিরাপত্তা দান করে না, তাহলে আল্লাহ তা’আলা কুকুরকে নির্দেশ দেন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য!’”

শায়খ শাকিক বলখী ও শায়খ আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম একদা হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী [বায়েযিদ বিস্তামী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলেন। একখানা দস্তারখান বিছানো হলো। একজন যুবক খাদিম এসে খাবার পরিবেশন করলো। উভয় মেহমান খাদিমকেও তাঁদের সঙ্গে খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। সে বললো, ‘হাযারাত! আমি রোযা রেখেছি।’ শাকিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, ‘খাও! তুমি এর বদলে এক মাস রোযা রাখার সওয়াব পাবে!’। পুনরায় সে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালো। শাকিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার বললেন, ‘খাও! তুমি এর বদলে এক বছর রোযা রাখার সওয়াব লাভ করবে!’। এবারও খাদিম যুবকটি খাবার খেতে

অস্বীকার করলো। হযরত বায়েযিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ‘এর কথা ভুলে যান! কারণ এখন সে আল্লাহর করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে!’ পরবর্তীতে জানা গেছে, ঐ বছরই যুবকটি চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়ে এবং তার হাত কতন করা হয়।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, “সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসরা শহরের এক রুটি ব্যবসায়ীকে আল্লাহর ওলি হিসাবে সম্বোধন করেন। হযরতের এক বন্ধু কথাটি শুনে ঐ লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হলেন। তিনি বসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন এবং লোকটির দোকানে পৌঁছলেন। লক্ষ্য করলেন, লোকটি মাথা [ঐ সময়ের নিয়মানুসারে] আবৃত করে কাজ করছিলেন। এতে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো, ‘লোকটি যদি আল্লাহর ওলি হতেন তাহলে অবশ্যই তার চুল জ্বলতো না, মাথা উন্মুক্ত থাকলেও।’ এরপর তিনি রুটি নির্মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রুটি নির্মাতা বললেন, ‘আপনি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছেন। সুতরাং আমার সঙ্গে বাক্যালাপের প্রয়োজন নেই!’ এরপর সত্যিই তিনি আর কথা বললেন না।”

ALL RIGHTS RESERVED

আমি আমার শায়খ হযরত আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি আবদুল্লাহ রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, তিনি শুনেছেন আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত মুহাম্মদ বিন ফজল বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খুব প্রশংসা করতেন। সুতরাং রাযী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী হয়ে বলখে আসলেন। সাক্ষাৎ শেষে তিনি কিছুটা হতাশ হলেন। বলখীকে যেরূপ ভেবেছিলেন তাঁর নিকট তিনি সেরূপ বলে মনে হলো না। তিনি আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে ফিরে আসলেন। হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জানতে চাইলেন, বলখীকে তোমার কেমন লেগেছে? রাযী জবাব দিলেন, ‘যা ভাবছিলাম তিনি তা নন বলে মনে হলো।’ হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্দেশ দিলেন: ‘তুমি ফিরে যাও! তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা হেতু তুমি ফায়দা থেকে বঞ্চিত হয়েছো। এবার সম্মান প্রদানের নিয়তে যাও।’ সুতরাং আবদুল্লাহ রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিরে গেলেন বলখে। এবারকার সাক্ষাতে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হলেন।

হযরত আমর বিন উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেখলেন হযরত হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি কি একটা লিখছেন। তিনি তা জানতে চাইলে মনসুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “এর দ্বারা আমি কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা [উ’রায়িদ] করতে পারি!” সাথে সাথে হযরত আমর বিন উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। পরবর্তীতে সুফি মাশাইখ মন্তব্য করেন: ‘অনেক পরে মনসুর হাল্লাজের করুণ পরিণতির কারণ ছিলো মক্কী সাহেবের এই অভিশাপ।’

শায়খ আবু আলী দাক্কাক রামাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “মুহাম্মদ বিন ফযলকে যখন বলখের মানুষ তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেয় তখন তিনি এই বলে অভিশাপ দেন: ‘হে আল্লাহ! এদের অন্তর থেকে আন্তরিকতার গুণ উঠিয়ে নিন!’। সেই থেকে এখন পর্যন্ত বলখে জন্ম নেওয়া একজনও সত্যনিষ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।”

হযরত আহমদ বিন ইয়াহইয়া আবিওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যে কেউ তার শায়খের সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছে, শায়খ এই দুনিয়ায় থাকাকালে এর প্রতিদান পাবে না। সুতরাং তার মুর্শিদের প্রতি প্রশংসাবাদও হৃদয় থেকে মুছে যাবে না। শুধুমাত্র শায়খের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা’আলা তাকে স্বীয় মুর্শিদের সন্তুষ্টি লাভের প্রতিদান দেবেন যা তার প্রাপ্তি। একইভাবে মুর্শিদের অসন্তুষ্টির কারণে তিনি দুনিয়ায় থাকতে, মুরিদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ মুর্শিদরা ক্ষমাকারী। তবে তাঁর মৃত্যুর পর ঐ মুর্শিদ যে তাকে অসন্তুষ্ট করেছে, সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।”

باب السماع

বাবুস সামা' [সামা' শ্রবণ অধ্যায়]

قال الله عزَّ وجلَّ: " فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه "

اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه: أنه مدحهم باتباع الأحسن.

وقال تعالى: " فهم في روضة يحبرون "، جاء في التفسير: أنه السماع وأعلم أن سماع الأشعار بالألمان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظوراً، ولم يسمع على مذموم في الشرع، ولم ينجز في زمام هواه، ولم ينخرط في سلك لهواه، مباح في الجملة.

ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها، فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان.

هذا ظاهر من الأمر. ثم ما يوجب المستمع توفر الرغبة على الطاعات، وتذكر ما أعدَّ الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرر من الزلات، ويؤدي إلى قلبه في اعمال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع، وقد جرى على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر، وإن لم يقصد أن يكون شعراً.

أخبرنا: أبو الحسن علي بن أحمد الإهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا الحارث بن أبي أسلمة قال: حدثنا أبو النضر قال:

حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنساً يقول: كانت الأنصار يحفرون الخندق فجعلوا يقولون:

نحن الذين بايعوا محمداً... على الجهاد ما بقينا أبداً فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة" وليس هذا اللفظ منه، صلى الله عليه وسلم، على وزن الشعر، لكنه قريب منه.

وقد سمع السلف الأكابرُ الأبيات بالألحان؛ فمن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس: وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، وأما الحداء فإجماع منهم على إجازته.

وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك، وروي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع، فقليل له: إذا أتى بك يوم القيامة، ويؤتى بحسناتك ولا في السيئات. يعني أنه من المباحات: وليس كلامنا في هذا النوع من السماع: فن هذه الطائفة جلت رتبته عن أن يستمعوا بلهواً، أو يقعدوا للسماع بسهولة، أو يكونوا بقلوبهم مفكرين في مضمون لغو. أو يستمعوا على صفة غير كفاء.

وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحة السماع، وكذلك عن عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب. وكذلك عن مرضي الله عنهم أجمعين، في الحداء وغيره.

وأُشيد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينهاها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار.

ومن المشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضي الله عنها، وفيه جاريتان

تغنيان، فلم ينههما.

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد ابن مطر قال: حدثنا الحباب بن محمد التستري قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، دخل عليها وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعث، فقال أبو بكر: مزار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عبداً وعيدنا هذا اليوم ".
 Khair-e-Shariat Ashraf
 All Rights Reserved
 Hii Centre, Subidbazar, Sylhet

أخبرنا: علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا عثمان بن الضي قال: حدثنا أبو كمال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة رضي الله عنها: " أنها أنسكت ذات قرابتها من الأنصار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ فقالت: نعم. قال: فأرسلت من يغني؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ن النصرار فيهم غزل، فلو أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحبيكم "

أخبرنا الأستاذ الإمام أبوبكر محمد بن الحسين بن فورك، رضي الله عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمود بن خرزاذ قال: حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازي قال: حدثنا سلمة بن سعيد، عن صدقة بنت أبي عمر، قالت: حدثنا علقمة ابن مرثد، عن زاذان، عن البراءة بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " حسنوا القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً " دلّ هذا الخبر على فضيلة الصوت

الحسن.

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الإهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا عبد السلام ابن هاشم قال: حدثنا عبدالله بن محرز، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن " .

أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن يونس الكريمي يقال: حدثنا الضحاك بن محمد أبو عاصم قال: حدثنا شبيب بن بشر بن الجلي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوتان ملعونان: صوتٌ ويل عند مصيبة، وصوت مزمارة عند نعمة " .

مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا بطل التخصيص.

والأخبارُ في هذا الباب تكثر، والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات تخرجنا عن المقصود من الاختصار، وقد روي أن رجلاً أشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أقبلت فلاح لها ... عارضان كالسبج

أدبرت فقلت لها ... والفؤاد في وهج

هل على ويحكما ... إن عشقت من حرج

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا.

وإن حُسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس: قال الله

عز وجل: " يزيد في الخلق ما يشاء ". قيل في التفسير: من ذلك، الصوت الحسن وذم الله سبحانه الصوت الفظيع؛ فقال تعالى: " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ".

واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جوده؛ فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحموله فيهون عليه بالحداء. قال الله تعالى: " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ".

وحكى إسماعيل بن عالية قال: كنت أمشي مع الشافعي، رحمه الله تعالى، وقت الهاجرة فجزنا بموضع يقول فيه أحد شيوخنا، فقال: مل بنا إليه، ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لا. فقال: مالك حسن!! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أذن الله تعالى لشيء كأذنه لني يتغنى بالقرآن ".

أخبرنا علي بن أحمد الإهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا ابن ملحان قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن يمجهر به ".

وقيل: إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير والوحش إذا قرأ الزبور، وكان يحمل مجلسه أربعمئة جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته.

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: " لقد أوتيت زمزماً من

مزامير آل داود " متفق عليه.

وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً ".

أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال: أخبرنا عبد الله بن علي السراج قال: حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري الرقي قال: كنت في البادية، فوافيت قبيلة من قبائل العرب، وأضافني رجل منهم، فرأيت غلاماً أسود مقيداً هناك. ورأيت جمالاً قد ماتت بفناء البيت، فقال لي الغلام: أنت الليلة ضيف، وأنت على مولاي كريم، فتشفع لي؛ فإنه لا يردك. فقلت لصاحب البيت: لا آكل طعامك حتى تحل هذا العبد.

فقال: هذا الغلام قد أفقرني وأتلف مالي!! فقلت: فما فعل؟ فقال: له صوت طيب، وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال، فحملها أحمالاً ثقيلة، وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثلاثة في يوم واحد، فلما حط عنها ماتت كلها، ولكن قدوهيته لك وحلّ عنه القيد، فلما أصبحنا أحببت أن أسمع صوته، فسألته عن ذلك، فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بئر هناك يستقي عليه، فحدا الغلام.. فهام الجمل على وجهه وقطع حباله، ولم أظن أنني سمعت صوتاً أطيب منه، فوقع لوجهي.. حتى أشار إليه بالسكوت.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيد يقول، وقد سئل: ما بال الإنسان يكون هادئاً، فذ سمع السماع اضطرب؟ فقال: إن الله تعالى لما خاطب الذرّ في الميثاق الأول بقوله: " أأنت بربك قالوا بلى

" استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك.

سمعت الأستاذ أبا عليّ الدقاق يقول: السماع حرام على العوام؛ لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد؛ لحصول مجاهداتهم، مستحب لأصحابنا؛ لحياة قلوبهم.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الصوفي يقول: سمعت الوجيهي يقول: سمعت أبا عليّ الروذباري يقول: كان الحارث بن أسد المحاسبي ثلاث إذا وجدن مُتسع بهنّ، وقد فقدناها: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء.

وسئل ذو النون المصري عن الصوت الحسن، فقال: مخاطبات وإشارات أودعها أنه تعالى كلّ طيب وطيبة.

وسئل مرة أخرى عن السماع فقال: وارد حقٌّ يزعج القلوب إلى الحقِّ؛ فمن أصغى إليه بحقّ تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق.

وحكى جعفر بن نصير: عن الجنيد أنه قال: تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن حق، ولا يقولون إلا عن وجد، وعند أكل الطعام؛ فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة، وعند مجارة العلم؛ فإنهم لا يذكرون إلا صفات الأولياء.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر بن ممشاد يقول: سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه. ترويح لمن صادفه.

وحكى عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان. والمكان؛

والإخوان.

وسئل الشبلي عن السماع فقال: ظاهره فتنة، وباطنه عبرة؛ فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة، وإلا فقد استدعي الفتنة، وتعرض للبلية.

وقيل: لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حيّ؛ فنفسه ذُبحت بسيف المجاهدة، وقلبه حي بنور الموافقة.

وسئل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع فقال: حال يبدي الرجوع إلى الأسرار من حيث الاحتراق.

وقيل: السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: السماع طبع، إلا عن شرع. خرق، إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة.

ويقال: السماع على قسمين: سماع بشرط العلم والصحو؛ فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات، وإلا وقع في الكفر المحض. وسماع بشرط الحال؛ فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية، والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة.

وحكي عن أحمد بن أبي الحراري أنه قال: سألت أبا سليمان عن السماع، فقال: من اثنين أحب إليّ من الواحد.

وسئل أبو الحسن النوري عن الصوفي، فقال: من سمع السماع، وآثر الأسباب.

وسئل أبو علي الروذباري عن السماع يوماً فقال: ليتنا تخلصنا منه رأساً برأس.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا عثمان المغربي

يقول: من أدعى السماع ولم يسمع صوت الطيور، وصرير الباب، وتصفيق الرياح، فهو فقير مدع.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكي يقول: قال جعفر: كان ابن زيري، من أصحاب الجنيد، شيخاً فاضلاً، فربما كان يحضر موضع سماع، فإنه استطابه فرش إزاره وجلس وقال: الصوفي في قلبه، وإن لم يستطبه قال. السماع لأرباب القلوب، ومر، وأخذ نعله.

سمعت محمد بن الحسين، رحمه الله تعالى، يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت عبدالله بن عبد المجيد الصوفي يقول: سئل رويم عن وجوب الصوفية عند السماع فقال:

يشهدون المعاني التي تعذب عن غيرهم فتشير إليهم: إليّ.. إليّ.. فيتنعمون بذلك من الفرح، ثم يقطع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء؛ فمنهم من يخرق ثيابه، ومنهم من يصيح، ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره. سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحصري يقول في بعض كلامه: ما أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك متصلاً غير منقطع. قال: وقال الحصري: ينبغي أن يكون ظماً دائماً، فكلما ازداد شربه ازداد ظمؤه.

وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: " فهم في روضة يخبرون " : أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية: " نحن الخالدات، فلا نموت أبداً، نحن الناعمات، فلا نبؤس أبداً " .

وقيل: السماع نداء، والوجد قصد.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: قلوب أهل الحق قلوب حاضرة، وأسماعهم أسمع مفتوحة.

وسمعه يقول: سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول: المستمع بين استتار وتجلي، فالاستتار يوجب التلهيب، والتجلي يورث الترويح؛ والاستتار يتولد منه حركات المريدين، وهو محل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه سكون الواصلين، وهو محل الاستقامة والتمكين، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة، قال الله تعالى: " فلما حضروه قالوا أنصتوا".

وقال أبو عثمان الحيري: السماع على ثلاثة أوجه: فوجه منها للمريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمرأاة.

والثاني: للصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلكما يوافق أوقاتهم.

والثالث: لأهل الاستقامة من العارفين، فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، رحمه الله، يقول: سمعت أبا الفرج الشيرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: قال أبو سعيد الخراز: من أدعى أنه مغلوب عن الفهم يعني في السماع، وأن الحركات مالكة له، فعلامته تحسين المجلس الذي هو فيه يوجد.

قال الشيخ أبو عبد الرحمن: فذكرت هذه الحكاية لأبي عثمان المغربي فقال:

هذا أدناه، وعلامته الصحيحة: أن لا يبقى في المجلس محق إلا أنس به، ولا يبقى فيه مبطل إلا استوحش منه.

وقال بندار بن الحسين: السماع علي ثلاثة أوجه: منهم من يسمع بالطبع، ومنهم من يسمع بالحال، ومنهم من يسمع بالحق.

الذي يسمع بالطبع يشترك فيه الخاص والعام؛ فإن جبلة البشرية استلذاذ الصوت الطيب.

والذي يسمع بالحال فهو يتأمل ما يردُّ عليه من ذكر عتاب أو خطاب أو وصل أو هجر أو قرب أو بعد، أو تأسف علي فائت أو تعطش إلى أت، أو وفاء بعهد أو تصديق لوعد أو نقض لعهد، أو ذكر قلق أو اشتياق أو خوف فراق أو فرح وصال، أو حذر انفصال أو ما جرى مجراه.

وأما من يسمع بحق فيسمع بالله تعالى، والله، ولا يتصف بهذه الأحوال التي هي ممزوجة بالحفظ البشرية فإنها مبقاة مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد يحق لا يحظ.

وقيل: أهل السماع على ثلاث طبقات: أبناء الحقائق يرجعون في سماعهم إلى مخاطبة لحق سبحانه لهم؛ وضرب يخاطبون الله تعالى بقلوبهم بمعاني ما يسمعون، فهم مطالبون بالصدق فيما يشيرون به إلى الله: وقالت: هو فقير مجرد قطع العلاقات من الدنيا والآفات، سمعون بطيبة قلوبهم، وهؤلاء أقربهم إلى السلامة.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري، وقد سئل عن السماع، فقال: مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب.

وقال الحواص، وقد سئل: ما بال الإنسان يتحرك عند سماع غير القرآن، ولا يجد ذلك من سماع القرآن؟ فقال: لأن سماع القرآن صدمة لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته، وسماع القول ترويح فيتحرك فيه.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول: سمعت الجنيد يقول: إذا رأيت المريد يُحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة.

وسمعت يقول: سمعت أبا عبد الله البغدادي يقول: سمعت أبا سعيد الرملي يقول: قال سهل بن عبد الله السماع علم أستاذ الله تعالى به لا يعلمه إلا هو.

وحكي أحمد بن مقاتل العكي قال: لما دخل ذو النون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية، ومعهم قَوَال، فاستأذنه أن يقول بين يديه شيئاً فأذن، فأبتدأ يقول:

Ali Centre, Subidhazar, Sylhet

صغيرُ هواك عذبي ... فكيف به إذا احتكا

وأنت جمعت من قلبي ... هوى قد كان مشتركا

أما ترثي لمكتتب ... إذا ضحك الخفي بكا

قال: فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض، ثم قام رجل من القوم يتواحد، فقال له ذو النون: الذي يراك حين تقوم.. فجلس الرجل.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في هذه الحكاة: كان ذو النون صاحب إشراف علي ذلك الرجل: حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، وكان ذلك

الرجل صاحب إنصاف؛ حيث قبل ذلك منه، فرجع فقعد.

سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة، يقال لأحدهما جيلة وللثاني رزيق فزار رزيق يوماً جيلة في أصحابه، فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئاً، فصاح واحد من أصحاب جيلة ومات. فلما أصبحوا قال جيلة لرزيق: أين الذي قرأ بالأمس؟ فليقرأ.. فقرأ آية، فصاح جيلة صيحة، فمات القاريء، فقال جيلة: واحد بواح والبادي أظلم.

وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال: بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل، فمزق واحد منهم قميصه، فأوحى الله تعالى إليه: قل له مَزَّق لي قلبك ولا تمزق ثيابك.

وسئل أبو علي المغازلي الشبلي فقال: ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا، ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس.

فقال الشبلي: ما أجتذبك إليه فهو عطف منه عليك، ولطف، وما رُدِّدت إلى نفسك فهو شفقة منه عليه، لأنه لم يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من شهر رمضان وهو يصلي خلق إمام له وأنا بجانبه، فقرأ الإمام: " ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ". فزقق زعقة قلت: طابت روحه وهوي رتعد

ويقول: بمثل هذا يخاطب الأحباب!! ويردد ذلك كثيراً. وحكي عن الجنيد أنه قال: دخلت على السري يوماً فرأيت عنده رجلاً مغشياً عليه، فقلت: ماله؟ فقال: سمع آية من كتاب الله تعالى. فقلت: تُقرأ عليه ثانياً، فقرأ، فأفاق، فقال لي: من أين علمت هذا؟ فقلت: إن قميص يوسف ذهب بسببه عينُ يعقوب عليهما السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئاً من الذكر يزعم، فقال له الجنيد يوماً: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني!! فكان إذا سمع شيئاً يتغير ويضبط نفسه، حتى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة، فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: حكي لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال: قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد، فلما دخلت الري سألته عن منزله، فكل من أسأل عنه يقول لي: ما تفعل بذلك الزنديق؟! فضيقوا صدري، حتى عذمت على الانصراف، فبت تلك الليلة في مسجد، ثم قلت: جئت هذه البلدة، فلا أقل من زيارته؛ فلم أزل أسأل عنه حتى وقت إلى مسجده وهو قاعد في المحراب، وبين يديه رَحْل، وعليه مصحف يقرأ فيه، وإذا هو شيخ بهي، حسن الوجه واللحية، فدنوت منه وسلمت عليه، فرد السلام وقال: من أين؟ فقلت: من بغداد، قصدت زيارة الشيخ. فقال: لو أن في بعض البلدان قال لك إنسان: أقم عندي حتى أشتري لك داراً أو جارية، أكان يمنعك

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت يحيى بن الرضا العلوي قال: سمعت أبو سلمان الدمشقي طوافاً ينادي: يا سسعتري بري فسقط مغشياً عليه، فلما افاق، سئل، فقال: حسبته يقول: اسمع تر برّي.

وسمع عتبة الغلام رجلاً يقول: سبحان ربّ السماء؛ إن المحب لقي عناء فقال عتبة: صدقت؛ وسمع رجل آخر ذلك القول، فقال: كذبت فكل واحد سمع من حيث هو.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمع أبا الحسن علي بن محمد الصوفي يقول: سمعت رويماً وقد سئل عن المشايخ، الذين لقيهم في السماع، فقال: كالقطيع إذا وقع فيه الذئب.

وحكي عن أبي سعيد الخراز قال: رأيت علي بن المرفق في السماع يقول: أقيموني، فاقاموه، فقام، وتواجد، ثم قال: أنا الشيخ الزفان.

وقيل: قام الرقي ليلة إلى الصباح، يقوم. ويسقط على هذا البيت، والناس قيام يبكون، والبيت:

بالله فأردد فؤاد مكتئب ... ليس له من حبيبة خلف

سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول: سمعت علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول: سمعت أبي يقول: خدمت سهل بن عبد الله سنين كثيرة، فما رأيته تغير عند سماع شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن وغيره، فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه " فالיום لا يؤخذ منكم فدية " رأيته تغير، وارتعد، وكاد يسقط، فلما رجع إلى حال صحوه سأله عن ذلك، فقال يا حبيبي ضعفنا.

وحكى ابن سالم قال: رأيته مرّة أخرى قرىء بين يديه الملك يومئذ الحق للرحمن فتغير وكاد يسقط، فقلت له في ذلك، فقال: ضعفت وهذه صفة الأكابر لا يرد عليه وارد وإن كان قوياً إلا وهو أقوى منه.

سمعت أليشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتدري ما تقول البكرة؟ فقلت: لا، فقال: تقول الله. الله.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت علي بن طاهر يقول: سمعت عبد الله بن سهل يقول: سمعت رويماً يقول: روي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنه سمع صوت ناقوس فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: سبحن الله، حقاً، إن المولى صمداً يبغي.

سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أحمد بن علي الكرخي الوجيهي يقول: كان جماعة من الصوفية متجمعين في بيت الحسن القزاز، ومعهم قوالون يقولون ويتواجدون، فأشرف عليهم ممشاد الدينوري؛ فسكتوا، فقال: أرجعوا إلى ما كنتم فيه، فلو جمع ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفي بعض ما بي.

وبهذا الإسناد عن الوجيهي قال: سمعت أبا علي الروذباري يقول: بلغنا في هذا الأمر إلى مكان مثل حد السيف إن قلنا كذا ففي النار.

وقال خبر النساج: قص موسى بن عمران، صلوات الله عليه، على قوم قصة، فرزقوا واحد منهم، فانتهره موسى، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، بطيبي فاحوا، وبجي باحوا، وبوجودي صاحوا، فلم تنكر على عبادي؟! وقيل: سمع الشبلي قائلاً يقول: الخيار عشرة بدق فصاح وقال: إذا كان

الخيار عشرة بدائق فكيف الشرار؟! وقيل: إذا تغنت الحور العين في الجنة توردت الأشجار.

وقيل: كان عون بن عبد الله يأمر جارية له حسنة الصوت فتغنى بصوت حزين حتى تبكي القوم.

وسئل أبو سليمان الداراني عن السماع، فقال: كل قلب يريد الصوت الحسن فهو ضعيف يداوي كما يداوي الصبي إذا أريد أن ينام، ثم قال أبو سليمان: إن الصوت الحسن لا يُدخل في القلب شيئاً، وإنما يحرك من القلب ما فيه. قال ابن أبي الحواري: صدق والله أبو سليمان.

وقال الجريري: كونوا ربانيين، أي سماعين من الله، قائلين بالله.

وسئل بعضهم عن السماع فقال: بروق تلمع ثم تخمد، وأنوار تبدوا ثم تخفى، ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها طرفة عين، ثم أنشأ يقول:

خطرة في السر منه خطرت ... خطرة البرق ابتدي ثم اضمحل

أي زور لك لو قصداً سري ... وملم بك لو حقاً فعل

وقيل: السماع فيه نصيب لكل عضو؛ فما يقع إلى العين تبكي، وما يقع إلى لسان يصيح، وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم، وما يقع إلى الرجل ترقص.

وقيل: مات بعض ملوك العجم، وخلف ابناً صغيراً، فأرادوا أن يبايعوه قالوا: كيف نصل إلى معرفة عقله وذكائه؟! ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال، فلما قال زال شيئاً ضحك الرضيع، فقبلوا الأرض بين يديه وبايعوه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: اجتمع أبو عمرو بن نجيذ، والنصراباذي، الطبقة في موضع؛ فقال النصراباذي: أنا أقول إذا اجتمع

القوم فواحد يقول شيئاً ويسكت الباكون خير من أن يغتابوا أحداً.
فقال أبو عمرو: لأن تغتاب أنت ثلاثين سنة أنجى لك من أن تظهر في
السماع ما لست به.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق. رحمه الله، يقول: الناس في السماع ثلاثة:
متسمع؛ ومتسمع؛ وسامع؛ فالمتسمع يسمع بوقت؛ والمتسمع يسمع بحال؛
والسامع يسمع بحق.

وسألت الأستاذ أبا علي الدقاق: رحمه الله تعالى، غير مرة. شبه طلب رخصة
في السماع، فكان يحيلني على ما يوجب الإمساك عنه، ثم بعد طول المعاودة
قال: إن المشايخ قالوا: ما جمع قلبك إلى الله قلبك إلى الله سبحانه وتعالى
فلا بأس به.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد
البصري قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن يعلي الرازي
قال: حدثنا حفص بن عمر العمري قال: حدثنا أبو عمر وعثمان بن بدر
قال: حدثنا هارون ابن حمزة عن الغدافري قال: حدثنا أبو عمر وعثمان
بن بدر قال: حدثنا هارون ابن حمزة عن الغدافري، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه
السلام: إني جعلت فيك عشرة آلاف سمع حتى سمعت كلامي، وعشرة
آلاف لسان حتى أحببتي، وأحب ما تكون إلي وأقربه إذا أكثر الصلاة
على محمد صلى الله عليه وسلم.

وقيل: رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الغلط في
هذا أكثر؛ يعني به: السماع.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر النهاوندي يقول: سمعت عليا السائح يقول: سمعت أبا الحارث الأولاسي يقول: رأيت أبلّيس، لعنه الله، في المنام علي بعض سطوح أولاس وأنا على سطح، وعلى يمينه جماعة، وعلى يساره جماعة، وعليهم ثياب نظاف، فقال لطائفة منهم: قالوا.. فقالوا، وغنوا، فاستفزعني طيبه، حتى همست أن أطرح نفسي من السطح.

ثم قال: ارقصوا، فرقصوا أطيّب ما يكون..

ثم قال لي: يا أبا الحارث، ما أصبْتُ شيئاً أدل به عليكم إلا هذا.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: اجتمعت ليلة من الشبلي، رحمه الله، فقال القوال، شيئاً، فصاح الشبلي، وتواجد قاعداً فقيل له: يا أبا بكر، مالك من بين الجماعة قاعداً؟! فقام وتواجد، وقال:

لي سَكْرَتان، وللدّمان واحدةٌ... شيءٌ خُصِصْتُ به من بينهم وحدي وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: جرت بقصر، فرأيت شاباً حسن الوجه مطروحاً، وحوله خلص، فسألت عنه، فقالوا: إنه جاز بهذا القصر وفيه جارية تغنى:

كُبِرَتْ هَمّةُ عبد... طمعت في أن تراكا

أو ما حسب لعينٍ... أن ترى من قد رآكا

فشهق شهقة ومات.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

অর্থাৎ: “সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে।” [যুমার : ১৭-১৮]

উক্ত [শেষোক্ত] আয়াতে ‘কথা’ শব্দটি ‘আল’সহ [আল-ক্বাওলা] নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর দ্বারা অর্থকে সার্বজনীন ও সর্ব-ব্যাপক করার ইঙ্গিত বুঝায়। যেমনটি ইশারা করা হয়েছে, ‘অতঃপর যা উত্তম’ [ফাইয়াত্তাবিউ’ন] কথাটি দ্বারা। আল্লাহ তা’আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন:

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

অর্থাৎ: “তারা সবুজ বাগানে মহানন্দে হাঁটবে।” [রুম : ১৫]

‘মহানন্দে হাঁটবে’ এর একটি ব্যাখ্যা হলো, সঙ্গীত শ্রবণ করা। জানা থাকা দরকার যে, ‘সঙ্গীত শ্রবণ বৈধ’ যদি এর উদ্দেশ্য হয় সুন্দর শব্দ ও সূর শ্রবণ। শ্রবণকারীর নিয়ত এমন কিছু হবে না যা শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার আবেগের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছেতাই করা ও এর মধ্যে যে আনন্দফুর্তি তার প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি বৈধ হবে না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই যে কবিতা আবৃত্তি হতো সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তিনি নিজেও কবিতা শ্রবণ করেছেন এবং যারা আবৃত্তি করতেন তাদেরকেও নিষেধ করেন নি। এছাড়া সামা’ শ্রবণকারীর মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহর আনুগত্যের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। তাকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রতি ভীত বান্দাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। [তিনি চাইলে] সামা’র মাধ্যমে তাঁদের অন্তরে আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল হতে পারে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বক্তব্যে কবিতার অনুরূপ কথা ব্যক্ত হয়েছে, যদিও তিনি নিজে হয়তো ‘কবিতা’র ভাষায় বলতে ইচ্ছা করেন নি।

হযরত আবুল হাসান আলী বিন আহমদ আহওয়াজী আমাদেরকে বলেছেন, তিনি হযরত আহমদ বিন উবাইদ সাফ্ফার থেকে, তিনি হযরত হারিস বিন উসামা থেকে, তিনি হযরত আবুল নযর থেকে, তিনি হযরত শু’বা থেকে, তিনি হযরত হুমাইদের সূত্রে বর্ণনা করেন: হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্দীআল্লাহু আনহু

বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী [আনসারগণ] খন্দক খননের সময় এই বাক্যগুলো আবৃত্তি করছিলেন:

আমরা আমাদের আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করেছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর জিহাদের প্রতি, যতদিন পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাগুলো শ্রবণ করে দু’আ করলেন: ‘হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবন ছাড়া জীবন নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সদয় হোন!’”

যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্যটি কবিতার ভাষায় রচিত ছিলো না, কিন্তু তা কবিতার মতোই ছিলো। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা এবং [পরবর্তী যুগের] অনেক মহাত্মন ফুকাহায়ে কিরাম কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ করতেন। যাঁরা সামা’র সমর্থক তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত মালিক বিন আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হিজাবের উলামায়ে কিরাম। আর ‘উট চালকদের গীত’ [হিদা’] বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে সকলেই একমত ছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা ও হাদিস দ্বারাও এটা সমর্থিত।

বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে জুরাইয রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সামা’র অনুমতি দিয়েছেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো: “যখন শেষ বিচারের দিন আপনার ভালো ও মন্দ আমলের ওজন হবে তখন এই সামা’ কোন্ পাল্লায় থাকবে?” তিনি জবাব দিলেন, “ভালোর সঙ্গেও নয় মন্দের সঙ্গেও নয়।” এতে এটাই ইঙ্গিত করে যে সামা’ বৈধ কিন্তু তা মুবাহ পর্যায়ের আমল। ইমাম শাফিঈ এটা অবৈধ বলেন নি। তবে তিনি মনে করতেন, সাধারণের জন্য সামা’ নিন্দনীয়। কিন্তু কেউ যদি গান-বাজনা তার জীবিকার উপায় হিসাবে বেছে নেয় কিংবা এটা সর্বদা শ্রবণ করে তাহলে এ ব্যক্তির সাক্ষ্য [শরয়ী] আদালতে বৈধ হবে না। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতামত হলো, গান-বাজনা [অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রসহ সামা’] শ্রবণ করলে তার মানবিক গুণাবলীর অবক্ষয় হবে, কিন্তু তিনি শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেন নি।

যাহোক, আমরা এখানে উক্তরূপ সামা’র কথা নিয়ে আলোচনা করছি না। যে দলের [সুফিদের] কথা আমরা এখানে বর্ণনা করছি তাঁরা তো আর সাধারণ মানুষ

নয় যে গান-বাজনা শ্রবণ করবেন চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে! কিংবা কোনো গান-বাজনার অনুষ্ঠানে বসে যাবেন উপেক্ষা করে কিংবা তাঁদের অন্তরকে এ ধরনের অর্থহীন [লাগউ] বিষয়ের প্রতি সম্পৃক্ত রাখবেন, অথবা গান-বাজনা শুনবেন অসঙ্গতভাবে।

হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে সামা' বৈধ হওয়ার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। অনুরূপ হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবি তালিব এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে 'উট চালকের গীত' সম্পর্কে বর্ণনা মিলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি হয়েছে, তিনি তা নিষিদ্ধ করেন নি। এটা সর্বজনজ্ঞাত বর্ণনা যে, তিনি একদা হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা'র গৃহে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর [আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা'র] দু'জন খাদিমা [বাজনা ছাড়া] গজল পরিবেশন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এদেরকে [গজল পরিবেশন করতে] নিষেধ করেন নি।

হযরত হিসাম বিন উরওয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন: হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর হুজরায় প্রবেশ করলেন। এসময় দু'জন মহিলা বুয়াত যুদ্ধের [আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ] উপর সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু দু'বার বললেন: “শয়তানের বাঁশি! শয়তানের বাঁশি!”। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [তিনিও হুজরায় ছিলেন] বললেন: “এদেরকে বলতে দাও আবু বকর! প্রত্যেক লোকদের নিজস্ব উৎসব আছে, আর আজ হলো আমাদের উৎসব!”

হযরত আবু জুবাইর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেছেন, তিনি একদা আনসারী একজন মহিলা আত্মীয়ার বিবাহনুষ্ঠানের আয়োজন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ এনে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি কনেকে বরের নিকট নিয়ে গেছো?” হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, নিয়েছি।’ তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: “তুমি কি কাউকে প্রেরণ করেছিলে, যে গজল পরিবেশন করবে?” এবার হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, ‘জি না, পাঠাই নি’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আনসাররা মুহাব্বাতের কবিতা পছন্দ করে। তোমার উচ্চিৎ ছিলো তাদের নিকট কাউকে প্রেরণ করা, যে [তাদেরকে] এই কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনাবে:

আমরা এসেছি তোমার কাছে, আমরা এসেছি তোমার কাছে
আমাদের জানাও স্বাগত, আমরাও তোমাদের জানাবো স্বাগত!”

হযরত বারা” বিন আজিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “কুরআনকে তোমার সুর দ্বারা ভালোবাসো, কারণ সুন্দর সুর কুরআনকে আরো সুন্দর করে।”

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য-ভূষণ আছে। কুরআনের সৌন্দর্য-ভূষণ হলো সুন্দর সুর।”

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “দু’টি সুর অভিশপ্ত: মানসিক ক্লেশের সময় বিলাপের সুর এবং আনন্দের সময় বাঁশির সুর।”

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদির অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো [শক্ত] আইন-কানুন প্রণয়ন অবৈধ হবে। এ সম্পর্কির বর্ণনা অনেক আছে। আমরা যদি এগুলো বর্ণনা করতেই থাকি তাহলে [এ গ্রন্থ] সংক্ষিপ্ত হওয়ার আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। বলা হয়ে থাকে, এক ব্যক্তি নিম্নের কবিতাটি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আবৃত্তি করলেন:

‘সে [নারী] আসলো, তার তুথনির হাড়িটি যেনো একখণ্ড উজ্জ্বল অলঙ্কার
সে ঘুরে দাঁড়ালো, অগ্নিদগ্ধ আমার হৃদয় থেকে তাকে বললাম:

‘দুর্দশা [তোমার-আমার তুথনি] উভয়ের প্রতি, এতে কি আমি পাপ করেছি
[তার প্রতি] ভালোবাসার জন্য?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: “না!” আল্লাহ তা’আলা কোনো কোনো মানুষের কণ্ঠধ্বনি মধুর করেছেন নিয়ামত হিসাবে। তিনি ইরশাদ করেন:

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ: “... তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন।” [ফাতির : ১]

কোনো কোনো মুফাসসির এই আয়াতাত্শের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় যেসব বস্তু যোগ হয় তার মধ্যে একটি হলো কণ্ঠের মধুর সুর। একই সময় আল্লাহ তা’আলা বিশী কণ্ঠধ্বনিকে অপছন্দও করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

অর্থাৎ: “নিঃসন্দেহে গাধার কণ্ঠধ্বনিই সর্বাপেক্ষা অপ্ৰীতিকর।” [লুকমান : ১৯]

এটা উপেক্ষা করার উপায় নেই যে, মানুষের হৃদয়ে সুন্দর সুর আনন্দদায়ক এবং এতে সৃষ্টি করে প্রশান্তি। তাই তো, একটি শিশু যখন সুন্দর সুর শ্রবণ করে, তখন সে নীরব হয়ে যায়। উট দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লেশ ও তার পিঠের ভারী বোঝা বহনের কষ্টকে সহ্য করে চলে, যখন তাকে তার চালক গীত শুনিতে আনন্দ দান করে। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

অর্থাৎ: “তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?” [গাশিয়া : ১৭]

হযরত ইসমাইল বিন উলাইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে দিনের দুপুরে হাঁটতে গেলাম। আমরা তখন একটি স্থান অতিক্রম করছি, শুনতে পেলাম কেউ কিছু আবৃত্তি করছেন। ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, ‘চলো, ওখানে যাই [আবৃত্তি শুনতে]’। পরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘এটা কি তোমাকে আমোদিত করেছে?’ জবাব দিলাম: ‘না, করে নি।’ তিনি তখন বললেন, ‘তোমার তো দেখছি কোনো অনুভূতি নেই!’”

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তা’আলা একজন নবীর সুরেলা কণ্ঠধ্বনিতে পঠিত কুরআন তিলাওয়াত সর্বাধিক বেশি পছন্দ করেন।”

হযরত আবু সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা’আলা কোনো নবীর কণ্ঠে জনসমক্ষে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা থেকে আর কোনো কিছু বেশি শ্রবণ করতে পছন্দ করেন না।”

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম যখন যবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন তখন অসংখ্য জিন, মানুষ, পাখি ও জীব-জন্তু এসে শ্রবণ করতো। তিলাওয়াত শেষে তারা চারশত পর্যন্ত মরদেহ বহন করে নিয়ে যেতো। এরা সবাই তিলাওয়াত শুনে উচ্চানুভূতি হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন: “দাউদ আলাইহিসসালামের গোত্রের যবুর কিতাবের একটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল।” একদা হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: “আমি যদি জানতাম আপনি [আমার তিলাওয়াত] শ্রবণ করবেন, তাহলে আমি খুব সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম।”

হযরত আবু বকর মুহাম্মদ দাউদ দিনাওয়ারী দুক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদা মরুভূমিতে ভ্রমণকালে এক বেদুঈন গোত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে মেহমান করলেন। [তার তাঁবুতে যাওয়ার সময়] লক্ষ্য করলাম সেখানে পায়ে বেড়ি বাধাবস্থায় একজন হাবসি ক্রীতদাস ও কয়েকটি মৃত উট পড়ে আছে। ক্রীতদাস আমাকে অনুরোধ করলো, ‘আপনি আজ রাতের জন্য একজন মেহমান। আমার মালিকের নিকট অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি। দয়াকরে মালিকের নিকট আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন। আমার বিশ্বাস তিনি আপনার কথা রক্ষা করবেন।’ সুতরাং আমি মেজবানকে এক পর্যায়ে বললাম: ‘আপনি ঐ ভৃত্যকে মুক্ত না করলে আমি আহার গ্রহণ করবো না!’ মেজবান জানালেন: ‘এই গোলামটি আমাকে গরীব বানিয়েছে। সে আমার অনেক সম্পদ নষ্ট করেছে!’ সে কি করেছে জানতে চাইলে তিনি বললেন: ‘তার গলার আওয়াজ খুব সুন্দর। ঐ মৃত উটগুলোকে কাজ থেকে বিরত রেখেছিলাম। কিন্তু

এই গোলাম তাদের উপর ভারী বোঝা দিয়ে অতি সুন্দর সুরে [উট চালনার] গান করে। এতে তারা দীর্ঘ তিন দিনের রাস্তা মাত্র একদিনে পাড়ি দেয়। অবশেষে বোঝা যখন সে সরালো তখনই সবগুলো উট মরে যায়। এরপরও আমি আপনার ইচ্ছার প্রতি সম্মান করবো।’

বেদুঈন সাথে সাথে গোলামের পা থেকে চেইন খুলে দিলেন। ভোরে উঠে আমি ঐ গোলামের কণ্ঠে গান শুনতে ইচ্ছা পোষণ করি। আমি মালিককে অনুরোধ জানালাম। তিনি গোলামকে নির্দেশ দিলেন কূপের নিকটে পানি পানরত একটি উঠের জন্য গান করতে। গান শুনেই উটটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। গলার দড়ি ছিড়ে ফেললো। আমি ইতোমধ্যে এর চেয়েও সুন্দর কোনো কণ্ঠধ্বনি শুনি নি। আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। অবশেষে আমার মেজবান তার দাসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন গান গাওয়া বন্ধ করে দিতে।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ প্রশ্ন করলো, ‘মানুষ কেনো [সাধারণত নীবর থাকা সত্ত্বেও] গানের সুরে আন্দোলিত হয়ে ওঠে?’ তিনি জবাব দিলেন: “আল্লাহ তা’আলা সকল মানবাত্মা সৃষ্টি করে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এই বলে: ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই?’ [আলাসতু বিরাব্বিকুম?]। সকলে জবাব দেয়: ‘অবশ্যই, আমরা [এ ব্যাপারে] সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ [ক্বালু বালা শাহিদনা]। [আরাফ : ১৭২] সকল মানবাত্মা সেদিন এ শব্দগুলো হৃদয়ঙ্গম করেছিলো। সুতরাং সুর শুনলেই সেই অঙ্গীকারের স্বাক্ষর অন্তরে জাগ্রত হয়ে তাদেরকে আন্দোলিত করে তোলে।”

শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “সাধারণের জন্য সামা’ অবৈধ। এর কারণ হলো তারা নফসে আন্নারার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু জাহিদদের জন্য এটা বৈধ। কারণ তারা আধ্যাত্মিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এটা আমাদের সাথীদের জন্য সুপারিশযোগ্য, কারণ এর দ্বারা তাদের হৃদয় সঞ্জীবিত হয়।”

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “তিনটি জিনিস আছে যা কারো ভাগ্যে জুটলে, তাকে আনন্দ দান করে। এগুলো থেকে অবশ্য আমরা বঞ্চিত। এ তিনটি বিষয় হলো: ক. একটি সুন্দর মুখশ্রী যখন তার সঙ্গে থাকে

আত্ম-সংযম; খ. একটি সুমধুর কণ্ঠস্বর যখন তার সঙ্গে থাকে ধার্মিকতা; এবং গ. একটি সুন্দর বন্ধুত্ব যখন তার সঙ্গে থাকে বিশুদ্ধতা।”

কেউ হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সুন্দর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি জবাব দিলেন: “[সুন্দর] বক্তৃতা ও [সূক্ষ্ম] ভাবভঙ্গী আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও নারীকে দান করেছেন।” যখন তাঁকে সামা’ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তিনি জবাব দিলেন: “[এটা] একটি ঐশি অনুগ্রহ [ওয়ারিদ], যা আল্লাহপ্রাপ্তির আকাজক্ষায় হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। যে কেউ সত্যসহ [বিহাঙ্ক] এর প্রতি আকর্ষিত হয়, সত্যকে লাভ করে [তাহাক্কাক] অথচ মনোযোগ দেয় তার নফসে আন্নারার প্রতি, সে ধর্মদ্রোহী [তাজান্দাক] হলো।” হযরত জাফর বিন নুসাইর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সূত্রে বর্ণিত, হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “গরীবের প্রতি রহমত নাজিল হয় তিন স্থানে: ১. যখন তারা সামা’ শুনে, কারণ তারা তো শুধুমাত্র সত্য বাসনাসহ শ্রবণ করে এবং প্রভুপ্রাপ্তির মহানন্দে কথা বলে; ২. যখন তারা তাদের খাবার গ্রহণ করে, কারণ তারা তো শুধুমাত্র সত্যিকার প্রয়োজন হেতু খায়; এবং ৩. দ্বীনের আলোচনার সময়, কারণ তারা শুধু ওলিদের [আউলিয়া] চারিত্রিক বিশেষত্বের কথা বলে থাকে।”

হযরত আবু বকর মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি থেকে বর্ণিত, হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সামা’ শ্রবণ ঐ ব্যক্তির জন্য ফিতনা যে তার অনুসন্ধান করে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য বিশ্রাম যে হঠাৎ এর সাক্ষাৎ পায়।” তিনি আরো বলেছেন: “সামা’ শ্রবণের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়: সময় [জামান], স্থান [মাকান] এবং বন্ধুত্ব [ইখওয়ান]।”

একব্যক্তি হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা’ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন: “এর বাহ্যিক দিক হলো ফিতনা [প্রলোভন], অপরদিকে আভ্যন্তরীণ দিক হলো উৎসাহ [ইবরা]। যে কেউ এর সূক্ষ্ম প্রলুব্ধি বুঝে তাকে শ্রবণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটা নিয়ে আসবে তার জন্য উৎসাহ। অন্যথায় সে এর প্রলোভনের শিকার হবে এবং নিজের উপর পরীক্ষায় পতিত করবে।”

তারা [সুফিরা] বলেন: “সামা’র অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য খাস, যার নফস মৃত কিন্তু হৃদয় এখনও জাগ্রত। এরূপ ব্যক্তির নফস তো আধ্যাত্মিক

আত্মসাধনার অসি দ্বারা জবাই করা হয়েছে এবং তার হৃদয় [আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি] আনুগত্যের নূরে সঞ্জীবিত।” কেউ হযরত আবু ইয়াকুব নাহরাজুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে সামা’ সম্পর্কে জানতে চাইলে জবাব দিলেন: “এটা হলো সেই গুট রহস্যের স্তরে ফিরে যাওয়া, যা সম্ভব হয় [নিজের নফসকে] অগ্নিদগ্ধতার মাধ্যমে।”

তঁারা [সুফিরা] বলেন: “সামা’ হলো মা’রিফাতপন্থীদের আত্মার জন্য একটি সুস্বাদু খাদ্য।” আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: ‘সামা’ শ্রবণ মানুষের স্বভাব [তাব], যদি এটা শরীয়তসম্মত হয়। এটা একটি সীমালঙ্ঘন, যদি তা সত্যিকার উচ্চাভিলাষসম্পন্ন না হয়। আর এটা ফিতনা, যদি তা ধর্মভীরুতার আওয়াযভুক্ত না থাকে।” তঁারা বলেন: “সামা’ দু’ধরণের: ১. দ্বীন শিক্ষা ও সংযমের মাধ্যমে শুনা। যে এতে অংশ নেবে তার জানা চাই, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ। অন্যথায় সে কুফরির মধ্যে পতিত হবে। ২. আধ্যাত্মিক অবস্থানির্ভর সামা। যে এতে অংশ নেবে সে তার নিজের মানবিক গুণাবলী বিলুপ্ত করতে হবে এবং জাগতিক সকল আকর্ষণ থেকে পবিত্র থাকবে।”

ALL RIGHTS RESERVED

হযরত আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি আবু সুলাইমান দারিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা’ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন: ‘একজন নয়, বরং যখন দু’জন তা পরিবেশন করে, তখন আমার আরো অধিক ভালো লাগে।’” কেউ হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ‘সুফি’ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি জবাব দিলেন: “তিনি হচ্ছেন সুফি যিনি সামা’ শুনে ও হালাল রিজিক গ্রহণ করেন।” একবার কেউ একজন হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা’ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি জবাব দিলেন: “যদি আমরা একে পদে পদে পবিত্র করতে পারতাম!”

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যে কেউ সামা’ শ্রবণের দাবী করে কিন্তু সে পাখিদের কণ্ঠধ্বনি, দরজার কঁ্যাচ কঁ্যাচে শব্দ কিংবা বাতাসের ঝনঝনানি শুনে না, সে একজন বাতিল ছলনাকারী।” হযরত জাফর খুলদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথী হযরত ইবনে জিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন বিশিষ্ট সুফি শায়খ

ছিলেন। তিনি সামা' পবিত্রেশন স্থানসমূহে প্রায়ই যেতেন। তাঁর পছন্দ হলে নিজের জামা মেজের উপর প্রশস্ত করে রেখে বলতেন, সুফি সেখানে, যেখানে তার হৃদয় আছে। আর অপছন্দ হলে তিনি বলতেন, সামা' শুধু ওদের জন্য যাদের হৃদয় আছে [আরবাব আল-কাল্ব]। এরপর তিনি সেডেল পায়ে পরে প্রস্থান করতেন।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল মজিদ বলেন, কেউ হযরত রুয়াইম বিন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা'র সময় সুফিদের আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতি [ওয়াজদ] সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন: “তাঁরা তখন এমন কিছু সত্যোপলব্ধি করেন যা অন্যদের নিকট গোপন আছে। তারা তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, ‘[এসো] আমার কাছে! আমার কাছে!’ এরপর একটি পর্দা পড়ে যায়। মুহূর্তে তাদের গভীর হর্ষ পরিণত হয় দুঃখ-বেদনায়; কেউ কেউ নিজেদের পরনের বস্ত্র ছিড়ে ফেলে। অন্যরা চিৎকার দেয়। আরো কেউ কেউ ক্রন্দন করে। প্রত্যেকেই যার তার অবস্থানুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায়।”

হযরত হুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন: “আমি সামা' শুনে কি করবো, যখন যে [সামা'] শুনে সে [নিজেই] অবশিষ্ট থাকে না? এজন্যই তোমার শ্রবণ হতে হবে স্থায়ী এবং বাধামুক্ত।” তিনি আরো বলেছেন: “সামা' শ্রবণকারীর মাঝে থাকতে হবে স্থায়ী পিপাসা ও স্থায়ী পানাব্যাস। পানীয়ের মাত্রা [এখানে আধ্যাত্মিক মুহাব্বাতের সূরা উদ্দেশ্য] বৃদ্ধি পেলে পিপাসাও বাড়ে।” হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর কলাম,

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

অর্থাৎ: “তারা মহানন্দে একটি সবুজ বাগানে বিচরণ করবে।” [ক্রম : ১৫] এর ব্যাখ্যায় বলেন: তারা বেহেশতের হুরদের সুরেলা কণ্ঠের গান শ্রবণ করবে: “আমরা চিরস্থায়ী, কখনো মরবো না; আমরা বরকতপ্রাপ্ত, আমরা কখনো কষ্ট পাবো না!” তাঁরা [সুফিরা] বলেন: “সামা' একটি আহ্বান এবং আধ্যাত্মিক মহানন্দের অনুভূতি হলো [এর জাবাবে] আকাজ্জা।”

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সিদ্দীকদের হৃদয় সর্বদাই উপস্থিত থাকে। তাঁদের কর্ণ সবসময় খোলা।” শায়খ আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “শ্রবণকারী পর্দাবৃত [ইসতিসার] ও স্পষ্টকরণের

[তাজাল্লি] মাঝখানে ভেসে বেড়ায়। পর্দাবৃত দ্বারা প্রদাহ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। আর তাজাল্লি বা স্পষ্টতার ফলে ফিরে আসে [প্রদাহ থেকে] মুক্তি। পর্দাবৃততার ফলেই অভিকাজ্জীদের [মুরিদুন] মধ্যে হরকত [কম্পন] এর সূচনা হয়। অপরদিকে স্পষ্টকরণের [তাজাল্লির] কারণে কাজ্জিত মাক্বামে পৌঁছে যাওয়াদের [ওয়াসিলুন] মধ্যে প্রশান্তির সূচনা হয়। এটা হলো ঋজুতা ও স্থায়িত্বের মাক্বাম। এটা [ঐশি] উপস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিষয়। সম্ভ্রমোদ্দীপক ঐশি উপস্থিতি অতিক্রমণকালীন এ মুহূর্তে শুধুমাত্র বিনয় ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধিতে আসে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'আলা ইরশাদ করেন:

يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا

অর্থ: “তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক!” [আহকাফ : ২৯]

শায়খ আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সামা’র তিনটি মুখ আছে। প্রথমটি অভিকাজ্জীর ও নবিসদের দিকে ফিরে থাকে, যারা এরই মাধ্যমে মহৎ আধ্যাত্মিক স্তরে উপনিত হতে আগ্রহী। কিন্তু নাফসানী খাহিশাত ও ধর্মদ্রোহিতার প্রতি এদের আকর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয় মুখ ওদের যারা সত্যনিষ্ঠ। তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক স্তরকে শক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা শুধু ওসব কথা শ্রবণ করেন যা তাদের বিস্ময়-উদ্বেককর মুহূর্তগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। তৃতীয় মুখটি মহাত্মন মা’রিফাতপন্থীদের জন্য খাস। যাকিছু হারাকাত ও স্থিরতা তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তা পছন্দ করার জন্য তাঁরা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।”

হযরত আবু সঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যদি কেউ অনুভব করে যে, ‘বুঝের’ - তথা সামা’ শ্রবণের সময় সে নিমজ্জিত হচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন হারাকাতের মধ্যে। বুঝতে হবে, এটা তার জন্য একটি ইশারা যে, তার আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতি দ্বারা সামা’ শ্রবণ আরো সুন্দর হয়ে যাবে।” শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন উক্ত বক্তব্যটুকু হযরত আবু উসমান মাগরিবীকে বলা হলো, তিনি মন্তব্য করলেন: “এটা তো এই অবস্থার ছোট্ট অংশ মাত্র। তার জন্য আসল ইশারা হলো, উপস্থিত আন্তরিক এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকবে না, যিনি এই অবস্থা হেতু তার প্রতি

আকর্ষিত হবেন না। অপরদিকে উপস্থিত সকল ভণ্ড দাবীদারদের মধ্যে তার থেকে দূরে থাকার অনুভূতি জাগ্রত হবে।”

হযরত বুন্দার বিন হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সামা’র মধ্যে তিনটি ধরণ আছে। কেউ আছে তারা শ্রবণ করেন নিম্ন স্বভাব দ্বারা [নাফসানী], কেউ আছে শ্রবণ করেন আধ্যাত্মিক স্তর দ্বারা [কুহানী], আর কেউ আছে সামা’ শুনে সত্যিকার অবস্থার [হাক্কানী] মধ্যে। স্বভাব দ্বারা শ্রবণকারীদের মধ্যে থাকতে পারেন সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। কারণ মানব স্বভাবই হলো সুন্দর কণ্ঠধ্বনির প্রতি দুর্বল। যারা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার মাধ্যমে শ্রবণ করেন তারা এসব বিষয় স্মরণ ও অনুভব করতে পারেন: ভর্ষসনা, বাচন, আগমন, বহির্গমন, নৈকট্য, দূরত্ব ইত্যাদি। তারা দুঃখবোধ করেন যখন কেউ চলে যায়, কিংবা আকাঙ্ক্ষিত হন কাউকে মতৈক্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে এগিয়ে আসতে। তারা অনুভব করেন কোনো প্রতিজ্ঞার সিদ্ধিলাভ কিংবা এর লঙ্ঘন, উদ্বেগ কিংবা অনুরাগ, আলাদা হওয়ার ভয় কিংবা মিলনের মহানন্দ, কিংবা প্রস্থানের হুমকি ইত্যাদি। আর যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর মাধ্যমে ও আল্লাহর জন্য শ্রবণ করেন, তাদেরকে মানবিক আবেগ-অনুভূতির মানদণ্ডে যাচাই করা যাবে না। কারণ আবেগ-অনুভূতি মূলত অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। সুতরাং এরূপ শ্রবণকারীরা আন্তরিকভাবে ও খাঁটিভাবে শুনে। তাদের শ্রবণে কোনো [পার্থিব] প্রয়োজন পূরণ কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত নেই। তারা [সুফিরা] বলেন, এদের মধ্যেও তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে আছেন ঐশি বাস্তবতার শিশুরা। তাদের সামা’র অবলম্বন আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে সম্বোধনের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় স্তরে যারা আছেন, তারা আল্লাহকে সম্বোধন করেন হৃদয় দ্বারা শ্রবণকৃত শব্দাবলি দিয়ে। যার দ্বারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হচ্ছেন তা থেকে তারা হাক্কিকাত লাভের চেষ্টায় রত। তৃতীয় স্তরের ব্যক্তির হলে নিঃস্ব, ফকির। তাদের কিছুই নেই। তারা জাগতিক সকল বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। তারা মুক্তভাবে স্বেচ্ছায় হৃদয় দ্বারা শ্রবণ করেন। আর তারাই হলেন সর্বাধিক পরিত্রাণপ্রাপ্ত।”

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা’ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন: “এটা হলো অন্তঃনিগূঢ় আপন থেকে পর্দা উন্মোচন করা, যাতে করে সেখানে প্রেমাস্পদের দৃশ্য ফুটে ওঠে।” হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করলো, ‘কুরআন ছাড়া অন্য কিছু শ্রবণ করে কেনো মানুষ উদ্দীপিত হবে? খাস করে এটা [উদ্দীপিত হওয়া] যখন ঐ ব্যক্তির মধ্যে কুরআন শ্রবণে সৃষ্টি হয় না?’ তিনি জবাব দিলেন: “কুরআন শ্রবণ হলো একটি ধাক্কা [সাদমা]। সুতরাং এর প্রচণ্ড শক্তি হেতু শ্রবণকালে কেউ নড়াচড়া করতে অপারগ। অপরদিকে, সাধারণ বক্তব্য [সামা] শ্রবণে সৃষ্টি হয় স্বস্তি ও বিশ্রামকর অবস্থা। তাই এটা চলাকালে মানুষ নড়াচড়া করতে সক্ষম।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যখন তুমি কোনো অভিকাজ্জী ব্যক্তি দেখবে যিনি সামা’কে ভালোবাসেন, জেনে রেখো ঐ ব্যক্তির মধ্যে তখনও অহঙ্কার [বাতালা] বিদ্যমান আছে।”

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সামা’ শ্রবণের জ্ঞান আল্লাহ তা’আলা তাঁরই নিকট সংরক্ষণ রেখেছেন। একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ এ সম্পর্কে জানে না।”

হযরত আহমদ বিন মুকাতিল আক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত: “যখন হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদ শহরে প্রবেশ করলেন, তখন স্থানীয় সুফিবৃন্দ তাঁর সুহবতে এসে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে একজন কাওয়াল [গায়ক] ছিলেন। সুফিরা হযরত মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট অনুমতি চাইলো, এই কাওয়ালের কণ্ঠে কিছু শ্রবণ করতে। তিনি অনুমতি দিলেন। কাওয়াল এই কবিতাটি অপূর্ব সুরে আবৃত্তি করলেন:

তোমার জন্য অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ অনুরাগ আমাকে বিরাট বেদনাতুর করেছে
কী হতো, যদি এটি [অনুরাগ] আমাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতো?
তুমি আমার হৃদয়ে জমা করেছো এমন এক অনুরাগ, যা অতীতে অনেকে
ভাগ করে নিয়েছিল।
তোমার মাঝে কি নেই কোনো দরদ তার প্রতি, যে ভেঙ্গে পড়েছে শোকাহত
হয়ে,
সে আছে ক্রন্দনে রত, আর যেজন মুক্ত [যন্ত্রণা থেকে] সে তো প্রাণভরে
হাসে!

[এটা শুনে] হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। এরপর একজন দরবেশ দাঁড়িয়ে গেলেন ও পরমানন্দদায়ক আচরণ শুরু করলেন।

হযরত মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন: ‘[সর্ব-দয়াময়] তিনি দেখছেন, যখন তুমি দাঁড়িয়েছো’। সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বসে পড়েন।”

আমার শায়খ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলতে শুনেছি: “হযরত যুননূন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ লোকটির সত্যিকার ইচ্ছা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি তাই তাকে জানিয়ে দিলেন, তোমার জন্য এ স্থানটি [ও কাজটি] প্রযোজ্য নয়। অপরদিকে লোকটিও এটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আস্তরিক ছিলেন তাই তিনি বসে পড়েন।”

হযরত ইবনে জাল্লা’ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মরক্কোতে [মাগরিবো] দু’জন সুফি শায়খ ছিলেন। তাঁদের মুরীদান ও সাথীদের সংখ্যা ছিল অনেক। একজনের নাম ছিলো জাবালা ও অপরজনের নাম জুরাইক্ব। একদিন জুরাইক্ব তাঁর ক’জন সাথীসহ জাবালার সাথে সাক্ষাতে আসলেন। জুরাইক্বের একজন সাথী পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াত অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন। ফলে জাবালার একজন সাথী কাঁদতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পরেরদিন জাবালা জুরাইক্বকে প্রশ্ন করলেন: ‘আপনার সাথী সেই ক্বারী সাহেব কোথায় যিনি গতকাল তিলাওয়াত করেছিলেন? আমি তাঁর কণ্ঠে আরো তিলাওয়াত শুনতে ইচ্ছুক।’ সুতরাং ঐ ক্বারী পুনরায় কুরআন শরীফের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। জাবালার একজন সাথী কাঁদতে লাগলেন। এতে তিলাওয়াতকারী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। জাবালা মন্তব্য করলেন: ‘একের জন্য এক। কিন্তু যে শুরু করেছিল তার অপরাধ বেশি!’”

হযরত ইব্রাহিম মারিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামা’র সময় নড়াচড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন: “হযরত মুসা আলাইহিসসালাম যখন ইসরাঈলের বংশধরদের নিকট ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি [আবেগ-আপ্লুত হয়ে] নিজের জামা ছিড়ে ফেলতে লাগলো। আল্লাহ তা’আলা মুসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলে: ‘তাকে বলো, আমার জন্য সে যেনো তার হৃদয় ছিড়ে ফেলে! কাপড় নয়।’”

হযরত আবু আলী মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, ‘সময় সময় কুরআন শরীফের একটি আয়াত আমি শ্রবণ করি। এর দ্বারা আমার মনে প্রবল প্রভাব পড়ে এবং প্রচণ্ড আগ্রহ জাগে যে, দুনিয়াবী সবকিছু বাদ দিয়ে দেবো। কিন্তু কিছু সময় পর আবার

নিজের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে এবং আমার লোকদের নিকট ফিরে যাই।’ একথা শুনে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “যার মাধ্যমে তুমি তাঁর [আল্লাহর] দিকে অগ্রসর হও তা তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ। আর যা তোমাকে তাঁর থেকে তোমার নিজের নিকট ফিরিয়ে আনে তা তাঁরই করুণা তোমার জন্য। যখন তুমি তাঁর দিকে ফিরে যাও তখন, সকল ক্ষমতা ও সামর্থ্য থেকে নিজেকে পরিহার করে নেওয়া তোমার জন্য উচিত নয়।” হযরত আহমদ বিন মুকাতিল আক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “পবিত্র রমজানের এক রাতে হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একটি মসজিদে আমি অবস্থান করছিলাম। মসজিদের ইমামের পেছনে আমরা উভয়ে নামায পড়ছিলাম। ইমাম সাহেব কুরআন শরীফের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

وَلَيْسَ شَيْئًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

অর্থঃ: “আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মুকাবিলায় কোনো দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না।” [বনী ইসরাঈল : ৮৬]

ALL RIGHTS RESERVED

[নামাযের মধ্যেই] হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিৎকার দিয়ে ওঠলেন ও ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলেন। মনে হলো তাঁর রূহ বেরিয়ে যাচ্ছে! [নামায শেষে] তিনি বললেন: ‘তিনি [আল্লাহ তা’আলা] তাঁর একান্ত আপনজনকে এরূপ বলছেন!’ এ কথাটি তিনি বার বার বলতে লাগলেন।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন [শায়খী] হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, সেখানে একজন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন। [হযরতকে] আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির কি হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন: ‘সে আল্লাহ তা’আলার কিতাবের একটি আয়াত শ্রবণ করেছিল।’ আমি বললাম, ‘এই আয়াতটি তার কানে পুনরায় তিলাওয়াত করার দরকার।’ এটা করা হলো এবং সে জ্ঞান ফিরে পেলো। হযরত সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তুমি এটা কোথায় শিখলে?’ আমি জবাব দিলাম: ‘হযরত ইয়াকুব আলাইহিসসালামের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়েছিল স্বীয় পুত্র ইউসূফ আলাইহিসসালামের জামা দেখে। এই দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে আসে ঐ জামাটি

আবার দেখেই।' শায়খ হযরত সাকুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার জবাব শুনে এর প্রতি সমর্থন জানালেন।

হযরত আবু হাতিম সিজিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত আবু নসর সাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন আলওয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন যুবক সাথী খুব জোরে চিৎকার করতেন যখনই তিনি আল্লাহর নাম [জিকির] শুনতেন। অবশেষে জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে সতর্ক করলেন: ‘তুমি যদি আরো একবার এরূপ চিৎকার দাও তাহলে আমার সঙ্গ ছাড়তে হবে!’ এরপর থেকে ঐ যুবক যখন কোন কিছু [জিকির] শুনতেন তখন [চিৎকার আটকানোর ফলে] তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ওয়ে উঠতো। সমগ্র শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়তো। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি এতো জোরে চিৎকার দিলেন যে, এতেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।”

আমি হযরত আবু হাতিম সিজিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে শ্রবণ করেছি, হযরত আবু নাসির সাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার এক সুফি ভাই আমার নিকট হযরত আবুল হুসাইন দাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি [দাররাজ] বলেন: “হযরত ইউসুফ বিন হুসাইন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি বাগদাদ ত্যাগ করলাম। রায় পৌঁছার পর তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিলো তা জানতে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। যাকেই আমি প্রশ্ন করলাম প্রত্যেকেই জবাবে বললো: ‘এই জিন্দিকের সাথে সাক্ষাতে আপানর প্রয়োজন কি?’ এ কথাটি শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বাগদাদ ফিরে যাবো। তবে এ রাতে একটি মসজিদে অবস্থান করলাম। ভাবলাম: ‘এ শহরে যখন ঢুকে গেছি, তাহলে একবার না হয় তাঁর [হুসাইন রাযীর] সঙ্গে দেখা করে যাই!’ সুতরাং আমি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়ে পুনরায় তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিলো তা মানুষকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁর মসজিদে পৌঁছুলাম।

তিনি তখন মিসরে বসা ছিলেন। তাঁর সামনে একটি রিয়ালের মধ্যে এক জিলদ কুরআন শরীফ ছিলো। তিনি এ থেকে তিলাওয়াত করছিলেন। দেখলাম, তিনি ছিলেন দৃশ্যত একজন প্রভাবশীল শায়খ, তাঁর সুদর্শন মুখমণ্ডলে ছিলো অতি সুন্দর দাড়ি। আমি সামনে এগিয়ে তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি সালামের জবাব

দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কোথেকে এসেছেন?’ জবাব দিলাম, ‘বাগদাদ থেকে। শায়খ! আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় এসেছি।’ তিনি জানতে চাইলেন: ‘যদি তুমি কোনো এক অদ্ভুত শহরে অবস্থানকালে কেউ তোমাকে প্রস্তাব দেয়, ‘আমার সঙ্গে থাকো, আমি তোমাকে এর বদলে একটি গৃহ কিংবা দাসী মেয়ে ক্রয় করে দেবো’, এ প্রস্তাব কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে থামিয়ে দেবে?’ আমি জবাব দিলাম, ‘হযরত! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাহা আমাকে এরূপ পরীক্ষায় ফেলেন নি! যদি তা হতো, তাহলে আমি জানি না কি করতাম!’ তিনি বললেন: ‘ভালো কোন কিছু আবৃত্তি করতে তুমি সক্ষম কি?’ বললাম, ‘জি হ্যাঁ। এবং আবৃত্তি করলাম:

আমি দেখেছি নিষ্ঠার সাথে তুমি ইমারত বানাচ্ছ আমার জায়গার
ওপর[অথচ] যদি তুমি বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হতে, যাকিছু তৈরি করছো তা
ধ্বংস করে দিতে!

তিনি এ কবিতাটি শ্রবণ করে কুরআন শরীফ বন্ধ করে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজ়ে গেলো। পরনের কাপড় সিক্ত হলো। আমার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠলো তাঁর এরূপ আহাজারি দেখে। তিনি বললেন: ‘হে আমার পুত্র! ‘ইউসুফ বিন হুসাইন একজন জিন্দিক’ বলার কারণে রায়বাসীদেরকে অভিযুক্ত করো না। নামাযের পর থেকেই আমি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলাম কিন্তু এ পর্যন্ত আমার চোখ থেকে এক ফোটা পানিও ঝরে নি। কিন্তু তোমার কবিতার পংক্তিগুলো শুনে মনে হচ্ছিলো শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হয়ে গেছে!’”

হযরত দাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত ইবনে ফুয়াতী ও আমি একদিন বসরা ও উবুলা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় ফুরাত [টাইগ্রিস] নদীর তীরে হাঁটছিলাম। আমরা পাহারা-মিনার সম্বলিত একটি সুন্দর প্রাসাদের নিকটে আসলাম। একটি বাঁদি মেয়েসহ একজন পুরুষ প্রাসাদের ঐ মিনারের উপর অবস্থান করছিলেন। মেয়েটি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলো:

আল্লাহর রাস্তায় আমার নিকট প্রেমকে তোমার জন্য উপহার দেওয়া হয়েছে
প্রত্যেক নতুন দিবসে তুমি বদলে যাও [তাতালাওয়ান], কিন্তু তোমার জন্য
অধিক সমুচিত যে, তুমি এরূপ হয়ে না যাও।

মিনারের নিচে দাঁড়িয়ে এক যুবক কবিতাটি শুনছিলেন। তার পরনে তালিযুক্ত খিরকা ও কাঁধে ঝুলছে একটি চামড়ার তৈরি ব্যাগ। তিনি চিৎকার দিলেন: “হে মেয়ে! তোমার মালিকের জীবনের ওসিলায় কবিতাটি আবার আবৃত্তি করো।” মেয়ে তখন এই লাইনটি পুনরায় আবৃত্তি করলো: ‘প্রত্যেক নতুন দিবসে তুমি বদলে যাও [তাতালাওয়ান], কিন্তু তোমার জন্য অধিক সমুচিত যে, তুমি এরূপ হয়ে না যাও।’ যুবক আবার বললেন, ‘আবার বলো!’। মেয়েটি আবার বললো। দরবেশ যুবক চিৎকার দিয়ে বললেন: ‘আল্লাহর কসম! এটাই আমার [অবিরাম] পরিবর্তন আল্লাহর সাথে!’ এরপর আবার এমন এক চিৎকার দিলেন যে, এতেই তাঁর রুহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রাসাদের মালিক বাঁদি মেয়েটিকে বললেন: ‘এবার আমি তোমাকে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম!’ বসরা শহরের মানুষ এই ঘটনা শুনে ছুটে আসলেন। দরবেশকে যথাযথ মর্যাদাসহ কাফন-জানাযা-দাফন করলেন। এরপর প্রাসাদের মালিক সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘হে বসরাবাসী লোকজন! আপনারা কি আমাকে চিনেন না? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা’আলার জন্য আমি সবকিছু বিসর্জন করলাম। সকল ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্ত করে দিলাম!’ তিনি কোমরবন্দ বাঁধলেন, গায়ে পরলেন ছেড়া জুকা, তার প্রাসাদ অনুদান হিসাবে দিয়ে দিলেন এবং এলাকা থেকে প্রস্থান করলেন। সেই থেকে কেউ কোনদিন তার মুখ দেখে নি, কোথায় ছিলেন সে খবরও জানে নি।”

হযরত ইয়াহইয়া রেজা আলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যখন আবু হুলামান দামেস্কী [বা ফারসী] শুনলেন, একব্যক্তি কাবা শরীফ তাওয়াফকালে এই কথাগুলো বলছিলেন: ‘হে বন্য সুগন্ধি গুল্ম! [ইয়া সা’তার বাররি] তখন তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিলেন, ‘আমি ভাবলাম তিনি বলছিলেন, ‘আত্মসংগ্রাম করো, তুমি আমার মহত্ব দেখতে পাবে! [ইসা’তারা বিররি]’” হযরত উতবা গোলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছেন: ‘প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের জন্য, সত্যিই প্রেমিক আছে নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝে!’ তখন তিনি চিৎকার দিলেন: ‘তুমি সত্য বলেছো!’ অপরদিকে আরেক ব্যক্তি একই বাক্য শুনে বললেন: ‘তুমি মিথ্যা বলেছো!’” তারা উভয়েই তাদের আধ্যাত্মিক স্তর মুতাবিক শ্রবণ করেছিলেন।

হযরত রুয়াইম বিন আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, সুফি শায়খরা সামা' শ্রবণের সময় কি করেন? তিনি জবাব দিলেন: “তারা [শ্রবণকারী সুফিরা] যেনো একদল মেষ যাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটি নেকড়ে!” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি আলী বিন মুয়াফ্ফাককে সামা' অনুষ্ঠানে থাকাকালে বলতে শুনেছি: ‘আমাকে দাঁড়াতে দাও!’ তারা তাঁকে [ধরে] দাঁড় করালেন। তিনি দাঁড়িয়ে হেলাদোলা শুরু করলেন। বললেন, ‘আমি নর্তক শায়খ [শায়খ জাফ্ফান]!’”

তারা [সুফিরা] বলেন: “হযরত দুক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুবহে সাদিক পর্যন্ত সারারাত সজাগ থাকতেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, আর উপস্থিতি অন্যরা কাঁদতেন:

আল্লাহর ওয়াস্তে, ভীষণ বেদনাতুর ব্যক্তির হৃদয়টি ফিরে দাও
কারণ তার প্রেমাস্পদের বিকল্প কেউ নেই।

হযরত আলী বিন হুসাইন ইবনে সালিম বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন: “আমি হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দীর্ঘদিনের খাদিম ছিলাম। সামা' শ্রবণকালে, আল্লাহর জিকিরকালে কিংবা কুরআন তিলাওয়াতকালে কখনো তাঁর অবস্থার পরিবর্তন দেখি নি। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষের দিকে একদিন তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াতটি শ্রবণ করলেন:

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ

অর্থাৎ: “অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।” [হাদীদ : ৫৭]

আমি দেখলাম তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। তিনি কাঁপছেন এবং সামান্যের জন্য পড়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হযরত! আপনার কী হয়েছিল?’ জবাব দিলেন: ‘প্রিয় বৎস! আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি!’”

হযরত ইবনে সালিম বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [তঁার পিতা থেকে] আরো বলেন: “আমি তাঁকে [হযরত তুসতরীকে] অন্য এক সময় দেখেছি। তাঁর সম্মুখে তখন কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পঠিত হচ্ছিলো:

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ

অর্থাৎ: “সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর।” [ফুরকান : ২৫]

তঁার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনি সামান্যের জন্য পড়ে যান। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন: “আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি।”

[ইমাম কুশাইরী বলেন] এটা হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের শায়খদের অবস্থার নমুনা। যখনই কোনো ঐশি সন্দর্শন [ওয়ারিদ] তাঁদের অন্তরে অবতরণ করতো, তা যতোই শক্তিশালী হোক না কেনো, তাঁরা এর থেকে শক্তিশালী থাকতেন।

আমি শায়খ আবদুর রহমান সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি হযরত আবু উসমান মাগরিবীকে দেখতে গেলাম। একব্যক্তি তখন কপিকল দ্বারা কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছিলেন। হযরত মাগরিবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘হে আবু আবদুর রহমান! তুমি কি জানো এই কপিকল কি বলছে?’ জবাব দিলাম: ‘জি না।’ বললেন: ‘এটা বলছে: ‘আল্লাহ! আল্লাহ!’”

হযরত রুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “বর্ণিত আছে, একটি চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শুনে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাথীদেরকে বললেন: ‘তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এটা কি বলে? তারা জবাব দিলেন: ‘বুঝি নি।’ তিনি বললেন: ‘এটা বলছে: প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অবশ্যই, অবশ্যই; প্রভু চিরন্তন, যিনি একক চিরস্থায়ী।’”

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী খারাকী ওয়াজিহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদল সুফি হযরত হাসান কায্জাযের গৃহে একত্রিত হতেন। তাঁদের সাথে থাকতেন কাওয়াল [গায়ক]। তাঁদের সামা’ পরিবেশনে সুফিদের মধ্যে আধ্যাত্মিক কম্পন শুরু হতো। একদা মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপস্থিত ছিলেন। এসময় তারা নীরব রইলেন। তিনি তাদেরকে বললেন: ‘যা তোমরা করছিলে তাতে ফিরে যাও! জগতের সকল বাদ্যযন্ত্রও যদি আমার কানে বাজানো হয় তবুও আমার [আল্লাহ] ধ্যানে একটুও প্রভাব ফেলতে পারবে না। না এটা আমাকে আমার বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে!’” একই সূত্রে বর্ণিত

আছে, হযরত ওয়াজিহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমাদের [সামা] ব্যবসার হাল এমনই হয়েছে যে, আমরা সেই বিন্দুতে পৌঁছুয়ে গেছি যা একটি অসির ক্ষুরধার প্রান্তের মতো। একটু এদিক-সেদিক হলেই আমরা নিমজ্জিত হবো জাহান্নামের অগ্নিতে।”

হযরত খায়রুন নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মুসা ইবনে ইমরান আলাইহিসসালাম একদিন কিছু লোককে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি চিৎকার করে উঠলো। মুসা আলাইহিসসালাম তাকে তিরস্কার করলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন: ‘আমার দয়া হেতু তারা ক্রন্দন করে; আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা হেতু তারা নিজেদেরকে প্রদর্শন করে [তিরস্কার পেতে]; আমাকে পাওয়ার মধ্যে যে অনুভূতি তাদের মধ্যে আন্দোলিত হয় তাতেই তারা চিৎকার দেয়! তাহলে তুমি কেনো আমার বান্দাদেরকে অভিযুক্ত করছো?’”

হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউকে বলতে শুনলেন: “এক ডজন শশা [খিয়ার], একটি মাত্র দানিকের [এক দানিক = এক দিরহামের ৬ ভাগের এক ভাগ] বিনিময়ে!” তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন: “যদি এক ডজন পৃণ্যবানদের [খিয়ার] মূল্য হয় মাত্র ১ দানিক তাহলে পাপীদের মূল্য কি হবে?” তাঁরা [সুফিরা] বলেন: “জান্নাতের হুররা যখন গান শুরু করে, তখন বৃক্ষরাজি গজে ওঠে।” বর্ণিত আছে, হযরত আউন বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা এক দাসী মেয়েকে নির্দেশ দিলেন সুন্দর সুরে গাইতে, যাতে করে উপস্থিত মানুষ কাঁদতে সক্ষম হয়।

কেউ একজন হযরত আবু সুলামইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট সামা’ সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি জবাব দিলেন: “প্রত্যেক হৃদয় যা সুন্দর কণ্ঠধ্বনির জন্য লালায়িত তা দুর্বল। এর প্রতি সেরূপ আচরণ করা চাই ঠিক যেভাবে একটি শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় করা হয়ে থাকে।” এরপর আবু সুলাইমান আরো বললেন: “একটি সুন্দর সুর হৃদয়ে কোনো কিছুর সূচনা করে না। বরং এটা জাগ্রত করে যা সেখানে আগে থেকেই ছিলো।” হযরত ইবনে আবিল হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একথা শুনে মন্তব্য করেন: “সুবহানাল্লাহ! আবু সুলাইমান সত্য বলেছেন!” হযরত জুরাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশ সম্পর্কে:

كُونُوا رَبَّانِيِّنَ

অর্থাতঃ “তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, ...” [আলে ইমরান : ৭৯] মন্তব্য করেন: “তাদের মতো হও যারা আল্লাহর কথা শ্রবণ করেন ও তাঁর মাধ্যমে কথা বলেন।”

কোনো এক ব্যক্তি একজন সুফিকে সামা’ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে বললেন: “বিদ্যুতের ঝলক যা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও পরে ধীরে ধীরে বিলীন হয়; আলো দৃশ্যমান হয়, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। কী মিষ্টি লাগে যদি তা চোখের পলক পরিমাণ সময়ও স্থায়ী থাকে!” এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন:

এক ভাবনা প্রবেশ করলো তার অন্তরের অন্তঃস্থলে- যেনো তা ছিলো বিজলির চমক, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো!

তারা বলেন: “সামা’ শব্দের জন্য প্রত্যেক মানব অঙ্গের মধ্যে একটি অংশ আছে। যখন এর একটি অংশ চোখে পড়ে, তখন তা কাঁদে; যখন এর একটি অংশ জিহ্বায় পতিত হয় তখন তা চিৎকার দেয়; যখন এর একটি অংশ হস্তে আসে, তখন সে পরনের বস্ত্রাদি ছিড়ে ফেলে ও বুকে আঘাত হানে; যখন একটি অংশ পায়ে পড়ে তখন তা নৃত্য করে।”

বর্ণিত আছে, যখন এক পারস্যের রাজার মৃত্যু ঘটে, তিনি উত্তরাধিকার হিসাবে ছোট্ট একটি শিশু রেখে যান। শিশুর প্রতি যখন রাজ্যের প্রজারা প্রভুভক্তির অঙ্গীকার করতে গেলো তখন তারা নিজেরাই প্রশ্ন করলো: “আমরা কিভাবে এই বাচ্চা শিশুটির জ্ঞানবুদ্ধির মাত্রা জানতে পারি?” তারা সিদ্ধান্ত নিল একজন গায়ককে নিয়ে আসবে। সে শিশুর সামনে গান করবে। যদি শিশুটি মনোযোগসহ গান শ্রবণ করে তাহলে বুঝা যাবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারা একজন গায়ক নিয়ে আসলো। গায়ক গান শুরু করতেই শিশুটি হাসতে লাগলো। সুতরাং প্রজারা মাটিতে চুম্বন দিলো ও শিশুর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করলো।

শাযখ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “হযরত আবু আমর বিন নুজাইদ, হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এবং তাঁর যুগের সুফিরা এক জায়গায় একত্রিত হলেন। হযরত নাসরাবাদী সকলকে বললেন: ‘আমি বিশ্বাস করি, একদল লোক যখন এক স্থানে একত্রিত হন তখন

একজনকে কথা বলা উচিত। বাকীরা অন্যের গীবত করার চেয়ে নীরব থাকাই ভালো।’ আবু আমর বললেন: ‘যদিও তুমি ত্রিশ বছর যাবৎ গীবত করে থাকো, তথাপি তা তোমার জন্য এটা উত্তম যে, যা তুমি শ্রবণকালে সত্যিই অনুভব করছো তা প্রকাশ না করো।”

হযরত দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন: “সামা’ শ্রবণ সম্পর্কিত তিনটি দল আছেন: ১. প্রথম দল শ্রবণ করতে অভিকাজ্জী [মুতাসামিত]। ২. দ্বিতীয় দল যারা শুনে [মুসতামি]। ৩. তৃতীয় দল যারা [সত্যিকার] শ্রবণকারী [সামি]। প্রথম দলভুক্ত ব্যক্তি শুনে তার নিজের মরমি মুহূর্তগুলোতে [ওয়ারুত]। দ্বিতীয় দলভুক্ত ব্যক্তি তার সার্বিক আধ্যাত্মিক অবস্থাভেদে [হাল] শুনে। আর তৃতীয় দলভুক্ত ব্যক্তি শুনে সত্যের মাঝে [বি-হাক্ক]।”

আমি শায়খ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বার বার, সামা’র ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু তিনি প্রতিবারই আমাকে যেসব ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে হবে তা-ই বলেছেন। আমার দীর্ঘদিনের সুহবত শেষে একদিন তিনি আমাকে বললেন: “সুফি শায়খরা বলেন: ‘যদি তোমার হৃদয় আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে [সামা] শ্রবণে কোনো ক্ষতি হবে না!’”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা’আলা হযরত মুসা আলাইহিসসালামের নিকট ওহি প্রেরণ করলেন: “আমি তোমার মধ্যে দশ হাজার শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপন করেছি, যাতে তুমি আমার কথাগুলো শুনতে পাও। স্থাপন করেছি দশ হাজার জিহ্বা যাতে তুমি আমার কথার জবাব দিতে পারো। তবে, আমার আরো নৈকট্যশীল বান্দা ও ভালোবাসার পাত্র হবে, যদি তুমি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পেশ করো আমার হাবীব মুহাম্মদের [সা.] উপর!”

বর্ণিত আছে, একজন সুফি-দরবেশ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বললেন: “এর মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে।” এখানে তিনি সামা’ সম্পর্কে বলেছেন। হযরত আবুল হারিস আউলাসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদা ছাদের উপর শুয়ে আছি। স্বপ্নে শয়তানকে দেখতে পেলাম। সে আউলাস শহরের একটি অট্টালিকার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডানপাশে একদল ও বামপাশে আরেকদল লোক ছিলো।

তাদের সকলের পরনে পরিষ্কার কাপড়-চোপড়। সে একটি দলকে বললো: ‘গান করো!’ তারা হেলেদুলে সুরেলা কণ্ঠে গান করলো। গানের সুর আমকে ভীতি প্রদান করলো। ভাবলাম ছাদ থেকে লাফ মারবো। সে [শয়তান] এবার [তাদেরকে] বললো: ‘নাচো!’ সুতরাং তারা খুব সুন্দরভাবে নাচতে লাগলো। এবার সে আমাকে বললো: ‘হে আবুল হারিস! তোমার নিকটস্থ হওয়ার জন্য এ থেকে আর কোনো উত্তম পথ আমি খুঁজে পাই নি!’”

হযরত আবদুল্লাহ বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “এক রাতে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলাম। একজন কাওয়াল কি একটা গাইছিলো। হযরত শিবলী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তিনি বসাবস্থায়ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। একজন প্রশ্ন করলো: ‘আবু বকর! আপনার কি হয়েছে? আপনি তে সামা’ পরিবেশনে উপস্থিত আছেন!’ তিনি ভাবোদ্দীপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবৃত্তি করলেন:

আমার মধ্যে বিরাজ করছে দু’টি প্রমত্ততা, আর আমার ফুর্তিবাজ-সাথীদের মাঝে আছে মাত্র একটি

আর এটাই তো একমাত্র জিনিস যা আমাকে সকলের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে।”

হযরত আবু আলী রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন আমি একটি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম একজন সুদর্শন যুবক জমিনের উপর পড়ে আছেন। তাকে ঘিরে রেখেছে একদল মানুষ। আমি তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে? তারা জবাব দিল: ‘এই প্রাসাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় যুবক একটি বাঁদি মেয়ের কণ্ঠে শুনতে পেলেন:

গোলামের এ সংকল্প কতো মহান যা তাকে প্রবৃত্ত করেছে তোমায় একনজর দেখতে

এটা নয় কি যথেষ্ট তার চোখের জন্য- তার পানে দৃষ্টি দেওয়া, যে ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছে তোমায়?

এরপর তিনি এতো জোরে এক চিৎকার দিলেন যে, এ থেকেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো!”

باب كرامات الأولياء

বাব কারামাতুল আউলিয়া [আউলিয়াদের কারামাত অধ্যায়]

قال الأستاذ أبو القاسم: ظهور الكرامات على الأولياء جائز. والدليل على جوازه أنه أمر موهومٌ حدوثه في العقل لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول، فواجبٌ وصفه، سبحانه، بالقدرة على إيجاده، وإذا وجب كونه مقدوراً لله، سبحانه، فلا شيء يمنع جواز حصوله.

وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله، فمن لم يكن صادقاً فظهور مثلها عليه لا يجوز. والذي يدل عليه أن تعريف القديم سبحانه إيانا، حتى نفرق بين من كان صادقاً في أحواله، وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم، ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولي بما لا يوجد مع المفترى في دعواه، وذلك الأمر هو الكرامة التي أشرنا إليها. ولا بد أن تكون هذه الكرامة فعلاً ناقضاً للعادة في أيام التكليف، ظاهراً على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله.

وتكلم الناس في الفرق بين الكرامات وبين المعجزات من أهل الحق؛ فكان الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، رحمه الله، يقول: المعجزات دلالات صدق الأنبياء، ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي، كما أن العقل المحكم لما كان دليلاً لعالم في كونه عالماً لم يوجد ممن لا يكون عالماً. وكان يقول: الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعاء، فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء فلا.

وأما الإمام أبو بكر بن فورك، رحمه الله، فكان يقول: المعجزات: بدلالات

الصدق، ثم إن ادعي صاحبها النبوة فالمعجزات تدل على صدقه في مقالته، وإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه في حلقته، فتسمى كرامة ولا تسمى معجزة وإن كانت من جنس المعجزات للفرق.

وكان رحمه الله يقول: من الفرق بين المعجزات والكرامات: أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى ذلك ويقطع القول به، والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته، لجواز أن يكون ذلك مكرراً.

وقال أوحده فنه في وقته القاضي أبو بكر الأشعري، رضي الله عنه: إن المعجزات تختص بالأنبياء، والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء ولا تكون للأولياء معجزة، لأن من شرط المعجزة اقتران دعوة النبوة بها، والمعجزة لم تكن معجزة لعينها، وإنما كانت معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة، فمتى اختل شرط من تلك الشرائط، لا تكون معجزة. وأحد تلك الشرائط: دعوة النبوة، والولي لا يدعي النبوة، فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة..

وهذا القول الذي نعتمده ونقول به، بل ندين به.

فشرائط المعجزات، كلها أو أكثرها، توجد في الكرامة إلا هذا الشرط للواحد. والكرامة فعل لا محالة محدث، لأن ما كان قديماً لم يكن له اختصاص بأحد، وهو ناقض للعادة، وتحصل في زمان التكليف وتظهر على عبد تخصيصاً له وتفضيلاً. وقد تحصل باختياره ودعائه، وقد لا تحصل له، وقد تكون بغير اختياره في بعض الأوقات، ولم يؤمر الولي بدعاء الخلق إلى نفسه ولو أظهر شيئاً من ذلك على من يكون أهلاً له لجاز.

واختلف أهل الحق في الولي: هل يجوز أني علم أنه ولي؟ أم لا؟ فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول: لا يجوز ذلك: لأنه بسلبه الخوف ويوجب له الأمن.

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه.

وهو الذي يؤثره ونقول به.

وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون كل ولي يعلم أنه ولي واجباً، ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلمه بعضهم. فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها.

وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء. بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدر عدمها في كونه ولياً. بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم معجزات؛ لأن النبي مبعوث إلى الخلق فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه؛ ولا يعرف إلا بالمعجزة.

وبعكس ذلك حال الولي؛ لأنه ليس بواجب على الخلق، ولا على الولي أيضاً، العلم بأنه ولي.

والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة.

وقول من قال لا يجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا تغيير العقابة، والذي يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق سبحانه، يزيد ويربوعلى كثير من الخوف.

وأعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة التي تظهر عليه، ولا له ملاحظة. وربما يكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة

لتحققهم أن ذلك فعل الله، فيستدلون بها على صحة ما هم عليه من العقائد.

وبالجملة، فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب، وعليه جمهور أهل المعرفة، ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء في الجملة علماً قوياً أنتفى عنه الشكرك. ومن توسط هذا الطائفة وتواتر عليه حكاياتهم وأخبارهم لم يتبق له شبهة في ذلك على الجملة. ومن دلائل هذه الجملة: نص القرآن في قصة صاحب سليمان عليه السلام. حيث قال "أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك" ولم يكن نبياً.

والأثر: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، صحيح أنه قال: يا سارية الجبل في حال خطبته يوم الجمعة، وتبلغ صوت عمر إلى سارية في ذلك الوقت حتى تحرز من مكامن العدو من الجبل في تلك الساعة.

فإن قيل: كيف يجوز إظهار هذه الكرامات الزائدة في المعاني على معجزات الرسل؟ وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء عليهم السلام؟ قيل: هذه الكرامات لاحقة بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأنكل من له بصادق في الإسلام لا تظهر عليه الكرامة. وكل نبي ظهرت كرامته على واحد من أمته فهي معدودة من جملة معجزاته؛ إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقاً لم تظهر على يد من تابعه الكرامة. فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم السلام: للإجماع المنعقد على ذلك.

وهذا أبو يزيد البسطامي سئل عن هذه المسألة فقال: مثل ما حصل
للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة، فتلك القطرة
مثل ما لجميع الأولياء، وما في الظرف مثل لبنينا صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদ: শায়খ আবুল কাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ হওয়া সম্ভব। এ সম্ভাব্যতার প্রমাণ হলো, এটা এমন জিনিস যা বুদ্ধির মানদণ্ডে ধারণার অন্তর্ভুক্ত যে, এর দ্বারা প্রাত্যহিক স্বাভাবিকতা স্থবির হয়ে যায় না। কারামাতের উৎস যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি এটা উদ্ভাবনে সক্ষম তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এটা ঘটানো মোটেই অসম্ভব নয় তাই কারামাত সত্য হওয়ার ব্যাপারটি অন্য কিছু দ্বারা রদ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যখন কারো মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ পায়, তখন বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি তাঁর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান। অপরদিকে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য সম্ভব নয়, যে [আধ্যাত্মিক অবস্থার ব্যাপারে] নিষ্ঠাহীন।

কারামাতের একটি প্রমাণ এই যে, চিরস্থায়ী মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বোধযোগ্য বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে অবগত করেছেন, এটা এমন জিনিস যা [আমাদের বুদ্ধির মাধ্যমে] ধারণাযোগ্য। ফলে আমরা যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও যে তা নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম। আল্লাহর বন্ধুজনকে তাই এমন কিছু সামর্থ্য দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন ভণ্ড ব্যক্তিকে দেওয়া হয় নি। আর এটাই হলো কারামাত যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি।

কারামাত হতে হবে এমন জিনিস যার স্থায়ীত্বকাল স্বাভাবিকতাকে পরিবর্তন করে দেবে [’আদা], যখন [ঐশি নির্দেশকৃত] ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা [তাকলিফ] অক্ষুণ্ন থাকবে। কারামাত প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ওলায়তকে সত্যায়িত করে। আহলে হাক্ব ব্যক্তিগণ ওলিদের কারামাত ও নবীদের কর্তৃক প্রদর্শিত মু’জিযার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ইমাম আবু ইসহাক ইসফারাইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে মতামত পেশ করেন যে, নবীদের মু’জিযা দ্বারা নবী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এটা শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুরূপ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যখন সদগুণাবলীর

বিকাশ ঘটে তখন শিক্ষিত হওয়ার প্রমাণ মিলে; যে শিক্ষিত নয় তার মধ্যে অনুরূপ সদগুণাবলী মিলবে না। তিনি [হযরত ইসফারাইনী] আরো শিক্ষা দিতেন, আউলিয়াদের কারামাত হলো কারো দু'আর ফলাফল [ইযাবাতাদ দাওয়া]। অন্যদিকে নবী-রাসূলদের মু'জিয়ার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবু বকর ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মতামত পেশ করতেন, নবী-রাসূলদের মু'জিয়া হলো সত্যবাদিতার প্রমাণ। তাঁর কথায়, যখন কোনো মু'জিয়া প্রকাশক নবুওয়াতের দাবী করেন, নবুওয়াতের মু'জিয়া তখন দাবীদাদের সত্যসিদ্ধতার প্রমাণ করে। অপরদিকে যখন কারামাত প্রকাশক ওলায়াতের দাবী করেন, কারামাত শুধুমাত্র দাবীদাদের আধ্যাত্মিক স্তরের প্রমাণ করে। এজন্য একে 'কারামাত' বলে, 'মু'জিয়া' বলে না। যদিও আগের শব্দটি পরেরটির সাথে সামর্থ্যবোধক কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো মন্তব্য পেশ করেছেন যে, নবী-রাসূলদের কর্তৃক প্রদর্শিত অতিস্বাভাবিক ঘটনা আর ওলিদের কর্তৃক প্রকাশিত অনুরূপ ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো: নবীদেরকে তা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো। আর ওলিরা তা গোপন রাখা জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [মু'জিয়ার ও তাঁর নবুওয়াতের] দাবী করেছেন এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলেছেন। অপরদিকে আল্লাহর বন্ধুজন এর উপর [অর্থাৎ, কারামাতের উপর] দাবী করেন না। না তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় [তার কারামাত হওয়া সম্পর্কে] কথা বলেন। কারণ এটা সম্ভাব্য যে, এই কারামাত [আল্লাহর পক্ষ থেকে] একটি পরীক্ষাও হতে পারে।

কাজী হযরত আবু বকর আশআরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে তাঁর যুগের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মতামত পেশ করেন: নবী-রাসূলদের মু'জিয়া হলো নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যাপার। অপরদিকে আউলিয়াদের কারামাত হলো আল্লাহর বন্ধুজনদের অধিকারভুক্ত ব্যাপার। ওলিরা নবীদের মু'জিয়া প্রদর্শনে অপারগ। কারণ মু'জিয়ার একটি শর্ত হলো, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে নবুওয়াত। মু'জিয়া নিজে নিজে প্রকাশ হতে পারে না। বেশ কিছু সংজ্ঞার মানদণ্ডে এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে। এসব সংজ্ঞার মধ্যে একটির মানদণ্ডেও না ঠিকলে, একে নবী-রাসূলদের মু'জিয়া হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না। আর এমন একটি মানদণ্ড হলো নবুওয়াতের দাবী। আউলিয়াগণ এই দাবী

কখনো করতে পারবেন না। সুতরাং তাদের মধ্যমে যা-ই প্রদর্শিত হোক না কেনো, তা কখনো মু'জিয়া হিসাবে গণ্য হবে না। এই তত্ত্বের উপর আমরা নির্ভরশীল, এটাই শিক্ষা দেই এবং বিশ্বাস করি। এই একটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছাড়া আউলিয়াদের কারামাত ও নবী-রাসূলদের মু'জিয়ার মধ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। আউলিয়াদের মু'জিয়া নিঃসন্দেহে একটি উদ্ভাবকমূলক ঘটনা [মুহদাত]। কারণ যাকিছু চিরন্তন তা [সৃষ্ট বস্তুর সাথে] আরোপ করা যাবে না। এ কার্যটি হলো বস্তুর প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিকতা ব্যাহতকরণ। ধর্মীয় আইন-কানুন [শরীয়ত] চলন্ত থাকাবস্থায় এটা সংঘটিত হয়। এটা প্রদর্শিত হয় আল্লাহর ওলির মাধ্যমে, তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদার প্রমাণ হিসাবে। হতে পারে এই কারামাতের প্রকাশ তাঁর ইচ্ছা ও দু'আর কারণে, কিন্তু তা প্রকাশ না-ও পেতে পারে। সময় সময় এটা তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছাড়াই প্রকাশ পেতে পারে। আল্লাহর ওলিদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, তোমরা মানুষকে [দ্বীনের প্রতি] ডাক দাও। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি কোন ব্যক্তিকে কারামাত দান করেন যা তার প্রাপ্য, তাহলে এটা [দ্বীনের প্রতি ডাক দেওয়া] সম্ভব হয়ে যায়।

মুহাক্কিক ব্যক্তিদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে যে, কেউ কি আল্লাহর ওলি, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই জানা বৈধ [সম্ভব] কি না। ইমাম আবু বকর বিন ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তা বৈধ [সম্ভব] নয়। কারণ এর দ্বারা তিনি আল্লাহভীতির অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হবেন এবং তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন মনে করবেন। কিন্তু, শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তা বৈধ [সম্ভব]। আমরা তাঁর মতামতের উপর অগ্রাধিকার দেই ও তার অনুমোদন করি। তবে, এ অবস্থা অবশ্যই সকল অলিআল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, সবাই বুঝতে সক্ষম হবেন না যে, তারা আল্লাহর বন্ধুজন। কিছু ব্যক্তি তা জানতে পারবেন আর কিছু ব্যক্তি জানবেন না। যদি কেউ জানতে সক্ষম হন যে, তিনি আল্লাহর বন্ধু- তাহলে বুঝতে হবে এটাও একটি কারামাত যা তাঁর জন্য খাস।

যদি আল্লাহর কোনো ওলির মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ পায় তাহলে এটা জরুরী হয়ে ওঠেনা যে, আল্লাহর সকল ওলির মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ হতে হবে। এছাড়া, যদি কোনো আল্লাহর ওলির জীবনেও একটি মাত্র কারামাতও প্রকাশ না পায় তাহলে এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, তিনি আল্লাহর ওলি নন।

অপরদিকে নবী-রাসূলদের ব্যাপারটি ভিন্ন। তাঁদের দ্বারা অবশ্যই মু'জিয়া প্রকাশ পাবে। কারণ নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয় মানুষের নিকট যারা নিশ্চিত হতে হবে যে, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। একমাত্র মু'জিয়া দ্বারা এটা প্রমাণ করা সম্ভব। অপরদিকে আউলিয়াদের ব্যাপারটি এর বিপরীত। নিজে কিংবা তাঁর চতুর্পাশ্বস্ত মানুষকে জানার প্রয়োজন নেই যে তিনি আল্লাহর ওলি।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবী তাঁকে বিশ্বাস করেছেন যখন তিনি বললেন, তাঁরা সকলে জান্নাতে যাবেন। যারা মনে করেন, [ওলি হওয়া জানা] সম্ভব বা বৈধ নয় এবং তারা কারণ হিসাবে আল্লাহভীতি থেকে মুক্ত হওয়া বলেন, তাদের জবাবে বলা যায়, আসলে তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যাদেরকে অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে তারাও আল্লাহ ভীতিতে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা রোজ হাশরের দিন তাঁর নির্দেশকে পরিবর্তন করতেও পারেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আতঙ্কবোধ, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁদের হৃদয়ে শুধু বেড়ে ওঠলো। ফলে তাঁর প্রতি ভয় শতগুণ বৃদ্ধি পেলো। জানা থাকা দরকার, কোনো কারামাতের উপর ভরসা করে আল্লাহর ওলিকে কখনো আস্থাশীল হতে নেই। বরং এর প্রতি ভ্রমোৎসর্গ করা উচিত নয়। যখন তাঁরা [আউলিয়ায় কিরাম] তাঁদের মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় [বাসিরা], কারণ তাঁরা জানেন, এই কার্যটি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাঁরা এ থেকে প্রমাণ পান যে, তাঁদের ধর্মিকতা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

মোটকথা, অলিদের কর্তৃক কারামাত প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এটাই অধিকাংশ আহলে মা'রিফাত ব্যক্তিদের মতামত। আল্লাহর ওলিদের কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের কারামাতের অসংখ্য সহীহ বর্ণনা হেতু, সকলের নিকট এর বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যে কেউ কোনো সুফির সুহবত লাভ করেছেন এবং এসব কারামাতের বর্ণনা শুনেছেন তাদের মধ্যে এগুলো সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনেও এর প্রমাণ বিদ্যমান। হযরত সুলাইমান আলাইহিসসালামের এক সাথীর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

অর্থাৎ: “কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।” [নামল : ৪০]

এখানে উল্লেখ্য, সুলাইমান আলাইহিসসালামের সাথী [বা সভাসদ] নবী ছিলেন না [অধিকাংশ তাফসিরবিদ বলেছেন, উক্ত সাথীর নাম ছিলো আসাফ বিন বারাখিয়া। তিনি বাদশা সুলাইমান আলাইহিসসালামের একজন বিশৃঙ্খল মন্ত্রী ছিলেন।]।

হযরত উমর ইবনে খাতাব রাডিআল্লাহু আনহু সম্পর্কিত মশহুর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি একদা মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবার সময় হঠাৎ বললেন: “হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে [খেয়াল রেখো]!” ঠিক এ মুহূর্তে তাঁর এই শব্দগুলো সিরিয়ায় যুদ্ধরত সেনাপতি সারিয়ার কানে পৌঁছে গেল। তিনি তখন পাহাড়ের দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হতে সমগ্র সৈন্যদেরকে রক্ষার ব্যবস্থা নেন।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন: ‘এটা কিভাবে সম্ভব যে, আউলিয়াদের কোন কোন কারামাত নবীদের মু’জিয়া থেকে বড় হতে পারে? তাহলে কি আউলিয়াদের মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশি হয়ে যায় না?’ এ প্রশ্নগুলোর জবাবে বলা যায়, ‘ওলিদের এসব কারামাত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলায় সংঘটিত হয়। কারণ, কেউ যদি দ্বীনের উপর সত্যবাদী ও প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তার মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ সম্ভব নয়। অনুরূপ আগের যুগের প্রত্যেক নবীর উম্মতদের মধ্যে যারা কারামাত প্রদর্শনের যোগ্যতা লাভ করেছেন তা মূলত ঐ নবীর শরীয়ত অনুসরণ ও ওসিলার ফসল। অন্য কথায়, যতো কারামাতই প্রকাশ হোক না কেনো তা প্রকারান্তরে নবীদেরই কারামাত। যদি এ রাসূলগণ সত্যবাদী না হতেন তাহলে তাঁর অনুসরণকারীদের কেউই কারামাত প্রদর্শনে সমর্থ হতেন না। আর ওলিদের স্তর অবশ্যই নবী আলাইহিমুসসালামদের তুলনায় অনেক নিম্নে। এ ব্যাপারে [ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে] মতৈক্য হয়েছে। হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বললেন: “নবীরা [আলাইহিমুসসালাম] যা প্রাপ্ত হয়েছেন তাহলো চামড়ার তৈরি পানির পাত্রভর্তি মধু থেকে একটি মাত্র ফোটা। আর যাকিছু সকল আউলিয়ায়ে কিরাম প্রাপ্ত হয়েছেন তা এই ফোটার সমপরিমাণ

রিসালাতুল কুশাইরী (রাহ.)

[ঔশি জ্ঞান] মাত্র। পুরো পাত্রে বাকী যা থেকেছে, তা সবই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

الكرامات

আল-কারামাত

قد تكون إجابة دعوة، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظهار، أو حصول ماء في زمان عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصاً من عدو، أو سماع خطاب من هاتف، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة.

وأعلم أن كثيراً من المقدورات يعلم اليوم قطعاً أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء؛ وبضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك، فمنها حصول إنسان لا من أبوين، وقلب جمادٍ بهيمة أو حيواناً، وأمثال هذا كثير.

অনুবাদ: ওলিদের এসব কারামাত দু'আর বিনিময়ে আসতে পারে। যেমন, প্রয়োজনের সময় দৃশ্যত কোনো উপায় ছাড়াই খাবার আসা; কিংবা অনাবৃষ্টির সময় আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ; অথবা কাউকে অতি অল্প সময়ে বিরাট দূরত্বে ভ্রমণ; কিংবা কোনো শত্রুর কবল থেকে [অলৌকিকভাবে] পলায়ন; অথবা অদৃশ্য কারোর কণ্ঠের কথা শ্রবণ করা এবং অন্যান্য কিছু ঘটনা সংঘটিত হওয়া যা প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিকতার বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়।

জেনে রাখুন, আজ এটা সুস্পষ্টভাবে এবং নির্ধাৎ জানা বিষয় যে, অসংখ্য ব্যাপার আছে যা আল্লাহ তা'আলা পূর্বনির্ধারণ করে রেখেছেন। এগুলোর মধ্যে অনেকটি আছে যা কখনো যে কোন পরিস্থিতিতেই ওলিদের কারামাত হিসাবে [দৃশ্যত অসম্ভব ঘটনা] প্রকাশ পাবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়: স্বামী-স্ত্রী ছাড়া মানবসন্তানের জন্ম হওয়া, কোন জড় পদার্থ প্রাণী বা জন্তুতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি।

فصل

ফাসল [পরিচ্ছেদ] -১

فإن قيل الولي قيل: يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فغيلاً مبالغة من الفاعل؛ كالعليم، والقدير غيره، فيكون معناه: من توالى طاعته من غير تخلل معصية.

ويجوز أن يكون فغيلاً بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولى الحقّ، سبحانه، حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، قال الله تعالى: "وهو يتولى الصالحين".

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “আল্লাহর বন্ধু তথা ‘ওয়ালি’ কথাটির অর্থ কি?” তাঁরা [সুফিরা] জবাবে বলেন: দু’টি সম্ভাবনা আছে। প্রথমটি হলো: এটা [কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়াপদের রীতিতে সৃষ্ট] ‘ফা’ইল’ হতে পারে, তার অর্থের মধ্যে তীব্রতাবর্ধন আনয়নের [কর্তৃবাচ্য বিশেষণ] ‘ফা’ইল’ হিসাবে। যেমন, ‘আ’লিম’ [অতি জ্ঞানসম্পন্ন], ‘ক্বাদির’ [অতি ক্ষমতাসম্পন্ন] ইত্যাদি শব্দ। এ ক্ষেত্রে [ওয়ালি শব্দের] অর্থ দাঁড়ায়: ‘সেই ব্যক্তি যার ধর্মীয় আমলসমূহ একের পর এক সংঘটিত হয় সকল ধরনের অবাধ্যতা দ্বারা বাধামুক্ত অবস্থায়।’ দ্বিতীয়টি হলো: এটাও সম্ভব যে শব্দটি [সৃষ্ট হয়েছে] সেই ‘ফা’ইল’ এর রীতিতে যাতে [কর্তার] অসাড়তার [বা কর্মবাচ্যতা] প্রতি জোর দেওয়া হয়। যেমন, শব্দ ‘ক্বাতিল’ [হত্যা] ‘মাক্বতুল’ [যাকে হত্যা করা হলো] অর্থে; কিংবা ‘জারিহ’ [আহত] ‘মাজরুহ’ [যাকে আহত করা হলো] অর্থে। অর্থাৎ ‘ওয়ালি’ তিনি, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা সর্বকালের জন্য তাঁর নিরাপত্তা [ইয়াতাওয়াল্লা] ও যত্নের ভার নিরবচ্ছিন্নভাবে [‘আলাত তাওয়ালি] গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা তার [ওয়ালির] জন্য কোন ‘পরিত্যাগ’ [খিদ্দলান] সৃষ্টি করেন নি, যার ফলে তার মধ্যে কোনো ‘অবাধ্যতা’র ক্ষমতা থাকতে পারে। বরং তাঁর বন্ধুর প্রতি তাঁর সহযোগিতাদান নিরবচ্ছিন্ন।

ফলে তিনি [ওয়ালি] সর্বদাই আনুগত্যশীল থাকার যোগ্যতা লাভ করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

অর্থাৎ: “তিনি [আল্লাহ] তাঁর নিরাপত্তায় [ইয়াতাতওয়াল্লা] নিয়ে যান সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে [সালিহীন]।” [আরাফ : ১৯৬]

ফصل

ফাসল [পিরচ্ছেদ] -২

فإن قيل: هل يكون الولي معصوماً قيل: أما وجوباً، كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصير على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات، فلا يمتنع ذلك في وصفهم.

ولقد قيل للجنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فاطرق ملياً، ثم رفع رأسه وقال: "وكان أمر الله قدراً مقدوراً".

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “আল্লাহর কোনো ওয়ালি ‘মাসুম’ হতে পারেন নি?”, তাঁরা [সুফিরা] জবাব দেন: “যদি এর [মাসুম হওয়া] দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে ‘অপরিহার্যতা এবং বাধ্যবাধকতা’ যেমনটি প্রযোজ্য নবীদের ক্ষেত্রে, তাহলে জবাব হলো, না। অপরদিকে যদি এর দ্বারা কেউ এটা বুঝাতে চান যে, তাঁরা [ওয়ালিরা] ঐশিভাবে নিরাপত্তা লাভ করেন এবং পাপকার্য থেকে বিরত থাকতে অটল, তাহলে যদিও তারা সময় সময় ছোটখাটো গুনাহ, ব্যর্থতা, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদিতে জড়িত থাকতে পারেন, তথাপি এরূপ [মাসুম হওয়ার মতো] গুণাবলী তাঁদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।” এক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলো: ‘হে আবুল কাসিম! মা’রিফাতপন্থী কেউ জিনা করতে পারে কি?’ তিনি [জুনাইদ রাহ.] মাথা নত করে অনেক্ষণ নীবরে বসে রইলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করে বললেন:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

-“আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।” [সূরা আহযাব : ৩৮]

فصل

ফাসল [পিরচ্ছেদ] ৩-

فصل فإن قيل: هل يسقط الخوف عن الأولياء قيل: أما الغالب على الأكابر فكان الخوف، وذلك الذي قلنا فيما تقدم على جهة الندره غير ممتنع، وهذا السري السقطي يقول: لو أن واحداً دل بستاناً فيه أشجار كثيرة وعلى كل شجرة طير يقول له بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله. فلو لم يخف أنه مكرٌ لكان ممكوراً وأمثال هذا من حكاياتهم كثيرة.

অনুবাদ: কেউ যদি প্রশ্ন করেন: “আল্লাহর ওয়ালিদের মধ্য থেকে খোদাভীতি উঠে যেতে পারে কি?”, তাদের পক্ষ থেকে [উচিৎ] জবাব হবে: “তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী ভয় বিদ্যমান। অথচ পূর্বে আমরা এ ব্যাপারে যা বলেছি তা অসম্ভব, তা কিস্তি নয়, যদিও খুব বিরল। হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: “কেউ যদি অসংখ্য বৃক্ষে পরিপূর্ণ কোনো বাগানে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি বৃক্ষে একেকটি পাখি [তাকে স্বাগত জানাতে] সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় বলে ওঠে: ‘আসসালামু আলাইকুম, ইয়া ওয়ালিআল্লাহ!’। এতে যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে এই ভীতি সৃষ্টি না হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা কোনো চাতুরি [মাক্র - অর্থাৎ সে ওয়ালি হয়ে গেছে, এরূপ ভাবনা আসা] নয়, তাহলে সে তো ধোঁকায় পড়েই গেলো।” সুফি সম্প্রদায় থেকে এরূপ অনেক কাহিনী শুনা যায়।

فصل

ফাস্‌ল [পিরচ্ছেদ] -৪

فإن قيل: رؤية الله سبحانه هل تجوز رؤية الله سبحانه على جهة الكرامة بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة؟ فالجواب عنه: أن الأقوى فيه أنه لا يجوز؛ لحصول الإجماع عليه، ولقد سمعت الإمام أبا بكر بن فورك، رضي الله عنه، يحكى عن أبي الحسن الأشعري أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير.

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “আউলিয়াদের কারামাতের মাধ্যমে ইহজগতে থাকাকালে আল্লাহর দর্শন লাভ কি কখনো সম্ভব?” জবাব হলো: অধিকাংশ মতে এটা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমি [ইমাম কুশাইরি বলেন] ইমাম আবু বকর বিন ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে শ্রবণ করেছি যে, ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে দু’টি মতামত পেশ করেছেন, ‘আল্লাহর দর্শন’ সম্পর্কিত তাঁর প্রণীত একটি বড় গ্রন্থে।

فصل

ফাস্‌ল [পিরচ্ছেদ] -৫

فإن قيل: تغير حال الولي هل يجوز أن يكون ولياً في الحال ثم تتغير عاقبته قيل: من جعل من شرط الولاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك. ومن قال: إنه في الحال مؤمن على الحقيقة وإن جاز أن يتغير حاله بعد لا يبعد أن يكون ولياً في الحال صديقاً، ثم يتغير، وهو الذي نختاره. ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولي أن يعلم أنه مأمون العاقبة، وأنه

لا تتغير عاقبته، فتلتحق هذه المسألة بما ذكرنا أن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي.

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “এটা কি সম্ভব যে, এখন কোনো এক ব্যক্তি আল্লাহর ওয়ালি আছেন, কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি আর ওয়ালিআল্লাহ থাকতে না-ও পারেন?” তাঁরা জবাবে বলেন: “যারা ভাবেন, কারো জীবনের সফলতা অর্জন ওয়ালি হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে একটি তাহলে তাঁরা এটা গ্রহণ করেন না।” অন্যদিকে অপর একদল এ মর্মে তর্ক করেন যে, কেউ বর্তমানে সত্যিকার ঈমানদার হতে পারে, যদিও পরবর্তীতে কারো অবস্থা বদলে যেতেও পারে। সুতরাং, এটা অসম্ভব নয় যে, বর্তমানে কেউ সত্যিকার ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর ওয়ালি আছেন, তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। আমরা এই মতামতকেই বেছে নিয়েছি। আল্লাহর ওয়ালির কারামাতের মধ্যে এটাও সম্পৃক্ত থাকা সম্ভব যে, আল্লাহ তা’আলা ওয়ালিকে আখিরাতের জীবনে তাঁর দয়ার অন্তর্ভুক্ত রাখার কথা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞাত করে রাখেন। এই বিষয়টি ‘আল্লাহর ওয়ালি হওয়া’ জানার ব্যাপারে আলোচনাকালে ইতোমধ্যে আমরা যা বলেছি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ALL RIGHTS RESERVED

فصل

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

ফাস্ল [পিরচ্ছেদ] -৬

فإن قيل: هل يزايل الولي خوف المكر قيل: إن كان مصطلاً عن شاهده، مختطفاً عن إحساسه بحالة فهو مستهلك عنه فيما استولى عليه، والخوف من صفات الحاضرين بهم.

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “আল্লাহর কোনো ওয়ালির মধ্য থেকে ‘ঐশি মাকর’ [পরীক্ষার জন্য খোদায়ী চাতুরি] এর ভয় নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?” তাঁরা জবাবে বলেন: “যখন তাকে তার পরিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্ত করা হয়, তার চেতনা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তার রুহানী স্তর দ্বারা ইন্দ্রিয়াপোলক্কি সরিয়ে নেওয়া হয়, যা তাকে দখল করে নিয়েছিল তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নেয়

তার সবকিছু [তখন এ ভয় বিলীন হয়]। কারণ ভয় হলো যারা উপস্থিত [চেতনাশীল] তাদের একটি বৈশিষ্ট্য।’

ফصل

ফাস্‌ল [পিরচ্ছেদ] - ৭

فإن قيل: ما الغالب على الولي في صحره قيل: صدقه في لأداء حقوقه، سبحانه، ثم رفعه على الخلق في جميع أحواله. ثم انبساط رحمته لكافة الخلق. ثم دوام تحمله عنهم بجميل الخلق. وابتدائه لطلب الإحسان من الله عزّ وجلّ إليهم من غير التماس منهم. وتعليق الهمة بنجاة الخلق، وترك الانتقام منهم، والتوقي عن استئثار حقد عليهم مع قصر اليد عن أموالهم، وترك الطمع بكل وجه فيهم، وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم، والتصاون عن شهود مساو بهم، ولا يكون خصماً لأحد في الدنيا ولا في الآخرة. *Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

واعلم أنّ من أجلّ الكرامات التي تكون للأولياء: دوام التوفيق للطاعات، والعصمة عن المعاصي والمخالفات، ومما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات على الأولياء قوله، سبحانه، في صفة مريم عليها السلام ولم تكن نبياً ولا رسولا: " كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا . وكان يقول: " أنى لك هذا؟ " فتقول مريم: " هو من عند الله . " وقوله سبحانه: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " وكان في غير أوان الرطب، وكذلك قصة أصحاب الكهف والأعاجيب التي

ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك، ومن قصة ذي القرنين وتمكينه سبحانه له ما لم يمكن لغيره، ومن ذلك ما أظهر على يدي الخضر عليه السلام من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيب، ومن كان يعرفه مما خفي على موسى عليه السلام. كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الخضر عليه السلام بها، ولم يكن نبياً، وإنما كان ولياً.

ومما روي من الأخبار في هذا الباب حديث جريج الراهب؛ أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايني قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا عمار بن رجا قال: حدثنا وهب بن جريز قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عوانة: وحدثني الصنعاني، وأبو أمية قال: حدثنا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصبي في زمن جريج، وصبي آخر؛ فأما عيسى فقد عرفتموه. وأما جريج فكان رجلاً عابداً في بني إسرائيل. وكانت له أم. فكان يوماً يصلي إذا اشتاقت إليه أمه. فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، الصلاة خير أم آتيها؟ ثم صلى. فدعته، فقال مثل ذلك. ثم صلى. فاشتد على أمه. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت زانية في بني إسرائيل، فقالت لهم: أنا أفتن جريجاً حتى يزني؛ فأتته، فلم تقدر على شيء. وكان راع يأوي بالليل إلى أصل صومعته، فلما أعيها راودت الراعي على نفسها؛ فأتاها، فولدت، ثم قالت: ولدي هذا جريج. فأتاه بنو إسرائيل، وكسروا صومعته، وشتموه، ثم صلى ودعا، ثم نحس الغلام.

قال محمد قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين

قال بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعي؛ فندموا على ما كان منهم، واعتذروا إليه، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب - أو قال: من فضة - فأبى عليهم، وبنّاها كما كانت..

وأما الصبي الآخر فإن امرأة كان معها صبي لها ترضعه، إذ مرَّ بها شاب جميل الوجه، ذو شارة، فقالت: اللَّهُمَّ اجعل ابني مثل هذا، فقال الصبي: اللَّهُمَّ لا تجعلني مثله..

قال محمد: قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحكي الغلام وهو يرضع ثم مرت بها أيضاً امرأة ذكروا أنها سرت، وزنت، وعوقبت، فقالت: اللَّهُمَّ لا تجعل ابني مثل هذا!! فقال: اللَّهُمَّ اجعلي مثلها...

فقالت له أمه في ذلك، فقال: إن الشاب جبار من الجبابرة، وإن هذه المرأة قيل: إنها زنت ولم تزن، وقيل: سرت ولم تسرق، وهي تقول: حسبي الله "

وهذا الخبر روي في الصحيح، ومن ذلك حديث الغار، وهو مشهور مذكور في الصحاح.

অনুবাদ: যদি কেউ প্রশ্ন করেন: “আত্মনিয়ন্ত্রণের অবস্থায় আল্লাহর ওয়ালিদের মধ্যে কোন্ জিনিসটি প্রভাবশীল থাকে?” তাঁরা বলেন: [প্রথমত] আল্লাহ তা’আলার আইন-কানুন মানায় অটল থাকা, তারপর সর্বাবস্থায় অন্যদের প্রতি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন এবং করুণাশীল থাকবেন। তারপর পুরো মানবজাতির প্রতি তার দয়ামায়া বিস্তৃত হবে, সকলের প্রতি সদাধৈর্য ও নম্র থাকবেন। তিনি সকলের প্রতি হিতসাধনের লক্ষ্যে সর্বদাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলার দরবারে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করবেন, একই সময় এর বিনিময়ে তাদের থেকে কোনো ফায়দা কামনা থেকে বিরত থাকবেন। তিনি তাঁর রূহানী শক্তি [হিমাতে] মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োগ করবেন এবং নিজে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণে

অগ্রসর হবেন না। আল্লাহ তা'আলার কোনো জীবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে তিনি বিরত থাকবেন। তাদের বিষয়-সম্পদ থেকে তার হাত দূরে থাকবে। কোনো ভাবেই লোভ-লাসসা তাঁর মধ্য থেকে প্রকাশ পাবে না। তাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা, গীবত ইত্যাদি তাঁর জিহ্বা থেকে বের হবে না। তিনি অপরের ব্যর্থতার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন এবং কারো প্রতি দুঃখিত হবেন না দুনিয়া ও আখিরাতে।’

জেনে রাখুন, ওয়ালিদের সর্বাধিক বৃহৎ কারামাত হলো, আল্লাহর আনুগত্যতার নেক আমল করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য লাভ এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মে জড়িত হওয়া ও তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকেই তত্ত্বাবধান পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ।

আউলিয়াদের কারামাত সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের প্রমাণসমূহের মধ্যে একটি হলো বিবি মারইয়াম সম্পর্কে তাঁর কালামে উল্লেখিত একটি আয়াত। জানা থাকা দরকার বিবি মারইয়াম নবী কিংবা রাসূল ছিলেন না। তিনি ইরশাদ করেন:

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

অর্থাৎ: “যখনই যাকারিয়া মিস্রাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন।” [আলে ইমরান : ৩৭] তিনি [হযরত যাকারিয়া] তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন:

قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا

অর্থাৎ: “হে মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?” তিনি জবাব দিতেন:

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

অর্থাৎ: “এটা আল্লাহর নিকট থেকে।”

আল্লাহ তা'আলার কালামে অপর আরেক প্রমাণ মিলে। তিনি [হযরত মারইয়ামকে] বললেন:

وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ بِحُذُوعِ النَّحْلَةِ تُسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا

অর্থাৎ: “আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।” [মারইয়াম : ২৫]

এসময় খেজুর ফলের মাওসুম ছিলো না। অনুরূপ গুহার ভেতর ঘুমন্ত যুবকদের কথা ও তাঁদের সম্পর্কিত কারামাতের ঘটনাবলীর বর্ণনা- যেমন, কুকুরের সাথে কথোপকথন ইত্যাদিও কুরআনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য [কুরআন: সূরা কাহফ : ৯-২৭]। হযরত যুলকারনাইন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বর্ণনাও একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত [কুরআন: সূরা কাহফ : ৮৩-৯৮]। আল্লাহ তা’আলা তাঁকে এমন ক্ষমতাবান করেছিলেন যা অন্য কাউকে করেন নি। একই শ্রেণীভুক্ত আরেকটি বর্ণনা হলো হযরত খিদ্দির আলাইহিসসালাম কর্তৃক সম্পাদিত কিছু কারামাত। হযরত মূসা আলাইহিসসালামের নিকট এগুলো গোপন থাকাও একই শ্রেণীভুক্ত বর্ণনা [কুরআন : সূরা কাহফ : ৬৫-৮২]।

হযরত খিদ্দির আলাইহিসসালাম কর্তৃক সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ডই ছিলো প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি কোনো নবী ছিলেন না। শুধুমাত্র আল্লাহর একজন ওয়ালি ছিলেন [অবশ্য কোনো কোনো আলিম তাঁকে নবী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন]।

এ সম্পর্কিত হাদিস শরীফে জুরাইয নামক এক ইয়াহুদি আলিমের বর্ণনা আছে। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “মাত্র তিন ব্যক্তি দোলনায় থাকাবস্থায় কথা বলেছেন: ঈসা ইবনে মারইয়াম; জুরাইযের সময় এক শিশু ও অপর আরেকজন।

ঈসা [আলাইহিসসালাম] সম্পর্কে তুমি ইতোমধ্যে জেনেছো। আর জুরাইয ছিলেন ইসরাঈলের বংশধরদের মধ্যে একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তার একজন মাতা ছিলেন। একদিন তিনি [জুরাইয] প্রার্থনা করছিলেন। তার মাতা তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠলেন। সুতরাং তিনি তাকে ডাক দিলেন: ‘জুরাইয!’ ডাক শুনে জুরাইয [আল্লাহকে ডেকে] জিজ্ঞেস করলেন: ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনার ইবাদতে মশগুল থাকা, না আমার মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া উত্তম?’ [কোনো জবাব না পেয়ে] এরপর তিনি উপাসনায় মশগুল থাকলেন। এদিকে তার মাতা পুনরায় ডাক দিলেন। তিনি একই প্রশ্ন করলেন আল্লাহর দরবারে এবং ইবাদতে মশগুল রইলেন। তার মাতা সহ্য করতে না পেরে এবার বললেন: ‘হে আল্লাহ! পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে এর মৃত্যু দিও না!’

ইসরাঈলের বংশধরদের মধ্যে একজন পতিতা নারী ছিলো। সে বললো: ‘আমি জুরাইযকে প্রলোভিত করবো। তাতে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন।

সে তখন জুরাইযের নিকটবর্তী হলো কিন্তু কিছুই পারলো না। জুরাইযের নির্জন উপাসনালয়ের নিকটে একজন মেমপালক থাকতেন। জুরাইযকে আকর্ষিত করতে ব্যর্থ হয়ে পতিতা নারী এই মেমপালকের কাছে যেয়ে তাকে প্রলোভিত করলো। এতে মেমপালক ফাঁদে পড়ে গেলো। এ থেকে পতিতা মহিলা এক ছেলে শিশুর জন্ম দিল। সে প্রচার করলো: ‘এই শিশুর পিতা জুরাইয!’।

ইসরাঈলের বংশধরগণ ছুটে এলো। জুরাইযের উপাসনালয় ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে তাকে তিরস্কার করলো। জুরাইয আল্লাহর দরবারে দু’আ করলেন। এরপর ঐ নবজাতক শিশুকে তার হাত দ্বারা ঘৃষি মারলেন।”

মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তার হাত দ্বারা’, আমি তখন তাঁর মুখ মুবারকের দিকে তাকাচ্ছিলাম।’ তারপর তিনি [রাসূলুল্লাহ সা.] বললেন, জুরাইয জিজ্ঞেস করলেন: ‘হে ছেলে! বল্ তোরা বাবা কে?’ নবজাতক ছেলেটি জবাব দিল: ‘ঐ মেমপালক!’ [একথা শুনে ইসরাঈলের বংশধররা] তারা যা করেছে তাতে লজ্জিত হলো এবং জুরাইযের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং বললো: ‘হে জুরাইয! আপনার জন্য আমরা স্বর্ণ দ্বারা উপাসনালয় নির্মাণ করবো।’- অথবা তারা বলেছিলো, ‘রৌপ্য দ্বারা’। কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি জানালেন। নিজের পূর্বকার নির্জন উপাসনালয় আবার নির্মাণ করলেন।

অপর যে শিশুটি [দোলনায় থেকে] কথা বলেছিল, সে ছিলো একজন মহিলার দুধের শিশু। একদিন খুব সুদর্শন ও উজ্জ্বল বর্ণের একজন যুবক মহিলাটির পাশদিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো: ‘ও আমার প্রভু! আমার শিশুটিকে তার মতো করুন!’। মহিলার দুধের শিশু তখন বলে ওঠলো: ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ লোকটির মতো করো না!’। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাচ্ছিলাম যখন তিনি এই দুধের শিশুর কথাটি উচ্চারণ করছিলেন। তিনি [রাসূলুল্লাহ সা.] বলতে থাকেন: এরপর ঐ মহিলার পাশকেটে একজন নারী যাচ্ছিলো যাকে চুরি ও ব্যভিচারের দায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এবার মহিলা দু'আ করলেন: ‘হে প্রভু! আমার শিশুকে এরূপ করো না!’ সাথে সাথে দুধের শিশু বলে ওঠলো: ‘হে প্রভু! আমাকে এই মহিলার মতোই করো!’। পরে শিশুটির মাতা [উক্ত] উভয় ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞাত হলো। সুদর্শন যুবক আসলে একজন জালিম ব্যক্তি ছিল। অপরদিকে যে নারীকে তারা ব্যভিচারী ও চোর বলে সাব্যস্ত করেছিল ও শাস্তি দিয়েছিলেন সে কিন্তু নির্দোষ ছিলো। এরপর শিশুর মাতা বার বার বলতে থাকে: ‘আল্লাহ তা’আলাই আমার জন্য যথেষ্ট!’” এই ঘটনাটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। [হাদিসটি বুখারী শরীফেও লিপিবদ্ধ হয়েছে]

فصل

Khanqa-e-Aminia-Asgaria

ফাস্‌ল [পিরছেদ] -b Centre, Subidbazar, Sylhet

أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عون، وزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وعبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي، وأبو الخصيب بن المستنير المصيبي قالوا: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، فأواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار. فقالوا: إنه والله كان من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم؛ فقال رجل منهم: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها أهلاً ولا مالاً، فعاقني طلب الشجرة يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فجئتهما به.. فوجدتهما نائمين.. فتخرجت أن أوقظهما، وكهرت أن أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فقمت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهم حتى

برق الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما، اللَّهُمَّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الخروج منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللَّهُمَّ إنه كان لي بنت عم، وكانت أحب الناس إليّ، فراودتها عن نفسها، فامتنعت، حتى أملت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت.. حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه!! فتخرجت من الوقوع عليها.. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ.. وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللَّهُمَّ، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، حين أنه لا يستطيعون الخروج منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال الثالث: اللَّهُمَّ إني استأجرت أجراً فأعطيتهم أجورهم، غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إليّ أجرتي، فقلت له. كلش ما ترى من أجرتك من الإبل والغنم والبقر والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزيء بي!! فقتل: إني لا استهزيء بك، فأخذ ذلك كله فاستاقه، ولم يترك منه شيئاً. " اللَّهُمَّ فن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.. فانفرجت الصخرة. فخرجوا من الغار يمشون " .

ومن ذلك الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه إن البقرة كملتهم: أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال: أخبرنا أبو عوانة قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها.. التفتت البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا؛ إنما خلقت للحرث! فقال الناس: سبحان الله!! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر".

ومن ذلك حديث أويس القرني، وما شهد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حاله وقصته، ثم التقاؤه مع هرم بن حيان، وتسليم أحدهما على صاحبه من غير معرفة تقدمت بينهما، وكل ذلك أوال ناقضة للعادة. وتركنا شرح حديث أويس لشهرته.

ولقد ظهر علي السلق من الصحابة والتابعين، ثم على من بعدهم من الكرامات ما بلغ حد الاستفاضة. وقد صنفق في ذلك كتب كثيرة وسنشير إلى طرف منها على وجه الإيجاز، إن شاء الله عز وجل، فمن ذلك: أن ابن عمر كان في بعض الأسفار فلقي جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع، فطرد السبع من طريقهم، ثم قال: إنما يسلط على ابن آدم ما يخافه، ولو أنه لم يخف غير الله لما سلط عليه شيء. وهذا خبر معروف.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي في غزاة، فحال بينهم وبين الموضع قطعة من البحر، فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماء.

وروي أن عتاب بن بشير، وأسيد بن خضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاء لهما رأس عصا أحد كالسراج.

وروي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة.. فسبحت حتى سمعا التسبيح.

وروي أ، النبي صلة الله عليه وسلم قال: " كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره " .

ولم يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله سبحانه. وهذه الأخبار لشهرتها أضربنا عن ذكر أساتيدها.

وحكي عن سهل بن عبد الله أنه قال: " من زهد في الدنيا أربعين يوماً صادقاً من قلبه مخلصاً في ذلك ظهرت ل الكرامات، ومن لم تظهر له، فلعدم الصدق في زهده " . فقليل لسهل: كيف تظهر له الكرامة؟ فقال:

يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال:

حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: حدثنا وهب بن كيسان، عن ابن عمر، عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينا رجل ذكر كلمة إذ سمع

رعداً في السحاب. فسمع صوتاً في الحاب: أن أسق حديقة فلان، فجاء

ذلك السحاب إلى سرحة فافرع ماءه فيها، فاتبع السحاب. فإذا رجل قائم

يصلي في حديقة. فقال: ما اسمك؟ فقال: فلان بن فلان باسمه. قال: فما

تصنع بجديقتك هذه إذ صرمتها؟ قال: ولم تسأل عن ذلك؟ قال: إني

سمعت صوتاً في السحاب أن اسق حديقة فلان. قال: أما إذ قلت فإني

أجعلها أثلاثاً. فأجعل لنفسي ولأهلي ثلثاً وأرد عليها ثلثاً. واجعل

للمساكين وابن السبيل ثلثاً " .

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: دخلنا

تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله بيتاً كان الناس يسمونه بيت السباع

فسألنا الناس عن ذلك. فقالوا: كان السباع تجيء إلى سهل، فكان يدخلهم هذا البيت، ويضيفهم، ويطعمهم اللحم، ثم يخليهم. قال أبو نصر: ورأيت أهل تستر كلهم تفيقن على هذا لا ينكرونه وهم الجمع الكثير.

سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول: سمعت حمزة بن عبد الل العلوي يقول: دخلت على أبي الخير التيناتي، وكنت أعتقد في نفسي أن أسلم عليه وأخرج ولا آكل عنده طعاماً، فلما خرجت من عنده ومشيت قدراً فإذا به خلفي، وقد حمل طبقاً عليه طعام، فقال: يا فتى. كل هذا؛ فقد خرجت الساعة من اعتقادك. وأبو الخير التيناتي مشهرو بالكرامات.

وحكي عن إبراهيم الرقي أنه قال: قصدته مسلماً عليه، فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستوياً. فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي، فلما سلمت خرجت للطهارة فقصدني السبع، قعدت إليه وقلت: إن الأسد قصدني!! فخرج وصاح على الأسد وقال: ألم أقل لك لا تتعرض لضيافتي؟؟ وتنحى وتطهرت. فلما رجعت قال: اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد، واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسد.

وقيل: كان لجعفر الخلدي فصقوع يوماً في دجلة وكان عنده دعاء مجرب للضالة ترد فدعا به؛ فوجد الفصّ في وسط أوراق كان يتفحصها. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: إن ذلك الدعاء: "يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي".

قال أبو نصر السَّراج: أراني أبو الطيب العكي جزءاً ذكر فيه من ذكر هذا الدعاء على ضالة وجدها، وكان الجزء أوراقاً كثيرة.

سألت أحمد الطابرائي السرخسي، رحمه الله، فقلت له: هل ظهر لك شيء منالكرامات؟ فقال: في وقت إرادتي وابتداء أمري ربما كنت أطلب حجراً أستنجي به فلم أجد، فتناولت شيئاً من الهواء فكان جوهرأ، فاستنجيت به وطرحته.

ثم قال: وأيّ خطر للكرامات؟! إنما المقصود منه: زيادة اليقين في التوحيد، فمن لا يشهد غيره موجدأ في الكون فسواء أبصر نعلأ معتادأ، أو ناقصأ للعادة.

سمعت محمد بن أحمد الصوفي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: كان ب عبادان رجل أسود فقير يأوي إلى الخرابات، فحملت معي شيئاً وطلبته، فلما وقعت عينه عليّ تبسم، وأشار بيده إلى الأرض، فرأيت الأرض كلها ذهبأ يلمع، ثم قال: هات ما معك، فناولته، وهالني أمره، وهربت.

سمعت منصور المغربي يقول: سمعت أحمد بن عطاء الروذباري يقول: كان لي استقصاء في أمر الطهارة، فضاق صري ليلة، لكثرة ماصيب من الماء، ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك، فسمعت هاتفأ يقول: العفو في العلم، فزال عني ذلك.

سمعت منصورأ المغربي يقول: فرأيته يوماً قعد على الأرض في الصحراء وكان عليها آثار الغنم بلا سجادة، فقلت: أيها الشيخ هذه آثار الغنم!! فقال: اختلف الفقهاء فيه.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول: سمعت أبا سليمان الخواص يقول: كنت راكباً حماراً يوماً، وكان الذباب يؤذيه، فيطأطأ رأسه، فكنت أضرب رأسه بخشبة في يدي، فرفع الحمار رأسه وقال: اضرب، فإنك على رأسك هوذا تضرب.

قال الحسين: فقلت لأبي سليمان لك وقع هذا؟ فقال: نعم كما تسمعي. وذكر عن ابن عطاء أنه قال: سمعت أبا الحسين النوري يقول: كان في نفسي شيء من هذه الكرامات، فأخذت قصبه من الصبيان وقمت بين زورقين، ثم قلت: وعزتك إن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرق نفسي. قال: فخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال.

فبلغ ذلك الجنيد فقال: كان حكمه أن تخرج له أفعى تلدغه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد القواس ببغداد يقول: حدثنا محمد بن عطية قال: حدثنا عبد الكبير بن أحمد بمكة، فطال شعري ولم يكن معي قطعة من حديد آخذ بها شعري، فتقدمت إلى مزين توسمت فيه الخير، فقلت: تأخذ شعري لله تعالى؟ فقال: نعم، وكرامة، وكان بين يديه رجل من أبناء الدنيا فصرفه وأجلسني، وحلق شعري، ثم دفع إلي قرطاساً فيه دراهم وقال لي: استعن بها على بعض حوائجك، فأخذتها واعتقد أن أدفع إليه أول شيء يفتح علي به.

قال: فدخلت المسجد، فاستقبلني بعض أصحابي وقال لي: جاء بعض إخوانك بصرة من البصرة من بعض إخوانك فيها ثلاثمائة دينار.

وقال: فأخذت الصرة وحملتها إلى المزين وقلت: هذه ثلاثمائة دينار تصرفها في بعض أمورك. فقال لي: ألا تستحي يا شيخ!! تقول لي احلق شعري لله، ثم آخذ عليه شيئاً.. انصرف عافاك الله.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت بن سالم يقول: لما مات إسحق بن أحمد دخل عليه سهل بن عبد الله صومعته فوجد فيها سفطاً فيه قارورتان في واحدة منهما شيء أحمر، وفي الأخرى شيء أبيض، ووجد شوشقة ذهب، وشوشقة فضة، قال: فرمى بالشوشقتين في الدجلة؛ وخلط ما في القارورتين بالتراب، وكان على إسحاق دين قال ابن سالم: قلت لسهل: ماذا كان في القارورتين؟ قال: أحدهما لو طرح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس صار ذهباً، والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صار فضة، فقلت: وماذا عليه لو قضي منه دينه؟ فقال: أي دوست خاف على إيمانه.

وحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شط دجلة فوجدها وقد النزق الشيطان، فانصرف وقال: وعزتك لا أجوزها إلا في زروق.

سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: أملي علينا الوجيهي حكاية عن محمد بن يوسف البناء قال: كان أبو تراب النخشي صاحب كرامات، فسافرت معه سنة، وكان معه أربعون نفساً: ثم أصابتنا مرة فاقة، فعدل أبو تراب عن الطريق، وجاء بعذق موز فتناولنا، وفينا شاب لم يأكل فقال له أبو تراب: كل.

فقال: الحال الذي اعتقده ترك المعلومات، وصرت أنت معلومي، فلا أصحابك بعد هذا!! فقال له أبو تراب: كن مع ما وقع لك.

وحكى أبو نصر السراج عن أبي يزيد قال: دخل عليَّ أبو علي السندي وكان أستاذ وبيده جراب، فصبها فإذا هي جواهر، فقلت: من أين لك هذا؟ فقال: وافيت وادياً ها هنا، فإذا هو يضيء كالسراج، فحملت هذا. فقلت: فكيف كان وقتلك الذي وردت فيه الوادي؟ فقال: وقت فترة عن الحال التي كنت فيها.

وقيل لأبي يزيد: فلان يمشي في ليلة إلى مكة! فقال: الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله. وقيل له فلان يمشي على الماء، ويطير في الهواء. فقال: الطير يطير في الهواء، والسمك يمر على وجه الماء. وقال سهل بن عبد الله: أكبر الكرامات أن تُبدل خُلُقاً مذموماً من أخلاقك.

অনুবাদ: [গুহার ঘটনাটিও অনুরূপ শ্রেণীভুক্ত। ঘটনাটি মশহুর এবং হাদীসের বিভিন্ন সহীহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রিসালাতের অধিকাংশ বর্ণনার মতো ইমাম কুশাইরী নিজের সনদে এই বর্ণনাটিও তুলে ধরেছেন। আমরা কলেবর বৃদ্ধি থেকে বেঁচে থাকতে সকল বর্ণনাকারীর নাম এখানে উল্লেখ করবো না।]

হযরত সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “অনেক দিন পূর্বে তিন ব্যক্তি ভ্রমণে বের হলেন। যখন রাত হলো, তারা একটি গুহার ভেতর আশ্রয় নিলেন। প্রবেশের পরই কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা বললো: ‘ইয়া আল্লাহ! এই পাথর সরানো ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। আমাদেরকে আল্লাহ তা’আলার দরবারে নিজেদের ভালো আমলের ওয়াসিলাসহ প্রার্থনা করতে হবে!’

সুতরাং প্রথমজন বললো: ‘আমার মাতাপিতা খুব বয়স্ক ছিলেন। আমি কখনো নিজের পরিবারের কাউকে কিংবা গৃহপালিত পশুদেরকে সন্ধ্যাকালীন দুধ পান করতে দেই নি, যতক্ষণ না তাদেরকে প্রথমে দিয়েছি। একদিন আমি লাকড়ি খুঁড়তে যেয়ে ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখলাম রাত ঘনিয়ে

যাওয়ায় আমার মাতাপিতা ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুধ দোহন করে তাদের জন্য সন্ধ্যাকালীন পানীয় তৈরি করলাম। কিন্তু তাদেরকে সজাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলাম। সন্ধ্যাকালীন পানীয়ও আমার পরিবারের লোকজন কিংবা পশুদেরকে দিতে চাই নি। সুতরাং আমি একটি পানপাত্রে পানীয় নিয়ে ভোর পর্যন্ত তাদের শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে তারা জেগে ওঠলেন ও পানীয় পান করলেন। হে প্রভু! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই আমলটি করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এই গুরুতর অবস্থা থেকে মুক্ত করুন।’ সাথে সাথে ঐ পাথরটি গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেল। কিন্তু গুহা থেকে বের হওয়ার মতো যথেষ্ট পথ সৃষ্টি হলো না।

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো: ‘হে প্রভু! আমার এক চাচাতো বোন ছিলো যাকে আমি সর্বাধিক ভালোবাসতাম। আমার আবেগ তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা চালালাম। কিন্তু সে আমাকে অগ্রাহ্য করলো। অবশেষে, এক বছর সে অভাবে পড়ে আমার নিকট আসলো। আমি তাকে ১২০ দিনার প্রদান করলাম এই শর্তে যে, সে আমার হবে। সুতরাং সে আমার নিট আসলো। আমি যখন তাকে তুলে নিতে উদ্যত হয়েছি, ঠিক তখন সে বললো, ‘আমার সতিত্ব হরণ করা তোমার জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না তুমি এই অধিকার লাভ করেছো!’ সুতরাং আমি তার সাথে ঘুমানো থেকে দূরে রইলাম এবং বের হয়ে গেলাম। হে আমার প্রভু! যদি এ আমলটি আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এই গুরুতর অবস্থা থেকে করুন!’ এবারও পাথরটি আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার মতো রাস্তা তৈরি হলো না।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বললো: ‘হে প্রভু! আমি কিছু লোক দ্বারা কাজ করাতাম ও তাদেরকে বিনিময় প্রদান করতাম। কিন্তু একব্যক্তি বিনিময়ের টাকা সংগ্রহ না করেই চলে গেল। আমি তার টাকা লাভের জন্য বিনিময় করলাম। সে কিছুদিন পর ফিরে এসে আমাকে বললো, ‘আবদুল্লাহ! আমার প্রাপ্য টাকা দিন!’। আমি তাকে বললাম, ‘তুমি যাকিছু দেখছো- উট, মেঘ, গরু ও গোলাম সবই তোমার বেতন!’। সে বললো, ‘আবদুল্লাহ! আমাকে নিয়ে মশকরা করো না!’। আমি বললাম, ‘মশকরা করছি না!’। সুতরাং সে সবকিছু নিয়ে গেল। কিছুই রেখে যায় নি। হে প্রভু! আমার আমলটি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এই গুরুতর অবস্থা থেকে রক্ষা করুন।’ পাথরটি সরে গেল। সুতরাং

তারা বের হয়ে গন্তব্যপথে পাড়ি জমালো।” এটা একটি সহীহ বর্ণনা। অনেক সহীহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ শ্রেণীভুক্ত আরেকটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে জানা যায়। হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “একদা একব্যক্তি তার এক গরুর পিঠে বোঝা তুলে তাড়াচ্ছিল। গরু তার দিকে ফিরে বললো, ‘আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে হালচাষের জন্য!’। মানুষ এ কথা শ্রবণ করে অবাক হয়ে গেল, এবং বলে ওঠলো: ‘সুবহানাল্লাহ!’” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমি এটা বিশ্বাস করি - আমি, আবু বকর এবং উমর”।

হযরত ওয়েস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত অনুরূপ শ্রেণীভুক্ত একটি বর্ণনা আছে। হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁকে কোন্ অবস্থায় কিভাবে দেখেছিলেন। অবশেষে তিনি কিভাবে হারিম বিন হাইয়্যানের সাক্ষাৎ পেলেন ও একে অন্যকে না চিনেও স্বাগত জানালেন। এসব ঘটনাবলী স্বাভাবিকতার বিরোধী। আমরা হযরত ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত ঘটনাটির বর্ণনা এখানে আনি নি এজন্য যে, এটা একটি মশহুর ঘটনা।

সালাফে সালিহীন কর্তৃক অনেক কারামাত প্রকাশ পেয়েছে। আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, তাবিঈ ও তাবৈ-তাবিঈনের মাধ্যমেও কারামাত প্রকাশের বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বর্ণনার সংখ্যা অনেক। এ ব্যাপারে অনেক কিতাবও রচিত হয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আল্লাহ চাহে তো কয়েকটি মাত্র বর্ণনা এখানে উল্লেখ করবো।

[১] হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদা এক ভ্রমণে ছিলেন। একদল লোককে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখলেন। তারা একটি সিংহ দেখে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি সিংহকে রাস্তার উপর থেকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন: “আল্লাহ তা’আলা মানুষকে ওসব বস্তুর উপর ক্ষমতা দিয়েছেন যা সে ভয় করে। যদি সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তাহলে তার উপর কারো ক্ষমতা থাকবে না।” এটা একটি মশহুর বর্ণনা।

[২] বর্ণিত আছে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী বিন হাদ্‌রামী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি ও তাঁর গন্তব্যস্থলের মাঝখানে একটি সাগর ছিলো। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সর্বাধিক বড়ো নামে [ইসমে আজম] ডাক দিলেন। এরপর সকল সৈন্যদেরকে নিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন।

[৩] একটি বর্ণনায় জানা যায়, একদা রাতের বেলা হযরত আব্বাদ বিন বিশর [বা আত্তাব বিন বশির] ও হযরত উসাইদ বিন হুজাইর [বিন ইমরুল কায়েস] রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহ থেকে বেরিয়ে আসলেন। অন্ধকার রাতে হাঁটার সময় একজনের হাতের যষ্টির মাথা উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো ও বাতির মতো তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে দিল।

[৪] বর্ণিত আছে, একদা হযরত সালমান ফারসি ও হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা সামনে একটি বড় পাত্র ছিলো। এটি হঠাৎ আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো। উভয় সাহাবী এই প্রশংসার বাক্যগুলো শুনলেন।

[৫] বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কতো লোক আছে যাদের চুল এলোমেলো, ধূলোবালিতে আবৃত, পরনে দু' টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই নয়, অজানা-অচেনা, যারা আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করে এবং তা কবুল হয়ে যায়।” এখানে তিনি বলেন নি, এরা ঠিক কোন্ জিনিসটি আল্লাহর নিকট চায়।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো মশহুর। তাই আমরা এগুলোর সদন উল্লেখ করি নি।

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যে কেউ সত্যিকার অর্থে এবং ইখলাসের সাথে চল্লিশ দিনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করবে, সে কারামাত প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। যদি সে এতে ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে দুনিয়া ত্যাগে সে আন্তরিক ছিলো না।” কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সে কিভাবে কারামাত প্রদর্শন করবে? তিনি জবাব দিলেন: “সে যাকিছু চায়, যেভাবে চায় ও যেখান থেকে চায় তা নিতে পারবে।”

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “এক ব্যক্তি প্রার্থনা করছিলো। সে একখণ্ড মেঘ থেকে বর্জধ্বনির শব্দ শুনলো। এরপর মেঘখণ্ডকে কেউ নির্দেশ দিতে শুনলো:

‘এই-এই বাগানে পানি দাও!’। মেঘখণ্ড বিশেষ ভূখণ্ডের উপর চলে গেলো ও সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলো। লোকটি মেঘখণ্ডের সঙ্গে চলে গেলো। দেখলো একব্যক্তি তার বাগানে বসে প্রার্থনা করছেন। আগন্তুক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম জিজ্ঞেস করলো। তিনি তার নাম বললেন। এরপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার এই বাগানের ফসল দিয়ে কি করবেন?’ দ্বিতীয় ব্যক্তি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কেনো এ প্রশ্ন করছেন?’ প্রথম ব্যক্তি জবাব দিলেন, ‘আমি মেঘমালা থেকে আওয়াজ শুনেছি: ‘এই-এই বাগানে পানিবর্ষণ করো!’।’ দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, ‘আপনি ফসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এর এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার স্ত্রীর জন্য রাখবো, এক-তৃতীয়াংশ বাগানেই ফেরৎ দেবো আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ গরীব ও মুসাফিরদেরকে প্রদান করবো।’”

হযরত আবু নাসির শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমরা তুসতারে পৌঁছিয়ে [সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরী রাহ. এর বাড়ি যেখানে ছিল] ওখানে দেখলাম, একটি গৃহ আছে। এটিকে স্থানীয়রা ‘সিংহের ঘর’ বলে সম্বোধন করেন। আমরা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বললেন: ‘হযরত সাহলের নিকট সিংহরা আসতো। তিনি এদেরকে ঘরে নিয়ে যেতেন ও তাদের মেজবান হতেন। মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করাতেন। এরপর এদের যেতে দিতেন।’” হযরত শাররাজ আরো বলেন: “এলাকার সকলেই এর সত্যতা স্বীকার করেছেন, যদিও তাদের সংখ্যা ছিলো বিরাট। কেউ এ বর্ণনা অস্বীকার করেন নি।”

হযরত হামযা বিন আবদুল্লাহ আলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদা আমি হযরত আবুল খায়র তিনাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ওখানে কিছু আহার না করেই ফিরে আসবো। দেখা-সাক্ষাতের পর আমি তাঁর গৃহ ত্যাগ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই লক্ষ্য করলাম এক থালা খাদ্যদ্রব্যসহ তিনি আমাকে অনুসরণ করে হেঁটে আসছেন। বললেন, ‘হে যুবক! এগুলো খাও! তুমি তো ইতোমধ্যে তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করে নিয়েছো!’”

হযরত আবুল খায়র তিনাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামাতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত ইব্রাহিম রাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: “আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর দরবারে যাই। মাগরিবের নামায আদায়কালে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করতে ভুলে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, ‘আমার এই ভ্রমণটি

বুঝি ব্যর্থ হলো!’ নামায শেষে আমি তাঁর প্রতি সালাম জানালাম। বাইরে চলে আসলাম অযু করতে। একটি সিংহ আমার দিকে ছুটে আসলো। আমি এক দৌড়ে হযরতের নিকট ফিরে আসলাম। চিৎকার দিয়ে বললাম: ‘হযরত! একটি সিংহ আমার দিকে ছুটে আসছে!’। তিনি বাইরে যেয়ে জোরে বললেন: ‘আমি কি বলি নি, আমার মেহমানদেরকে কষ্ট দেবে না?’। সিংহ ফিরে চলে গেল। আমি অযু সেরে নিলাম। যখন তাঁর দরবারে ফিরে আসলাম, তিনি বললেন, ‘তুমি বাহ্যিক ব্যাপার সঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো এবং তুমি সিংহকে ভয় করো। কিন্তু আমরা নিজেদের হৃদয়কে সঠিক করতে ব্যস্ত আছি এবং সিংহ আমাদেরকে ভয় করে!’”

হযরত জাফর খুলদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি আঙুটি-পাথর ছিলো। একদা এটি দজলা নদীতে পড়ে গেল। তিনি একটি কালাম জানতেন যার দ্বারা নিশ্চিতভাবে হারানো জিনিসের সন্ধান মিলতো। তিনি তা উচ্চারণ করলেন। দেখা গেলো তাঁর আঙুটি-পাথরটি কিছু কাগজের ভেতর পড়ে আছে। আমি হযরত আবু হাসিম সিজিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেতে শুনেছি, তিনি হযরত আবু নাসির শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছেন, উক্ত কালামটি হলো:

يَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اِجْمَعِ عَلَيَّ ضَالَّتِي

অর্থাতঃ “হে মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করনেওয়াল্লা! এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।” [আলে ইমরান : ৯ দ্র:]

তিনি [শাররাজ রাহ.] আরো বলেন: “হযরত আবু তায়্যিব আক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে একখানা বই দেখালেন, যাতে এই কালাম পাঠ করে যারা হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছেন তাদের নামের তালিকা লিখা আছে। এতে বহু পৃষ্ঠা ছিলো।”

আমি [ইমাম কুশাইরি বলেন] হযরত আহমদ তাবারানী শারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘আপনার মাধ্যমে কোনো কারামাত প্রকাশ হয়েছে কি?’ জবাব দিলেন: “আমার নব্বতিত্ব কালে [ইরাদাতি], আল্লাহর রাস্তায় চলার শুরুতে আমি মাঝে মধ্যে একটি ডেলার সন্ধান করতাম যার মাধ্যমে মলত্যাগের পর নিজেকে পরিস্কার করতে পারি। কিন্তু খুঁজে পেতাম না। আমি বাতাসে হাত

রেখে দিলে একটা কিছু মুঠিতে আসতো কিন্তু তা ঢেলা নয় বরং মূল্যবান পাথর [জাওহার] হতো। আমি এটা দ্বারাই নিজেকে পরিস্কার করতাম, এরপর ছুড়ে ফেলে দিতাম।” তিনি পরে বললেন: ‘কারামাতের গুরুত্ব কি? তাহলো আল্লাহর একত্বের উপর ঈমান বৃদ্ধি। যে কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, তার জন্য সাধারণ ঘটনা ও অতিস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।’

আমি হযরত মুহাম্মদ বিন আহমদ সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবুল হাসান [আবুল খায়র] বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আবাদান দ্বীপে একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি সে স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ এলাকায় ঘুরাফেরায় থাকতেন। আমি কিছু একটা হাদিয়া সাথে নিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলাম। তিনি যখন আমাকে দেখলেন, মৃদু হেসে অঙ্গুলি দ্বারা মাটির দিকে তাকাতে নির্দেশ করলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম মাটির উপর পড়ে আছে অসংখ্য স্বর্ণখণ্ড! এরপর বললেন: ‘তুমি কি এনছো, দাও!’। আমি তার হাতে হাদিয়া তুলে দিলাম। তার আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখে কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে সেখান থেকে পালালাম।”

আমি হযরত মনসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আহমদ বিন আতা রুজবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি বাহ্যিক পবিত্রতা [তাহারাত] অর্জনের ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তিত থাকতাম। তবে এক রাত ওয়ু করার সময় অতিরিক্ত পানি খরচ করার কারণে অস্বস্তি অনুভব করলাম। আমার অন্তর অশান্ত হয়ে ওঠলো। অবশেষে দু’আ করলাম: ‘হে প্রভু! আমি আপনার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি!’ আমি একটি গায়েবী আওয়াজ শুনলাম: ‘ক্ষমা জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান!’, এরপর আমার অসুস্থতা দূর হয়ে গেলো।”

আমি হযরত মনসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি তাঁকে [রুজবারী রাহ.] দেখেছি। তিনি একদিন মরুভূমিতে একটি পাথরের উপর উপবেশন করছিলেন। তাঁর শরীর বকরি ও মেঘের মল দ্বারা আবৃত ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ‘হে শাইখী! এগুলো তো বকরি ও মেঘের মল!’ জবাব দিলেন: ‘ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।” আমি

হযরত আবু হাতিম সিজিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবু নাসির শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত হুসাইন বিন আহমদ রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবু সুলাইমান খাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “একদিন আমি একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। মাছিদের উপদ্রবে সে বার বার তার মাথা নাড়াচ্ছিলো। এদিকে আমি বার বার লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানছিলাম। হঠাৎ গাধাটি তার মাথা তুলে বলে ওঠলো: ‘মারতে থাকো! তুমি তোমার মাথায়ও আঘাত অনুভব করবে!’”। বর্ণনাকারী হযরত রাজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ঠিকই কি আপনি নিজে আঘাত অনুভব করেছিলেন?’ তিনি জবাব দিলেন: “হ্যাঁ, ঠিক তাই করেছি।”

হযরত ইবনে আতা আদমী বলেন, আমি হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমার বেলায়ও কিছু কারামাত প্রকাশ পেয়েছে। একদা একদল ছেলের হাত থেকে বেতের কিছু টুকরো হাতে নিয়ে দু’টি নৌকোর মাঝখানে নদীর পানিতে নেমে যাই। এরপর বললাম: আপনার বড়ত্বের কসম! যদি ৩ সের ওজনের একটি মাছ আমার নিকট না আসে, তাহলে নিজেই নদীর পানিতে নিমজ্জিত করে ডুবে মরবো! কী আশ্চর্য, সত্যিই ৩ সের ওজনের একটি মাছ আমার নিকটে এসে হাজির হলো।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি শুনে মন্তব্য করলেন: “এটা ভালো হতো, যদি কোনো সর্প এসে তাকে কামড় দিতো!”।

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্তাদ হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একবার মক্কা শরীফ অবস্থানকালে মাথার চুল দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় কেটেছেটে পরিপাটি করতে ইচ্ছা হলো। নিজের নিকট চুল কাটার কিছু না থাকায় চলে গেলাম এক নাপিতের কাছে। অনুভব করলাম, নাপিতের মধ্যে ভালো চারিত্রিক গুণাবলী পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাকে অনুরোধ করলাম: ‘আল্লাহ তা’আলার ওয়াস্তে আমার চুলগুলো কেটে দেবে?’। সে জবাব দিল: ‘অবশ্যই, সানন্দে দেবো!’ তার দোকানে একজন ধনী ব্যক্তি চুল কাটার জন্য বসা ছিলেন। নাপিত তাকে সরিয়ে আমাকে বসিয়ে চুল কাটতে শুরু করলো। কাজ শেষে সে আমাকে এক থলে টাকা দিল যাতে ৩০০ দিরহাম ছিলো। এরপর বললো: ‘এই দিরহামগুলো আপনার যে কোন প্রয়োজনে খরচ

করবেন।' আমি তা গ্রহণ করলাম ও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে তাওফিক দেবেন, তখন তার টাকা ফেরৎ দেবো। আমি মসজিদে ঢুকে একজন সাথীকে পেলাম। তিনি বললেন: 'আপনার এক পীরভাই বসরা থেকে এই ৩০০ দিরহামের থলেটি নিয়ে এসেছেন। এই টাকা আপনার আরেক পীরভাই আপনাকে দান করেছেন। এই নিন।' আমি থলেটি নিয়ে ফিরে আসলাম নাপিতের কাছে এবং বললাম: 'এই ৩০০ দিরহাম তোমাকে দিলাম। যে কোন প্রয়োজন পূরণে তুমি এগুলো খরচ করবে।' সে বললো: 'হে শায়খ! আপনার কি লজ্জা হয় না? আপনি বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে চুল কেটে দেওয়ার জন্য। আর এখন বলছেন, চুল কাটার জন্য বিনিময় নিতে! চলে যান, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!'"

হযরত ইবনে সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "ইসহাক বিন আবদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুসংবাদ শুনে হযরত সাহল তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেখতে গেলেন। সেখানে খেজুর পত্রের তৈরি একটি ঝুড়ি তার দৃষ্টিগোচর হলো। ভেতরে ছিলো দু'টি বোতল। প্রথমটিতে আছে লাল বস্ত্র ও দ্বিতীয়টি আছে সাদা বস্ত্র। ঝুড়িতে একখণ্ড স্বর্ণ ও একখণ্ড রৌপ্যও ছিলো। হযরত তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লাল ও সাদা বস্ত্র মাটিতে ফেলে দিলেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড ছুড়ে মারলেন দজলা নদীতে। এখন ইসহাক বিন আবদুল্লাহ ঋণী হলেন।" ইবনে সালিম আরো বলেন: "আমি হযরত তুসতরীকে প্রশ্ন করলাম, 'ঐ বোতল দু'টোর ভেতর কি ছিলো?', জবাব দিলেন: 'যে কোন বোতল থেকে তুমি যদি এক দিরহাম ওজন পরিমাণ বস্ত্র কয়েকটি আমার টুকরোতে মিশাতে তাহলে তা স্বর্ণে পরিণত হতো। আর যদি তুমি এক দিনার ওজন পরিমাণ বস্ত্র কয়েকটি সীসার সাথে মিশাতে তাহলে তা রূপায় পরিণত হতো।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ইসহাক যদি তার ঋণ এগুলো দিয়ে পরিশোধ করতেন তাহলে কি সঠিক হতো?' তিনি জবাব দিলেন: 'বন্ধু! তিনি তো মৃত্যুর জন্য ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন!'"

বর্ণিত আছে, এক রাতে হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দজলা নদীর তীরে চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন নদীর উভয় তীর একত্রিত হয়ে গেছে, যাতে তিনি পার হয়ে যেতে পারেন! কিন্তু তিনি বললেন, 'হে মহান! আমি বরং পার হতে চাই একটি নৌকায় চড়ে!'।

আমি হযরত আবু হাতিম সিজিসতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট শুনেছি, তিনি হযরত হযরত আবু নাসির শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছেন, আমি হযরত মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বান্না সম্পর্কিত একটি ঘটনা হযরত ওয়াজিহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শ্রবণ করেছি: “হযরত আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বহু কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। একদা তিনিসহ আমরা চল্লিশ ব্যক্তি একটি সফরে যাই। এক জায়গায় পৌঁছানোর পর সকলে ভীষণভাবে ক্ষুধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আবু তুরাব রাস্তা থেকে কিছুদূর যেয়ে ফিরে আসলেন এক গুচ্ছ কলা নিয়ে। এক যুবক ছাড়া বাকি সবাই মিলে এই কলাগুলো খেলাম। আবু তুরাব যুবককে খলা খেতে অনুরোধ করলেন। সে জবাব দিল: ‘আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনো ধরনের নিশ্চিত রিজিক [মালুমাত] থেকে বিরত থাকবো। অথচ আপনি আমাকে তা-ই দিচ্ছেন। এখন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।’ আবু তুরাব বললেন, ‘তাহলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো!’”

হযরত আবু নাসির শাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন: “একদা আমার উস্তাদ আবু আলী সিন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে দেখতে তাশরিফ আনলেন। তাঁর হাতে একটি থলে ছিল। তিনি এটা ঝেড়ে খালি করলেন। দেখা গেলো থলে থেকে অনেক মণি-মুক্তা বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতে চাইলাম এগুলো তিনি কোথেকে এনেছেন। বললেন: ‘ঐ ওখানে, আমি, একটি উপত্যকায় ছিলাম। দেখতে পেলাম কি যেনো একটা বস্তু বাতির মতো উজ্জ্বল। আমি তা হাতে তুলে নিয়ে আসলাম।’ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার মুহূর্তগুলো [আধ্যাত্মিক স্তর] [ওয়াকুতুকা] কি ছিলো যখন আপনি উপত্যকায় প্রবেশ করেন?’ জবাব দিলেন, ‘ঐ মুহূর্তগুলোতে যে আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান করছিলাম তা থেকে দুর্বলতার দিকে যাচ্ছিলাম।’”

কেউ একজন হযরত আবু ইয়াজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জানালো: ‘অমুক ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে পায়দল মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিয়ে গেছেন!’ জবাব দিলেন: ‘[তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?] শয়তান তো এক ঘণ্টার ভেতর মাশরিক থেকে মাগরিবে ভ্রমণ করতে সক্ষম!’।” তাঁকে আরো বলা হলো, ‘অমুক-তমুক পানির উপর হাঁটেন ও আকাশে উড়ে বেড়ান!’ জবাব দিলেন:

‘[তাতে আশ্চর্যের কি আছে?] পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর মাছ পানিতে কি ভাসতে পারে না?’। হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সর্বাধিক বড় কারামাত হলো, নিজের নৈতিক চরিত্রের নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন আসা।”

فصل

ফাসল [পিরচ্ছেদ] -৯

سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول: سمعت ابن سالم يقول: سمعت أبي يقول: كان رجل يقال له عبد الرحمن بن أنس يصحب سهل بن عبد الله، فقال له يوماً: ربما أتوضأ للصلاة فيسيل الماء بين يدي قضبان ذهب وفضة.

فقال سهل: أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون خشخشة ليشغلوا بها؟؟ سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثني الجنيّد قال:

دخلت على السري يوماً فقال لي: عصفور كان يجيء في كل يوم فأفت له الخبز، فيأكل من يدي، فنزل وقتاً من الأوقات فلم يسقط على يدي، فتذكرت في نفسي: ماذا يكون السبب؟ فذكرت أنني أكلت ملحاً بأبزار، فقلت في نفسي: لا آكل بعدها، وأنا تأثب منه؛ فسقط على يدي وأكل.

وحكى أبو عمرو الأنماطي قال: كنت مع أستاذي في البادية، فأخذنا المطر، فدخلنا مسجداً نستكن فيه، وكان السقف يפק، فصعدنا السطح، ومعنا خشبة نريد إصلاح السقف، فقصر الخشب عن الجدار، فقال لي أستاذي: مدها، فمددتها.. فركبت الحائظ من هاهنا ومن هاهنا.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت ماراً في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين للشرعة، فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا تتبعها الشرعة فهي كفر.

وقال بعضهم: كنت عند خير النساج، فجاءه رجل وقال: أيها الشيخ رأيته أمس وقد بعث العزل بدرهمين، فجئت خلفك، فحللتها من طرف إزارك، وقد صارت يدي منقبضة على الدرهمين في كفي، قال: فضحك خير وأوماً بيده إلى يدي ففتحها، ثم قال: امض واشتر بهما لعيالك شيئاً، ولا تعد لمثله.

وحكي عن أحمد بن محمد السلمي قال: دخلت على ذي النون المصري يوماً، فرأيت بين يديه طشتاً من ذهب، وحوله الندّ، والعنبر يسجر، فقال لي: أنت ممن يخل على الملوك في حال بسطهم؟ ثم أعطاني درهماً، فانفقت منه إلى بلخ.

وحكي عن أبي سعيد الخراز قال: كنت في بعض أسفاري، وكان يظهر لي كل ثلاثة أيام شيء، فكنت آكله، وأستقل به، فمضى عليّ ثلاثة أيام وقتاً من الأوقات ولم يظهر شيء فضعفت!! وجلست، فهتف بي هاتف. أينما أحب إليك: سبب، أو قوة؟ فقلت: القوة. فقامت من وقتي، ومشيت اثني عشر يوماً لم أذق فيهما شيئاً، ولم أضعف.

وعن المرتعش قال: سمعت الخواص يقول: تهت في البادية أياماً، فجاءني شخص وسلم عليّ، وقال لي: تهت! فقلت له: نعم، فقال: ألا أدلك على الطريق؟ ومشى بين يدي خطوات، ثم غاب عن عيني، وإذا أنا على الجادة،

فبعد ذلك ما تهت ولا أصابني في سفر جوع ولا عطش.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي، يقول: سمعت عمر بن يحيى الأردبيلي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول لي: لما مات أبي ضحك على المغتسل؛ فلم يجسر أحد يغسله، وقالوا: إنه حي، حي جاء واحد من أقرانه وغسله.

سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت طلحة القصائري يقول: سمعت المنجي صاحب سهل بن عبد الله يقول: كان سهل يصبر عن الطعام سبعين يوماً، وكان إذا أكل ضعف، وإذا جاع قوي.

وكان أبو عبيد البصري إذا كان أول شهر رمضان يدخل بيتاً، ويقول لامرأته: طبني على الباب، وألقي إلي كل ليلة من الكوة رغيفاً، فإذا كان يوم العيد فتح الباب ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفاً في زاوية البيت، فلا أكل ولا شرب، ولا نام، ولا فاتته ركعة من الصلاة.

وقال أبو الحارث الأولاشي: مكثت ثلاثين سنة ما يسمع لساني إلا من بصري، ثم تغيرت الحال؛ فمكثت ثلاثين سنة لا يسمع سري إلا من ري. حدثنا أبو الحسين غلام شعوانة قال: سمعت علي بن سالم يقول: كان سهل بن عبد الله أصابته زمانة في آخر عمره، فكان إذا حضر وقت الصلاة انتشرت يده ورجلاه، فإذا فرغ من الفرض عاد إلى حال الزمانة.

وحكي عن أبي عمران الواسطي قال: انكسرت السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوح، وقد ولدت في تلك الحالة صبية، فصاحت بي وقالت لي:

يقتلني العطش!! فقلت: هو ذا يرى حالنا؛ فرفعت رأسي، فإذا رجل في الهواء وفي يده سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر، وقال: هاك اشربا. قال: فأخذت الكوز وشربنا منه فإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل. فقلت: من أنت رحمك الله؟ فقال: عبد لمولاك، فقلت: بيم وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته فأجلستني في الهواء. ثم غاب عني ولم أره.

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا بكران بن أحمد الجيلي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: رأيت شاباً عند الكعبة يكثر الركوع والسجود فدنوت منه، وقلت: إنك تكثر الصلاة!! فقال: أنتظر الأذن من ربي في الانصراف.

قال: فرأيت رقعة سقطت عليه، مكتوب فيها: "من العزيز الغفور إلى عبدي الصادق: انصرف مغفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر".

وقال بعضهم: كنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده مع جماعة نتجاري الآيات، ورجل ضرير بالقرب منا يسمع، فتقدم إلينا، وقال: أنست بكلامكم؛ اعلموا أنه كان لي صبية وعيال، وكنت أخرج إلى البقيع اختطب، فخرجت يوماً. فرأيت شاباً عليه قميص كتان ونعله في إصبعه، فتوهمت أنه تائه. فقصدته أسلب ثوبه: فقلت له: إنزع ما عليك. فقال: تسر في حفظ الله. فقلت الثانية والثالثة. فقال لا بد؟ فقلت: لا بد!! فأشار من بعيد بأصبعه إلى عيني فسقطنا. فقلت: بالله عليك. من أنت؟ فقال: إبراهيم الخواص.

وقال ذو النون المصري: كنت وقتاً في السفينة فسرقت قطيفة. فاتهموا بها

رجلاً. فقلت: دعوه حتى أرفق به. وإذا الشاب نائم في عباءة: فأخرج رأسه من العبادة فقال له: ذو النون في ذلك المعنى. فقال: ألي تقول ذلك؟! أقسمت عليك يا رب أن لا تدع واحداً من الحيتان إلا جاء بجوهرة. قال: فرأينا وجه الماء حيتاناً في أفواههم الجواهر، ثم ألقى الفتى نفسه في البحر وتمر إلى الساحل.

وحي عن إبراهيم الخواص قال: دخلت البادية مرة فرأيت نصرانياً على وسطه زنار فسألني الصحبة فمشينا سبعة أيام فقال لي: يا راهب الحنيفية هات ما عندك من الانبساط فقد جعنا إلهي لا تفضحني مع هذا الكافر. فرأيت طبقاً عليه خبر وشواء ورطب وكوز ماء. فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام ثم بادرت وقلت: يا راهب النصرارى. هات مع عندك. فقد انتهت النوبة إليك. فاتكأ على عصاه ودعا. فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقى. قال: فتحيرت، وتغيرت. وأبيت أن آكل. فألح علي فلم أجبه. فقال: كل؛ فإني أبشرك ببشارتين إحداهما: أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وحل الزنار. والأخرى: أني قلت: اللهم إن كان هذا العبد خطر عند فافتح علي بهذا؛ ففتح. فأكلنا ومشينا وحجج. وأقمنا بمكة سنة ثم إنه مات ودفت بالبطحاء.

وقال محمد بن المبارك الصوري: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمان، فصلينا ركعات، فسمعت صوتاً من أصل الرمان: يا أبا إسحق أكرمنا بأن نأكل منا شيئاً، فطأطأ إبراهيم رأسه، فقال ثلاث مرات. ثم قال: يا محمد كن شفيعاً إليه؛ ليتناول منا شيئاً فقلت: يا أبا إسحق، لقد سمعت. فقام وأخذ رمانتين،

فأكل واحدة وناولني الأخرى فأكلتها وهي حامضة، وكانت شجرة قصيرة، فلما رجعنا مررنا بها فإذا هي شجرة عالية ورماتها حلو. وهي تثمر في كل عام مرتين. وسموها رمانة العابدين ويأوي إلى ظلها العابدون.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت أبا جعفر الخفاف يقول: حدثني جابر الرحبي قال: أكثر أهل الرحبة عليّ الإنكار في باب الكرامات، فركبت السبع يوماً ودخلت الرحبة، وقلت: أين الذين يكذبون أولياء الله؟ قال: فكفوا بعد ذلك عني.

سمعت منصوراً المغربي يقول: رأى بعضهم الخضر عليه السلام، فقال له: هل رأيت فوقك أحداً؟ فقال: نعم، كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة، والناس حوله يستمعون..

فرأيت شاباً بالعبد منهم رأسه على ركبتيه. فقلت له: يا هذا عبد الرزاق يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت، وأنا لست بغائب عن الله؟ فقلت: إن كنت كما تقول، فمن أنا؟! فرفع رأسه وقال: أنت أخي أبو العباس الخضر، فعلمت أن لله عبداً لم أعرفهم.

وقيل: كان لإبراهيم بن أدهم صاحب يقال له يحيى يتعبد في غرفة ليس إليها سلم ولا درج، فكان إذا أراد أن يتطهر، يجيء إلى باب الغرفة ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويمر في الهواء كأنه طير، ثم يتطهر، فإذا فرغ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ويعود إلى غرفته.

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: سمعت عمر بن محمد بن أحمد

الشيرازي بالبصرة قال: سمعت أبا محمد جعفر الحذاء بشيراز قال: كنت أتأدب بأبي عمر الاصطخري، فكان إذا خطر لي خاطر أخرجُ إلى اصطخر فربما أجابني عما احتاج إليه من غير أن أسأله، وربما سأله فأجاني ثم شغلت عن الذهاب فكان إذا خطر على سرِّي مسألة أجابني من اصطخر، فيخاطبني بما يَرِدُ عليّ.

وحكي عن بعضهم قال: مات فقير في بيت مظلّم، فلما اردنا غسله تكلفنا طلب سراج، فوقع من كوة ضوء.. فأضاء البيت، فغسلناه، فلما فرغنا ذهب الضوء كأنه لم يكن. *Khanqa-e-Aminia, Sylhet*
وعن آدم بن أبي إياس قال: كنا بعسقلان، وشاب يغشانا ويجالسنا. ويتحدث معنا؛ فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي، قال: فودعنا يوماً وقال: أريد الإسكندرية. فخرجت معه، وناولته دريهمات، فأبى أن يأخذها. فالححت عليه فألقى كفاً من الرمل في ركوته. واستقى من ماء البحر. وقال: كله!! فنظرت فإذا هو سويق بسكر كثير فقال، من كان حاله معه مثل هذا يحتاج إلى دراهمك؟! ثم أنشأ يقول: *Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

بحق الهوى يا أهل ودي تفهموا ... لسانٌ وجوي بالوجود غريب
حرام على قلب تعرّض للهوى ... يكونُ لغير الحق فيه نصيب
ولغيره:

ليس في القلب والفؤاد جميعاً ... موضعٌ فارغ يراه الحبيب
هو سُؤلي ومُنيتي وسروري ... وبه ما حييت عيشي يطيب
وإذا ما السقام حل بقلبي ... لم أجد غيره لقسمي طيب

অনুবাদ: আমি হযরত হযরত মুহাম্মদ তামিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আলী সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত ইবনে সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আবদুর রহমান বিন আহমদ নামক এক ব্যক্তি হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে থাকতেন। তিনি একদা হযরত তুশতারীকে বললেন, ‘আমি যখন অযু করতে যাই তখন দেখতে পাই দু’টি ধারায় পানি প্রবাহিত হচ্ছে: এর একটি স্বর্ণের ও অপরটি রৌপ্যের।’ প্রতিক্রিয়ায় হযরত তুশতারী বললেন, ‘তুমি কি জানো না, যখন শিশুরা কাঁদে তখন তাদেরকে ঝুমঝুমি দেওয়া হয় যাতে করে তারা অন্যমনস্ক হয়ে যায়!’” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদা শায়খ সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি ঘটনার কথা বললেন, ‘একটি পাখি প্রত্যেকদিন এখানে আসতো। কিছু রুটি গুঁড়ো করে রাখতাম। পাখিটি আমার হাতে বসে তা খেতো। একদিন পাখিটি আসলো ঠিকই কিন্তু আমার হাতে বসলো না। ভাবলাম, কারণ কি হতে পারে? মনে পড়লো, আমি ঐদিন ঝাল মসলার তৈরি মাংস খেয়েছি। আর এটাই কারণ হবে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন ঝাল মসলার তৈরি মাংস খাবো না। দেখা গেল পাখিটি হাতে বসে গেছে এবং আগের মতো রুটির গুঁড়ো খাচ্ছে।”

হযরত আবু উমর আনমামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: “আমার শায়খের সাথে একদা মরুভূমিতে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা একটি মসজিদে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু মসজিদের ছাদে অনেক ছিদ্র থাকায় বৃষ্টির পানি পড়ছিলো। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম উপরে উঠে একখণ্ড কাঠ এঁটে দেবো, যাতে বৃষ্টি আটকে যায়। কিন্তু কাঠখণ্ড বেটে থাকায় ছাদ থেকে দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছুলো না। আমি শায়খকে কথাটি জানালাম। তিনি বললেন, ‘কাঠখণ্ড টেনে লম্বা করো!’ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তা-ই করলাম। আশ্চর্য! সত্যিই তা লম্বা হয়ে গেল। আর এর দ্বারা এক দেওয়াল থেকে অপর দেওয়াল পর্যন্ত ছাদকে আবৃত করলাম।”

হযরত আবু বকর দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “ইয়াহুদিদের একটি মরুভূমিতে আমি ঘুরে বেড়াছিলাম। হঠাৎ মনের মধ্যে ভাবোদ্বেক হলো, ইলমে

হাক্কিকাত ও ইলমে শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। একটি বৃক্ষের নিচ থেকে দৈববাণী শুনলাম: ‘প্রতিটি সত্য যা শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তা কুফরী!’।”

একজন সুফি বলেছেন: “আমি হযরত খায়র নাস্‌সাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো: ‘শায়খ! আমি সেদিন আপনার নিকট থেকে ২ দিরহামের বিনিময়ে সুতা ক্রয় করি। আমি আপনাকে অনুসরণ করি ও আপনার কটিবস্ত্র থেকে ওগুলো চুরি করে নিয়ে যাই। কিন্তু হঠাৎ করে আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় অবশ হয়ে গেলো!’ হযরত খায়র রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হেসে ওঠলেন এবং নিজের হাত দ্বারা লোকটির মুষ্টিবদ্ধ হতের প্রতি ইশারা করলেন। এতে তা খুলে গেলো। এরপর তাকে বললেন: ‘যাও! এই দিরহামগুলোর বিনিময়ে তোমার পরিবারের জন্য কিছু ক্রয় করো। আর কখনো এরূপ কাজ করো না!’”

বর্ণিত আছে হযরত আহমদ বিন মুহাম্মদ সুলামী বলেছেন: “একদিন আমি হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে দেখা করতে যাই। তার সম্মুখে একটি সোনালি পাত্র দেখতে পেলাম। এর চতুর্দিকে সুগন্ধি ধূপ ও মোমতুল্য বস্তু প্রজ্জ্বলিত ছিলো। তিনি আমাকে দেখে বললেন: ‘তুমি হলে সেই ব্যক্তি যে বাদশাহদের দরবারে উপস্থিত হয় যখন তারা দয়াপরবশ হন!’ তিনি আমকে ১টি দিরহাম দান করলেন। আমি এটা দ্বারাই বলখ পর্যন্ত ফিরে আসার যাবতীয় খরচ আঞ্জাম দিলাম।” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “কোনো এক ভ্রমণকালে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, প্রতি তিন দিনে একবার মাত্র খাবার যোগাড় হতো। এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট ছিলো। তবে এক সময় একাধারে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও খাবার জুটলো না। আমি দুর্বল হয়ে পড়লাম। [দাঁড়াতে না পেরে] বসতে বাধ্য হলাম। ঠিক এমন সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আমার কর্ণগোচর হলো: ‘তোমার কোনটি পছন্দ হয় বেশি: ‘ক্ষমতা’ না ‘উপায়’?’ জবাব দিলাম: ‘ক্ষমতা’। সাথে সাথেই আমি আবার দাঁড়িয়ে গেলাম এবং পরবর্তী ১২ দিন পর্যন্ত আমি হাঁটতে থাকি- কিছুই খাই নি। অথচ আমি দুর্বলতা অনুভবই করি নি।”

হযরত মুরতাইশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি একবার বেশ কিছুদিন যাবৎ

মরুভূমিতে ঘুরাফেরা করছিলাম। এরপর একদিন এক যুবকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। আমাকে দেখে তিনি স্বাগত জানালেন। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কি হারিয়ে গেছি? জবাব দিলাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন: ‘আমি কেনো আপনাকে পথ দেখাবো না?’ তিনি ওঠে দাঁড়িয়ে আমার সামনে অগ্রসর হলেন। মাত্র ক’টি পদক্ষেপ চলেই কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গায়েব হয়ে গেলেন! আমি আর তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। দেখলাম আমি একটি রাস্তার উপর আছি। তখন থেকে আর ক্ষিধে কিংবা ক্লান্তি আমাকে স্পর্শই করলো না। আমি নিশ্চিন্তে চলতে থাকি।”

হযরত ইবনুল জাল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার পিতার মৃত্যুর পর গোসলের খাটে থাকাবস্থায় তিনি হাসতে থাকেন! কেউ তার দেহ ধৌত করার সাহস পেলেন না। কারণ তারা মনে করলেন, তিনি তখনো জীবিত। অবশেষে তার এক নিকট-অনুসারী [মুরীদ] আসলেন। তিনি তার দেহ ধৌত করতে সক্ষম হলেন।”

হযরত আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সাথী হযরত মাহিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সাহল [তুশতারী রাহ.] কোনো কোনো সময় দীর্ঘ ৮০ দিন পর্যন্ত উপবাস করতেন। খাবার খেলে তিনি দুর্বল হয়ে যেতেন। অপরদিকে ক্ষুদার্ত থাকলে সবল হতেন। রমজান মাসের শুরুতে আবু উসমান বুসরী নিজের স্ত্রীর কাছে এসে বলতেন: ‘আমার কক্ষের দরজা কাদা মাটি দ্বারা সিলমোহর করে দেবে। প্রত্যেক রাতে এক টুকরো রুটি জানালা দিয়ে কক্ষের ভেতর ছুড়ে মারবে!’ ঈদের দিন আমরা যেয়ে ঐ কক্ষের সিলমোহর ভেঙ্গে দিতাম। দরজা খোলার পর তাঁর স্ত্রী এসে দেখতেন কক্ষের ভেতর একটি কোণে ত্রিশ টুকরো রুটি পড়ে আছে। যদিও তিনি খাবার খান নি, পানি পান করেন নি, অথবা ঘুমানও নি, কিন্তু এক রাকআত নামায পর্যন্ত তাঁর কাযা হয় নি।”

হযরত আবুল হারিস আলাওয়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি চল্লিশ বছর কাটিয়েছি আমার জিহ্বার দ্বারা [খেয়ে-ধেয়ে]। আমার অন্তরের কথা ছাড়া অন্য কারো কথাও শ্রবণ করি নি। এরপর আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। তখন থেকে আমার অন্তর নিজের কিংবা অন্য কারো কথা আর শুনে নি, একমাত্র আমার প্রভুর কথা ছাড়া!” হযরত আলী বিন সালিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শেষ জীবনে পৌঁছিয়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। তবে নামায ও অন্যান্য [ধর্মীয়]

আমল পালনকালে তাঁর হাত-পা স্বাভাবিক হয়ে যেতো। আমল শেষ হলেই কিন্তু হাত-পা পুনরায় পূর্বের মতো চেতনহীন হয়ে পড়তো।”

হযরত আবু ইমরান ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “[এক ভ্রমণকালে] আমাদের জাহাজ ডুবে গেলো। একখণ্ড কাষ্ঠের উপর আমি ও আমার স্ত্রী ভাসছিলাম। এ অবস্থায়ই সে একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দিল। স্ত্রী আমাকে ডেকে বললো, ‘ওগো! আমি তো পিপাসায় মারা যাবো!’ তাকে বললাম: ‘আল্লাহ আমাদের অবস্থা দেখছেন!’ আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি একব্যক্তি বাতাসের মধ্যে ভেসে আছে! তার হতে একটি স্বর্ণের তৈরি চেইন। এর এক প্রান্তে বাধা আছে রুবির তৈরি একটি পানপাত্র। তিনি আমাদেরকে বললেন: ‘পান করো!’ আমি পানপাত্রটি ধরে নিলাম ও এ থেকে উভয়ে পান করলাম। পানীয়টুকু ছিলো মিশক থেকেও সুগন্ধিময়, বরফ থেকেও ঠাণ্ডা এবং মধু থেকেও মিষ্টি। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘আপনি কে? আল্লাহ তা’আলা আপনার উপর রহমত নাজিল করুন!’ তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি আপনার মালিকের একজন গোলাম!’ বললাম, ‘আপনি কিভাবে এতো উঁচু স্তরে উন্নীত হলেন?’ জবাব দিলেন: ‘আমি নিজের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দিয়েছি। সুতরাং তিনি আমাকে বাতাসে বসিয়ে দিয়েছেন।’ এরপর তিনি আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। আমি তাঁকে আর কখনো দেখি নি।”

হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “পবিত্র কাবা ঘরের নিকটে আমি একজন যুবককে দেখতে পেলাম। তিনি অবিরত রুকু-সিজদা করছিলেন। তাঁর কাছে যেয়ে বললাম: ‘আপনি তো বেশ নামায পড়ছেন!’ তিনি জবাবে বললেন: ‘আমি প্রভুর অনুমতি চাইছি বিদায় হতে!’ এরপর চোখে পড়লো এক টুকরো কাগজ যাতে লিখা ছিলো: ‘সর্বাধিক গৌরবান্বিত ও সর্বাধিক ক্ষমাশীল থেকে আমার একান্ত বান্দার প্রতি। বিদায় হও! আমি তোমার আগে ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি!’”

একজন সুফি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরে [মদীনাতে মুনওয়ারায়] অবস্থান করছিলাম। [একদিন] মসজিদে নববীতে একদল লোকের সঙ্গে বসে আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনায় লিপ্ত হই। আমাদের কাছেই একজন অন্ধ ব্যক্তি বসা ছিলেন। তিনি মনোযোগসহ বিভিন্ন কেছা শ্রবণ করছিলেন। এক পর্যায়ে সামনে এসে বললেন, ‘আমি আপনাদের

বর্ণনাগুলো শুনছিলাম অত্যন্ত আনন্দসহ। শুনুন, আমার একটি মেয়েসহ কয়েকজন সন্তানাদি ছিলো। একটি বিশেষ স্থান থেকে লাকড়ি জমিয়ে বিক্রি করে জীবন-যাপন করতাম। একদা আমি সেখানে একজন যুবককে দেখতে পেলাম। তার পরনে সুতি জামা ও পায়ে ছিলো স্যান্ডেল। ভাবলাম, তিনি হয়তো রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তার জামাটি ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হলাম। কাছে যেয়ে বললাম, তোমার জামা খোলো! তিনি বললেন, ‘এখান থেকে চলে যাও! আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন!’ আমি জোর চালালাম। তিনবার আমি বললাম, জামা খোলে দিতে। অবশেষে তিনি বললেন, ‘তাহলে তা-ই হবে!’ আমি ও বললাম, ‘তা-ই হবে!’ তিনি আমার চোখের দিকে অঙ্গুলি ইশারা করলেন বেশ কিছু দূরে থেকে! সাথে সাথে আমার চোখ দু’টো ছিটকে বেরিয়ে পড়লো। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম: ‘আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন! আপনি কে?’ তিনি বললেন: ‘ইব্রাহিম খাওয়াস!’”

হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদা জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম। এক পর্যায়ে এক টুকরো মূল্যবান কাপড় চুরি হয়ে যায়। সবাই একজন যুবককে সন্দেহ করছিলো। আমি সকলকে বললাম, তাঁকে ছেড়ে চলে যাও! আমি তার সাথে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলে দেখি!” যুবক ছেলেটি জুব্বা দিয়ে নিজেকে আবৃত করে ঘুমোচ্ছিলো। সে যখন তার মাথা জুব্বার ভেতর থেকে বের করলো, তখন হযরত যুননুন তাকে ব্যাপারটি বললেন। যুবক বলে ওঠলো: ‘আপনি কিভাবে আমাকে একথা বললেন?’ হে আমার প্রভু! আমি আপনার দরবারে আবদার করছি, সাগরের একটি মাছও যেনো মুখে একেকটি মণি-মুক্তা ছাড়া ভেসে না ওঠে!’ আমি দেখলাম সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে অসংখ্য মাছ ভেসে ওঠলো পানির ওপর। প্রত্যেকটির মুখে ছিলো একেকটি মণি-মুক্তা। যুবক ছেলেটি তখন লাফ মেরে জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেল। এরপর সে পানির উপর পায়ে হেটে সাগর পাড়ি দিয়ে তীরে পৌঁছিয়ে গেলো।”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন মরুভূমিতে যাই। মরুভূমির মাঝখানে একজন খ্রিস্টানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার কোমরে ছিলো জিম্মিদের কোমরবন্ধ [অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট পরিচিতিমূলক বেল্ট]। তিনি আমার সাথে থাকার অনুমতি চাইলেন। সুতরাং দীর্ঘ ৭ দিন আমরা একত্রে সফর করি। তিনি আমাকে এক পর্যায়ে বললেন, ‘হে

একত্ববাদের আলিম! [হানাফিয়া] আপনার আতিথেয়তা প্রদর্শন করুন। আমরা তো ভীষণ ক্ষুধার্ত!’ বললাম: ‘ইয়া আল্লাহ! এই অবিশ্বাসীর সামনে আমাকে লজ্জিত করুন না!’ সামনেই দেখতে পেলাম একটি থালাভর্তি খাবার। এতে ছিলো ভুনা গোশত, খেজুর এবং পাশেই একটি পানিভর্তি বড়ো জগ। আমরা উভয়ে পেটপুরে খেলাম ও পান করলাম।

এরপর আরো ৭ দিনের জন্য ভ্রমণ করলাম। এবার আমি খ্রিস্টানের পূর্বেই কথা বললাম: ‘হে খ্রিস্টান পাদ্রী! এবার দেখান আপনি কি করতে পারেন! এখন তো আপনার পালা!’ তিনি তার যষ্টির উপর ভর করে [মনে মনে] প্রার্থনা করলেন। আশ্চর্য! এবার দু’টি থালাভর্তি খাবার এসে গেলো। আমার দ্বারা প্রাপ্ত খাবারের দ্বিগুণ! আমি হতভম্ব হলাম, মলিন হলো আমার মুখমণ্ডল এবং খাবার গ্রহণে বিরত রইলাম। তিনি বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও আমি খাবার খেলাম না। অবশেষে তিনি বললেন: ‘আপনার জন্য আমার নিকট দু’টি সুসংবাদ রক্ষিত আছে। প্রথমত: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল!’ তিনি তার কোমরবন্ধ খুলে ফেললেন। এরপর বললেন: ‘দ্বিতীয় সুসংবাদটি হলো, আমি যখন প্রার্থনা করি তখন বলেছিলাম, হে প্রভু! আমার সাথী তোমার এ বান্দার মূল্য যদি আপনার নিকট একটুও থেকে থাকে তাহলে তার ওয়াসিলায় আমাদেরকে কিছু খাবার দান করুন! এবং তিনি দান করেছেন।’ এরপর আমিও তার সাথে খেলাম এবং সামনে অগ্রসর হলাম। আমরা মক্কা শরীফ পৌঁছিয়ে উভয়ে হজ্জ পালন করলাম। দীর্ঘ এক বছর মক্কা মুকাররমায় আমরা অবস্থান করি। আমার সাথী সেখানেই মারা গেলেন এবং তাকে স্থানীয় কবরস্থানে [জান্নাতুল মা’আল্লায়] দাফন করা হলো।”

হযরত মুহাম্মদ বিন মুবারক সুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম ও আমি জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। দ্বিপ্রহরে সময় উপস্থিত হলে আমরা একটি ডালিম গাছের নীচে বসে পড়লাম। যুহরের নামায শেষে গাছের নিচ থেকে একটি গায়েবী আওয়াজ আমাদের কানে পৌঁছুলো: ‘আবু ইসহাক [ইব্রাহিম আদহামের কুনিয়াত]! আমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করে সম্মানিত করুন!’ ইব্রাহিম রাহ. তাঁর মাথা নত করলেন। গায়েবী আওয়াজটি তিনবার আমরা শুনতে পেলাম। এরপর আমাদের উদ্দেশ্য করে আওয়াজ

আসলো: ‘হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান, যাতে তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে সম্মানিত করেন।’ আমি তখন বললাম: ‘আবু ইসহাক! আপনি তো শুনলেন।’ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। গাছ থেকে দু’টি ডালিম পেড়ে আনলেন। নিজে একটি খেলেন ও আমাকে অপরটি দিলেন। ডালিমটির স্বাদ ছিলো চুকা! ডালিম গাছটি বেশ ছোট ও বেটে ছিলো। জেরুজালেম থেকে ফেরার পথে এই গাছের নিচ দিয়েই যাই। দেখলাম গাছটি বেশ বড় ও লম্বা হয়েছে। তার ডালিমগুলোও ছিলো মিষ্টি স্বাদের। আমি বছরে দু’বার করে গাছটি থেকে পাকা ডালিম পাড়তাম। লোকজন একে ‘নামাযীদের ডালিম গাছ’ বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। ভ্রমণকালে মানুষ এই গাছের নিচে এসে নামায আদায় করতেন।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি আবু জাফর খাসাস থেকে জাবির রাহবী রাহমাতুল্লাহির কথা শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন: “রাহবা শহরের মানুষ [বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সিরিয়ার একটি শহর] আমার নিকট প্রায়ই এসে বলতো, তারা আউলিয়ার কারামাতে বিশ্বাসী নয়। আমি একদিন একটা সিংহের পিঠে ছড়ে রাহবা শহরে প্রবেশ করি। উপস্থিত সকলকে প্রশ্ন করলাম: ‘যারা আল্লাহর ওয়ালিদেরকে মিথ্যাবাদী বলে তারা এখন কোথায় আছে?’ এরপর থেকে আর কখনও তারা আমার নিকট আসে নি।”

হযরত মনসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “একজন সুফি হযরত খিজির আলাইহিসসালামকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি কখনও কাউকে দেখেছেন যার স্তর আপনার চেয়েও উর্ধ্ব?’ তিনি জবাব দিলেন: হ্যাঁ। আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম রা. মদীনা শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করতেন। অনেক লোক তাঁর চতুর্দিকে বসে হাদিস শুনতেন। আমি একদিন লক্ষ্য করলাম এক যুবক অদূরেই বসে আছেন। তার মাথা নিজের হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগানো। আমি তাকে বললাম: ‘ও হে যুবক! আব্দুর রাজ্জাক মানুষকে হাদিস শুনাচ্ছেন আর তুমি তা শ্রবণ করতে আগ্রহী নও?’ তিনি বললেন: ‘তিনি তো বর্ণনা দিচ্ছেন ওসব লোকের বরাতে যারা মৃত, আর আমি কখনো তো আল্লাহ থেকে অনুপস্থিত নই!’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘ব্যাপারটি যদি এরূপই হয়, তাহলে বলো তো, আমি কে?’ তিনি মাথা উত্তোলন করে জবাব দিলেন: ‘আপনি আমার ভাই আবুল আব্বাস খিজির।’ আমি

বুঝতে সক্ষম হলাম, আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দাও আছেন যাদেরকে আমি চিনতে অপারগ।”

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সাথী ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ইয়াহইয়া। তিনি এমন একটি কক্ষে উপাসনা করতেন যেখানে না ছিলো সিঁড়ি কিংবা মই। অযু করতে চাইলে দরজার সামনে এসে বলতেন: ‘আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি কিংবা ক্ষমতা নেই।’ এরপর তিনি শূন্যে উড়াল দিতেন। অযু সেরে আবার বলতেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি কিংবা ক্ষমতা নেই।’ এরপর পুনরায় কক্ষে ঢুকে পড়তেন।”

হযরত আবু মুহাম্মদ জাফর সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত আবু উমর ইসতাখরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট অধ্যয়ন করেছি। যখনই কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম তখনই চলে যেতাম ইসতারায় [ইরানের ফার্স অঞ্চলের একটি পুরাতন শহর]। তাঁর সম্মুখীন হওয়ার পর সময় সময় তিনি প্রশ্ন না শুনেই জবাব দিতেন। অবশেষে তিনি আমাকে ইসতারায় ভ্রমণে বের হতে নিষেধ করলেন। সেই থেকে কোনো প্রশ্ন যখনই আমার মনে জাগ্রত হতো, তখনই তিনি ইসতারায় থেকে সাড়া দিতেন ও আমার মনে উত্তর এসে যেতো।”

কেউ একজন বলেছেন: “এক [সুফি] দরবেশ অন্ধকার কক্ষে মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা যখন তাঁকে গোসল দিতে চাইলাম তখন বাতির প্রয়োজন দাঁড়ালো। হঠাৎ একটি জানালার মধ্য দিয়ে আলো এসে কক্ষে ঢুকে পড়লো। সমগ্র কক্ষটি আলোকিত হয়ে ওঠলো। তাঁকে গোসল দেওয়ার পর পুনরায় ঐ আলোটুকু গায়েব হয়ে গেলো, যেনো তা কখনো আসেই নি।” হযরত আদম বিন আবু ইয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমরা তখন [বর্তমান ইসরাঈল-ফিলিস্তিন সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর] আসকালানে থাকতাম। প্রায়শঃই এক যুবক এসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। কথাবার্তা শেষে তিনি আমাদের সাথে নামায আদায় করতেন। একদিন তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বলে বিদায় নিলেন। আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। এক পর্যায়ে তাঁকে কয়েকটি দিরহাম হাদিয়া দিতে চাইলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। আমি বার বার অনুরোধ জানালে, তিনি নিজের চামড়ার বউলের ভেতর একমুষ্টি বালু ঢুকালেন। কিছু সাগরজল এতে মিশিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে নির্দেশ দিলেন: ‘এটি খাও!’ আমি বউলের দিকে তাকিয়ে একেবারে থ! দেখলাম মজার খাবার,

সেসাথে আছে অনেক চিনি! তিনি বললেন, ‘বলো তো, আল্লাহর সাথে যার এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান সে কি কখনো তোমার ক’টি দিরহামের প্রতি ক্রক্ষেপ করতে পারে?’ এরপর নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন:

আবেগপূর্ণ প্রেমের প্রতিজ্ঞা, যে কেউ আমায় ভালোবাসে, ভেবে দেখো আমি
কিভাবে প্রভুর সঙ্গে অতিঅভিভূত সাক্ষাতের [উযুদী] বর্ণনা করি, যা এই
সাক্ষাতকে করেছে অস্পষ্ট।

আবেগে পরিপূর্ণ হৃদয়ের জন্য অন্যত্র প্রশান্তির সন্ধানে লিপ্ত হওয়া তো
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ!”

অপর কেউ নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন:

নহে মোর হৃদয়ে নহে মোর আত্মায় আছে কোনো শূন্য স্থান, প্রেমাস্পদকে
দেখাতে,
সে-ই তো মোর আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও মহানন্দ
তারই মাধ্যমে, বেঁচে আছি যতকাল, আমার জীবন হয়েছে পুলকিত
হৃদয় যখন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন
আমি খুঁজে পাবো না কোনো নিরোগকারক শুধু তাকে ছাড়া।

فصل

ফাস্‌ল [পিরচ্ছেদ] -১০

جاءني يهودي يتقاضى عليّ في دين كان له عليّ. وأنا قاعد عند الأتون أوقد
تحت الاجر. فقال لي اليهودي: يا إبراهيم. أرني آية أسلم عليها..
فقلت له: تفعل؟! فقال: نعم. فقلت: إنزع ثوبك. فنزع، فلففته، ولففت
على ثوبه ثوبي، وطرحته في النار، ثم دخلت الأتون وأخرجت الثوب من
وسط النار وخرجت من الباب الآخر، فإذا ثيابي بجاها لم يصيبها شيء،
وثيابه في وسطها صارت حراقة، فأسلم اليهودي.

وقيل: كان حبيب العجمي يُرى بالبصرة يوم الترويه، ويوم عرفة بعرفات سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: تزوج عباس بن المهدي امرأة، فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه ندامة، فلما أراد الدنو منها أجزع عنها، فامتنع من وطئها، وخرج.. فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج!! قال الأستاذ الإمام: هذا هو الكرامة على الحقيقة؛ حيث حفظ عليه العلم.

وقيل: كان الفضيل بن عياض على جبل من جبل منى، فقال: لو أن ولياً من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يمشي لمد، قال: فتحرك الجبل. فقال: أسكن، لم أردك بهذا!! فسكن الجبل. وقال عبد الواحد بن زيد لأبي عاصم البصري: كيف صنعت حين طلبك الحجاج؟ قال: كنت في غرفتي فدقوا على الباب، فدخلوا، فدفعني بي دفعة، فإذا أنا على جبل أبي قبيس بمكة، فقال له عبد الواحد: من أين كنت تأكل؟ قال: كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطاري بالريغفين اللذين كنت آكلهما بالبصرة.

فقال عبد الواحد: تلك الدنيا أمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم. وقيل: كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ولا يستقبله أحد إلا أعطاه شيئاً، فكان إذا أتى منزله رمى إليه بالدراهم، فتكون بمقدار ما أخذه لم ينقص شيئاً.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت أبا أحمد الكبير يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: يقول: سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول: دخلت على الجنيد، وكنت أريد أن أخرج إلى الحج، فأعطاني درهماً

صحيحاً، فشددته على مئزري، فلم أدخل منزلاً إلا وجدت فيه رفقاء، ولم أحتج إلى الدرهم؛ فلما حججت، ورجعت إلى بغداد دخلت على الجنيد. فمدّ يده وقال: هات، فناولته الدرهم، فقال: كيف كان؟ فقلت: كان الختم نافذاً.

وحكي عن أبي جعفر الأعور قال: كنت عند ذي النون المصري، فتذاكرنا حديث طاعة الأشياء للأولياء، فقال ذو النون. من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور في أربع زوايا البيت، ثم يرع إلى مكانه فيفعل، قال فدار السرير في أربع زوايا البيت وعاد إلى مكانه. وكان هناك شاب فأخذ يبكي حتى مات في الوقت.

وقيل: إن واصلاً الأحذب قرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ والله لا طلبته أبداً!! فدخل خربة ومكث يومين فلم يظهر له شيء. فاشتد عليه، فلما كان اليوم الثالث إذا بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن منه نية، فصار معه، فإذن: قد صار دوختين فلم يزل ذلك حالهما حتى فرق بينهما الموت.

وقال بعضهم: أشرفت على إبراهيم بن إبراهيم، وهو في بستان يحفظه، وقد أخذه النوم، وإذا حية في فيها طاقة نرجس تروّحه بها.

وقيل: كان جماعة من أيوب السجستاني في السفر فأعياهم طلب الماء، فقال أيوب: أتسترون عليّ ما عشت؟ فقالوا: نعم، فدور دائرة فنبع الماء، فشربنا فقال: فلما دخلنا البصرة أخبر به حماد بن زيد، فقال عبد الواحد بن زيد شهدت معه ذلك اليوم.

وقال بكر بن عبد الرحمن: كنا مع ذي النون المصري في البادية، فنزلنا

تحت شجرت من أم غيلان فقلنا: ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب؛ فتبسم ذو النون وقال أأشتهون الرطب؟ وحرّك الشجرة وقال: أقسمت عليك بالذي ابتدأك وخلقك شجرت إلا نثرت علينا رطباً جنياً.. ثم حرّكها، فنثرت رطباً جنياً. فأكلنا وشعبنا. ثم نمنا فانتبهنّا وحرّكنا الشجرة فنثرت علينا شوكةً.

وحكي عن أبي القاسم بن مروان النهاوندي قال: كنت أنا وأبو بكر الوراق مع أبي سعيد الخراز نمشي على ساحل البحر نحو صيدا فرأى شخصاً من بعدي، فقال: اجلسوا. لا يخلوا هذا الشخص أن يكون ولياً من أولياء الله. قال: فما لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه. وبيده ركوة ومحبرة وعلين مرقعة. فالتفت أبو سعيد إليه منكرّاً عليه لحمله المحبرة مع الركوة فقال له: يا فتى، كيف الطرق إلى الله تعالى؟ فقال: يا أبا سعيد، أعرف إلى الله طريقين: طريقاً خاصاً، وطريقاً عاماً، فأما الطريق العام فالذي أنت عليه. وأما الطريق الخاص: فهلم، ثم مشى على الماء حتى غاب عن أعيننا. فبقي أبو سعيد حيران مما رأى!! وقال الجنيد: جئت مسجد الشونزية فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون في الآيات فقال فقير منهم: أعرف رجلاً لو قال لهذه الأسطوانة كوني ذهباً نصفك، ونصفك فضةً كانت.. قال الجنيد: فنظرت. فإذا الأسطوانة نصفها ذهب ونصفها فضة.

قيا: حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي، فعرض لهما سبع، فقال سفيان لشيبان: أما ترى هذا السبع؟ فقال: لا تخف. فأخذ شيبان أذنه فعرّكها... فبصبص وحرّك ذنبه.. فقال سفيان: ما هذه الشهرة؟! فقال: لو لا مخافة

الشهرة لما وضعت زادي إلا على ظهره حتى آتي مكة!! وحكي أن السري لما ترك التجارة كانت أخته تنفق عليه من ثمن غزلها. فأبطأت يوماً، فقال لها السري: لم أبطأت؟! فقالت: لأن غزلي لم يشتر، وذكروا أنه مخلط. فامتنع السري عن طعامها ثم إن أخته دخلت عليه يوماً فرأت عنده عجوزاً تكنس بيته، وتحمل إليه كل يوم رغيفين فحزنت أخته وشكت من أكل طعامها قبيض الله لي الدنيا لتنفق علي وتخدمني.

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا علي بن هارون قال: حدثنا علي ابن أبي التميمي قال: حدثنا جعفر بن القاسم الخواص قال: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: كنت عند أبي محفوظ معروف الكرخي، فدعا لي؛ فرجعت إليه من الغد وفي وجهه أثر، فقال له إنسان: يا أبا محفوظ، كنا عندك بالأمس ولم يكن بوجهك هذا الأثر، فما هذا؟! فقال: سل عما يعنيك!! فقال الرجل: بمعبودك أن تقول، فقال: صليت البارحة هاهنا، واشتهيت أن أطوف بالبيت، فمضيت إلى مكة، وطفيت، ثم ملت إلى زمزم؛ لأشرب من مائها. فزلقت على الباب، فأصاب وجهي ما تراه.

وقيل: كان عتبة الغلام يقعد فيقول: يا ورشان إن كنت أطوع لله عز وجل مني فتعال واقعد على كفي؛ فيجيء الورشان ويقعد على كفه. وحكي عن أبي علي الرازي أنه قال: مررت يوماً على الفرات، فعرضت لنفسي شهوة السمك الطري، فإذا الماء قد قذف سمكة نحوي، وإذا رجل يعدو ويقول: أشويها لك؟ فقلت: نعم. فشواها، فقعت وأكلتها.

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم في رفقة فعبض لهم السبع؛ فقالوا: يا أبا

إسحاق قد عرض لنا السبع!! فجاء إبراهيم وقال: يا أسد، إن كنت أمرت
فينا بشيء فامض، وإلا فارجع. فرجع الأسد، ومضوا.
وقال حامد الأسود: كنت مع الخواص في البرية، فبتنا عند شجرة، إذ جاء
السبع، فصعدت الشجرة إلى الصباح لا يأخذني النوم، ونام إبراهيم
الخواص والسبع يشم من رأسه إلى قدمه.. ثم مضى.
فلما كانت الليلة الثانية بتنا في مسجد في قرية، فوقعت بقّة على وجهه
فضربته، فأنّ أنّة، فقلت: هذا عجيب، البارحة لم تجزع من الأسد، والليلة
تصيح من البقّ!!؟ فقال: أما البارحة، فتلك حالة كنت فيها بالله عز وجل،
وأما الليلة، فهذه حالة أنا فيها بنفسي.
وحكي عن عطاء الأزرق: أنه دفعت إليه امرأته درهمين من ثمن غزلها؛
ليشتري لهم شيئاً من الدقيق، فخرج من بيته، فلقي جارية تبكي، فقال لها:
ما بالك؟ فقالت: دفع إلي مولاي درهمين اشتري لهم شيئاً. فسقطا مني
فأخاف أن يضربني!! فدفع عطاء الدرهمين إليها. ومرّ. وقعد على حانوت
صديق له ممن يشق الصاج وذكر له الحال وما يخاف من سوء خلق امرأته.
فقال له صاحبه: خذ من هذه النشارة في هذا الجراب لعلكم تنتفعون بها
في سحر التنور؛ إذ ليس يساعدني الإمكان في شيء آخر.. فحمل النشارة،
وفتح باب داره، ورمى بالجراب، وردّ الباب ودخل المسجد إلى ما بعد
العتمة؛ ليكون النوم أخذهم ولا تستطيل عليه المرأة، فلما فتح الباب
وجدتهم يخبزون الخبز؛ فقال: من أين لكم هذا الخبز؟ فقالوا: من الدقيق
الذي كان في الجراب. لا تشتري من غير هذا الدقيق! قال: أفعل إن شاء الله.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله

يقول: سمعت أبا جعفر بن بركات يقول: كنت أجالس الفقراء، ففتح عليّ بدينار، فأردت أن أدفعه إليهم، ثم قلت في نفسي: لعلّي أحتاج إليه.. فهاج بي وجع الضرس، فقلعت سنّاً، فوجعت الأخرى حتى قلعتها..

فهتف بي هاتف: إن لم تدفع إليهم الدينار، فلا يبقى في فمك سنٌّ واحدة!. قال الأستاذ: وهذا في باب الكرامة أتم من أن كان يفتح عليه بدنائير كثيرة تنقض العادة.

وحكى أبو سليمان الداراني قال: خرج عامر بن قيس إلى الشام، ومعه شكوة إذا شاء صبّ منها ماء ليتوضأ للصلاة، وإذا شاء صبّ منها لبناً يشربه.

وروى عثمان بن أبي العاتكة قال: كنا في غزاة الأرض الروم، فبعث الوالي سرية إلى موضع، وجعل الميعاد في يوم كذا.

قال: فجاء الميعاد ولم تقدم السرية، فبينما أبو مسلم يصلي إلى رحمه الذي ركزه بالأرض إذ جاء طائر إلى رأس السنان وقال: إن السرية قد سلمت وغنمت وسيردون عليكم يوم كذا في وقت كذا.

فقال أبو مسلم للطير: من أنت، رحمك الله تعالى؟ فقال: أنا مذهب الحزن عن قلوب المؤمنين.

فجاء أبو مسلم إلى الوالي وأخبره بذلك، فلما كان اليوم الذي قال أتت السرية على الوجه الذي قال.

وعن بعضهم قال: كنا في مركب فمات رجل كان معنا عليل، فأخذنا في جهازه، وأردنا أن نلقيه في البحر فصار البحر جافاً، ونزلت السفينة، فخرجنا وحفرنا له قبراً، ودفناه، فلما فرغنا استوى الماء، وارتفع المركب،

وسرنا.

وقيل: إن الناس أصابتهم مجاعة بالبصرة، فاشترى حبيب العجمي طعاماً بالنسيئة، وفرقه على المساكين وأخذ كيسه فجعله تحت رأسه، فلما جاءوا يتقاضونه أخذه، وإذا هو مملوء دراهم، ففضى منها ديونهم.
وقيل: أراد إبراهيم بن أدهم أن يركب السفينة فأبوا إلا أن يعطيهم ديناراً، فصلى على الشط ركعتين، وقال: اللَّهُمَّ إنهم قد سألوني ما ليس عندي، فصار الرمل بين يديه دنائير.

حدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا محمد بن أحمد المروزي قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: قال أبو حمزة نصر بن الفرج خادم أبي معاوية الأسود قال: كان أبو معاوية ذهب بصره، فإذا أراد أن يقرأ نثر المصحف فيرد الله عليه بصره، فإذا أطبق المصحف ذهب بصره..

وقال أحمد بن الهيثم المتطيب: قال لي بشر الحافي: قل المعروف الكرخي: إذا صليت جئتكَ؛ قال: فأديت الرسالة وانتظرت، فصلينا الظهر ولم يجيء، ثم صلينا العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، فقلت في نفسي: سبحان الله مثل بشر يقول شيئاً ثم لا يفعل!! لا يجوز أن لا يفعل!!... وانتظرت وأنا فوق مسجد على مشرعة، فجاء بشر بعد هوى من الليل، وعلى رأسه سجادة، فتقدم إلى دجلة ومشى على الماء، فرميت بنفسي من السطح، وقبلت يديه ورجليه، وقلت: ادع الله لي، فدعا لي، وقال: استره علي. قال: فلم أتكلم بهذا حتى مات.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي قال: حدثنا أبو الفرج الورثاني قال: سمعت

علي بن يعقوب بدمشق قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت قاسماً الجرعي يقول: رأيت رجلاً في الطواف لا يزيد على قوله: إلهي، قضيت حوائج الكل ولم تقض حاجتي.. فقلت: مالك لا تزيد على هذا الدعاء؟

فقال: أحدثك.. اعلم أنا كنا سبعة أنفس من بلدان شتى، فخرجنا إلى الجهاد، فأسرنا الروم، ومضوا بنا لنقتل؛ فرأيت سبعة أبواب فتحت من السماء وعلى كل باب جارية حسناء من الحور العين، فقدم واحد منا فضربت عنقه، فرأيت جارية منهم هبطت إلى الأرض وبيدها منديل فقبضت روحه حتى ضربت أعناق ستة منا، فاستوهبني بعض رجالهم، فقلت الجارية: أيُّ شيء فاتك يا محروم!!! وغلّقت الأبواب؛ فأنا يا أخي متأسف متحسر على ما فاتني...
قال قاسم الجرعي: أراه أفضلهم، لأنه رأى ما لم يروا.. وعمل على الشرق بعدهم.

وسمعتة يقول: سمعت أبا النجم أحمد بن الحسين بنجورستان يقول سمعت أبا بكر الكتاني يقول: كنت في طريق مكة في وسط السنة، فإذا أنا بهميان ملآن يلتمع دنانير، فهممت أن أحمله لأفرقه على فقراء مكة، فهتف هاتف: إن أخذته سلبناك فقرك..

حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا أحمد بن يوسف الخياط قال: سمعت أبا علي الروذباري يقول: سمعت العباس الشرقي يقول: كنا مع أبي تراب النخشي في طريق مكة، فعدل عن الطريق إلى ناحية فقال له بعض أصحابه: أنا عطشان. فضرب برجله إلى الأرض فإذا الأرض

عين من ماء زلال، فقال الفتى: أحب أن أشربه ف قدح، ف ضرب بيده إلى الأرض فناولوه قدحاً من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت، فشرب وسقانا، وما زال القدح معنا إلى مكة فقال لي أبو تراب يوماً: ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم الله بها عباده؟..

فقلت: ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن بها. فقال: من لم يؤمن بها فقد كفر، إنما سألتك من طريق الأحوال. فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه.

قال: بلى، قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق، وليس الأمر كذلك، إنما الخدع في حال السكون إليها، فأما من لم يقترح ذلك، ولم يساكنها فتلك مرتبة المرَبَّانيين.

حدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا أبو الفج الورثاني قال: سمعت محمد بن الحسين الخلامي بطرسوس قال: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كنا في غرفة سرِّي السقطي ببغداد، فلما ذهب من الليل شيء لبس قميصاً نظيفاً وسراويل ورداء ونعلاً، وقال ليخرج؛ فقلت: إلى أين في هذا الوقت؟ فقال: أعود فتحاً الموصل.

فلما مشى في طرقات بغداد أخذه العسس وحبسوه، فلما كان من الغد أمر بضربه مع المحبوسين، فلما رفع الجلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر أن يحركها فليل للجلاد: اضرب!! فقال: بحذائي شيخ واقف يقول لي لا تضربه، فتقف يدي لا تتحرك.

فنظروا من الرجل، فإذا هو فتح الموصل؛ فلم يضربوه.

অনুবাদ: [হযরত ইব্রাহিম আজুরী রামাতুল্লাহি আলাইহি বলেন]: “একজন ইয়াহুদি আমার নিকট আসলেন। তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। সেটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য দাবী জানালেন। এ সময় আমি বসা ছিলাম ইট পুড়ানোর একটি চুল্লির [আজুর] নিকট। ইয়াহুদি আমাকে বললেন: ‘ইব্রাহিম! আমাকে একটি কারামাত দেখাও যাতে আমি মুসলমান হয়ে যাই!’। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সত্যিই হয়ে যাবে?’ তিনি সম্মতি জানালেন। আমি বললাম, ‘তোমার বহির-বস্ত্র খোলে ফেলো!’ আমি তার কাপড় ভাঁজ করে আমার নিজেরটি দ্বারা পেঁচিয়ে দিলাম। এরপর উভয় কাপড় অগ্নিতে উত্তপ্ত চুল্লির ভেতর ফেলে দিলাম! কিছুক্ষণ পর আগুন থেকে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসলাম। সুবহানাল্লাহ! দেখলাম, আমার কাপড়টি সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রয়েছে। কিন্তু ইয়াহুদির কাপড়টি জ্বলে ছাই! সাথে সাথে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন।”

বর্ণিত আছে হযরত হাবিবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইয়াওমুত তারবিয়া [আরাফাত দিবসের আগের দিন] দিবসে বসরা শহরে দেখা গেলো গোসল করছেন। এর পরের দিন ছিলো আরাফাত দিবস [ইয়াওমুল আরাফাত]। তিনি এদিন সেখানে উপস্থিত হয়ে উকুফ করতেও দেখা গেছে।

আমি হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছি, তিনি হযরত আহমদ বিন আবদুল্লাহ ফারগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছেন: “হযরত আব্বাস বিন মুহতাদী একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের রাতেই কিন্তু গভীর অনুশোচনায় আক্রান্ত হলেন। তিনি যখন স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে চাইলেন তখন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে আটকে রাখলো [যুজিরা আনহা]। তিনি কিছুতেই স্ত্রীকে ছুঁতে পারলেন না। সুতরাং তিনি তাকে তালাক দিলেন। তিন দিন পরে জানা গেলো এই মহিলা আরেক জনের স্ত্রী।”

শায়খ ও ইমাম [কুশাইরী] মন্তব্য করেন: ‘এটা একটি সত্যিকার কারামাত। কারণ তাঁর ধর্মজ্ঞান তাঁকে একই মহিলার সঙ্গে দু’জন স্বামী একই সাথে থাকা থেকে বিরত রেখেছে!’

বর্ণিত আছে হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা নিজেকে মিনার উপত্যকায় একটি পাহাড়ের উপর উপস্থিত হয়েছেন দেখলেন। তিনি বললেন, ‘যদি আল্লাহর কোনো বন্ধুজন এই পাহাড়কে নির্দেশ দিতেন, তাহলে এটা কাঁপতে থাকতো।’ তাঁর কথা শেষ হতেই পাহাড়টি কাঁপতে শুরু

করলো! তিনি বললেন, ‘আরে! কান্ত হও! আমি তো তোমাকে কাঁপতে বলি নি!’ সাথে সাথে পাহাড়টি স্থির হয়ে গেলো।”

হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু আসিম বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন: ‘হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ যখন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এলো তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিলো?’ জবাব দিলেন: ‘আমি তখন কক্ষের ভেতর ছিলাম। তারা দরজার কড়ায় নাড়া দিয়ে ভেতরে আসলো। আমি তখন নিজেকে নিজেই একটি ধাক্কা মারলাম। দেখলাম, মক্কা মুকাররমার জাবালে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থান করছি!’ হযরত জায়িদ আবার প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি পাহাড়ের উপরে থেকে কিভাবে আহার করলেন?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘যখনই ইফতারের সময় আসতো, এক বৃদ্ধা পাহাড় বেয়ে উপরে আসতেন আমার জন্য দু’টুকরো রুটি নিয়ে, যা আমি বসরায় থাকতে আহার করতাম।’ হযরত জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব কথা শ্রবণ করে মন্তব্য করেন, ‘আবু আসিমকে খেদমত করতে আল্লাহ তা’আলা সমগ্র আলমকে নির্দেশ দিয়েছেন।”

ALL RIGHTS RESERVED

বর্ণিত আছে হযরত আমির বিন আবদুল ক্বায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সৈনিক ভাতা পেতেন। অর্থ নিয়ে আসার সময় রাস্তায় যার সাথেই তার সাক্ষাৎ ঘটতো তিনি এর সবটুকু হাদিয়া দিতেন। বাড়িতে ফেরার পর পকেটে হাত রেখে দেখতেন সব মূদ্রাই অপরিবর্তিত রয়েছে। একটুও কমে নি। আমি [ইমাম কুশাইরি] আবু আবদুল্লাহ শিরাজীর মাধ্যমে শুনেছি, হযরত আবু আমর যাজ্জায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে একটি বাস্তব দিনার হাদিয়া দিলেন। আমি এটি সতর্কতার সাথে নিজের কোমর-বস্ত্রের মধ্যে ঐটে রাখি।

ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে যেখানেই কারো ঘরে মেহমান হিসাবে প্রবেশ করেছি সেখানেই বন্ধু-বান্ধব পাই। ফলে ঐ দিরহাম ব্যয় করার সুযোগ বা প্রয়োজন হয় নি। [হজ্জ শেষে] যখন আমি বাগদাদে ফিরে আসি, তখন আবার হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে

বললেন: ‘এটি আমাকে ফেরৎ দাও!’ তারপর জিজ্ঞেস করলেন: ‘কিরূপ ছিলো?’
জবাব দিলাম: ‘অধ্যাদেশ পূরণ হয়েছে!’”

হযরত আবু জাফর আওয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলাম। কিভাবে আল্লাহর ওয়ালিদের নির্দেশ বিভিন্ন বস্তু মান্য করে সে ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিলো। হযরত যুননুন বললেন, ‘এরূপ নির্দেশ মানার একটি উদাহরণ হলো, আমি এই বসার গদিটিকে নির্দেশ দিলাম, যাও! এই কক্ষের চারটি কোণ পর্যন্ত বেড়িয়ে তোমার স্বস্থানে ফিরে আসো!’ কথা শেষ হতেই গদিটি কক্ষের চার কোণে গেলো এবং ফিরে আসলো তার আগের জায়গায়। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত এক যুবক কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর মৃত্যুবরণ করলেন।”

বর্ণিত আছে হযরত ওয়াসিল আহবাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন: আয়াত, Subidbazar, Sylhet

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

অর্থঃ: “আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।” [জারিয়াত : ২২]

তখন তিনি বলে ওঠলেন: ‘আমার রিজিক আকাশে, আর আমি এর সন্ধান লিপ্ত হয়েছি এখানে- এই জমিনে! আল্লাহর কসম! আমি কখনো আর এর জন্য অনুসন্ধান করবো না!’ তিনি একটি ধ্বংসস্থলে আবৃত বিরান ভূমিতে বসবাস করতে লাগলেন। দু’দিন কেটে গেলো। কোনো খাবারই মিললো না। তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। তৃতীয় দিন খেজুর পত্রের তৈরি একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর তার সম্মুখে হাজির হলো। তাঁর এক ভাই ছিলেন যার নিয়তের দৃঢ়তা তাঁর চেয়েও শক্তিশালী ছিলো। তিনিও এখানে আসলেন। সাথে সাথে আরেকটি খেজুরভর্তি ঝুড়ির আবির্ভাব ঘটলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উভয়েই বাকী জীবন এখানে কাটিয়ে দিলেন।

একজন সুফি বলেন: “হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক রাতে দেখলাম একটি বাগান পাহারা দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তিনি ক্লান্তি হেতু নিদ্রামগ্ন হলেন। লক্ষ্য করলাম মুখে একগুচ্ছ নার্কিস ফুলসহ একটি সর্প এসেছে। সে হযরতকে এর দ্বারা বাতাস করতে লাগলো।”

এটা বর্ণিত আছে: “একদল লোক হযরত আইউব সাকতিয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ভ্রমণে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সকলেই ভীষণভাবে পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। পানির কোনো সন্ধানই মিললো না। হযরত আইউব সকলকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আমার অবস্থার ব্যাপারটি যতোদিন জীবিত আছি, ততোদিন পর্যন্ত কি গোপন রাখবে?’ তারা রাজী হলেন। হযরত আইউব ঘুরতে লাগলেন। আশ্চর্য! তার পদতলে পানিতে পরিপূর্ণ একটি কূপের আবির্ভাব ঘটলো। সকলেই এ থেকে তৃপ্তিসহ পানি পান করলেন। বসরায় পৌঁছার পর হাম্মাদ বিন জায়িদ এই ঘটনাটির কথা ব্যক্ত করলেন। হযরত আবদুল ওয়াহিদ জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেন। বললেন: ‘এদিন আমি নিজেই তাঁর সাথে থেকে ঘটনাটি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।’”

হযরত বকর বিন আবদুর রাহমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একটি মরুভূমিতে অবস্থান করছিলাম। আমরা একটি বাবলাবৃক্ষের [উন্মে গাইলান] ছায়ায় বসা ছিলাম। আমি বললাম: ‘যদি এখানে খেজুর থাকতো তাহলে কতো না ভালো হতো!’ তিনি বাবলা গাছে ধরে নাড়া দিলেন ও বললেন: ‘যিনি তোকে গাছ হিসাবে সৃষ্টি করছেন তাঁর নামে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের উপর খেজুর বর্ষণ কর!’ তিনি পুনরায় গাছটিকে ধরে ঝাকুনি দিলেন। সত্যিই দেখা গেলো, গাছ থেকে অসংখ্য তাজা খেজুর ঝরে পড়ছে। আমরা তৃপ্তিসহ এগুলো ভক্ষণ করলাম। এরপর উভয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যাই। জেগে ওঠে পুনরায় গাছে নাড়া দিলাম। কিন্তু এখন গাছ থেকে পড়তে লাগলো অসংখ্য কাঁটা!”

হযরত আবুল কাসিম বিন মারওয়ান নিহাওয়ান্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: “কোনো একদিন হযরত আবু বকর ওয়াররাক এবং আমি হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সমুদ্র সৈকতের উপর দিয়ে সাইদা [বর্তমান লেবাননের ‘সিডন’ নামক পুরাতন একটি জনপদ] শহরের দিকে হাঁটছিলাম। হযরত খাররাজ বেশ দূরে কাউকে হাঁটতে দেখে বললেন: ‘এসো, আমরা বসে পড়ি, ঐ ব্যক্তি সম্ভবত আল্লাহর কেনো ওয়ালি হবেন!’

কিছুক্ষণ পর একজন সুদর্শন যুবক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাঁধে ঝুলন্ত আছে ভিক্ষাবস্ত্রের জন্য নির্মিত চামড়ার ঝুলি, হাতে কালির দোয়াত এবং পরনে তালিযুক্ত জুবা। আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একই সাথে কালির দোয়াত

ও ভিক্ষার ঝুলি বহনের জন্য তাকে তিরস্কার করতে তার প্রতি ফিরে তাকালেন। বললেন: ‘হে যুবক! আল্লাহ তা’আলা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাগুলো কি?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘আবু সাঈদ! আমি দু’টি মাত্র রাস্তার সন্ধান পেয়েছি: প্রথমটি হলো সাধারণের ও দ্বিতীয়টি বিশেষ ব্যক্তির জন্য খাস। আপনি আছেন সাধারণ রাস্তার ওপর! আর বিশেষ ব্যক্তিদের রাস্তা কি তা বুঝার জন্য আমাকে সুযোগ দিন।’ তিনি তখন সাগরের পানির উপর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু সাঈদ সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একবার সুনিজিয়া মসজিদে গেলাম [বাগদাদের একটি মসজিদ ও কবরস্থান]। সেখানে একদল সুফির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। তাঁরা আল্লাহ তা’আলার নিদর্শনসমূহ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, ‘আমি এক ব্যক্তিকে চিনি, যার নির্দেশে [সামনের] এই পিলারটি অর্ধেক স্বর্ণ ও অর্ধেক রৌপ্যে পরিণত হয়ে যাবে।’ [হযরত জুনাইদ বলেন] আমি লক্ষ্য করলাম, ঐ পিলারটি ঠিকই অর্ধেক স্বর্ণ ও অর্ধেক রৌপ্যে পরিণত হয়ে গেছে!”

বর্ণিত আছে হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার হযরত শাইবান রাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একটি সিংহের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত সুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি চিৎকার দিলেন, ‘হযরত! আপনি ঐ সিংহটি দেখছেন?’ শাইবান রাহ. শান্তভাবে বললেন, ‘ভয় করো না!’। তিনি সিংহের নিকটে যেয়ে তার কানে হাত বুলালেন। সিংহ তার লেজ তুলে ঘুরাতে লাগলো। সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অভিযোগের সুরে বললেন, ‘এটা কি দান্তিকতার পর্যায়ে যায় না?’ শাইবান জবাব দিলেন, ‘দান্তিকতার ভয় যদি থাকতো না, তাহলে আমি এর পিঠে রসদপত্রের বোঝা রেখে দিতাম। সে তা বহন করে সুদূর মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত নিয়ে যেতো!’”

বর্ণিত আছে হযরত সাররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন তখন তাঁর এক বোন সুতা বুনে বিক্রি করে যা আয় হতো তা থেকে তাঁকে খাবার কিনে দিতেন। একদিন বেশ দেরিতে বোন তার ভাইয়ের ঘরে আসলেন। কারণ জানতে চাইলে বোন বললেন, ‘আমার বুনা সুতা বিক্রয় হয়নি, মানুষ বলে এটা নাকি নিলুমানের।’ এ রাতে হযরত সাক্বাতি

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বোনের দেওয়া খাবার খেলেন না। কয়েকদিন পর বোন যখন হযরতের ঘরে আসলেন তখন দেখলেন, এক বৃদ্ধা তাঁর কক্ষটি পরিষ্কার করছেন। এই বৃদ্ধা দৈনিক দু'টুকরো রুটিও হযরতের জন্য নিয়ে আসছিলেন। বোন বেশ দুঃখিত হলেন। তিনি হযরত আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যাপারটি হযরত সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অবগত করলেন। জবাবে হযরত সাক্বাতি বললেন, ‘আমি যখন বোনের খাবার থেকে বিরত থাকি, তখন আল্লাহ তা’আলা পৃথিবীকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন আমাকে সাহায্য ও খিদমাত করার জন্য।’

হযরত মুহাম্মদ বিন মনসুর তুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন হযরত আবু মাহফুজ মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতে ছিলাম। তিনি আমার জন্য দু’আ করলেন। পরের দিন তাঁর দরবারে ফিরে দেখি হযরতের মুখে একটি কাটার দাগ রয়েছে। উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবু মাহফুজ! আমরা আপনার সঙ্গে সেদিনও ছিলাম। আপনার মুখমণ্ডলে কাটার দাগ দেখি নি, এখন এটা কিভাবে হলো?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘যাকিছু তোমার ক্ষেত্রে জরুরী, তা-ই আমাকে জিজ্ঞেস করো!’ কিন্তু তিনি ছিলেন নাছুড়বান্দা। বার বার কারণ জানতে চাইলেন, বললেন: ‘আপনি যাঁর ইদাবত করেন তাঁর ওয়াস্তে আপনি বলুন, কিভাবে এ দাগ পড়লো?’ অবশেষে হযরত মারুফ রাহ. বললেন: ‘গত রাতে এখানে নামায আদায় করার পর মন চাইলো কাবা শরীফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করবো! [তিনি ছিলেন শত শত মাইল দূরে কারখ শহরে] আমি মক্কা শরীফ চলে গেলাম। তাওয়াফ শেষে জমজম কূপের নিকট গেলাম পানি পান করতে। দরজার সম্মুখে পা পিছলে পড়ে গেলাম। এতেই আমার মুখের কিছু অংশ কেটে গেলো, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছে।”

বর্ণিত আছে হযরত উতবা গোলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসতেন ও বলতেন: ‘হে কচ্ছপ-ঘুঘু! তুমি যদি আমার চেয়েও বেশি আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যশীল জীবী হয়ে থাকো তাহলে এসো, আমার হাতে স্থির হয়ে বসো!’ বাস্তবিকই কচ্ছপ-ঘুঘু এসে তাঁর হাতে স্থির হয়ে বসে পড়তো। হযরত আবু আলী রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন ফোরাত নদীর তীরে হাঁটছিলাম। মনে আগ্রহ জন্মালো তাজা মাছ খাবো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, নদীর মধ্যে বড়

একটি ঢেউ ওঠে আমার দিকে চলে আসলো। পানি চলে যাওয়ার পর দেখলাম বড় একটি তাজা মাছ আমার কাছেই ছটফট করছে। এক ব্যক্তি ছুটে আসলেন। বললেন, ‘আমি কি এটা পুড়ে আপনার জন্য কাবাব বানাবো?’ বললাম, ‘হ্যাঁ, তাই করুন।’ এরপর বসে বসে এটা খেলাম।”

বর্ণিত আছে হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদল লোকসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি সিংহ এসে তাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। তারা চিৎকার দিল, ‘হে আবু ইসহাক! একটি হিংস আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে!’ হযরত ইব্রাহিম রাহ. এগিয়ে যেয়ে সিংহকে বললেন: ‘হে সিংহ! তোমাকে যদি নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে আমাদের ওপর কিছু করতে, তাহলে তা পালন করো। অন্যথায় এখান থেকে চলে যাও!’ সিংহটি সাথে সাথে চলে গেলো। কাফেলাও গন্তব্যপথে পড়ি জমালো।

হযরত হামিদ আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে একটি মরুভূমিতে অবস্থান করছিলাম। সন্ধ্যা আসন্ন দেখে একটি গাছের নিচে আমরা তাঁবু ফেললাম। রাতে একটি সিংহ আমাদের দিকে আসছে দেখে আমি গাছের উপর আরোহণ করলাম। সারারাত নিদ্রাহীন অবস্থায় সেখানে রইলাম। এদিকে ইব্রাহিম তাঁবুর ভেতর খুব নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। [ভোরে] এক পর্যায়ে দেখলাম, সিংহটি হযরতের দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার নাক দিয়ে শূঁকে চলে গেলো। আমরা দ্বিতীয় রাত গ্রামের একটি মসজিদে কাটলাম। রাতে একটি ডাঁশ হযরত খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুখমণ্ডলে বসে কামড় দিলো। তিনি সজোরে ‘আহ!’ শব্দ উচ্চারণ করলেন। আমি বললাম: ‘আশ্চর্যের ব্যাপার! গত রাতে আপনি সিংহকেও ভয় করলেন না। অথচ আজ রাতে একটি ছোট ডাঁশের কামড় খেয়ে চিৎকার দিলেন!’ তিনি বললেন: ‘দেখো! গত রাতে আমার আধ্যাত্মিক স্থিতি ছিলো আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে, আর আজ ছিলো নিজের সাথে।”

বর্ণিত আছে হযরত আ’তা রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্ত্রী তাঁকে দু’টো দিরহাম দিয়েছিলেন। তিনি এই মূদ্রা দু’টো সুতা বুনে আয় করেন। তার ইচ্ছা ছিলো হযরত আ’তা কিছু আঠা ক্রয় করে নিয়ে আসবেন। ঘর থেকে বের হওয়ার পর হযরত আ’তার সঙ্গে একটি দাসী মেয়ের সাক্ষাৎ ঘটলো। মেয়েটি অব্যবহার ধারায় অশ্রু ফেলছিলো। তিনি জানতে চাইলেন, তার কি হয়েছে? সে

বললো: ‘আমার মালিক আমাকে দু’টো দিনার দিয়েছিলেন কিছু ক্রয় করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি এগুলো হারিয়ে ফেলেছি। ফেরৎ যাওয়ার পর তিনি আমাকে মারধোর করবেন, তাই ভয়ে কাঁদছি।’ হযরত আ’তা তার দু’টো দিরহাম মেয়েকে দিয়ে চলে গেলেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর দোকানে যেয়ে বসলেন। লোকটি সেগুন কাঠের ব্যবসা করতেন। তিনি সকল কথা খুলে বললেন। জানালেন, আঠা ছাড়া বাড়ি ফিরলে তাঁর অতিরাগী স্ত্রী কি না বলে? তাঁর ভয় হচ্ছিলো। বন্ধু বললেন, ‘ঐ থলের মধ্যে কিছু করাতে গুঁড়ো আছে। ওটা নিয়ে যাও। এ মুহূর্তে অন্য কোনোভাবে তোমাকে সাহায্য করতে অপারগ।’ সুতরাং তিনি ঐ থলেটি নিয়েই বাড়ি ফিরলেন। কক্ষের ভেতর থলেটি রেখে চলে গেলেন মসজিদে। ইশার নামাযের পূর্বে ফিরে আসলেন না। দেরি করার উদ্দেশ্য ছিলো নিজের সন্তানাদিকে ঘুমিয়ে পড়তে দেওয়া ও স্ত্রীর গোস্বা থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর স্ত্রী রুটি বানাচ্ছেন! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আঠা পেলে কোথায়? স্ত্রী জবাব দিলেন, ‘কেনো? তুমি তো এক থলে আঠা এনে রাখলে! আর আঠা কিনবে না।’ তিনি বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ! আমি তা-ই করবো।’

হযরত জাফর বিন বারাকাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি কয়েকজন সুফির সুহবতে থাকতাম। একদা ১ দিনার পেয়ে তাঁদেরকে হাদিয়া দিতে চাইলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবলাম, এটি হয়তো আমারই প্রায়োজনে কাজে আসতে পারে। এরপর হঠাৎ দাঁতের ব্যথা শুরু হলো। একটি দাঁত উপড়ে ফেলে দিতে হলো। এক গায়েবী আওয়াজ শুনলাম: ‘তুমি যদি তাদেরকে এই দিনার না দাও তাহলে মুখের ভেতর একটিও দাঁত থাকবে না!’” শায়খ কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, ‘কারামাত হিসাবে এটা খুবই যথার্থ। তিনি যদি বেশি দিনার পেতেন তাহলে ভিন্ন হতো।’

আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত আমির বিন আবদুল ক্বায়েস দামেস্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি বহন করছিলেন চামড়ার তৈরি পানির থলে। যখন ইচ্ছা করতেন অয়ু করতে, থলে থেকে বেরিয়ে আসতো পানি। আর যখন ইচ্ছা করতেন দুগ্ধ পান করতে, তখন এই একই থলে থেকে বেরিয়ে আসতো দুধ!”

হযরত উসমান বিন আবি আতিকু রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমরা বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। কমান্ডার একদল সৈন্যকে একটি বিশেষ এলাকায় প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট দিবসে অভিযান শেষ করে মূল সৈন্যসামন্তের নিকট ফিরে আসার নির্দেশও দিলেন। সে নির্দিষ্ট দিন আসলো কিন্তু প্রেরিত সৈন্যরা ফিরলো না। এদিকে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের বর্শা সামনের মাটিতে গেড়ে নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ একটি পাখি এসে বর্শার মাথায় বসে গেলো ও পরিস্কার ভাষায় বললো, ‘প্রেরিত সৈন্যরা নিরাপদে আছে। তারা এই-এই সময় ও দিনে আসবে।’ হযরত আবু মুসলিম একে জিজ্ঞেস করলেন: ‘তুমি কে? আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত নাজিল করুন!’ পাখি জবাব দিল, ‘আমি সেটি, যে ঈমানদারদের হৃদয় থেকে দুঃখ-বেদনা মুছে দেয়!’ হযরত মুসলিম কমান্ডারের নিকট যেয়ে খবরটি জানালেন। ঠিকই পরবর্তীতে পাখিটি যে দিবসে বলেছিলো, সেদিন সৈন্যরা ফিরে আসলো।”

একজন সুফি বলেন: ‘আমরা একটি জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম। আমাদের সাথী রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। আমরা কাফন ও জানাযা শেষে তার মরদেহ সাগরে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে সাগরের পানি শুকিয়ে গেল। জাহাজ আটকা পড়লো শুকনো ভূমিতে। আমরা বাইরে যেয়ে একটি কবর খোঁড়লাম। মৃতকে দাফন করে ফিরে আসলাম জাহাজে। কিছুক্ষণ পরই পানি ফিরে আসলো। জাহাজ পুনরায় ভাসমান হলো। আমাদের নিয়ে জাহাজখানা গন্তব্য স্থানের দিকে এগুতে লাগলো।’

বর্ণিত আছে একদা বসরার লোকজন দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলো। ক্ষুধার জ্বালায় সবাই কাতর। এমতাবস্থায় হযরত হাবিবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঋণ করে কিছু খাবার এনে অধিক ক্ষুধার্তদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এরপর নিজের টাকার থলে মাথার নিচে রাখলেন। ঋণদাতারা আসলো টাকার জন্য। তিনি ঐ থলে বের করলেন। এটা দিরহামে পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

একদিন হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা করলেন। ভাড়ার টাকা না দেওয়ায় নৌকার মাঝি তাঁকে উঠতে দিলো না। বললো, ভাড়া ১ দিরহাম দিতেই হবে। তিনি নদীর তীরে দু’রাকাতাত

নামায আদায় করে দু'আ করলেন: ‘হে আমার প্রভু! মাঝি আমাকে যা দেওয়ার জন্য দাবি করছে, তা-তো আমার কাছে নেই।’ দু'আ শেষ হতেই দেখা গেলো আশপাশের বালু দানাগুলো দিনারে পরিণত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত আবু মুয়াবিয়া আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গোলাম হামযা নাসির বিন ফারায চোখের দৃষ্টি হারালেন। কিন্তু যখনই তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করতেন তখনই তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসতো। কুরআন শরীফ বন্ধ করে দিলেই দৃষ্টিশক্তি পুনরায় হারিয়ে যেতো।”

হযরত আহমদ বিন হাইসাম মুতাতায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, মারুফ খারকিকে বলো, আমি নামায শেষে তার নিকট আসবো। আমি সংবাদ দিয়ে তার অপেক্ষায় সেখানেই রইলাম। আমরা যুহরের নামায আদায় করার পরও তিনি আসলেন না। এরপর আমরা মাগরিবের নামাযও পড়লাম কিন্তু তিনি তখনো আসলেন না। আমি মনে মনে বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! বিশরের মাতো লোক যা বলেন তা-ই করা তো উচিত! একরূপ করা তো তাঁর জন্য সম্ভব নয়!’ পানির গামলার নিকট মসজিদের ছাদে আমি অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে রাত ঘনিয়ে আসলে হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আসছেন দেখলাম। তার মাথায় ছিলো যায়নামাজ। তিনি দজলা নদীর তীরে আসলেন ও পায়দল পানির উপর দিয়ে হেঁটে মসজিদের নিকট চলে আসলেন! আমি ছাদ থেকে লাফ মেরে নিচে নেমে তাঁর হাতে চুম্বন করলাম। বললাম, ‘হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন!’ তিনি দু'আ করে বললেন, ‘খবরদার! আমার এ কারামাতটির কথা কাউকে বলো না।’ আমি এ ব্যাপারে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিরব থাকি।”

হযরত ক্বাসিম জু'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি কাবা শরীফ তাওয়াফরত এক ব্যক্তিকে দেখেছি। তিনি বার বার একটি দু'আ পাঠ করছিলেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি সকলের হাজত পূরণ করেছেন। কিন্তু আমারটি পূরণ করেন নি!’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার প্রয়োজনটি কি? আপনি যে একই কথা বার বার বলছেন?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি আপনাকে বলছি।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমরা ৭ ব্যক্তি বাইজান্টিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে যাই। তারা আমাদেরকে

কতল করতে নিয়ে গেলো নিজেদের ক্যাম্পে। হঠাৎ দেখলাম আকাশের মধ্যে ৭টি দরোজা খুলে গেছে! প্রত্যেক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেহেশতের অপূর্ব সুন্দরী হুরগণ। একজন এগিয়ে গেলো। তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হলো। আমি দেখলাম একজন হুর নেমে আসলো। তার হাতে ছিলো রেশমি রুমাল। সে ঐ মৃত সৈন্যের রুহ এতে মুড়িয়ে নিয়ে উপরে আরোহণ করলো। এভাবে ৬ জনেরই মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলো কাফিররা। প্রত্যেকবারই একেকজন হুর এসে তাদের রুহ রেশমি রুমালে আবৃত করে নিয়ে যায়।

সবশেষে আমার পালা আসলো। বাইজান্টাইন একজন বললো, একে আমার গোলাম হিসাবে প্রদান করুন। এদিকে লক্ষ্য করলাম সর্বশেষ হুর বলে ওঠলো: ‘ও হে বঞ্চিত ব্যক্তি [মাহরুম], তুমি কি না হারালে!’ আকাশের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। এখন, হে বন্ধু! আমি সেই হারানো জিনিসের জন্য আক্ষেপ করছি।” বর্ণনাকারী হযরত জু’ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেন: ‘আমি মনে করি এ ব্যক্তিই সকলের মধ্যে উত্তম ছিলেন। কারণ তিনি এমন এক দৃশ্য অবলোকন করেছেন যা অন্যরা দেখে নি। সাথীদের শাহাদাতবরণের পর থেকে আল্লাহর প্রতি তার প্রেমাবেগ শতগুণ বেড়েছে।’

হযরত আবু বকর কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি বছরের মাঝামাঝি সময়ে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি বড় থলে দেখলাম। এর ভেতর ছিলো উজ্জ্বল অনেক দিনার। মক্কা শরীফের গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নিয়তে আমি তা হাতে তুলে নিলাম। সাথে সাথে এক গায়েবী আওয়াজ শুনলাম: ‘তুমি যদি এটা নাও, তাহলে তোমাকে ফকিরী অবস্থা থেকে বঞ্চিত করা হবে!’”

হযরত আব্বাস শারকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত আবু তুরাব নাখশাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমরা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে সফরে ছিলাম। মক্কা শহরের রাস্তা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। হযরতের এক তরুণ মুরীদ আমাদেরকে বললেন, ‘আমি পিপাসার্ত।’ হযরত আবু তুরাব পা দ্বারা মাটির উপর আঘাত হানলেন। সাথে সাথে মাটি ফেটে মিষ্টি, ঠাণ্ডা পানি বেরিয়ে আসলো। যুবক বললেন, ‘আমি এ পানি একটি পানপাত্র দ্বারা পান করতে চাই।’ হযরত আবু তুরাব এবার হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। সাথে সাথে একটি গায়েবী সাদা পানপাত্র হযরতের হাতে এলো। এমন সুন্দর পানপাত্র আমি কখনো

দেখি নি। তিনি এটা যুবকের হাতে দিলেন। তিনি পানি পান করে পাত্রটি আমাদেরকে দিলেন। আমরাও পানি পান করলাম।

উক্ত পাত্রটি আমাদের নিকট মক্কা মুকাররমায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত ছিলো। একদিন হযরত আবু তুরাব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলার কোনো কোনো বান্দাদেরকে তিনি যেসব বস্তু দয়াপরবশ হয়ে দান করেন এ ব্যাপারে আপনার সাথীরা কি বলেন?’ আমি বললাম, ‘এ পর্যন্ত আমি কাউকে দেখি নি যিনি এগুলো বিশ্বাস করেন না।’ তিনি বললেন, ‘যে কেউ এসব বিশ্বাস করে না সে একজন অবিশ্বাসী। আমি তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাভিত্তিক মতামত জানতে চেয়েছিলাম।’ আমি বললাম, ‘কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেছে বলে আমার জানা নেই।’ তিনি মন্তব্য করলেন: ‘তোমার সাথীরা মনে করেন, কারামাত আল্লাহর পক্ষ থেকে চাতুরী মাত্র। অথচ এটা সত্য নয়। এগুলো [কারামাত] চাতুরী তখনই হয়, যখন কেউ এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে বসে। আর যারা এগুলোর প্রত্যাশা করেন না এবং এদের উপর ভরসাও করেন না, তাঁরাই আল্লাহর মানুষের [রাব্বানিয়্যিউন] স্তরে উন্নীত হয়েছেন।”

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন মুকুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তারসাস [বর্তমান তুরস্কের সিলিসিয়া অঞ্চলের একটি জনপদ] শহরে থাকাকালে বলেন: আমি হযরত আবু আবদুল্লাহ জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমরা একদা বাগদাদ শহরে হযরত সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কক্ষে অবস্থান করছিলাম। রাত ঘনিয়ে আসলে হযরত সাক্বাতি রাহ. একটি পরিস্কার জুব্বা, আবা ও পাজামা পরলেন। পায়ে একজোড়া পাদুকা পরে বের হয়ে যেতে প্রস্তুত হলেন। আমরা জানতে চাইলাম, এতো রাতে তিনি কোথায় যাবেন? জবাব দিলেন, ‘আমি হযরত ফাতহুল মাওলিসীকে দেখতে যাচ্ছি।’

বাগদাদের রাস্তায় চলাকালে একজন চৌকিদার তাঁকে ধরে ফেললো। নিয়ে গেলো জেলে। পরদিন অন্যান্য কয়েদির মতো তাঁকেও বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেওয়া হলো। জল্লাদ যখন হযরতের শরীরে বেত্রাঘাতের জন্য হাত তুললো তখনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। তার হাত ওঠানো অবস্থায়ই সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়লো। উপস্থিতরা বললো, ‘কি হলো? মারো!’ জল্লাদ বললো: ‘আমার সামনে একজন সুফি শায়খকে দেখতে পাচ্ছি! তিনি বার বার বলছেন, ‘খবরদার বেত্রাঘাত করবে না!’ আমি আমার হাত নাড়াতেও পারছি না!’ তারা

লক্ষ্য করলো, উপস্থিত সুফি শায়খ ছিলেন হযরত ফাতহুল মাওলিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সাথে সাথে তাঁরা হযরত সাক্বাতিকে ছেড়ে দিল।”

ফصل

ফাস্‌ল [পিরচ্ছেদ] -১১

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الحارث الخطابي قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال: كان أناس من قریش يجلسون إلى عبد الواحد بن زيد، فأتوه يوماً وقالوا: إنا نخاف من الضيقة والحاجة!! فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك، وتلهمه الصفي من أحبائك أن تأتينا بروق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء فأنت الحنان المنان القديم الإحسان، اللهم الساعة، الساعة..

قال: فسمعت والله قعقة للسقف، ثم تناثرت علينا دنائير ودراهم، فقال عبد الواحد بن زيد: استغنوا بالله عز وجل عن غيره، فأخذوا ذلك، ولم يأخذ عبد الواحد بن زيد شيئاً.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي الجوزي مجنديسابور قال: سمعت الكتاني يقول: رأيت بعض الصوفية، وكان غريباً ما كنت أثبتته قد تقدم إلى الكعبة وقال: يا رب ما أدري ما يقول هؤلاء! - يعني الطائفين - فقيل له: انظر ما في هذه الرقعة. قال: فطارت الرقعة في الهواء وغابت.

« وسمعتہ يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر الورثاني يقول: سمعت محمد بن علي ابن الحسين المقرئ بطرسوس يقول: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: اشتهدت والدتي على والدي يوماً من الأيام سمكاً، فمضى والدي إلى السوق وأنا معه، فاشترى سمكاً، ووقف ينتظر من يحمله، فرى صبياً وقف بجذائه مع صبي فقال: يا عم، تريد من يحمله؟ فقال: نعم، فحمله ومشى معنا، فسمعنا الأذان، فقال الصبي: أذن المؤذن، واحتج أن أتطهر وأصلي، فإن رضيت، وإلا فأمل السمك، ووضع الصبي السمك ومرو.

فقال أبي: فنحن ألولى أن نتوكل في السمك. فدخلنا المسجد فصلينا، وجاء الصبي وصلى، فلما خرجنا فإذا بالسمك موضوع مكانه، فحمله الصبي ومضى معنا إلى دارنا.

فذكر والدي ذلك لوالدتي، فقالت: قل له حتى يقيم عندنا ويأكل معنا، فقلنا له، فقال: إني صائم، فقلنا: فتعود إلينا بالعشى، فقال: إذا حملت مرة في اليوم لا أحمل ثانياً، ولكني سأدخل المسجد إلى المساء، ثم أدخل عليكم، فمضى..

فلما أمسينا دخل الصبي، وأكلنا، فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة، ورأينا فيه أنه يؤثر الخلوة، فتركناه في بيت، فلما كان في بعض الليل وكان لقريب لنا بنتٌ زمنة، فجاءت تمشي، فسألناها عن حالها، فقالت: قلت يارب بجرمة ضيفنا أن تعافيني، فقمت. قالت: فمضينا لنطلب الصبي، فإذا الأبواب مغلقة كما كانت، ولم نجد الصبي. فقال أبي: فمتهم صغير، ومتهم كبير.

سمعت محمد بن الحسين يقول: حدثنا أبو الحارث الخطابي قال: حدثنا

محمد ابن الفضل قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال: أتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس في ظل، فقلت له: لو سألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل: فقال: ربي أعلم بمصالح عباده، ثم أخذ حصتي من الأرض، ثم قال: اللَّهُمَّ إِن شئت أن تجعلها ذهباً فعلت، فإذا هي والله في يده ذهب، فألقاها إلي وقال: أنفقتها أنت فلا خير في الدنيا إلا للأخرة.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت الحسين بن أحمد الفارسي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت أحمد بن منصور يقول: قال لي أستاذي أبو يعقوب السوسي: غسلت فريداً فأمسك إبهامي وهو على المغتسل. فقلت: يا بني خلّ يدي؛ أنا أدري أنك لست بميت، وإنما هي نقلة من دار إلى دار.. فخلي يدي..

وسمعتة يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد الطرسوسي يقول: سمعت إبراهيم ابن شيبان يقول: صحبني شاب حسن الإرادة، فمات، فاشتغل قلبي به جداً، وتوليت غسله، فلما أردت غسل يديه بدأت بشماله من الدهشة، فأخذها مني وناولني يمينه فقلت: صدقت يا بني، أنا غلطت.

وسمعتة يقول: سمعت أبا النجم المقرئ البرذعي بشيراز يقول: سمعت الراقي يقول: سمعت أحمد بن منصور يقول: سمعت أبا يعقوب السوسي يقول: جاءني مريد بمكة فقال: يا أستاذ، أنا غداً أموت وقت الظهر؛ فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنصفه، وكفني بنصفه الآخر، ثم لما كان الغد جاء وطاف بالبيت، ثم تباعد ومات، فغسلته، وكفنته ووضعت في اللحد، ففتح عيني، فقلت: أحياء بعد موت؟! فقال: أن حيّ، وكل محب لله حي.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت أبا علي بن وصيف المؤدب يقول: تكلم سهل بن عبد الله يوماً في الذكر فقال: أن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحيى الموتى لفعل، ومسح يده على عليل بين يديه، فبرىء، وقام.

سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول: أخبرني علي بن إبراهيم بن أحمد قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا الحسين بن عمر قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: كان عمرو بن عُتبة يصلي والغمام فوق رأسه، والسباع حوله تحرك أذنانها.

وسمعته يقول: سمعت أبا عبد الله بن مفلح يقول: سمعت المغازلي يقول: سمعت الجنيد يقول: كانت معي أربعة دراهم فدخلت على السري وقلت: هذه أربعة دراهم حملتها إليك، فقال: أبشري يا غلام بأنك تُفلح؛ كنت أحتاج إلى أربعة دراهم؛ فقلت: "اللَّهُمَّ ابعتها على يد من يفلح عندك".

وسمعته يقول: حدثني إبراهيم بن أحمد الطبري قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن يحيى قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو إبراهيم اليماني قال: خرجنا نسير على ساحل البحر مع إبراهيم بن أدهم فانتبهنا إلى غيضة فيها حطب يابس كثير، وبالقرب منه حصن، فقلنا لإبراهيم بن أدهم: لو أقمنا الليلة هاهنا وأوقدنا من هذا الحطب؟ فقال: افعلوا فطلبنا النار من الحصن. فأوقدنا، وكان معنا الخبز فأخرجنا نأكل، فقال واحد منا: ما أحسن هذا الجمر، لو كان لنا لحم نشويه عليه؟! فقال إبراهيم بن أدهم: إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكموه. فقال: فبينما نحن كذلك إذا بأسد يدر إيلاً فلما قرب منا وقع، فاندقت عنق، فقام إبراهيم

بن أدهم وقال: أذبحوه، فقد أطعمكم الله. فذبحناه.. وشوينا من لحمه والأسد واقف ينظر إلينا.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا القاسم عبد الله بن علي الشجري يقول: سمعت حامداً الأسود يقول: كنت مع إبراهيم الخواص في البادية سبعة أيام على حالة واحدة، فلما كان السابع ضعفت، فجلست، فالتفت إلي وقال مالك؟ فقلت: ضعفت!! فقال: أيما أغلب عليك: الماء أو الطعام؟ فقلت: الماء، فقال: الماء وراءك.

فالتفت فإذا عين ماء كاللبن الحليب، فشربت وتطهرت، وإبراهيم ينظر ولم يقربه. فلما أردت القيام هممت أن أحمل منه، فقال: أمسك؛ فإنه ليس مما يتزود منه.

سمعت أبا عبد الله بن عبد الله يقول: سمع أبا عبد الله الدباس البغدادي يقول: سمعت فاطمة أخت أبي علي الروذباري تقول: سمعت زينونة خادمة أبي الحسين النوري - وكانت تخدمه، وخدمت أبا حمزة، والجنيد - قالت: كان يوم بارد، فقلت للنوري: أحمل إليك شيئاً؟ فقال: نعم، فقلت: ماذا تريد؟ قال: خبز ولبن، فحملت، وكان بين يديه فحم، وكان يقلبها بيده وقد اشتغلت يده، فأخذ يأكل الخبز واللبن يسيل على يده وعليها سواد الفحم، فقلت في نفسي: ما أقدر أولياءك يا رب!! ما فيهم أحد نظيف!! قالت: فخرجت من عنده، فتعلقت بي امرأة وقالت: سرقت لي رزمة ثياب وجروني إلى الشرطي، فأخبر النوري بذلك، فخرج وقال للشرطي: لا تتعرضوا لها؛ فإنها وليه من أولياء الله تعالى، فقال الشرطي: كيف أصنع

والمرأة تدعى؟! قال: فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة، فاسترد النوري المرأة، وقال لها: تقولين بعد هذا ما أقدر أولياءك، قالت: فقلت قد تبت إلى الله تعالى.

سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي يقول: سمعت محمد بن فارس الفارسي يقول: سمعت أبا الحسن خيراً النساج يقول: سمعت الخواص يقول: عطشت في بعض أسفاري، وسقطت من العطش فإذا أنا بماء ربي على وجهي ففتحت عيني فإذا برجل حسن الوجه راكب دابة شهباء، فسقاني الماء، وقال: كن رديفي، وكنت بالحجاز فما لبثت إلا يسيراً، فقال لي: ما ترى؟ فقلت: أرى المدينة، فقال: أنزل وأقرىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، وقل: أخوك الخضر يقرئك السلام.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: قال أبو الحديد: سمعت المظفر الجصاص يقول: كنت أنا ونصر الخراط ليلة في موضع فتذاكرنا شيئاً من العلم، فقال الخراط: إن الذكر لله تعالى فائدته في أول ذكره أن يعلم أن الله تعالى ذكره فيذكر الله تعالى ذكره. قال فخالفته، فقال: لو كان الخضر عليه السلام هاهنا لشهد بصحته. قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين السماء والأرض حتى بلغ إلينا وسلم وقال: صدق: الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره، فعلمنا أنه الخضر، عليه السلام.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: جاء رجل إلى سهل بن عبد الله وقال: إن الناس يقولون إنك تمشي على الماء. فقال: سل مؤذن المحلة، فإنه رجل صالح لا يكذب. قال: فسألته، فقال المؤذن: لا أدري هذا!! ولكنه كان في

بعض هذا الأيام نزل الحوض ليتطهر فوق في الماء فلو لم أكن أنا لبقی فیہ. قال الأستاذ أبو علی الدقاق: إن سهلاً كان بتلك الحالة التي وصف بها، ولكن الله سبحانه يريد أن یستر أولیاءه فأجرى ما وقع من حدیث المؤذن والحوض سترًا لحال سهل، وسهل كان صاحب الكرامات.

وفي قریب من هذا المعنى ما حکى عن أبي عثمان المغربي قال: رأیتہ بخط أبي الحسين الجرجاني قال: أردت مرة أن أمضي إلى مصر، فخطر لي أن أركب السفينة، ثم خطر ببالي أني أعرف هناك، فخفت الشهرة، فمرّ المركب فبدا لي، فمشيت على الماء ولحقت بالمركب ودخلت السفينة والناس ينظرون، ولم يقل أحد إن هذا ناقض للعادة أو غير ناقض، فعرفت أن الولي مستور وإن كان مشهوراً.

ومما شاهدنا من أحوال الأستاذ؟ أبي علی الدقاق، رضي الله عنه؛ معاينة أنه كان به علة حرقه البول، وكان يقوم في ساعة غير مرة، حتى كان یجدد الضوء غير مرة لركعتي فرض، وكان یحمل معه قارورة في طريق المجلس، وربما كان یحتاج إليها والطريق مرات ذاهباً وجائياً، وكان إذا قعد على رأس الكرسي يتكلم لا یحتاج إلى الطهارة ولو أمتد به المجلس زماناً طويلاً، وكنا نعاين ذلك منه سنين، ولم یقع لنا في حیاته أن هذا شيء ناقض للعادة، وإنما وقع لي هذا وفتح عليّ علمه بعد وفاته.

وفي قریب من هذا ما یحكي عن سهل بن عبد الله أن كان قد أصابته زمانه في آخر عمره، فكان ترد عليه القوة في أوقات الفرض فیصلي قائماً.

ومن المشهور أن عبد الله الوزان كان مقعداً، وكان في السماع إذا ظهر به وجد یقوم ویستمع.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: حدثنا إبراهيم بن محمد المالكي قال: حدثنا يوسف بن أحمد البغدادي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حججت أنا وأبو سليمان الداراني، فبينما نحن نسير إذ سقطت السطيحة مني، فقلت لأبي سليمان فقدت السطيحة. وبقينا بلا ماء، وكان برد شديد، فقال أبو سليمان: يا راد الضلة.. ويا هادياً من الضلالة اردد علينا الضالة، فإذا واحد ينادي: من ذهبت له سطيحة؟ قال: فقلت: أنا.. فأخذتها، فبينما نحن نسير وقد تدرّعنا بالفراء من شدة البرد فإذا نحن بإنسان عليه طمران وهو يترشح عرقاً، فقال أبو سليمان: تعالى ندفع إليك شيئاً مما علينا من الثياب، فقال: يا أبا سليمان أتشير إلي بالزهد وأنت تجد البرد؟ أنا أسيح في هذه البرية منذ ثلاثين سنة ما انتفضت، ولا ارتعدت، يلبسني الله في البرد فيحاً من محبته، ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته.. ومراً.

وسمعتة يقول: سمعت أبا بكر محمد بن علي التكريتي يقول: سمعت محمد ابن علي الكتاني بمكة يقول: سمعت الخواص يقول: كنت في البادية مرة، فسرت في سوط النهار، فوصلت إلى شجرة، وبالقرب منها ماء، فنزلت، فإذا بسبع عظيم أقبل، فاستسلمت، فلما قرب مني إذا هو يعرج، فحمحم وبرك بين يدي، ووضع يده في حجري، فنظرت فإذا يده منتفخة فيها قيح ودم، فأخذت خشبة وشققت الموضع الذي فيه القيح، وشددت علي يده خرقة، ومضى، فإذا أنا به بعد ساعة ومعه شبلان يبصبسان لي، وحملني إلى رغيفاً.

وسمعتة يقول: حدثنا أحمد بن علي السائح قال: حدثنا محمد بن عبد الله

بن مطرف قال: حدثنا محمد بن الحسين العسقلاني قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: اشتكى محمد بن السماك، فأخذنا ماءه وانطلقنا به إلى الطبيب، وكان نصرانياً.

قال: فبينما نحن نسير بين الحيرة والكوفة استقبلنا رجل حسن الوجه، طيب الرائحة، نقي الثوب، فقال لنا: إلى أين تريدان؟ فقلنا: نريد فلاناً الطبيب نريه ماء ابن السماك.

فقال: سبحان الله!! تستعينون على ولي الله بعدو الله!!.. اضربوا به الأرض، وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له: ضع يدك على موضع الوجع وقل: "وبالحق انزلنا وبالحق نزل" ثم غاب عنا فلم نره. فرجنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك، فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل، فعوفي في الوقت، فقال: كان ذلك الخضر عليه السلام.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الرحمن بن محمد الصوفي يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: كنا قعوداً في مجلس أبي يزيد البسطامي، فقال: قوموا بنا نستقبل ولياً من أولياء الله تعالى. فقمنا معه، فلما بلغنا الدرب فإذا إبراهيم بن شيبه الهروي، فقال له أبو يزيد: وقع في خاطري أن أستقبلك، وأشفع لك إلى ربي. فقال إبراهيم بن شيبه: ولو شفعت في جميع الخلق لم يكن بكثير، إنما هم قطعة طين! فتحير أبو يزيد من جوابه.

قال الأستاذ: وكرامة إبراهيم في استصغار ذلك أتم من كرامة أبي يزيد فيما حصل له في من الفراسة، وصدق له من الحالة في باب الشفاعة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي

يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول وقد سأله سالم المغربي عن أصل توبته، فقال: خرجت من مصر إلى بعض القرى، فنمت في الطريق، ثم انتبهت، وفتحت عيني، فإذا أنا بقبرة عمياء سقطت من شجرة على الأرض، فانشقت الأرض، فخر منها سكرجتان إحداهما من ذهب، والأخرى من فضة، وفي إحداهما سمسم، وفي الأخرى ماء ورد فأكلت من هذه، وشربت من هذه فقلت: حسبي.. تبت، ولزمت الباب إلى أن قبلني..

وقيل: أصاب عبد الواحد بن زيد فالج فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى الوضوء، فقال: من هاهنا، فلم يجبه أحد فحلف فوت الوقت، فقال: يا رب أحللي من وثاقي؛ حتى أقضي طهارتي، ثم شأنك وأمرك. قال: فَصَحَّ، حتى أكمل طهارته، ثم عاد إلى فراشه، وصال كما كان.

وقال أبو أيوب الحمال: كان أبو عبد الله الديلمي إذا نزل منزلاً في سفر عمد إلى حماره وقال في أذنه: كنت أريد أن أشدك، فالآن لا أشدك، وأرسلك في هذه الصحراء؛ لتأكل الكلاً، فإذا أردنا الرحيل فتعال.. فإذا كان وقت الرحيل يأتيه الحمار.

وقيل: زوج أبو عبد الله الديلمي ابنته، واحتاج إلى ما يجهزها به، وكان له ثوب يخر به كل وقت فيشتري بدينار، فخرج له ثوب، فقال له البياع: إنه يساوي أكثر من دينار، فلم يزالوا يزيدون في ثمنه حتى بلغ مائة دينار، فجهزها..

وقال النضر بن شميل: ابتعت إزاراً فوجدته قصيراً فسالت ربي تعالى أن يمغط لي ذراعاً، ففعل، يمغط: أي يمد: من مغط القوس، وهو مده قال

النضر بن شميل: ولو استزدته لزادني.

وقيل: كان أمر بن عبد قيس سأل أن يهون عليه طهوره في الشتاء؛ فكان يؤتى به وله بخار، وسال ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه فكان لا يبلي بهن، وسأله أن يمنع الشيطان من قلبه وهو في صلاته فلم يجبه إليه.

وقال بشر بن الحارث: دخلت الدار فإذا أنا برجل، فقلت: من أنت؟ دخلت داري بغير إذني، فقال: أخوك الخضر. فقلت: ادع الله لي. فقال: هون الله عليك طاعته؛ فقلت: زدني، فقال: وسترها عليك.

وقال إبراهيم الخواص: دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة فقيل؛ فإذا فيها سبع عظيم، فخفت، فهتف بي هاتف: اثبت؛ فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك.

أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو الفرج الورثاني قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الصيرفي يقول: سمعت جعفرًا الديلمي يقول: دخل النوري الماء فجاء لص فأخذ ثيابه، ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت يده؛ فقال النوري: قدر رد علينا الثياب فردَّ عليه يده. فعوفي.

وقال الشبلي: اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال، فكنت أدور في البراري، فرأيت شجرة تين، فمددت يدي إليها لأكل، فنادتني الشجرة: إحفظ عليك عقدك، لا تأكل مني فأني ليهودي.

وقال أبو عبد الله بن خفيف: دخلت بغداد قاصداً إلى الحج وفي رأسي نحوه الصوفية، ولم آكل الخبز أربعين يوماً، ولم أدخل على الجنيد، وخرجت ولم أشرب الماء إلى رُبالة، وكنت على طهارتي، فرأيت طيباً على رأس البئر وهو يشرب، وكنت عطشان، فلما دنوت من البئر ولى الطيب، وإذا الماء في

أسفله.. فمشيت وقلت: يا سيدي، مالي محل هذا الظبي؟! فسمعت من خلفي: جربناك فما صبرت!! ارجع وخذ الماء. فرجعت، فإذا البئر ملاءى ماء، فملأت ركوتي وكنت أشرب منه وأتطهر إلى المدينة، ولم بنفسى.

ولما استقيت سمعت هاتفاً يقول: إن الظبي جاء بلا ركوة، ولا حبل، وأنت جئت مع الركوة والحبل!! فلما رجعت من الحج دخلت الجامع، فلما وقع بصر الجنيد عليّ قال: لو صبرت لنبع الماء من تحت رجلك، لو صبرت وصبر ساعة! سمعت حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني يقول: سمعت أبا أحمد بن علي الحافظ يقول: سمعت أحمد بن حمزة بمصر يقول: حدثني عبد الوهاب - وكان من الصالحين - قال: قال محمد بن سعيد البصري: بينما أنا أمشي في بعض طرق البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوق جملاً، فالتفت فإذا الجمّل وقع ميتاً، ووقع الرجل والقنب، فمشيت ثم التفتت فإذا الأعرابي يقول: يا مسبّب كلّ سبب، ويا مولى من طلب، وردّ عليّ ما ذهب من جمّل يحمل الرجل والقنب، فإذا الجمّل قائم والرجل والقنب فوقه.

وقيل: إن شبلاً المروزي انتهى لحماً فأخذ بنصف درهم، فاستلبته منه حداً في الطريق، فدخل شبل مسجداً ليصلي، فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته إليه لحماً، فقال: من أيت هذا؟ فقالت: تنازعت حدّاتان، فسقط هذا منهما، فقال شبل: الحمد لله الذي لم ينس شبلاً، وإن كان شبلٌ كثيراً ينساه.

أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثاني قال: سمعت محمد بن داود يقول: سمعت أبا بكر بن معمر يقول:

سمعت ابن أبي عبيد اليسري يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين، فخرج في السرية، فمات المهر الذي كان تحته وهو في السرية، فقال: يا رب، أعرناه حتى نرجع إلى بصرى يعني: قريته، فإذا المهر قائم، فلما غزا ورجع إلى بصرى قال: يا بني، خذ السرج عن المهر، فقالت: إنه عرق فإن أخذت السرج عنه داخله الريح، فقال: يا بني، إنه عارية، قال: فلما أخذت السرج عنه وقع المهر ميتا.

وقيل: كان بعضهم نباشاً، فتوفيت امرأة، فصلى الناس عليها وصلى هذا النباش؛ ليعرف القبر، فلما جنَّ عليه الليل نبش قبرها، فقالت: سبحان الله، رجل مغفور له يأخذ كفن امرأة مغفور لها؟! قال: هبي أنك مغفور لك، فأنا من أنا؟! فقالت: إن الله تعالى غفر لي ولجميع من صلى علي، وأنت قد صليت علي. فتركته ورددت التراب عليها، ثم تاب أرجل وحسنت توبته.

سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أبا الحسن إسماعيل بن عمرو بن كامل بمصر يقول: سمعت أبا محمد نعمان بن موسى الحيري بالحيرة يقول: رأيت ذا النون المصري وقد تقاتل اثنان: أحدهما من أولياء السلطان، والآخر من الرعية، فعدا الذي من الرعية عليه، فكسر ثنيته، فتعلق الجندي بالرجل وقال: بيني وبينك الأمير، فجازوا بذئ النون، فقال الناس: اصعدوا إلى الشيخ؛ فصعدوا إليه، فعرفوه ما جرى، فأخذ السن، ثم بلها بريقه، وردّها إلى فم الرجل في الموضع الذي كانت فيه، وحرّك شفّتيه، فتعلقت بإذن الله تعالى، فبقي الرجل يفتش فاه، فلم يجد الأسنان إلا سواء.

حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسين بن عرفة بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن إسماعيل بن أبي خلد، عن أبي سيرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمن.. فلما كان في بعض الطريق نفق حماره، فقام وتوضأ، ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللَّهُمَّ إني جئت مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، لا تجعل لأحد عليّ منة، اليوم أطلب منك أن تبعث حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه.

سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أبا بكر النابلسي يقول: سمعت أبا بكر الهمداني يقول: بقيت في برية الحجاز أياماً لم آكل شيئاً، فاشتيت باقلاً حاراً وخبزاً من باب الطاق؛ فقلت: أنا في ابرية وبيني وبين العراق مسافة بعيدة، فلم أتمّ خاطري إلا وأعرابي من بعيد ينادي: باقلاً حاراً وخبز. فتقدمت إليه فقلت عندك باقلاً حاراً وخبز؟ فقال: نعم. وبسط مئزراً كان عليه، وأخرج خبزاً وباقلاً، وقال لي: كل. فأكلت، ثم قال لي: كل. فأكلت، ثم قال لي: كل. فأكلت. فلما قال لي الرابعة، قلت: بحق الذي بعثك إليّ إلا ما قلت لي من أنت؟ فقال: أنا الخضر. وغاب عني فلم أره.

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي يقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: سمعت أبا جعفر الحداد يقول: جئت الثعلبية وهي خراب، ولي سبعة أيام لم آكل شيئاً، فدخلت القبة، وجاء قوم خراسانيون أصابهم جهد فطرحوا أنفسهم على باب القبة، فجاء أعرابي على راحلة وصبّ تمرّاً بين أيديهم

فاشتغلوا بالأكل ولم يقولوا لي شيئاً، ولم يرني الأعراي، فلما كان بعد ساعة. فإذا بالأعراي، جاء وقال لهم: معكم غيركم؟ فقالوا: نعم، هذا الرجل داخل القبة. قال: فدخل الأعراي، وقال لي: من أنت؟ لم لم تتكلم؟ مضيت، فعارضني إنسان فقال لي: قد خلقت إنساناً لم تطعمه. ولم يمكني أن أمضي، فتطوّلت على الطريق، لأنّي رجعت عن أميال!! وصبّ بين يدي التمر الكثير، ومضى، فدعوتهم، فأكلوا وأكلت.

سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أبا طاهر الرقي يقول: سمعت أحمد ابن عطاء يقول: كلمني جمل؛ في طريق مكة رأيت جمالا والمحامل عليها، وقد مدّت أعناقها في الليل، فقلت: سبحان من يحمل عنها ما هي فيه، فالتفت إليّ جمل وقال لي: قل جلّ الله. فقلت جلّ الله.

سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت الحسن بن أحمد الفارسي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت أبا بكر بن معمر يقول: سمعت أبا ذرعة الجنبي يقول: مكرت بي امرأة فقالت: ألا تدخل الدار فتعود مريضاً؟ فدخلت فأغلقت الباب.. ولم أر أحداً؛ فعلمت ما فعلت، فقلت: اللهمّ سوّدها. فاسودت؛ فتحيرت. وفتحت الباب؛ فخرجت، فقلت: اللهمّ ردها إلى حالها فردّها إلى ما كانت عليه.

سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أبا محمد الغطريفي يقول: سمعت السراج يقول: سمعت أبا سليمان الرومي يقول سمعت: خليلا الصياد يقول: غاب ابني محمد فوجدنا عليه وجداً شديداً؛ فأتيت معروفاً الكرخي فقلت: يا أبا محفوظ، غاب ابني وأمه واجدة عليه!! فقال: ما تشاء؟ فقلت: ادع الله أن يرده فقال: اللهمّ إن السماء سماءك، والأرض أرضك.. وما

بينهما لك.. اثت بمحمد..

قال خليل: فأتيت باب الشام فإذا هو واقف، فقلت: أين كنت يا محمد؟ فقال: يا أبت كنت الساعة بالأنبار.

قال الأستاذ أبو القاسم: واعلم أن الحكايات في هذا الباب تربو على الحصر. والزيادة على ما ذكرناه تخرجنا عن المقصود من الإيجاز؛ وفيما ذكرناه مقلع في هذا الباب.

অনুবাদ: হযরত সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “অনেক কুরাইশ ব্যক্তি হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন জায়িদ [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হতেন। একদিন তারা এসে তাঁকে বললেন: ‘আমরা অপরিপাক ও প্রয়োজনের স্বল্পতার আশঙ্কা করছি।’ তিনি আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সর্বোচ্চ নামসহ ভিক্ষা প্রার্থনা করছি। এসব নামের মাধ্যমে আপনি স্বীয় বন্ধুদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়াপরবশ হন। এগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার আপনজনদের মধ্যে যারা পবিত্র তাঁদেরকে পথপ্রদর্শন করেন। আপনি আমাদেরকে দৈনিক প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন। আপনিই হৃদয়ের সঙ্গে শয়তানের সম্পৃক্ততা থেকে আমরা ও আমাদের সাথীদেরকে রক্ষা করেন। কারণ আপনি সর্বাধিক করুণাময় দাতা, যার হিতসাধনের নেই কোনো শুরু কিংবা শেষ। এখনই, হে আমার প্রভু! এখনই!’ তারপর আমরা শুনতে পেলাম ছাদের মধ্যে বনবনানি শব্দ হচ্ছে। দিনার ও দিরহামের বর্ষণ শুরু হয়েছে! হযরত জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাদেরকে সবকিছু ছাড়া যথেষ্ট দিয়েছেন।’ কুরাইশরা এই অর্থ সংগ্রহ করলেন। কিন্তু হযরত জাহিদ কিছুই নিলেন না।”

হযরত খাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মক্কা মুকারমায় একজন সুফির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে যাকে ইতোমধ্যে দেখি নি। তিনি কাবা শরীফের নিকটে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তাঁরা [অর্থাৎ কাবাঘর তওয়াফরতরা] কি দু’আ করছেন আমি জানি না!’ কেউ তাঁকে বললো, ‘এই কাগজ টুকরোর প্রতি

তাকাও!’ কিন্তু হঠাৎ করে ঐ কাগজের টুকরো আকাশে উড়ে গায়েব হয়ে গেল।”

হযরত আবু আবদুল্লাহ বিন জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন আমার আন্নার মনে চাইলো মাছ খাবেন। তিনি আমার পিতাকে বাজার থেকে মাছ ক্রয় করার জন্য অনুরোধ জানালেন। পিতা বাজারে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। একটি বড় মাছ ক্রয় করে আব্বা অপেক্ষা করছিলেন মাছটি কারো দ্বারা বহন করে বাড়িতে নিয়ে আসবেন। দু’টি ছেলে আসলো। এর একটিকে বহনের জন্য বললেন। সে রাজি হলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই আযান শুনা গেলো। ছেলে বললো, আমাকে নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমরা মাছটি রাস্তায় রেখেই নামাযে চলে গেলাম। নামায শেষে ফিরে এসে দেখলাম মাছটি সেখানেই আছে। আমরা বাড়িতে পৌঁছুলাম। আন্না ছেলেকে খাবার খাওয়াতে চাইলে বললো, আমি রোযা রেখেছি। আব্বা বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখানে ইফতার করে যাবে। বললো, আমি মসজিদে যেয়ে বাকি সময় কাটিয়ে দেবো। ইফতারের সময় এসে আমাদের সাথে খেলো। ছেলেটি অযু করতে চাইলে তাকে অযুর জায়গা দেখিয়ে দিলাম। অযু সেরে সে একটি কক্ষে ঢুকে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল।

আমাদের এক আত্মীয়ের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত একটি মেয়ে ছিলো। লক্ষ্য করলাম সে পায়ে হেটে আমাদের নিকট এসেছে! তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কিভাবে সুস্থ হলে? বললো: ‘আমি দু’আ করলাম, হে আল্লাহ! আমাদের এ বাড়ির মেহমানের ওয়াসিলায় আমাকে সুস্থ করুন যাতে আমি দাঁড়াতে পারি। আল্লাহর অপার মহিমায় আমি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেছি!’ আমরা সাথে সাথে ঐ কক্ষের দরজায় গেলাম যেখানে ছেলেটি ইবাদতরত ছিলো। দরজা আগের মতো বন্ধ ঠিকই আছে কিন্তু ভেতরে কেউই ছিলো না। আমার পিতা মন্তব্য করলেন: ‘আল্লাহর বন্ধুদের মধ্যে ছোট ও বড় উভয়েই আছেন!’”

হযরত ইয়াহইয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন জারিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি তখন ছায়ার মধ্যে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘আপনি যদি আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ পেতে আবদার জানান, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দেবেন, নয় কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার প্রভু তাঁর গোলামদের

দেখভালের ব্যাপারে অধিক অবহিত।’ তিনি কয়েকটি শিলাখণ্ড হাতে তুলে নিলেন। বললেন: ‘হে আমার প্রভু! আপনি যদি চান এগুলোকে স্বর্ণে পরিণত করতে, তাহলে তা-ই করুন!’ সুবহানাল্লাহ! দেখা গেলো ওগুলো স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে। তিনি আমার দিকে সবগুলো ছুড়ে মেরে বললেন, ‘এগুলো [সাদকা] হিসাবে খরচ করো! মনে রেখো, এ পৃথিবীর কোনো আমলই ভালো নয় শুধু ওগুলো ছাড়া, যা পরকালের জন্য করা হয়।”

হযরত শায়খ আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একজন সুফি মুরীদের মরদেহ খাটের উপর রেখে গোসল দিচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে ফেললো। বললাম, হে পুত্র! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি জানি বাস্তবে তুমি মৃত নও। এটা [মৃত্যু] এক অবস্থা থেকে আরেকটিতে পরিবর্তন মাত্র।’ সাথে সাথে সে আমাকে ছেড়ে দিল।” হযরত ইব্রাহিম বিন শাইবান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একজন যুবক আধ্যাত্মিকভাবে আমার একান্ত আপনজন ছিলো। সে মারা গেলো। আমার হৃদয়ে তার জন্য ভীষণ ব্যথা অনুভব করলাম। তার মরদেহ গোসল দেওয়ার সময়, প্রথমেই [অযু করাতে যোগে] হাত ধুইতে যাচ্ছিলাম। অতিরিক্ত শোকাহত হওয়ায় [ভুলে] প্রথমে তার বাম হাত ধৌত করতে উদ্যোগত হলাম। সে সাথে সাথে তার বাম হাত সরিয়ে নিল এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিল। আমি বললাম, ‘হে আমার পুত্র! তুমি ঠিকই করছো। আমি ভুল করে ফেলছিলাম।” হযরত আবু ইয়াকুব সুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মক্কা মুকাররমায় তরীকতের রাস্তায় প্রাথমিক স্তরের একজন সুফি এসে আমাকে বললেন, ‘ইয়া শায়খী! আমি আগামীকাল মারা যাবো। এই দিনারটি নিন, এর অর্ধেক আমার কবর খুঁড়তে ও বাকি অর্ধেক কাফনের জন্য ব্যয় করবেন।’ পরের দিন তিনি আসলেন, কাবা শরীফ তাওয়াফ করেই মৃত্যুবরণ করলেন। আমি তার অসিয়তমতো কাফন পরিয়ে জানাযা শেষে দাফন করলাম। করবে রাখার পরমুহূর্তেই তিনি চোখ দু’টো খুলে আমার দিকে তাকালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘একি! আপনি বুঝি জীবিত আছেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি জীবিত অবশ্যই। আল্লাহর প্রত্যেক প্রেমিকই তো জ্যাস্ত!’”

হযরত ওয়াসিফ মুয়াদ্দিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর জিকিরের উপর বয়ান পেশ করছিলেন। তিনি বললেন, ‘যদি কেউ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর জিকির

করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করার ইচ্ছা করে তাহলে সে তা পারবে।’ এরপর তিনি এক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে হাত বুলালেন। লোকটি সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।” হযরত বিশর বিন হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যখন হযরত আমর বিন উৎবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু’আ করতেন তখন একখণ্ড মেঘ এসে তাঁকে ছায়া দান করতো। সিংহরা এসে তার চতুর্দিকে নিজেদের লেজ নড়াচড়া করে ঘোরাফেরা করতো।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার নিকট চারটি দিরহাম ছিলো। আমি হযরত শায়খ সিররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে গেলাম। বললাম: ‘শায়খী! এই চারটি দিরহাম আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ এনেছি।’ তিনি বললেন, ‘হে সন্তান! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। তুমি সফল হবে। আমার চার দিরহামের প্রয়োজন ছিলো। এজন্য আমি দু’আ করেছিলাম: হে আল্লাহ! আপনি এই দিরহামগুলো আমার নিকট পাঠিয়ে দেন এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি আপনার সফল বান্দা হবেন!’”

হযরত আবু ইব্রাহিম ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমরা ক’জন একটি সফরে ছিলাম। সমুদ্র সৈকতের উপর চলাকালে একটি ঝোপের কাছে আসলাম যেখানে ছিলো অনেক লাকড়ি। অদূরে একটি কেল্লাও দেখতে পেলাম। কেউ একজন হযরতকে বললেন: ‘এখানে অনেক লাকড়ি আছে। রাত কাটানোর জন্য বেশ সুবিধাজনক মনে হচ্ছে। আমরা চাইলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে পারি। কি বলেন হযরত?’ তিনি রাজী হলেন। আমরা কেল্লার একজনের নিকট আগুন ধার দিতে বললাম। এরপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলাম। আমাদের সাথে কিছু রুটি ছিলো। এগুলো বের করলাম। সাথী একজন বললেন, ‘এই অঙ্গারগুলো কী সুন্দর! যদি আমাদের নিকট কিছু মাংস থাকতো, তাহলে এগুলোর উপর পুড়ে রান্না করে খেতাম!’ হযরত ইব্রাহিম বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে খাওয়াতে পারেন!’ সাথে সাথে দেখলাম, একটি সিংহ হরিণকে তাড়া দিতে দিতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। হরিণটি কাছে এসেই পড়ে গেল। তার ঘাড় ভেঙ্গে গেছে। ইব্রাহিম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন: ‘এটা জবাই করো! আল্লাহ তা’আলা তোমাদের জন্য খাবার প্রেরণ করেছেন!’ সুতরাং আমরা এটি জবাই করে মাংস বুনে শুরু করলাম। ঐদিকে সিংহটা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখলো।”

হযরত হামিদ আসওয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “চারটি শর্তসাপেক্ষে আমি হযরত ইব্রাহিম খাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে মরুভূমিতে সফরে ছিলাম। এই শর্তগুলোর সবক’টি তখনো অপরিবর্তিত ছিলো। সপ্তম দিনে কিন্তু অনাহারে থাকার কারণে দুর্বল হয়ে বসে পড়ি। তিনি জানতে চাইলেন: ‘তোমার কি হয়েছে?’ বললাম, ‘হযরত! দুর্বলতা আমাকে আড়ষ্ট করেছে।’ বললেন, ‘কোনটি তোমার বেশি দরকার, খাবার না পানি?’ বললাম, ‘পানি।’ তিনি তখন বললেন, ‘পানি তোমার পেছনেই আছে!’ আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি সত্যিই মিষ্টি পানির ফোয়ারা দেখাচ্ছে। যেনো তাজা দুধ। আমি পিপাসা মিটিয়ে পান করলাম ও অযু সারলাম। হযরত খাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবকিছু দেখলেন কিন্তু কাছে আসলেন না। সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কিছু পানি সাথে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হলো। তিনি বললেন, ‘এটা করো না। এই পানি সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে নি।’”

হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিমা জাইতুনা [যিনি হযরত আবু হামযা বাগদাদী ও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমারও খাদিমা ছিলেন] বলেন: “দিনটি ছিলো খুব ঠাণ্ডা। আমি হযরত নূরীকে জিজ্ঞেস করলাম গরম কিছু দেবো কি না? বললেন, ‘হ্যাঁ’। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি চাচ্ছেন?’ বললেন, ‘দুধ ও রুটি।’ আমি এগুলো নিয়ে আসলাম।

হযরতের সামনে কিছু কয়লার ছাই ছিলো। তিনি কি একটা দিয়ে এ ছাইটুকু নড়াচড়া করছিলেন। ফলে ছাই বাতাসে উড়ছিলো। রুটি খাওয়ার সময় হযরতের হাতে কিছু দুধ পড়ে গেলো ও ছাইয়ের সঙ্গে মিশে সমস্ত হাত কালো করে দিল। আমি মনে মনে বললাম, ‘ইয়া আল্লাহ! তোমার বন্ধুরা কতো নোংরা! তাদের মধ্যে কেউ পরিচ্ছন্ন নেই!’ কিছুক্ষণ পর আমি বাইরে চলে আসলাম। হঠাৎ এক মহিলা আমাকে ধরে চিৎকার দিতে লাগলো: ‘তুমি আমার কাছ থেকে এক গাটরি কাপড় চুরি করেছো!’ সাথে সাথে কয়েকজন এসে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গিলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তার কাছে। হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খবর পেয়ে কর্মকর্তার নিকট চলে আসলেন। বললেন, ‘একে রাখবেন না, সে আল্লাহ ত’আলার একজন ওয়ালিয়া।’ কর্মকর্তা বললেন, ‘কিন্তু হযরত, আমি কি করতে পারি? সে তো চুরি করেছে বলে ঐ মহিলা অভিযোগ করেছেন।’ একটু পরই আরেক দাসি এক গাটরি কাপড় নিয়ে আসলো। এই গাটরিই ঐ মহিলা খুঁজছিলেন। সুতরাং আমি ছাড়া পেলাম। বাড়িতে ফিরে আসার

পর হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন: ‘তুমি এখনো ভাবো, আল্লাহর ওয়ালির নোংরা?’ বললাম, ‘হযরত! এই ধারণার কারণে আমি ইতোমধ্যে আল্লাহ তা’আলার দরবারে তাওবাহ করেছি!’”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার এক সফরের সময় খুব বেশি পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমি এর তীব্রতা হেতু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার মুখের উপর পানি পড়ছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি বাদামি-ধূসর রঙের একটি ঘোড়ায় আরোহণরত এক সুদর্শন পুরুষ আমার নিকটে। তিনি আমাকে পানি পান করতে দিলেন। এরপর বললেন, ‘আমার সাথে ঘোড়ায় আরোহণ করো!’ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ঘোড়া থেমে গেলো। দেখলাম আমরা হিজায় অঞ্চলে পৌঁছে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি সামনে কি দেখছো?’ জবাব দিলাম, ‘মদীনা মুনাওয়ারা’। বললেন, ‘ঘোড়া থেকে নামো! যাও, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত ও সালাম জানাও। তাকে বলবে, আপনার ভাই খিজির আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করেছেন।”

হযরত মুজাফফর জাসসাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি এক রাতে হযরত নাসির খাররাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে কোথাও অবস্থান করছিলাম। আমরা সুফিদের জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনায় ছিলাম। খাররাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর জিকির সম্পর্কে মতামত পেশ করলেন, ‘যখন কেউ আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হয়, তখন শুরুতেই তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা’আলা প্রথমে তাকে স্মরণ করেছেন বলেই সে জিকির করতে সক্ষম হচ্ছে।’ আমি এতে দ্বিমত পোষণ করলাম। তিনি বললেন, ‘যদি খিজির আলাইহিসসালাম এখানে আসতেন তাহলে তিনিও দেখতে আমার সঙ্গে একমত হচ্ছেন।’ হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এক বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে হাজির হয়েছেন। তিনি বাতাসের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘তিনি [খাররাত রাহ.] সত্য বলেছেন। যে কেউ আল্লাহ তা’আলার জিকির করে, সে এই জিকিরকে প্রাপ্ত হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা’আলা যখন তাকে দয়া করে স্মরণ করেন।’ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা উভয়ে এটা বুঝতে পারলাম যে, তিনি ছিলেন হযরত খিজির আলাইহিসসালাম।”

আমি হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “এক ব্যক্তি হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট যেয়ে বললো: ‘মানুষ বলে আপনি নাকি পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন?’ হযরত সাহল বললেন: ‘এ ব্যাপারে এখানকার মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তিনি একজন সত্যবাদী লোক, মিথ্যা বলবেন না।’ সুতরাং লোকটি মুয়াজ্জিনকে হযরত তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। মুয়াজ্জিন বললেন: ‘আমি [পানির উপর দিয়ে হাঁটা] এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। বরং ক’দিন আগে দেখলাম, তিনি অযু করতে পুকুরঘাটে গিয়েছেন। পা পিছলে পড়ে গেলেন পানিতে। আমি যদি সেখানে থাকতাম না তাহলে হয়তো তিনি ওখানেই রয়ে যেতেন!’”

এরপর হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন, “সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবশ্যই কারামাতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। তবে আল্লাহ তা’আলা তাঁর ওয়ালিদের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকেন। তিনি মুয়াজ্জিনের বর্ণনা দ্বারা হযরতের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখলেন। কারণ, সাহল তো কারামাতের অধিকারী এক মহান ওয়ালি ছিলেন।”

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুরূপ একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবুল হাসান জুরজানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতের লেখা একটি নিজের ঘটনা পাঠ করেছি। এতে লিখা ছিলো: “আমি একদা মিসরে যেতে ইচ্ছা করলাম। ভাবলাম জাহাজে ভ্রমণ করবো। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের মধ্যে একথার উদ্বেক হলো যে, আমাকে তো ওখানকার সবাই চিনে। একসময় আমি সুনাম অর্জনে ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে একটি জাহাজ এলো। ঘাটে না ভিড়ায় আমি পানির উপর দিয়ে হেঁটে জাহাজে আরোহণ করলাম। অনেকে আমার এ অস্বাভাবিক কাজটি দেখলো। কিন্তু কেউ তো বললো না, এটা এক আশ্চর্য কারামাত! আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহ তা’আলা তাঁর বন্ধুজনদের সর্বদাই নিরাপদ রাখেন।”

হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু কিছু কারামাত আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। হযরতের মুত্বাশয়ে একবার রোগ হলো। ঘণ্টায় কয়েকবার প্রস্রাব করতে হতো। এমনকি দু’রাকাত নামায পড়েই পুনরায় অযু করা জরুরী হয়ে পড়লো। দারস প্রদানের জন্য রাস্তায় বের হলে সাথে নিতেন

প্রশ্রাব করার বোতল। যাওয়া এবং আসার সময় কয়েকবার প্রশ্রাব করতে হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখন তিনি দারসে বসে বক্তব্য শুরু করতেন তখন তাঁর রোগের প্রকোপ মোটেই থাকতো না। তিনি অনেক সময়ব্যাপী বক্তব্য পেশ করে যেতেন, প্রশ্রাবের বেগ পরিলক্ষিত হতো না। আমরা তাঁর এ ব্যাপারটি অনেক বছর যাবৎ দেখেছি। তিনি জীবিত থাকতে আমাদের ধারণায়ই আসে নি যে, এটি একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। হযরতের মৃত্যুর পর বিষয়টি আমি অনুধাবন করলাম। অনুরূপ বর্ণনা মিলে হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কেও। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। অথচ নামাযের সময় তাঁর শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য স্বাভাবিক হয়ে যেতো। এমনকি তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ওয়াযযান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে মশহুর একটি ব্যাপার সবার জানা ছিলো। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শরীরের চেতনা হারান। কিন্তু সামা' শ্রবণের সময় তিনি কোথেকে শক্তি পেয়ে যেতেন এবং সকলের মতো দাঁড়িয়ে শরীর নড়াচড়াও করতে পারতেন।

হযরত আহমদ বিন আবি হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি হযরত আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে পবিত্র হজ্জ পালনে যাই। পথিমধ্যে আমার চামড়ার পানির থলেটি হারিয়ে যায়। হযরত দারামীকে বললাম, ‘হুজুর! আমার পানির থলেটি হারিয়ে গেছে।’ সুতরাং আমরা পানি ছাড়াই এগিয়ে চললাম। আবহাওয়ার অবস্থা ছিলো খুব ঠাণ্ডা। হযরত দারামী রাহ. বললেন: ‘হে আল্লাহ! আপনি চাইলে হারানো জিনিস ফিরে দিতে পারেন। আপনি যাকে চান, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের পানির থলেটি ফিরিয়ে দেন।’ হঠাৎ শুনলাম এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলছে: ‘পানির-চামড়া কে হারিয়েছে?’ আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, ‘আমি! আমি হারিয়েছি।’ সুতরাং থলেটি ফিরে পেলাম।

আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু হলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো, তাই নিজেদেরকে যেটুকু সম্ভব কাপড় দ্বারা আবৃত করে চললাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তার পরনে ছিলো ত্যানা। অথচ তার শরীর থেকে ঘর্ম ঝরে পড়ছিলো। হযরত আবু সুলাইমান তাকে বললেন: ‘আসুন, আপনিও আমাদের গরম কাপড় পরে ঠাণ্ডা শরীর কিছুটা উষ্ণ করুন!’ লোকটি প্রতিক্রিয়ায় বললেন: ‘হে আবু

সুলাইমান! ঠাণ্ডা অনুভব করার পরও আপনি কিভাবে আমাদেরকে আত্মবিলুপ্তি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেবেন? আমি এই বিরানভূমির উপর দীর্ঘদিন যাবৎ ভ্রমণ করে আসছি। কিন্তু কখনো থর থর করে কাঁপি নি কিংবা উত্তেজিত হই নি। ঠাণ্ডা মওসুমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বস্ত্রাবৃত করেন তাঁর মুহাব্বাতের উষ্ণতা দ্বারা। গরমের সময় তিনি আমাকে দান করেন তাঁর মুহাব্বাতের শীতল স্বাধের বস্ত্র।' একথা বলে তিনি চলে গেলেন।”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একবার দিন দুপুরের সময় মরুভূমিতে হাটছিলাম। একটি বৃক্ষের নিকট এসে দেখলাম কাছেই পানির বরণা দেখাচ্ছে। সুতরাং সেখানেই তাঁবু গাড়লাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটি সিংহ আমার দিকে আসছে। নিজের অবস্থা ভাগ্যের উপর ছেড়ে পালিয়ে না যেয়ে বসেই রইলাম। সিংহ যখন কাছে আসলো, লক্ষ্য করলাম সে খুঁড়ে খুঁড়ে হাঁটছে। আমার কাছে এসে বসে পড়লো। তার কণ্ঠে যেমন আতর্নাদের সুর। আমার সামনে মাথা নত করে তার থাবা আমার কোলে রাখলো। দেখলাম এটা ফুলে গেছে। এক যায়গায় পুঁজ ও রক্ত জমাট বেধে আছে। আমি এক টুকরো শানদার কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা ঐ জায়গাটিতে একটি ছোট ছিদ্র করলাম। এতে দূষিত পুঁজ ও রক্তটুকু বেরিয়ে আসলো। এরপর এক টুকরো কাপড় দ্বারা ক্ষত জায়গাটুকু বেধে দিলাম। সিংহটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরই কিন্তু তার দু'টি শাবক নিয়ে ফিরে আসলো। ওরা আমার উদ্দেশ্যে লেজ তুলে নাড়তে থাকে। তারা নিয়ে এসেছে আমার জন্য এক টুকরো রুটিও।” Sylhet

হযরত আহমদ বিন আবি হাওয়ারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত মুহাম্মদ বিন সাম্মাক নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের নিকট অভিযোগ করলেন। আমরা তার প্রশ্নাব সংগ্রহ করে একজন খ্রিস্টান ডাক্তারের নিকট যাত্রা করলাম। হিরা ও কুফার [ইরাকের দু'টি শহর] মধ্যখানে পৌঁছার পর সুদর্শন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। তার পরনে পরিস্কার বস্ত্রাদি ছিলো। শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিলো সুঘ্রাণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?’। জবাব দিলাম, ‘আমরা অমুখ খ্রিস্টান ডাক্তারের নিকট ইবনে সাম্মাকের প্রশ্নাব নিয়ে যাচ্ছি। তিনি অসুস্থ।’ তিনি অভিযোগ করে বললেন: ‘আপনারা আল্লাহর এক বন্ধুর জন্য সাহায্য চাইতে যাচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার এক দুশমনের কাছে! এই

বোতলটি ভেঙ্গ ফেলুন! ইবনে সাম্মাকের নিকট ফিরে যান! তাঁকে বলবেন: ‘যে যায়গায় ব্যথা পাচ্ছেন সেখানে আপনার হাত রাখুন ও বলুন:

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

অর্থাৎ: “আমি সত্যসহ এটা [কুরআন] নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে।” [বনী ইসরাঈল : ১০৫]

এরপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা ইবনে সাম্মাক রামাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ফিরে এসে সব খুলে বললাম। তিনি নিজের হাত ব্যথার জায়গায় রেখে কুরআন শরীফের ঐ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন। আল্লাহর মহিমায় তিনি সাথে সাথে আরোগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি বললেন, ‘যাকে তোমরা দেখেছিলে, তিনি ছিলেন খিজির আলাইহিসসালাম।’”

হযরত আবদুর রহমান মুহাম্মদ বিন সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চাচা বিস্তামী থেকে বর্ণনা করেন: “আমরা একদিন হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক দারসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, ‘এসো, আল্লাহর এক ওয়ালিকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসি!’ আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম ও তাঁর সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম। শহরের মূল তোরণে পৌঁছে হযরত ইব্রাহিম বিন শাইবা হারাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত বিস্তামী তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ‘এটা আমার অনুভূতিতে জাগ্রত হলো যে, বাইরে এসে আপনাকে স্বাগত জানাবো ও আপনার জন্য আমার প্রভুর দরবারে সুপারিশ করবো।’ প্রতিত্তোরে হযরত ইব্রাহিম বললেন, ‘জগতের সকল প্রাণীর জন্যই যদি আপনি সুপারিশ করেন তবুও যথেষ্ট হবে না। কারণ তারা তো ময়লাযুক্ত ধুলো ছাড়া আর কিছু নয়!’ হযরত বিস্তামী রাহ. একথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।” এ ব্যাপারো [শায়খ কুশায়রী রাহ.] মন্তব্য করেন: ‘এ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কারামাত হযরত বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির থেকেও অধিক বিশুদ্ধ। তাঁর আধ্যাত্মিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো সুপারিশ করার ব্যাপারটি।’

হযরত সালিম মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত যুননুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাঁর তাওবার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিলেন: “আমি মিশর [সম্ভবত মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম শহর ফুয়াত] ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে

জেগে ওঠলে চোখে পড়লো একটি অন্ধ ভরতপাখি তার বাসা থেকে নিচে পড়ে আছে। হঠাৎ মাটি ফেটে দু’টি পাত্র বেরিয়ে এলো। এর একটি স্বর্ণের আর অপরটি রৌপ্যের। একটিতে ছিলো তিল ও অপরটিতে গোলাপজল। ভরতপাখি তিল খেলো ও গোলাপজল পান করলো। আমি ভাবলাম, ‘এটা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাওবা করলাম।’ এরপর নিজেকে অবিরত [আল্লাহর] দরোজায় দাঁড়ানো অবস্থায় রাখলাম যতক্ষণ না তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন।”

বর্ণিত আছে [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা] হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। যখন নামাযের সময় আসলো তিনি অযু করতে চাইলেন। ডাক দিলেন: ‘কেউ কি এখানে আছে?’ কেউ সাড়া দিলো না। নামায কাযা হওয়ার আশঙ্কায় তিনি আকুতি করে আল্লাহর দরবারে দু’আ করলেন: “হে আমার প্রভু! এই প্রতিবন্ধকতা থেকে আমাকে মুক্ত করুন যাতে আমি অযু করে নিতে পারি। এরপর আমার সঙ্গে যেভাবে আপনার ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করবেন!” তিনি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে ওঠলেন। অযু সারলেন। নামায শেষে বিছানায় যাওয়ার পর পুনরায় রোগ ফিরে আসলো।

হযরত আবু আইউব হাম্মাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যখনই হযরত আবু আবদুল্লাহ দাইলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোথাও তাঁর ফেলতে ইচ্ছা করতেন তখনই তিনি তাঁর গাধায় হেলান দিতেন। গাধার কানে ফিসফিস করে বলতেন: ‘আমি তোমাকে বেধে রাখবো না। মাঠে চরে খেতে দেবো। তবে শর্ত হলো, আমরা যখন পুনরায় যাত্রা করবো তুমি ফিরে আসবে!’ সত্যিই, যাত্রার সময় আসলে গাধাটি ফিরে আসতো।”

বর্ণিত আছে হযরত আবু আবদুল্লাহ দাইলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মেয়েকে কিছু যৌতুকসহ বিবাহ দিতে চাইলেন। অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি একটি জুব্বা বানিয়ে ১ দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। এবারও একটি জুব্বা বানিয়ে বিক্রি করার জন্য ব্যাপারির নিকট নিয়ে গেলেন। ব্যাপারি বললেন, ‘এটা তো এক দিনার চেয়েও বেশি মূল্যবান।’ অন্যান্য ব্যাপারি এসে ক্রয় করার জন্য দাম করতে লাগলেন। তারা ক্রমান্বয়ে এটার মূল্য বৃদ্ধি করতে করতে ১০০ দিনারে নিয়ে স্থির করলেন। এই অর্থে মেয়ের বিবাহের যৌতুক হয়ে গেলো।

হযরত নাদির বিন শুমাইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একটি আবজর্না-মোড়ক ক্রয় করলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম এটা অনেক বেটে। তাই দু’আ করলাম, ‘হে প্রভু! এটার দৈর্ঘ্য এক হাত পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন।’ তা-ই হলো। যদি আরো বেশি বলতাম তাহলে তিনি তা-ই করে দিতেন।”

বর্ণিত আছে হযরত আমির বিন আবদুল ক্বায়েস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা’আলার নিকট দু’আ করলেন, শীতের সময় অযু করাটা তাঁর জন্য সহজ করে দিতে। দু’আর পর থেকে সব শীতের সময় তার অযুর পানি গরম হয়ে যেতো। তিনি এটাও আল্লাহর দরবারে আবদার করেন, নারীদের প্রতি আকর্ষণ তাঁর অন্তর থেকে মুছে দিতে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হয়। অবশেষে তিনি আল্লাহ তা’আলার নিকট আরজ করেন, শয়তানকেও তাঁর অন্তর থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে। কিন্তু এবার আল্লাহ তা’আলা তাঁর দু’আটি কবুল করেন নি।

হযরত বিশরে হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি বাড়িতে এসে এক ব্যক্তিকে সেখানে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে আপনি? অনুমতি ছাড়া আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন!’ তিনি বললেন, ‘আমি আপনার ভাই খিজির!’ তাঁকে দু’আ করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন: ‘আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রতি আপনার আনুগত্য সহজ করে দিন!’ বললাম, ‘আরো কিছু দু’আ করুন।’ বললেন: ‘তিনি যেনো আপনার আনুগত্যকে গোপন রাখেন!’”

হযরত ইব্রাহিম খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “মক্কা শরীফ যাত্রাকালে পথিমধ্যে রাতের বেলা একটি ধ্বংস্তুপের ভেতর প্রবেশ করলাম। ওখানে সাক্ষাৎ ঘটলো এক বিরাট সিংহের সাথে! আমি ভয় পেলাম। পরমুহূর্তে গায়েবী আওয়াজ শুনলাম, ‘দৃঢ় থাকো! তোমার নিরাপত্তায় ৭০ হাজার ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন!’”

হযরত জাফর দাইবুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “হযরত আবুল হুসাইন নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি শ্রোতস্বিনীর নিকটবর্তী হলেন, গোসল সারতে। এদিকে তীরে রেখে যাওয়া তাঁর কাপড়-চোপড় এক চোর নিয়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসলো বস্ত্রাদি নিয়ে। তার হাত বিবর্ণ হয়ে গেছে! হযরত নূরী বললেন: ‘সে বস্ত্রাদি ফিরে দিয়েছে। আমরা তার হাত ফিরে দিলাম।’ সাথে সাথে চোরের হাত স্বাভাবিক হয়ে গেলো।”

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদা প্রতিজ্ঞা করলাম হালাল ছাড়া কিছুই খাবো না। একদিন আমি মরুভূমিতে ঘোরাফেরা করছিলাম। একটি ডুমুর গাছের নিকটে এসে [ডুমুর আনতে] হাত প্রসারিত করলাম। গাছ থেকে আওয়াজ আসলো, ‘আপনার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দেবেন না! আমার ফল খাবেন না! আমার মালিক একজন ইয়াহুদী!’”

হযরত আবু আবদুল্লাহ খাফিফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “পবিত্র হজ্জের ভ্রমণে যাত্রাকালে আমি বাগদাদে গেলাম। সুফিদের বৃথা-গৌরবের কথা আমার মস্তিষ্কে বক্র করে দিল। আমি চল্লিশ দিন যাবৎ রুটি খাই নি। জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও দেখতে গেলাম না। এরপর বাগদাদ ছেড়ে চললাম। [ইরাকের] জুবাল শহরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পানিও পান করি নি। আমার অযুও যায় নি। চোখে পড়লো একটি হরিণ। কূপ থেকে পানি পান করছে। আমার পিপাসা লাগলো। আমি যখন কূপের নিকট গেলাম তখন হরিণটি ছুটে পালালো। এদিকে কূপের পানি একেবারে তলায় নেমে গেলো। আমি চলতে চলতে বললাম: ‘হে আমার প্রভু! আপনার নিকট আমি কি এই হরিণের সমানও নয়?’ পেছন থেকে একটি আওয়াজ আমার কর্ণগোচর হলো: ‘আমরা তোমাকে পরীক্ষা করেছে। কিন্তু তুমি যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে পারো নি!’ আমি ফিরে গেলাম কূপের নিকট। দেখলাম এটি পানিতে ভরে গেছে। আমি পানির-চামড়া ভরে নিলাম। মদীনা মুনওয়ারায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পানি পান করলাম। কিন্তু পানি কখনো কমলো না। পান করার সময় একবার একটি আওয়াজ শুনলাম: ‘হরিণটি নিয়ে আসেনি পানির-চামড়া ও দড়ি। কিন্তু তোমার কাছে উভয়টিই ছিলো।’ হজ্জ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আমি বাগদাদ হয়ে যাই। সেখানকার জুমু’আ মসজিদে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি আমাকে বললেন, ‘ও হে! তুমি যদি ধৈর্যশীল থাকতে তাহলে পদতল থেকে পানি সজোরে বেরিয়ে আসতো! শুধু আরো একটি ঘণ্টার জন্য যদি তুমি ধৈর্যধারণ করতে!’”

হযরত মুহাম্মদ বিন সাঈদ বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একদিন বসরা শহরের রাস্তার উপর হাঁটছিলাম। চোখে পড়লো একজন বেদুঈন। সে একটি উট তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম উটটি মাটিতে পড়ে গেলো এবং মৃত্যুবরণ করলো। উটের উপরে রাখা রসদপত্র ও গদি ইত্যাদিও জমিনের

উপর ছিটকে পড়লো। আমি শুধুমাত্র হাঁটতে শুরু করবো, লক্ষ্য করলাম এ বেদুঈন খুব করজোড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করছে: ‘হে সব ঘটনা ঘটানোর মালিক! হে সকল আবদারকারীর প্রভু! এইমাত্র আমি যা হারালাম তা ফিরিয়ে দিন!’ কী আশ্চর্য! দেখলাম উটটি উঠে গেলো, তাঁর পিঠে গদি ও রসপত্রও ছিলো!”

বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাংস খেতে পছন্দ করতেন। একদিন অর্ধ দিনারের বিনিময়ে কিছু মাংস ক্রয় করলেন বাজারে য়েয়ে। ফেরার পথে কোথেকে একটি চিল মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে গেল! মর্মাহত হয়ে হযরত শিবলী মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে বাড়ি ফিরলেন। খাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বুনা মাংস নিয়ে আসলেন। হযরত শিবলী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘মাংস কোথেকে আসলো?’ স্ত্রী বললেন, ‘দু’টি চিল ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তাদের কাছ থেকেই এই মাংস ঘরের সামনে পড়েছে!’ হযরত শিবলী বললেন: ‘সুবহানাল্লাহ! তিনি শিবলীকে ভুলেন নি, অথচ শিবলী তাঁকে ভুলে গেছে!’”

হযরত ইবনে আবি উবাইদ বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন: “আমার পিতা একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একদল সৈন্যের সঙ্গে অশ্বশাবকে আরোহণ করে চলছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শাবকটি মারা গেলো। তিনি দু’আ করলেন, ‘হে প্রভু! এটি [মৃত শাবক] আমাকে ধার দিন যাতে করে বুশরায় ফিরে যেতে পারি!’ - তিনি তাঁর নিজের গ্রামের কথা উদ্দেশ্য করেন। হঠাৎ দেখা গেলো ঐ মৃত অশ্বশাবকটি দাঁড়িয়ে গেছে! জিহাদ শেষে বাড়ি ফিরে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, শাবকের উপর থেকে জিনটি নামিয়ে নিতে। আমি বললাম, ‘শাবক ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে। তার উপর থেকে জিন সরালে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হতে পারে।’ পিতাজি বললেন, ‘এটা ধার করা জন্তু, হে আমার পুত্র!’ আমি যখন তার উপর থেকে জিনটি সরালাম তখন সাথে সাথে অশ্বশাবকটি মৃত্যুবরণ করলো।”

একজন সুফি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি কাফন চোর ছিলেন। একদা একজন মহিলা মৃত্যুবরণ করলেন। সুফিও সবার সাথে জানাযা পড়লেন। উদ্দেশ্য ছিলো মহিলাকে কোথায় কবরস্থ করা হবে, তা জানা। রাতের বেলা তিনি মহিলার কবর খুঁড়লেন। কবরস্থ মহিলা বলে ওঠলেন: ‘সুবহানাল্লাহ! যে লোকটিকে আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা করেছেন, তিনিই এখন এমন এক মহিলার

কাফন চুরি করতে এসেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করেছেন!' তিনি বললেন, 'তোমাকে তো মাফ করেছেন বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কেনো মাফ করলেন?' মহিলা বললেন, 'আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছিল সকলকেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন!' সুফি একথা শুনে কবর থেকে বেরিয়ে আসলেন। মহিলার কবরে পুনরায় মাটি দিলেন। তিনি খাস দিলে তাওবা করে এই চুরির কাজটি জিন্দেগীর জন্য পরিত্যাগ করলেন।

হযরত আবু মুহাম্মদ নু'মান বিন মূসা হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "দু'ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। এর একজন ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত সেনা। অপরজন সাধারণ ব্যক্তি। একে অন্যকে আক্রমণের সময় সাধারণ ব্যক্তি সৈন্যের দাঁত ভেঙ্গে ফেললো। সৈন্য তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিল: 'আমাদের মধ্যকার ঝগড়া কমান্ডারকে মিটিয়ে দিতে দাও!' তারা চললো কমান্ডারের নিকট। রাস্তায় কিছু লোক বললো, 'এ দ্যাখো হযরত যুননুন মিসরী দাঁড়িয়ে আছেন। তোমরা তার কাছে যাও।' তারা হযরতের নিকট যেয়ে সবকিছু খুলে বললো। যে দাঁতটি পড়ে গিয়েছিল তিনি সেটি হাতে তুলে নিলেন। নিজের মুখের লালা দ্বারা সিক্ত করে সৈন্যের মাড়িতে স্বস্থানে রেখে দিলেন। আল্লাহর মহিমায় এটি লেগে গেলো। সৈন্য বার বার সব দাঁত হাত দ্বারা পরীক্ষা করলো- সবই তো ঠিক আছে!"

হযরত আবু সাবরা নাখরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে বর্ণিত আছে: "ইয়েমন থেকে এক ব্যক্তি হিজায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তার গাধাটি মারা গেলো। তিনি অযু করে দু'রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন: 'হে আমার প্রভু! আমি এসেছি আপনার সন্তুষ্টি কামনায় জিহাদে অংশ নিতে। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং কবরে শায়িতদেরকে পুনরুত্থান করবেন। আমাকে কারো অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করবেন না! আজ আমি আপনার দরবারে আবদার জানাচ্ছি মৃত এই গাধাটিকে পুনরুত্থান করুন।' সাথে সাথে গাধাটি দাঁড়িয়ে গেলো। সে তার কান দু'টো নাড়তে লাগলো।"

হযরত আবু বকর হামদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমি হিজায়ের মরুভূমিতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। কোনো কিছু খাবার জুটে নি। বাবুত তাক্ব [বাগদাদের একটি মহল্লা] এর গরম কড়াইশুঁটি আর রুটির জন্য মনে ভীষণ

আগ্রহ জন্মালো। কিন্তু নিজেকে নিজেই বললাম, ‘আমি তো একটি মরুভূমির মাঝখানে পড়ে আছি। ইরাক ও আমার মধ্যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান। এ ইচ্ছা তো কখনো পূরণ হবার নয়।’ ভাবনা শেষ হতে না হতেই শুনলাম দূর থেকে এক বেদুঈন চিৎকার দিচ্ছেন: ‘গরম কড়াইশুঁটি ও রুটি!’ আমি তার কাছে এসে বললাম, ‘সত্যিই কি আপনার নিকট কড়াইশুঁটি ও রুটি আছে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আছে।’ তিনি কোমরে বাঁধা মোড়কটি খুলে ফেললেন। কড়াইশুঁটি ও রুটি বের করে আমাকে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি খেলাম। তিনি আমাকে তিনবার আমন্ত্রণ জানালেন, আমি তিনবারই খেলাম। চতুর্থবার আমন্ত্রণ জানানোর পর জিজ্ঞেস করলাম, যে আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ওয়াস্তে বলুন, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি খিজির!’ তিনি সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁকে আর দেখলাম না।”

হযরত আবু জাফর হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি [বাগদাদের] তালাবিয়া অঞ্চলে আসলাম। সমগ্র এলাকা ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ ৭ দিন হলো আমি কিছুই ভক্ষণ করি নি। একটি গম্বুজযুক্ত ইমারতের ভেতর প্রবেশ করলাম। কিছুক্ষণ পর প্রবেশদ্বারে কয়েকজন খুরাশানী ব্যক্তিকে দেখলাম। দীর্ঘ ভ্রমণে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একজন বেদুঈন উটনী চড়ে সেখানে আসলেন এবং কিছু খেজুর তাদের দিকে ছুড়ে মারলেন। তারা খেতে লাগলেন কিন্তু আমাকে কিছুই বললেন না। অবশ্য বেদুঈন ব্যক্তি আমাকে দেখেন নি। কিছুক্ষণ পর বেদুঈন ফিরে এসে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা ছাড়া এখানে অন্য কেউ আছেন কি?’ তারা জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, ভেতরে একব্যক্তি আছেন।’ তিনি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কে? আপনি আগে আমার সঙ্গে কথা বললেন না যে? এই মাত্র এখানে আসার পূর্বে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি এক ব্যক্তিকে ওখানে রেখে এসেছো যিনি উপবাসে আছেন।’ তিনি আমার সামনে অনেক খেজুর রাখলেন। এরপর চলে গেলেন। আমি খোরশানীদেরও আমন্ত্রণ জানালাম এবং সবাই মিলে খেলাম।”

আমি হযরত হামজা বিন ইউসুফ থেকে, তিনি হযরত আবু তাহির রাক্বী থেকে, তিনি হযরত আহমদ বিন আ’তা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছেন: “একদা একটি উট আমার সঙ্গে কথা বলেছে! আমি তখন মক্কা মুকারমায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি কাফেলা দেখলাম। তাদের উটগুলো ভারী বোঝা

বহর করছিলো। রাতের বেলা উটগুলো তাদের গলা দীর্ঘ করে চলছিলো। আমি দু'আ করলাম: ‘সেই আল্লাহর প্রসংশা করছি যিনি ইচ্ছা করলে এদেরকে ভারী বোঝা বহন থেকে রেহাই দিতে পারেন!’ আমার নিজের উট ঘাড় ফিরিয়ে বললো, ‘বলো: আল্লাহু আকবার!’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার!’”

আমি হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সুফিকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত হাসান বিন আহমদ ফারসীকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত দুক্কীকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত আবু বকর মুয়াম্মারকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত জুর'আ জানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “এক মহিলা আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। সে আমাকে বললো, ‘একজন রোগিকে দেখতে আপনি গৃহে আসবেন না?’ ঘরে ঢুকানোর পরই কিন্তু সে দরজায় তালা মারলো। ভেতরে অন্য কাউকে না দেখে বুঝতে পারলাম তার আসল উদ্দেশ্য কি ছিলো। আমি দু'আ করলাম: ‘আমার প্রভু! তাকে কালো করে ফেলুন!’ সাথে সাথে সে কালো রঙ ধারণ করলো। সে ভয়ে দরজা খুলে দিল। [বের হতে হতে] আমি পুনরায় দু'আ করলাম: ‘হে প্রভু! এবার তাকে আগের মতো করে দিন।’ সাথে সাথে সে তার পূর্বের চেহারা ফিরে পেলো।”

হযরত খলিল হাদাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমার ছেলে মুহাম্মদ হারিয়ে গেলো। আমরা তার জন্য এতোই শোকাহত হলাম যে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলাম। অবশেষে আমি হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হলাম। বললাম: ‘ইয়া আবু মাহফুয! আমার পুত্র হারিয়ে গেছে। শোকাহত হয়ে তার মা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।’ বললেন: ‘আমি কি করতে পারি?’ আবদার করলাম: ‘তাকে ফেরৎ পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।’ তিনি দু'আ করলেন: ‘হে আল্লাহ! আকাশ-পৃথিবী ও মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক আপনিই। মুহাম্মাদকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন!’

এরপর আমি দামেস্কোর তোরণে গেলাম। দেখলাম, ওখানে মুহাম্মাদ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কোথায় ছিলে বাবা মুহাম্মাদ?’ জবাব দিলো: ‘হে আব্বা! কিছুই বুঝতে পারছি না। মাত্র ক'টি মুহূর্ত পূর্বে আমি আশ্বার [বাগদাদ থেকে ৩৮ মাইল দূরে ফুরাত নদীর বাম তীরে অবস্থিত একটি শহর] নগরে ছিলাম!’”

লেখক [শায়খ হযরত আবুল কাসিম কুশাইরী] বলেন: ‘জেনে রাখুন, [উপরে বর্ণিত] এরকম ঘটনাবলীর সীমা নেই। আমরা যদি আরো বেশি বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করি তাহলে, যে সংক্ষিপ্ততা রক্ষার ইচ্ছা করছি তা সম্ভব হবে না। সুতরাং যা কিছুই আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি তা-ই, এ বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে বলে মনে করছি।’

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب رؤيا القوم

বাব রূ'ইয়াল ক্বাওম [সুফিদের দৃকশক্তি]

قال الله تعالى: " لهم البشرى في الحياة الدنيا، وفي الآخرة " .

قيل: هي الرؤيا الحسنة يراها المرء، أو ترى له.

أخبرنا أبو الحسن الإهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم المنقري قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء قال: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: " لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة " قال صلى الله عليه وسلم: " ما سألتني عنها أحد قبلك. هي الرؤيا الحسنة يراها المرء، أو ترى له " .

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد زيد قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرها فليتفل عن يساره، وليتعوذ؛ فإنها لن تضره " .

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس المزكي قال: حدثنا أبو أحمد حمزة ابن العباس البزار قال: حدثنا عياش بن محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله ابن موسى، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي".
ومعنى الخبر: أن تلك الرؤيا رؤيا صدق، وتأويلها حق، وأن الرؤيا نوع
من أنواع الكرامات، وتحقيق الرؤيا خواطراً ترد على القلب، وأحوال
تتصور في الوهم إذا لم يستغرق النوم جميع الاستشعار، فيتهم الإنسان عند
اليقظة أنه كان رؤية في الحقيقة، وإنما كان ذلك تصوراً وأوهاماً للخلق
تقررت في قلوبهم، وحين زال عنهم الإحساس، الظاهر تجردت تلك
الأوهام عن المعلومات بالحس والضرورة فقويت تلك الحالة عند
صاحبها، فإذا استيقظ ضعفت تلك الأحوال التي تصورها بالإضافة إلى
حال إحساس بالمشاهدات وحصول العولم الضرورية، ومثله: كالذي يكون
في ضوء السراج عند اشتداد الظلمة، فإذا طلعت الشمس عليه غلبت
ضوء السرج. فيتقاصر نور السراج بالإضافة إلى ضياء الشمس، فمثال
حال النوم كمن هو في ضوء السراج، ومثال المستيقظ كمن تعالى عليه
النهار؛ فإن المستيقظ يتذكر ما كان متصوراً له في حال نومه.
ثم ن تلك الأحاديث والخواطر التي كانت ترد على قلبه في حال نومه مرة
تكون من قبل الشيطان، ومرة من هواجس النفس، ومرة بخواطر الملك،
ومرة تكون تعريفاً من الله عز وجل بخلق تلك الأحوال في قلبه ابتداءً،
وفي الخبر: "أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً".

وأعلم أن النوم على أقسام: نوم غفلة، ونوم عادة، وذلك غير محمود، بل هو
معلوم؛ لأنه أخو الموت، وفي بعض الأخبار المروية: "النور أخو الموت".
وقال الله عز وجل: "وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار".
وقال تعالى: "الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في المنام".

وقيل: لو كان في النوم خير لكان في الجنة نوم.
وقيل: لما ألقى الله على آدم في الجنة أخرج منه حواء. وكلُّ بلاء به إنما حصل حين حصلت حواء.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لما قال إبراهيم لإسماعيل، عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال إسماعيل: يا أبت، هذا جزاء من نام عن حبيبه، لو لم تنم لما أمرت بذبح الولد.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: كذب من ادعى حبي، فإذا جئته الليل نام عني!! والنوم ضد العلم؛ ولهذا قال الشبلي: نعسة في ألف سنة فضيحة.

وقال الشبلي: اطلع الحق على الخلق فقال: من نام غفَل، ومن غَفَلَ حُجِب، فكان الشبلي يكتحل بالملح بعه حتى كان لا يأخذه النوم، وفي معناه أنشدوا:

عجباً للمحب كيف ينام... كل نوم على المحب حرام
وقيل: المريد: أكله فاقة، ونومه غلبة، وكلامه ضرورة.

وقيل: لما نام آدم عليه السلام بالحضرة قيل له: هذه حواء لتسكن إليها، هذا جزاء من نام بالحضرة.

وقيل: إن كنت حاضراً فلا تنم؛ فإن النوم في الحضرة سوء أدب، وإن كنت غائباً فأنت من أهل الحسرة ولمصيبة، والمصاب لا يأخذه نوم. وأمّا أهل المجاهدات فنومهم صدقة من الله عليهم، وأن الله عز وجل يباهي بالعبد إذا نام في سجوده، يقول: انظروا إلى عبيدي نام وروحه عندي، وجده بين يدي.

وقال الأستاذ: أي روحه في محل النجوى، وبدنه على بساط العبادة. وقيل: كل من نام على الطهارة يؤذن لروحه أن تطوف بالعرش وتسجد لله عز وجل قال تعالى: " وجعلنا نومكم سباتاً " .

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: شكا رجل إلى بعض المشايخ من كثرة النوم، فقال: اذهب فاشكر الله تعالى على العافية، فكم من مريض في شهوة غمضة من النوم الذي تشكو منه.

وقيل: لا شيء أشد على إبليس من نوم العاصي؛ يقول: متى ينتبه ويقوم حتى يعصي الله!! وقيل: أحسن أحوال العاصي أن ينام: إن لم يكن الوقت له لم يكن عليه.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: تواعد شاه الكرمانى السهر، فغلبه النوم مرة، فرأى الحق، سبحانه، في النوم، فكان يتكلف النوم بعد ذلك، فقليل له في ذلك؛ فقال:

رأيت سرور قلبي في منامي ... فأحببت التنعّس والمناما
وقيل: كان رجل له تلميذان، فأختلفا فيما بينهما، فقال أحدهما: النوم خير، لأن الإنسان لا يعصى الله في تلك الحالة. وقال الآخر: اليقظة خير، لأنه يعرف الله تعالى في تلك الحالة.

فتحاكما إلى ذلك الشيخ فقال: أما أنت الذي قلت بتفضيل النوم فالموت خير لك من الحياة، وأما أنت الذي قلت بتفضيل اليقظة، فالحياة خير لك من الموت.

وقيل: اشتري رجل مملوكة، فلما دخل الليل قال: افرشي الفراش. فقالت المملوكة: يا مولاي، ألك مولى؟ قال: نعم، فقالت: ينام مولاك؟ فقال: لا.

قالت: ألا تستحي أن تنام ومولاك لا ينام!! وقيل: قالت بنية لسعيد بن جبير: لم لا تنام؟ فقال: إن جهنم لا تدعني أن أنام. وقيل: قالت بنت لمالك بن دينار: لم لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات. وقيل: لما مات الربيع بن خيثم قالت بنية لأبيه: الأسطوانة التي كانت في دار جارتنا أين ذهبت؟ فقال: إنه كان جارتنا الصالح يقوم من أول الليل إلى آخره؛ فتوهمت البنية أنه كان سارية؛ لأنها كانت لا تصعد السطح إلا بالليل فنجدته قائماً.

وقال بعضهم: في النوم معان ليست في اليقظة؛ منها أنه يرى المصطفى، صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والسلف الماضيين في النوم، ولا يراهم في اليقظة وكذلك يرى الحق في النوم، وهذه مزية عظيمة.

وقيل: رأى أبو بكر الآجري الحق، سبحانه. في النوم، فقال له: سل حاجتك. فقال اللهم اغفر لجميع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أولى بهذا منك، سل حاجتك.

وقال الكتاني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه خلافه شأنه الله.

وقال الكتاني أيضاً: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: ادع الله أن لا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم أربعين مرة "يا حي، يا قيوم، لا إله إلا أنت" فإن الله يحيي قلبك.

ورأى الحسن بن علي، رضي الله عنهما، عيسى بن مريم، في المنام، فقال: إني أريد أن اتخذ خاتماً، فما الذي أكتب عليه؟ فقال: اكتب عليه: "لا إله إلا الله، الملك الحق المبين" فإنه في آخر الأنجيل.

وروي عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ربي عز وجل في المنام، فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال.

وقيل: رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام، فقال: يا أحمد، كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني.

وقال يحيى بن سعيد القطان: رأيت ربي في المنام فقلت: يا رب، كم أدعوك فلا تستجيب لي!! فقال تعالى: يا يحيى نبي أحب أن أسمع صوتك.

وقال بشر بن الحارث: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه في المنام، فقلت: يا أمير المؤمنين عظمي، فقال: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلباً لثواب الله تعالى، وأحسن من ذلك ثمة الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى، فقلت له: يا أمير المؤمنين: زدني، فقال:

قد كنت ميتاً فصرت حياً... وعن قريب تصير ميتاً
عزّ بدار الفناء بيت... فابن بدار البقاء بيتاً

وقيل: رأى سفيان الثوري في المنام؛ فقليل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: رحمني، فقليل له: ما حال عبد الله بن المبارك؟ فقال: هو ممن يلج على ربه كل يوم مرتين.

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: رأى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي أبا سهل الزجاجي في المنام، وكان الزجاجي يقول بوعيد الأبد، فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال الزجاجي: الأمر هاهنا أسهل مما كنا نظنه!! ورؤي الحسن بن عاصم الشيباني في المنام، فقليل له: ما فعل الله بك؟ فقال: ما يكون من الكريم إلا الكرم.

ورؤي بعضهم في المنام فسئل عن حاله، فقال:

حاسبونا فدققوا... ثم منوا فأعتقوا

ورؤي حبيب العجمي في المنام، فقليل له: مَتَّ يا حبيبي العجمي؟! فقال هيهات.. ذهبت العجمة وبقيت في النعمة.

وقيل: دخل الحسن البصري مسجداً ليصلي فيه المقرب، فوجد إمامهم حبيباً العجمي، فلم يصل خلفه. لأنه خاف أن يلحن العجمة في لسانه، فرأى في المنام تلك الليلة قائلاً يقول له: لِمَ لم تصل خلفه؟ لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك.

ورؤي مالك بن أنس في المنام. فقليل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة: " سبحان الحي الذي لا يموت ".

ورؤي في الليلة التي مات فيها الحسن البصري كأن أبواب السماء مفتحة.. وكأن منادياً ينادي: ألا إن الحسن البصري قدم على الله تعالى وهو عنه راض.

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول: رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في المنام على حالة حسنة فقتل: يا أستاذ، بم وجدت هذا؟ فقال: يحسن ظني برئي: وقيل: رؤي الجاحظ في المنام، فقليل له: ما فعل الله بك؟ فقال:

فلا تكتب بخطك غير شيء... بسرّك في القيامة أن تراه

وقيل: رأيت الجنيدُ إبليس في منامه عرياناً، فقال له: ألا تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء لا ناس، إنما الناس أقوام في مسجد الشونزية أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي، قال الجنيد: فلما انتبهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة وضعوا رؤوسهم على ركبهم متفكرين، فلما رأوني قالوا: لا

يغرنك حديث الحبيث.

ورؤى النصراباذي بمكة بعد وفاته في النوم، ف قيل له: ما فعل الله تعالى بك: فقال: عوتبت عتاب الأشراف، ثم نوديت: يا أبا القاسم، أبعد الاتصال انفصال؟ فقلت: لا ياذا الجلال، فما وضعت في اللحد حتى لحقت بالأحد.

ورؤى ذو النون المصري في المنام، ف قيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: كنت أسأله ثلاث حوائج في الدنيا، فاعطاني البعض، وأرجو أن يعطيني الباقي؛ كنت أسأله أن يعطيني من العشرة التي على يد رضوان واحدة، ويعطيني بنفسه، وأن يعذبني عن الواحدة التي بيد مالك بعشرة ويتولى هو، وأن يرزقني أن أذكره بلسان الأبدية.

وقيل: رؤى الشبلي في المنام بعد موته، ف قيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: لم يطالبني بالبراهين على الدعاوي إلا على شيء واحد، قلت يوماً: لا خسارة أعظم من خسران الجنة، ودخول النار، فقال لي: وأي خسارة أعظم من خسران لقائي!!

سمعت الأستاذ أبا علي يقول: رأى الجريري الجنيد في المنام. فقال: كيف حالك يا أبا القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وبادت تلك العبارات، ومانفعا إلا تسبيحات كنا نقولها بالعداوات. وقال التباجي: تشهيت يوماً شيئاً، فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: أيجمل بالحرّ المريد أن يتذل للعبيد، وهو يجد من مولاه ما يريد؟! وقال ابن الجلاء: دخلت المدينة وبي فاقة، فتقدمت إلى القبر، وقلت أنا ضيفك يا نبي الله.. فغفوت غفوة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نومي وقد أعطاني رغيفاً فأكلت

نصفه وانتبهت وييدي النصف الآخر.

وقال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: زوروا ابن عون؛ فإنه يحب الله ورسوله.

وقيل: رأى عتبة الغلام حوراء في المنام علي صورة حسنة، فقالت له: يا عتبة، أنا لك عاشقة، فانظر أن لا تعمل من الأعمال شيئاً يحال بيني وبينك، فقال لها عتبة: طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لي عليها. حتى ألقاك.

سمعت منصوراً المغربي يقول: رأيت شيخاً في بلاد الشام كبير الشأن، وكان الغالب عليه الانقباض، فقيل لي: رأيت شيخاً في بلاد الشام كبير الشأن وكان الغالب عليه الانقباض، فقيل لي: إن أردت أن ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه وقل له: رزقك الله الحور العين؛ فإنه يرضى منك بهذا الدعاء. فسألت عن سببه، فقيل: إنه رأى شيئاً من الحور في منامه. فبقي في قلبه شيء من ذلك، فمضيب وسلمت عليه، وقلت: رزقك الله الحور العين، فانبسط الشيخ معي.

وقيل: رأى أيوب السخيتاني جنازة عاص، فدخل دهليزاً؛ لك يحتاج إلى الصلاة عليها فرأى بعضهم الميت في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وقال لي قل لأيوب السخيتاني " قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكنكم خشية الإنفاق " .

وقيل: رؤي الليلة التي مات فيها مالك بن دينار كأن أبواب السماء قد فتحت، وقائلاً يقول: ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة.

وقال بعضهم: رأيت الليلة التي مات فيها داود الطائي نوراً، وملائكة

صعوداً وملائكة نزولاً، فقلت: أي ليلة هذه؟ فقالوا: ليلة مات فيها داود الطائي وقد زخرفت الجنة لقدم روحه على أهلها.

অনুবাদ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

অর্থাৎ: “তাদের [তথা আল্লাহর ওয়ালিদের] জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে।” [ইউনুস : ৬৪]

উক্ত আয়াতংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন: “এর অর্থ হলো, মু'মিন সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি দেখবেন কিংবা তাকে দেখানো হবে।”

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, কেউ একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত আয়াত [ইউনুস : ৬৪] সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি জবাব দিলেন: “এই আয়াত সম্পর্কে ইতোমধ্যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করে নি। এর অর্থ হলো, মু'মিন সুন্দর অন্তর্দৃষ্টি দেখবেন কিংবা তাকে দেখানো হবে।”

হযরত আবু কাতাদা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বপ্ন [ক'ইয়া] আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, [সাধারণ কিছু] স্বপ্ন [হলুম] আসে শয়তান থেকে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তা অপছন্দ করে, তাহলে সে যেনো বামদিকে থু থু নিক্ষেপ করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে আমাকেই দেখবে। কারণ শয়তান আমার অবয়ব ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না।” এই হাদিসের অর্থ হলো, এরূপ স্বপ্ন সত্যস্বপ্ন। এর ব্যাখ্যাও সত্য। কারণ স্বপ্নও এক ধরনের কারামাত। দৃকশক্তির সঠিক সংজ্ঞা হলো: হৃদয়ে প্রবেশকৃত চিন্তা ও যে অবস্থায় এর স্বরূপ কল্পনায় [ওয়াহম] আকার ধারণ করে, যখন নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিকে ডিজিয়ে যায় না। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ বিশ্বাস করে এটা একটি সত্য দৃকশক্তির প্রকাশ। তবে, মানুষের ক্ষেত্রে এটা দৃশ্যমান আকার ও

কল্পনা যার অবস্থান মানব হৃদয়ে। যখন তাদের বহিরাপোলক্সি তাদেরকে বঞ্চিত করে, তখন এসব কল্পনা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও জরুরী জ্ঞান থেকে খসে পড়ে। এরপর এই অবস্থাটি দৃকশক্তিশীল ব্যক্তিকে আরো ক্ষমতা দান করে। তার দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে যে উপলব্ধি লাভ হয় সে তুলনায় যখন সে জাগ্রত হয় তখন, যে অবস্থায় সে কল্পনা করে তা দুর্বল হয়।

যে স্বপ্ন দেখে, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে বাতির মাধ্যমে দেখে যখন সবকিছু অন্ধকারে পতিত হয়। কিন্তু যখন সূর্য উদিত হয় তখন ঐ বাতির আলোকে সূর্যের আলো মুছে ফেলে। কারণ বাতির আলো সূর্যের আলো থেকে অনেক গুণ দুর্বল। সুতরাং স্বপ্নাবস্থা হলো, যেনো কেউ বাতির আলোতে অবস্থান করছে। আর কেউ জাগ্রত হওয়ার অবস্থা হলো, যোনো কারো উপর দিনের আলো পতিত হয়েছে। যে জেগে ওঠে তখন, সে ঘুমন্ত অবস্থায় যাকিছু কল্পনাশক্তিতে এসেছিল তা স্মরণ করে। ওসব ঘটনা, বর্ণনা ও দৃশ্যাবলি যা সময় সময় দেখনেওয়ালার অন্তরে প্রবেশ করে তা আসতে পারে শয়তান থেকে, আসতে পারে আত্মার তৎপরতা থেকে কিংবা ফিরিশতাদের কর্তৃক [নির্দেশিত] চিন্তা থেকে। কোনো সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্কতাস্বরূপও আসতে পারে, যিনি দেখনেওয়ালার হৃদয়ে সরাসরি এগুলো সৃষ্টি করে দেন। হাদীসের একটি ভাষ্য অনুযায়ী: “স্বপ্নের মধ্যে সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ তার কথায়।”

জেনে রাখুন, নিদ্রা দু'ধরনের: (১) অচেতনশীল নিদ্রা [নাওম গাফলা] এবং (২) অভ্যাসগত নিদ্রা [নাওম 'আদা]। এ ধরনের নিদ্রা তেমন প্রশংসনীয় নয়; বরং এটা দ্রুটিযুক্ত, কারণ এটা হলো মৃত্যুর ভাই। একটি বর্ণনায় আছে: “নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।” আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

অর্থাত্: “তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর, তা জানেন।” [আনআম : ৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

অনুবাদ: অর্থাৎ: “আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।” [যুমার : ৪২]

তঁারা [সুফিরা] বলেন: “নিদ্রার মধ্যে যদি উত্তম কিছু থাকতো, তাহলে বেহেশতে নিদ্রা থাকতো।” তঁারা আরো বলেন: “যখন আল্লাহ তা’আলা আদম আলাইহিসসালামকে বেহেশতে নিদ্রামগ্ন করলেন তখন তিনি তার থেকে হাওয়া আলাইহাসসালামকে বের করলেন। আর সকল পরীক্ষা তার উপর পতিত হলো যখন হাওয়া আলাইহাসসালামকে সৃষ্টি করা হলো।”

আমি শায়খ হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “যখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিসসালামকে বললেন, ‘হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে কুরবানী করছি’ [সাফফাত : ১০২], ইসমাইল আলাইহিসসালাম বলেছিলেন: ‘এটা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য খেসারত যে তাঁর প্রেমাস্পদের সম্মুখে নিদ্রিত হয়। আপনি যদি ঘুমোতেন না, তাহলে আপনাকে নিজের সন্তান জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হতো না!’”

তঁারা [সুফিরা] বলেন: “আল্লাহ তা’আলা হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের নিকট ওয়াহি প্রেরণ করেন, ‘যে আমাকে ভালোবাসার দাবী জানায় অথচ রাতের বেলা ঘুমায়, সে মিথ্যাবাদী।’” নিদ্রা হলো জ্ঞানের বিপরীত। এজন্য হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: “একটি নিদ্রা হলো হাজার বছরের বিভীষিকা।” তিনি আরো বলেছেন: “আল্লাহ তা’আলা তাঁর সৃষ্ট জীবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘যে ঘুমন্ত সে অবহেলিত; আর যে অবহেলিত সে [আল্লাহ থেকে] পর্দাবৃত।’” শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের চোখদ্বয়ে লবণ দিতেন যাতে তাঁর নিদ্রা না আসে। অন্তরে এরূপ ভাবনা নিয়েই সুফিরা আবৃত্তি করেন:

কী অদ্ভুত কথা, প্রেমিক ব্যক্তি বুঝি ঘুমিয়ে পড়ে?

কারণ সকল ঘুমই তো প্রেমিকের জন্য হারাম!

তঁারা [সুফিরা] বলেন: “সুফি রাস্তার প্রাথমিক সালিকরা একমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে খায়, অপারণ হয়ে ঘুমায় এবং জরুরতের কারণে কথা বলে।” আদম আলাইহিসসালাম যখন নিদ্রামগ্ন হলেন তখন আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হলো: “এ হচ্ছে হাওয়া, সুতরাং তুমি তাঁর কাছে স্বস্তি পাবে।” [আ’রাফ :

১৮৯] এটাই হলো খেসারত, ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঐশী উপস্থিতির সম্মুখে ঘুমিয়ে পড়ে। তাঁরা বলেন: “তুমি যদি আল্লাহর উপস্থিতির মাঝে থাকো, তাহলে তুমি ঘুমাবে না। কারণ আল্লাহর উপস্থিতির মাঝে নিদ্রা যাওয়া খারাপ আচরণ।” তাঁরা আরো বলেন: “যদি অনুপস্থিত থাকো, তাহলে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত ও পীড়িতদের অন্তর্ভুক্ত। আর পীড়িতদেরকে নিদ্রা গ্রাস করতে পারে না।”

আর যারা সচেষ্ট আছে [আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে], নিদ্রা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর দয়া। আল্লাহ তা’আলা তাঁর ঐ বান্দার উপর গৌরববোধ করেন যে উপাসনার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। তিনি বলেন: “দেখো, আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো! সে ঘুমন্ত কিন্তু তার আত্মা আমার সাথে এবং তার দেহ আমার সম্মুখে সিজদাবনত।” শায়খ [কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] বলেন: “অর্থাৎ, তার আত্মা আল্লাহর সঙ্গে একান্ত বাক্যালাপে বিদ্যমান [নাভ্যে]। [একই সময়] তার দেহ জায়নামায়ে লুঠিয়ে পড়ে ইবাদত করছে।”

তাঁরা বলেন: “যদি কেউ অযু অবস্থায় ঘুমায় তাহলে তার আত্মা আল্লাহর আরশকে তাওয়াফ করার ও তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত থাকার অনুমতি লাভ করে।” আল্লাহ তা’আলা বলেছেন: “ওয়াজাআলনা নাওমাকুম সুবাতা”, অর্থাৎ : “তোমাদের নিদ্রাকে করেছি কান্দি দরকারী।” [নাবা : ৯] আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “এক ব্যক্তি তার মুর্শিদের নিকট অভিযোগ করলো, আমি বেশি ঘুমাই। মুর্শিদ জবাব দিলেন: ‘যাও! আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করো তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য, কারণ কতো রুগ্ন লোক আছে যারা একটু ঘুমের জন্য আহাজারি করছে!’”

তাঁরা বলেন: “পাপীদের ঘুম শয়তানের নিকট সর্বাধিক পীড়াদায়ক। সে অভিযোগ করে: ‘আল্লাহকে অমান্য করতে কখন সে জাগ্রত হবে ও দাঁড়াবে?’” তাঁরা বলেন: “পাপীদের উত্তম সময় হলো যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে। তার হাতে সময় না থাকলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কিছুই থাকবে না।” আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “হযরত সাহল কিমরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাত জেগে ইবাদত করতেন। একদিন নিদ্রা তাঁকে আড়ষ্ট করলো। স্বপ্নে আল্লাহ তা’আলার দীদার লাভ করলেন। সেদিন থেকে তিনি ইচ্ছে করে ঘুমানোর চেষ্টা করতেন। যখন কেউ তাকে ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তিনি নিচের পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করলেন:

আমার হৃদয়ের আনন্দকে নিদ্রার মধ্যে পেয়েছি
এবং আমি তন্দ্রা ও নিদ্রাকে ভালোবেসে ফেলেছি!”

বর্ণিত আছে একজন মুর্শিদের দু’জন মুরীদের মধ্যে একটি বিষয়ে ঝগড়া বাধে। একজনের দাবী: ‘নিদ্রা উত্তম, কারণ মানুষ এ অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানী করতে পারে না।’ অপরজনের দাবী: ‘জাগ্রত থাকাই উত্তম, কারণ আল্লাহর মা’রিফাত [পরিচিতি] লাভ এ অবস্থায় সম্ভব।’ তারা এই ব্যাপারটি সমাধানের জন্য নিজেদের মুর্শিদের দরবারে হাজির হলো। তিনি বললেন: ‘যে মনে করে নিদ্রা উত্তম, তার জন্য জীবন থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। আর যে মনে করে নিদ্রা থেকে জাগ্রতাবস্থা উত্তম, তার জন্য মৃত্যু থেকে জীবনই শ্রেয়।’

তারা [সুফিরা] বলেন: “এক ব্যক্তি একজন দাসী মেয়ে ক্রয় করলেন। রাত আসলে পরে তিনি মেয়েটিকে বললেন, বিছানা প্রস্তুত করো। দাসী মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, ‘হে আমার মালিক! আপনারও কি কোনো মালিক আছেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, আছেন।’ সে আবার জিজ্ঞেস করে, ‘আপনার মালিক কি কখনো ঘুমান?’ তিনি বললেন, ‘না, অবশ্যই না।’ এরপর সে মন্তব্য করে, ‘আপনি কি ঘুমোতে লজ্জাবোধ করেন না, যেখানে আপনার মালিক কখনো ঘুমান না?’”

তারা বলেন, হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে একটি ছোট্ট মেয়ে প্রশ্ন করলো, ‘আপনি ঘুমান না কেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘গেহেন্না আমাকে ঘুমোতে দেয় না!’ তারা আরো বলেন: ‘হযরত মালিক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলো: ‘আপনি কেনো ঘুমান না?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘রাতের বেলা অতর্কিত হামলা হতে পারে, তোমার আব্বু সেই ভয়ে ঘুমোতে পারেন না!’ বর্ণিত আছে হযরত রাবি বিন খুতাইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন মারা গেলেন, পড়শী এক মেয়ে তার পিতাকে প্রশ্ন করলো, ‘আব্বু, আমাদের পড়শীর উঠোনে যে পিলারটি দণ্ডায়মান থাকতো, সেটি এখন দেখছি না কেনো?’ প্রতিত্তোরে তার পিতা বললেন, ‘তিনি তো ছিলেন আমাদের পরহেজগার পড়শী, যিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সারারাত কাটিয়ে দিতেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।’ মেয়েটি মনে করতো তিনি একজন পিলার ছিলেন। সে প্রত্যেক রাতে নিজের ঘরের ছাদে উঠে ঘুমোতে যেতো ও তাঁকে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতো। একজন সুফি বর্ণনা করেন, “ঘুমের মধ্যে কেউ কেউ এমন কিছু বাস্তবতা অনুভব করেন যা জাগ্রত অবস্থায় করা যায় না।

সুতরাং স্বপ্নের মধ্যে আল-মুস্তফার [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাক্ষাৎ লাভ হতে পারে। এছাড়া সাক্ষাৎ ঘটতে পারে অতীতের সালাফে সলেহীনের সঙ্গে। এসব সাক্ষাৎ লাভ জাগ্রত অবস্থায় হওয়া তার জন্য সম্ভব নয়। অনুরূপ সে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভেও ধন্য হতে পারে।”

বর্ণিত আছে হযরত আবু বকর আযযুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করলেন: ‘তুমি যা-ই চাও তা আমার কাছে বলো!’ তিনি বললেন, ‘আমার প্রভু! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পাপী উম্মতকে ক্ষমা করুন!’ আল্লাহ বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত অনেক বেশি যথাযোগ্য। তুমি নিজে কি চাও তা-ই বলো!’

হযরত খাতুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করলাম। তিনি বললেন, ‘যে কেউ নিজেকে মানুষের জন্য ভূষিত করে এমন জিনিস দ্বারা যা আল্লাহ জানেন বাস্তবে তার নেই, সে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হবে।’” তিনি [খাতুনী রাহ.] আরো বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন যাতে আমার হৃদয় না মরে!’ তিনি বললেন: ‘প্রত্যহ চল্লিশবার বলবে, ‘ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বায়্যুমু’, আল্লাহ তোমার হৃদয়কে জ্যাস্ত রাখবেন।’” হযরত হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিসসালামকে স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন: ‘আমি একটি সীলমোহর আঙটি বানাতে চাই। এতে কী খোদিত থাকলে ভালো হয়?’ ঈসা আলাইহিসসালাম জবাব দিলেন: ‘এতে খোদাই করুন: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি হাক্কুল মুবিন’, এটা ইঞ্জিল কিতাবের শেষে লিখিত আছে।’”

বর্ণিত আছে হযরত আবু ইয়াযিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: “আমি আমার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম: ‘আপনাকে পাওয়ার রাস্তা কোনটি?’ জবাব আসলো: ‘তোমার নফসকে বিলুপ্ত করো এবং আসো!’” হযরত আহমদ বিন খিদরুইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখলেন। আল্লাহ বললেন: “প্রত্যেকেই আমার কাছ থেকে কিছু চায়। শুধুমাত্র আবু ইয়াজিদ [বিস্তামী] আমাকেই চায়।” হযরত ইয়াহইয়া

বিন সাঈদ কাত্তান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি আমার প্রভুকে স্বপ্নে দেখে বললাম, ‘হে প্রভু! কতোবার আপনাকে ডাকলাম, কিন্তু আপনি জবাব দিলেন না!’ মহান প্রভু বললেন, ‘ইয়াহইয়া! আমি তোমার ডাক শুনাকে ভালোবাসি!’”

হযরত বিশর বিন হারিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি আমীরুল মু’মিনীন হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে স্বপ্নে দেখলাম। আবদার করলাম, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আমাকে উপদেশ দিন!’ বললেন, ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় গরীবদের প্রতি ধনীদের নশ্তা কতো সুন্দর! আল্লাহর উপর ভরসায় ধনীদের প্রতি গরীবদের গর্ব কতো সুন্দর!’ আমি আবার বললাম, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আমাকে আরো উপদেশ দিন!’ তিনি আবৃত্তি করলেন:

‘তুমি ছিলে মৃত, তারপর জীবিত হলে এবং শীঘ্রই আবার মৃত হবে
অনিত্য জগতে থাকার বাসস্থান তো ক্ষণিকের ছাড়া কিছু নয়
তাই গড়ে তোল নিজের জন্য স্থায়ী বাসস্থান চিরনিত্য জগতে!’”

বর্ণিত আছে, কেউ একজন হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘তিনি আমার প্রতি দয়ালু হয়েছেন।’ আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবস্থা কি বলুন?’ জবাব দিলেন, ‘তিনি তো ঐ ব্যক্তি যিনি দৈনিক দু’বার আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হন।’”

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: হযরত আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু সাহল জায়জানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলেন। জীবিত থাকতে জায়জানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ্বাস করতেন, পরজীবনে পাপীদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। সুলুকী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার সাথে আল্লাহ তা’আলা কিরূপ আচরণ করলেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘এখানকার ব্যাপার-সাপার আমাদের ধারণায় যা ছিলো তার থেকে অনেকটা আরামদায়ক।’”

কেউ একজন হযরত হাসান বিন ইসাম শাইবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?’ জবাব দিলেন, ‘দয়ালুর কাছ থেকে দয়া ছাড়া আর কি আসতে পারে?’ এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে একজন সুফিকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। সুফি এই পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করে শুনালেন:

আমাদেরকে ধরে নিয়ে গেলো তারা জবাবদিহীর জন্য কঠোরভাবে
এরপর তারা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে দিল!

হযরত হাবীবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ এজনক স্বপ্নযোগে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে হাবীবে আজমী! আপনি কি মৃত?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘অবশ্য নয়! ফার্সিঘোমটা [‘উজমা] আমাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং আমি এখন বাস করছি নিয়ামতের মরো’ বর্ণিত আছে, একদিন হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামায আদায় করতে মসজিদে ঢুকলেন। লক্ষ্য করলেন হযরত হাবীবে আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামাযে ইমামতি করছেন। আরবী ভাষার শব্দগুলো [আজমী হওয়ায়] সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন কি না সে ভয়ে বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামাআতে শরীক হলেন না। সেদিন রাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন: একব্যক্তি তাঁকে বলছেন, ‘তুমি কেনো তাঁর [হযরত আজমীর] পেছনে নামায পড়লে না? যদি পড়তে তাহলে তোমার অতীতের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হতো!’

কেউ একজন হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?’ জবাব দিলেন, ‘আমাকে আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা করেছেন। প্রত্যেকবার জানাযা চোখে পড়লে যে শব্দগুলো হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাহিআল্লাহু আনহু উচ্চারণ করতেন, তা-ই আমার জন্য মুক্তির কারণ হয়েছে। তিনি বলতেন: ‘প্রশংসা চিরঞ্জীবী আল্লাহর জন্য যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না!’ যে রাতে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুবরণ করেন, কোনো এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন জান্নাতের তোরণসমূহ খোলা হয়েছে। একব্যক্তি এ’লান করছেন: ‘অবশ্যই, হযরত হাসান বসরী আল্লাহ তা’আলার দরবারে আসছেন, যিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট!’

আমি হযরত আবু বকর বিন ইশকিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি শায়খ হযরত আবু সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশান্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলাম: ‘শায়খ! আপনি কিভাবে এই স্তরে উন্নীত হলেন?’ জবাব দিলেন: ‘আমার প্রভু সম্পর্কে ভালো ধারণা করে!’ কেউ হযরত জাহিদ বসরী [মু’তাযিলী] রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন?’ জবাবে তিনি এই পঙ্ক্তিটি উচ্চারণ করেন:

‘তোমার হাতে এমন কিছু কখনো লিখবে না, যা কিয়ামত দিবসে দেখে তুমি খুশি হবে না।’

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার স্বপ্নযোগে শয়তানকে [মানুষের সামনে] উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুই কি মানুষের সামনে লজ্জাবোধ করিস্ না?’ শয়তান জবাব দিল: ‘ওরা তো কেউ [বাস্তবে] মানুষ নয়! আসল মানুষগুলো অবস্থান করছেন [বাগদাদের] শুনিযিয়া মসজিদে। তারা আমার দেহকে দুর্বল করেছেন ও যকৎ জ্বালিয়ে ফেলেছেন!’ হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘জাগ্রত হয়ে আমি শুনিযিয়া মসজিদে চলে আসলাম। সেখানে একদল লোক মাথা হাটুদ্বয়ের উপর রেখে গভীর মুরাকাবায় লিপ্ত ছিলেন। আমাকে দেখে তারা বললেন, ‘আপনি যেনো অভিশপ্ত শয়তানের বর্ণনা দ্বারা প্রতারিত না হন!’

হযরত নাসরাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শরীফে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ একজন স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?’ জবাবে বললেন, ‘যেভাবে আশরাফদেরকে [মহৎ ব্যক্তিদেরকে] তিরস্কার করা হয়, আমাকেও অনুরূপ তিরস্কার করা হয়েছে। এরপর একটি কণ্ঠধ্বনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: ‘আবুল কাসিম! বিচ্ছিন্নতার পর একত্রীকরণ আছে কি?’ জবাব দিলাম, ‘না, ও হে রাজাধিরাজের অধিকারী!’ কবরে শায়িত করার পরই আমি এককের সঙ্গে চলে গেলাম!’

হযরত যুনুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন?’ জবাবে বললেন: ‘জীবিত থাকতে আমি তাঁর নিকট তিনটি জিনিস

চাইতাম। এর মধ্যে কিছু পেয়েছি এবং আশা করছি বাকিগুলো এখানে [পরকালের জীবনে] পাবো। এ জিনিসগুলো হলো: [১] আমি তাঁকে আবদার জানাই, [বেহেশতের দাররক্ষক] রিজওয়ান ফিরিশতা যে দশটি জিনিস সংরক্ষণ করে রেখেছেন তা আমাকে দান করার জন্য। তিনি [আল্লাহ তা’আলা] নিজেই তা আমাকে দান করেছেন; [২] আমি তাঁকে আবদার করেছি, দশটি সাজা আমাকে দিতে যার মধ্যে একটি [দোযখের দাররক্ষক] মালিক ফিরিশতার হাতে। তিনি [আল্লাহ তা’আলা] নিজেই তা দিয়েছেন; এবং [৩] আমি তাঁকে আবদার করেছি, চিরন্তন জিহ্বার দ্বারা যেনো তাঁর স্মরণ করার ক্ষমতা আমাকে দান করেন।’

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর কেউ একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘তিনি আমাকে আমার দাবিগুলোর কোনোটির জন্যই তিরস্কার করেন নি, শুধু একটি ছাড়া। [জীবদ্দশায়] একদিন আমি বলেছিলাম: ‘বেহেশত হারানো ও দোযখে প্রবেশের মতো বড় ক্ষতি আর কিছুই নেই।’ আল্লাহ আমাকে [এখন] বললেন, ‘আমার সাথে সাক্ষাতের চেয়ে বড় ক্ষতি কি আর কিছু হতে পারে?’”

আমি শায়খ আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “হযরত জুরাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘হে আবুল ক্বাসিম! আপনি কেমন আছেন?’ তিনি জবাব দিলেন:

‘চলে গেছে ওসব রূপকাত্মক পরোক্ষোল্লেখ [ইশারাত]।

বিলীন হয়েছে ওসব সন্দেহমুক্ত অভিব্যক্তি [’ইবারাত]।

শুধুমাত্র ওসব আল্লাহর প্রশংসাবাণী যা আমরা সকালে উচ্চারণ করতাম, তা-ই আমাদেরকে রক্ষা করেছে [এ পরজনমে]।”

হযরত নিবায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন কোনো একটি জিনিষের জন্য আমি লালায়িত হলাম। এরপর স্বপ্নে দেখলাম কে যেনো আমাকে বলছেন: ‘এটা কি কোনো মুক্ত লোকের জন্য মানানসই হলো যে, সে নিজেকে নিজেই অসম্মানিত করে তাঁর [আল্লাহর] বান্দাদের সম্মুখে? অথচ সে যা চায়, তার সবই নিজের মুর্শিদের নিকট থেকে পেতে পারে।”

হযরত ইবনে জাল্লা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি মদীনা শরীফ আসলাম, সর্বহারা ও ক্ষুধার্ত হয়ে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে গেলাম। সালাম জানিয়ে বললাম: ‘ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি আপনার এক মেহমান।’

কিছুক্ষণ পর আমার নিদ্রা এসে গেলো। স্বপ্নে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে এক টুকরো রুটি দিলেন। আমি এর অর্ধেক খেলাম। এরপর যখন ঘুম ভাঙলো, আমার হাতে বাকি অর্ধেক রুটি তখনো ছিলো।”

একজন সুফি বর্ণনা করেন: “স্বপ্নযোগে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নসিব হলো। নির্দেশ দিলেন যাও, ইবনে আওউয়ানকে যেয়ে দেখো। কারণ তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসেন!” বর্ণিত আছে হযরত উৎবা গোলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নযোগে একজন হুরের সাক্ষাৎ পেলেন। সে তাঁকে বললো: “ইয়া উৎবা, আমি আপনার প্রেমে বিভোর। এমন কোনো কাজ করবেন না, যা মাঝখানে এসে আমাদের উভয়কে আলাদা করে দেয়।” উৎবা বললেন, “আমি তো এই দুনিয়াকে তিন তালুক দিয়েছি এবং এর নিকট ফিরেও যাবো না তোমার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত!”

আমি [ইমাম কুশাইরী] হযরত মনসুর মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “সিরিয়ায় আমি একজন বিশিষ্ট সুফি শায়খকে দেখেছি যিনি নিজেকে নিজের মধ্যেই রেখে দেওয়ার অভ্যাস করতেন [ইনক্বিবাদ]। আমাকে একজন বললেন, ‘আপনি যদি এই শায়খকে বন্ধুভাবাপন্ন পেতে চান তাহলে এই বলে তাঁকে স্বাগত জানাবেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে বেহেশতের হুরদের দ্বারা পুরস্কৃত করুন!’ তিনি এই বাণী শ্রবণ করলে খুব বেশি খুসি হবেন আপনার প্রতি। আমি এর কারণ জানতে চাইলে, বলা হলো: ‘তিনি কিছু হুরকে স্বপ্নযোগে দেখেছেন। তাদের চেহারা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গেছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যেয়ে ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে বেহেশতের হুরদের দ্বারা পুরস্কৃত করুন!’ বলে সম্ভাষণ জানালাম। তিনি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।’

হযরত আইউব শাকতিয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন পাপীর জানাযা

দেখলেন। নিজেকে কক্ষের প্রবেশ হলে লুকিয়ে রাখলেন যাতে ঐ ব্যক্তির জানাযায় শরীক না হন। এরপর মৃত ব্যক্তিকে একজন সুফি-দরবেশ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন, ‘আইউব শাকতিয়ানীকে বলো,

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ - وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا

অর্থাৎ: “বলুন: যদি আমার পালনকর্তার রাহমাতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।” [বনী ইসরাঈল : ১০০]

বর্ণিত আছে যে রাতে হযরত মালিক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুবরণ করেন, মানুষ স্বপ্নে দেখলো জান্নাতের তোরণসমূহ উন্মুক্ত হয়েছে। একজন এ’লান করছেন: ‘অবশ্যই, মালিক বিন দীনার জান্নাতবাসী হয়েছেন!’ একজন সুফি বর্ণনা করেন: “এ রাত ছিলো হযরত দাউদ তা’রী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর রাত। আমি [স্বপ্নে] দেখলাম, একটি নূর ও একজন ফিরিশতা আকাশ থেকে অবতরণ ও আরোহণ করতে। প্রশ্ন করলাম, এটা কোন্ রাত? তারা বললেন, ‘এ রাতে হযরত দাউদ তা’রী ইন্তিকাল করেছেন। জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়েছে তাঁর রুহকে স্বাগত জানাতে।”

فصل

ফাসল [পিরচ্ছেদ] -১

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري: رأيت الأستاذ أبا علي الدقاق في المنام، فقلت له: ما فعل بك؛ فقال: ليس للمغفرة هاهنا كبير خطر، أقل من حضر هاهنا خطراً "فلان" أعبي كذا كذا.
ووقع لي في المنام أن ذلك الإنسان الذي ناه قتل نفساً بغير حق.

وقيل: لما مات كرز بن وبرة رؤي في المنام كأن أهل القبور خرجوا من قبورهم وعليهم ثياب جدد بيض قيل: ما هذا؟ قيل: إن أهل القبور كسوا ثياباً جديداً لقدوم كرز بن وبرة عليهم.

ورؤي يوسف بن الحسين في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، فقيل له: بماذا؟ فقال: لأنني ما خلطت جداً بهزل قط.

ورؤي أبو عبد الله الزرّاد في المنام، فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقفني، وغفر لي كلّ ذنب أقررت به في الدنيا، إلا واحداً استحيت أن أقر به، فوقفني في العرق، حتى سقط لحم وجهي!! فقيل له: وما ذاك؟ فقال: نظرت يوماً إلى شخص جميل؛ فاستحييت أن أذكره.

سمعت أبا سعيد الشحام يقول: رأيت الشيخ الإمام أبا الطيب سهلاً الصعلوكي في المنام، فقلت له: أيها الشيخ، فقال: دع الشيخ!! فقلت: وتلك الأحوال التي شاهدتها؟! فقال: لم تغن عنا شيئاً، فقلت: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال غفر لي مسائل كانت تسأل عنها العُجُز فأجبتهم عنها.

سمعت أبا بكر الرشيدي الفقيه يقول: رأيت محمداً الطوسي المعلم في المنام، فقال لي: قل لأبي سعيد الصفار المؤدب:

وكنا على أن لا نخول عن الهوى ... فقد، وحياة الحب حلت، وما حلنا

تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا ... وأظهرتم الهجران، ما هكذا كنا!!

لعل الذي يقضي الأمور بعلمه ... سيجمعنا بعد الممات كما كنا

قال: فانتبهت. وقلت ذلك لأبي سعيد الصفار، فقال: كنت أزرو قبره كل يوم جمعة، فلم أزره هذه الجمعة.

وحكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم

وحوله جماعة من الفقراء، فبينما هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان، وبيد أحدهما وطئت، وبيد الآخر إبريق؛ فوضع الطست بين يدي رسول الله على الله عليه وسلم فغسل يده، ثم أمر الملكين حتى غسلوا أيديهم، ثم وضع الطست بين يدين فقال أحدهما للآخر: لا تصب على يده؛ فإنه ليس منهم، فقلت يا رسول الله، اليس قد روى عنك أنك قلت " المصع من أحب " ؟ فقال: بلى، فقلت وأنا أحبك، وأحب هؤلاء الفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم: " صب على يده، فإنهم منهم "

وحكي عن بعضهم أنه كان يقول: أبدأ.. العافية.. العافية، فقليل له: ما معنى هذا الدعاء؟ فقال: كنت حملاً في ابتداء أمري، وكنت محملاً يوماً صدراً من الدقيق، فوضعت لاسريح، فكنت أقول: يا رب، ولو أعطيتني كل يوم رغيفين من غير تعب لكنت أكتفي بهما، فإذا رحلان يختصمان. فتقدمت أصلح بينهما: فضرب أحدهما رأسي بشيء أراد أن يضرب به خصمه، فدمي وحبي.. فجاء صاحب " الربع " فأخذهما، فلما رأني ملوثاً بالدم أخذني وظني أنني ممن تشاجر. فأدخلني السجن، وبقيت في السجن مدة أوتي كل يوم برغيفين، فرأيت ليلة في المنام قائلاً يقول لي: إنك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب، ولم تسأل العافية!! فأعطك ما سألت. فانتبهت، وقلت العافية. العافية، فرأيت باب السجن يُقرع، وقيل: أين عمر الحمال؟ فأطلقوني وخلوا سبيلي.

وحكي عن الكتاني أنه قال: كان عندنا رجل من أصحابنا هاجت عينه، فقليل له: ألا تعالجهما؟ فقال: عزمت على أن لا أعالجهما حتى تبرأ، قال: فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: لو كان هذا العزم على أهل النار كلهم،

لأخرجناهم من النار.

وحكي عن الجنيد أنه قال: رأيت في المنام كأني أتكلم على الناس.. فوقف عليّ ملكٌ. فقال: أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله ماذا؟ فقلت: عملٌ خفيّ بميزانٍ وفيّ. قال: فولى الملك عني، وهو يقول: كلام موفق والله. وقال رجل للعلاء بن زياد: رأيت في المنام كأنك من أهل الجنة. فقال: هل الشيطان أراد أمراً فعصمت منه، فأشخص إليّ رجلاً يعينه على مقصوده من إضلالي.

وقيل رؤي عطاء السلمي في النوم، ف قيل له: لقد كنت طويل الحزن، فما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أما والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً، ف قيل له: ففي أي الدرجات أنت؟ فقال: " مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين.. " الآية.

وقيل: رؤيا الأوزاعي في المنام، فقال: ما رأيت ها هنا درجة أرفع من درجة العلماء، ثم المحزونين. وقال النباجي: قيل لي في المنام: من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلقه، وسمحت نفسه في نفقته، وقلت وسأوسه في صلاته.

وقيل: رؤيت زبيدة في المنام، ف قيل لها: ما فعل الله تعالى بك؟ فقالت غفر لي، ف قيل: بكثرة نفقتك في طريق مكة؟ فقالت: لا، أما إنَّ أجراها عاد إلى أربابها، ولكن غفر لي بنيّتي.

ورؤي سفيان الثوري في المنام، ف قيل له: ما فعل الله بك؟ قال: وضعت أول قديمي على الصراط، والثاني في الجنة.

وقال أحمد بن أبي الحواري: رأيت في النوم جارية ما رأيت أحسن منها،

يتلألاً وجهها نوراً، فقلت: ما أنور وجهك، فقلت: تذكر الليلة التي بكيت فيها؟ فقلت: نعم، فقلت: حملت إليّ دمعك فمسحت بها وجهي، فصار وجهي هكذا.

وقيل: رأى يزيد القرشي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقرأ عليه، فقال له: هذه القراءة فأين البكاء؟! وقال الجنيد: رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء، فقال أحدهما لي: ما الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد، فقال الآخر: صدق، ثم صعدا.

ورؤي بشر الحافي في المنام، فقليل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وقال: أما استحييت يا بشر مني، كنت تخافني كل ذلك الخوف!! وقيل: رؤي أبو سليمان الداراني في المنام، فقليل له ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وما كان شيء أضّر عليّ من إشارات القوم!! وقال علي بن الموفق: كنت أفكر يوماً في سبب عيالي من الفقر الذي بهم، فرأيت في المنام رقعة فيها مكتوب " بسم الله الرحمن الرحيم: يا ابن الموفق، أتخشى الفقر وأنا ربك!! " فلما كان وقت الغسل أتاني رجل بكيس فيه خمسة آلاف دينار، وقال: خذها إليك يا ضعيف اليقين.

وقال الجنيد: رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى فقال لي: يا أبا القاسم: من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟ فقلت: لا أقول إلا حقاً، فقال: صدقت.

وقال أبو بكر الكتاني: رأيت في المنام شاباً لم أر أحسن منه، فقلت: من أنت؟ فقال: التقوى، قلت: فأين تسكن؟ قال: في قلب كل حزين، ثم التفت فإذا امرأة سوداء كأوحش ما يكون، فقلت: من أنت؟ فقلت:

الضحك، فقلت: وأين تسكنين؟ فقالت في كل قلب فرح. مرح. قال: فانتبهت، واعتقدت أن لا أضحك إلا غلبة.

وحكي عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه قال لي: من عرف طريقاً إلى الله تعالى سلكه، ثم رجع عنه عذبه الله عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين.

ورؤي الشبلي في المنام، ف قيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: ناقشني حتى أيست، فلما رأى يأسى تغمدني برحمته.

وقال أبو عثمان المغربي: رأيت في النوم كأن قائلاً يقول لي: يا أبا عثمان، اتق الله في الفقر، ولو بقدر سمسة.

وقيل: كان لأبي سعيد الخراز ابن مات قبله، فرآه في المنام، فقال له: يا بني، أوصني.

ALL RIGHTS RESERVED

فقال: يا أبت، لا تعامل الله على الجبن، فقال: يا بني، زدني.

فقال: لا تخالف الله تعالى فيما يطالبك به، فقال: زدني.

فقال: لا تجعل بينك وبين الله قميصاً قال؛ فما لبس القميص ثلاثين سنة.

وقيل: كان بعضهم يقول في دعائه: اللهم الذي لا يضرك وينفعنا لا تمنعه عنا، فرأى في المنام كأنه قيل له: وأنت. فالشيء الذي يضرك ولا ينفعك فده.

وحكي عن أبي الفضل الأصبهاني أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله سل الله أن لا يسلبني الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء قد فرغ الله تعالى منه. وحكي عن أبي سعيد الخراز قال: رأيت إبليس في المنام، فأخذت عصاي لأضربه، ف قيل

لي: إنه لا يفزع من هذا، إنما يفزع من يكون في القلب.
وقال بعضهم: كنت أدعو لرابعة العدوية، فرأيتها في النوم تقول: هداياك
تأتينا على أطباق من نور، مخمّرة بمناديل من نور.
ويروى عن سماك بن حرب أنه قال: كف بصري، فرأيت في المنام كأن
قائلاً يقول لي: إئت الفرت، فانغمس فيه، وافتح عينيك، قال: ففعلت،
فأبصرت.
وقيل: رُئي بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لما رأيت
ري عزوجل قال لي: مرحباً يا بشر، لقد توفيتك يوم توفيتك، وما على
الأرض أحبّ إليّ منك.

অনুবাদ: শায়খ ইমাম আবুল ক্বাসিম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,
‘আমি শায়খ আবু আলী দাঈক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এক রাতে স্বপ্নে
দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার
করেছেন?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘এখানে ক্ষমাশীলতা তেমন বড়ো গুরুত্বপূর্ণ
নয়। এখানকার লোকদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির হলে অমুক-
তমুক’ - অন্যান্যদের সঙ্গে নিজের নামও উচ্চারণ করলেন। স্বপ্নের মধ্যেই আমার
ভাবনায় আসলো, একটি লোকের নাম তিনি বলেছেন, যে জীবিত থাকতে
অন্যভাবে একজনকে হত্যা করেছিল।’

বর্ণিত আছে, যখন হযরত কুর্জ বিন ওয়ারা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মারা
গেলেন তখন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন কবরবাসীরা দলে দলে নতুন শ্বেত বস্ত্র
পরে ওঠে এসেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, এভাবে ওঠার কারণ কি?’ তাকে বলা
হলো: ‘কবরবাসীরা নতুন কাপড় পরার কারণ হলো, হযরত কুর্জ বিন ওয়ারা
আসছেন তাদের সাথে মিলিত হতে।’

কেউ একজন হযরত ইউসুফ বিন হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে
জিজ্ঞেস করলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?’

জবাব দিলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আমাকে ক্ষমা করেছেন।’ কারণ জানতে চাইলে, তিনি জবাব দিলেন: ‘আমি কখনো গুরুত্বকে তামাশার সাথে মিশ্রণ করি নি।’ একব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ জাররাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে কেমন অবস্থায় রাখলেন?’ জবাব দিলেন: ‘তিনি আমাকে সামনে উপস্থিত রেখে জীবিত থাকতে যতো পাপ করেছিলাম তা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু একটি ছাড়া, যেটি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করতে আমি লজ্জিত ছিলাম। সুতরাং তিনি আমাকে [স্থায়ী উপস্থিতিতে] দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে দিলেন যতক্ষণ না আমার মুখ থেকে মাংস ঝরে পড়তে শুরু হলো!’ খাব দেখেনেওয়ালা প্রশ্ন করলেন, ‘ঐ পাপটি কি ছিলো?’ তিনি বললেন: ‘একদিন আমি একজন সুদর্শন লোকের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর এটা স্বীকার করতে আমি ভীষণ লজ্জিত হয়েছি।’

আমি [ইমাম কুশাইরী] হযরত আবু সাঈদ শাহহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “এক রাতে শায়খ ইমাম আবু তায়্যিব সাহল সুলুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম। সম্বোধন করলাম: ‘হে শায়খ!’ বলে। তিনি সাথে সাথে বললেন: ‘শায়খ, বলা থেকে বিরত থাকো!’ আমি জিজ্ঞেস করলাম: ‘জীবিত থাকতে এতো বেশি রুহানী স্তরসমূহ অভিজ্ঞতা লাভের পরও?’ জবাব দিলেন: ‘এসব কোনো কিছুই কাজে আসে নি!’ তারপর আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে কোন্ অবস্থায় রেখেছেন?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আমাকে ক্ষমা করেছেন। বৃদ্ধ, দুর্বল লোকেরা যেসব বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতেন আর ওগুলোর জবাব আমি দিতাম, তা-ই আমার মুক্তির কারণ হয়েছে।”

হযরত আবু বকর রশিদী ফকীহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন: “স্বপ্নযোগে হযরত মুহাম্মদ তুসী মুআল্লিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বললেন, ‘নিম্নের কবিতাটি হযরত আবু সাঈদ সাফ্ফার মুয়াদ্দিব এর সম্মুখে আবৃত্তি করবেন:

আমরা উভয়ে রক্ষা করতাম পণ, অনুরাগ থেকে বিচ্যুত না হতে
কিন্তু, প্রেম-জীবনের শপথ, তুমি বিচ্যুত হয়েছে, অথচ আমরা হই নি
তুমি অপরের সাথে মিশে আমাদের থেকে সরে গেছো
এবং তুমি দেখিয়েছো আমাদের প্রতি বিরাগ- না, আমরাতো এরূপ ছিলাম না

তিনি [আল্লাহ] যিনি স্বীয় জ্ঞানে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যেনো আমাদের মরণের পরে মিলন ঘটান, ঠিক যেরূপ আমরা আগে ছিলাম!”

খাব দেখেনেওয়ালা বলেন: “জাগ্রত হয়ে, উক্ত কবিতাটি হযরত মুয়াদ্দিব এর নিকট যেয়ে আবৃত্তি করলাম। তিনি মন্তব্য করলেন, ‘আমি তাঁর [ফকীহ রাহ. - এর] কবর প্রত্যেক শুক্রবার জিয়ারত করতাম। কিন্তু এ শুক্রবার জিয়ারত করতে ভুলে যাই।’”

একজন সুফি বলেন: “এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন একদল দরবেশ। এ অবস্থায় দু’জন ফিরিশতা অবতরণ করলেন। একজনের হাতে ছিলো একটি পাত্র আর অপরজনের হাতে জগ। পাত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে তাঁর হাত মুবারক উভয় ফিরিশতা কর্তৃক ধুইয়ে দেওয়া হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিশতাদের নির্দেশ দিলেন উপস্থিত সকল দরবেশদের হাতও ধুইয়ে দিতে। এরপর পাত্রটি আমার সম্মুখে রাখা হলো। একজন ফিরিশতা অপরজনকে বললেন: ‘এই ব্যক্তির হাতে পানি ঢালবে না, কারণ সে তো ওদের দলের নয়।’ আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি বর্ণিত হয় নি যে, আপনি বলেছেন: ‘যে যাকে ভালোবাসে সে তাদেরই দলভুক্ত?’ তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’ তখন আমি বললাম, ‘আমি আপনাকে ভালোবাসি ও এই দরবেশদেরকেও ভালোবাসি!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার নির্দেশ দিলেন: ‘তার হাতেও পানি ঢালো, কারণ সে ওদেরই দলভুক্ত!’”

বর্ণিত আছে একজন সুফি সর্বদা জিকির করতেন: “শুভবোধ! শুভবোধ!” কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ ধরনের ইবাদত? তিনি বুঝালেন: “প্রাথমিক জীবনে একজন কুলি হিসাবে কাজ করতাম। একদিন খুব ভারী এক বস্তা আঠা বহন করছিলাম। কিছুটা বিশ্রাম নিতে এটি মাটিতে রেখে দিলাম। বললাম: ‘হে আল্লাহ! পরিশ্রম ছাড়া আপনি যদি দু’টুকরো রুটি আমাকে দান করতেন তাহলে আমি এতেই সন্তুষ্ট থাকতাম!’ হঠাৎ দু’ব্যক্তি আমার সামনে হাজির হলো। তারা একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করছিলো। আমি এগিয়ে গেলাম মধ্যস্থতা করতে। কিন্তু বিধি বাম, একজন খুব জোরে আমার মাথার উপর কি একটা শক্ত বস্তু দ্বারা আঘাত হানলো, যদিও তার উদ্দেশ্য ছিলো অপরজনকে মারা। আমার মুখ রক্তে

রঞ্জিত হলো। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন এসে উভয়কে গ্রেফতার করলো। একজন অফিসার আমাকে রক্তে রঞ্জিত দেখে ভাবলো, আমিও বুঝি মারামারি করছিলাম। তাই আমাকেও গ্রেফতার করে জেলে পাঠালো। আমি বেশ কিছুদিন জেলে ছিলাম। প্রত্যহ আমাকে দু'বেলা দু'টি রুটি দেওয়া হতো। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম একটি কণ্ঠে উচ্চারণ হচ্ছে: 'তুমি পরিশ্রম ছাড়া প্রতিদিন দু'টি রুটির জন্য আবদার করেছিলে, সুতরাং তুমি তা পেয়েছো। কিন্তু শুভবোধের আবদার করো নি, তাই তা দেওয়া হয় নি।' সুতরাং জেগে ওঠে আমি বলতে থাকি, 'শুভবোধ! শুভবোধ!' এরপর শুনলাম এক ব্যক্তি জেল কক্ষের দরোজার কড়া নেড়ে বলছেন, 'কুলি উমর কৈ?' তারা আমাকে জেল থেকে মুক্ত করে দিল।”

হযরত খাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: “আমাদের এক সাথীর একটি চোখ রক্তবর্ণ দেখাচ্ছিল। একজন প্রশ্ন করলেন, চোখটির চিকিৎসা করছেন না কেন? জবাব দিলেন, ‘আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজে নিজে ভালো না ওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করবো না।’ তারপর আমি [হযরত খাত্তানী] স্বপ্নে দেখলাম কেউ বলছেন, ‘দোযখবাসী সকলে যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করতো তাহলে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হতো!’”

বর্ণিত আছে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম মানুষের সম্মুখে ওয়াজ করছি। একজন ফিরিশতা এসে প্রশ্ন করলেন, ‘বলুন তো, কোন্ জিনিস আল্লাহর নিকটস্থদেরকে সর্বাধিক নিকটস্থ করে?’ জবাব দিলাম: ‘একটি গোপন আমল যার ওজন হয় একটি বিশ্বাসভাজন পাল্লা দ্বারা।’ ফিরিশতা যেতে যেতে বললেন: ‘আল্লাহর কসম! এটা তো অবশ্যই একটি মুবারক ওয়াজ!’”

এক ব্যক্তি হযরত 'আলা বিন জায়িদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন: “আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি জান্নাতবাসীদের সাথে আছেন!” তিনি মন্তব্য করলেন: “হয়তো শয়তান চেয়েছিলো আমাকে কোনো খারাপ জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট করতে। কিন্তু এ থেকে মুক্ত থাকতে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং সে আমার নিকট একজনকে পাঠালো, যাকে সে অভিযোগ করেছে আমাকে পথভ্রষ্ট করার সামর্থ্য লাভে!” কেউ একজন হযরত 'আতা' সালামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন: ‘[দুনিয়ার জীবনে] আপনি সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশার

মধ্যে কালাতিপাত করতেন। এখন আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন?' তিনি জবাব দিলেন: 'আলহামদুলিল্লাহ! তিনি [ওসব দুঃখ-দুর্দশার বদলে] এখন দান করেছেন দীর্ঘ বিশ্রাম ও অনাবিল আনন্দ।' খাব দেখনেওয়ালা আবার জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কোন্ স্তরের অধিকারী হয়েছেন?' তিনি [কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে] জবাবে বললেন:

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ - وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

অর্থ: “তারা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।” [নিসা : ৬৯]

একব্যক্তি স্বপ্নযোগে হযরত আওয়াঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখলেন। তিনি বললেন: ‘আমি এখানে ফকীহদের চেয়েও উন্নত স্তরে উপনিত কাউকে দেখি নি। তাঁদের পরে আছেন দুঃখিতজনরা।’ হযরত নিবায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমাকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে, ‘যে কেউ তার রিজেক লাভের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, সে দেখবে তার নৈতিক চরিত্র উন্নত হবে, তার আত্মা হবে উদার ও প্রশস্ত এবং ফরয নামাযে দূর হবে প্রলুব্ধমূলক চিন্তা-ভাবনা।’” কোনো এক ব্যক্তি বিবি জুবাইদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহাকে স্বপ্নে দেখলেন। প্রশ্ন করলেন: ‘আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?’ তিনি জবাব দিলেন: “তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।” প্রশ্নকারী আবার বললেন: ‘এটা কি আপনার দ্বারা জনকল্যাণমূলক কাজ তথা মক্কা শরীফ পর্যন্ত খাল খননের [নহরে জুবাইদা] কারণে হয়েছে?’ তিনি বললেন, “না! সঠিক মালিকদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার কারণে হয়েছে। [প্রজাদের নিকট থেকে হারুনুর রশীদ কর্তৃক আদায়কৃত টাকা সর্বদা শরীয়তসম্পন্ন বা আইনসঙ্গত ছিলো না। মলিকা জুবাইদা মানুষের টাকা অনুদানের নামে ফেরৎ দিতেন।] আমার নিয়ত খালিস হওয়ায় তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।”

একব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যা করেছেন, বলবেন?” জবাব দিলেন: “আমার প্রথম পদক্ষেপ পুলসিরাতের উপর পতিত হয় এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ পতিত হয় জান্নাতে।” হযরত আহমদ বিন আবি হাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদা স্বপ্নের মাঝে আমি এক অপূর্ব সুন্দরী রমনীকে দেখলাম। তার মতো লাভণ্যময়ী কোনো মহিলাকে ইতোমধ্যে

আমি দেখি নি। তার মুখশ্রী থেকে ভেসে আসছিলো নূর। জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জিনিসটি আপনার মুখমণ্ডলকে এরূপ নূরানী করলো? জবাব দিলেন, ‘আপনার কি মনে আছে সেরাতের কথা যখন আপনি কেঁদেছিলেন?’ বললাম, ‘হ্যাঁ, মনে আছে।’ তিনি বললেন, ‘আপনার চোখের একফোটা অশ্রু আমার নিকট নিয়ে আসা হয়। আমি এ অশ্রুটুকু আমার মুখমণ্ডলে ঘষে দিলাম। ফলে আমার চেহারা এরূপ নূরানী হয়ে ওঠলো।’”

বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াজিদ আবান রাকাসী [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ওয়ালি। তিনি তরকে দুনিয়া হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।] রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবে দেখলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন শরীফের কিছু আয়াতমালা তিলাওয়াত করে শুনালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: ‘এতো শুধু তিলাওয়াত, কিন্তু চোখের পানি কোথায়?’

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম দু’জন ফিরিশতা অবতরণ করলেন। প্রথমজন আমাকে প্রশ্ন করলেন: ‘সত্যবাদিতা [সিদ্ক] কাকে বলে?’ জবাব দিলাম: ‘নিজের প্রতিজ্ঞার প্রতি অনুগত থাকা’। দ্বিতীয়জন বললেন: ‘তিনি সত্য বলেছেন’। এরপর উভয়ে আরোহণ করলেন।”

একব্যক্তি হযরত বিশরে হাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন?’ জবাব দিলেন: “তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন: ‘হে বিশর! তুমি আমার সম্মুখে লজ্জাবোধ করো না, আমাকে এতো বেশি ভয় করার কারণে?’” কেউ একজন হযরত আবু সুলাইমান দারামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনাকে নিয়ে কি করলেন?’ তিনি জবাব দিলেন: ‘তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। সুফিদের রূপকাত্মক প্রলুব্ধি আমাকে সর্বাধিক ক্ষতি করেছে।’

হযরত আলী বিন মুয়াফ্ফাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একদিন আমি নিজের পরিবার ও দারিদ্র্যতার মধ্যে আমাদের দুরাবস্থার কথা ভাবছিলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম একখণ্ড কাগজ। এতে লিখা ছিলো: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হে ইবনে মুয়াফ্ফাক! তুমি কিভাবে গরীবত্বের কারণে ভীত হবে, যখন

আমিই তোমার একমাত্র প্রভু?’ রাতের শেষে ভোরেই একব্যক্তি নিয়ে আসলেন ৫ হাজার দিনারে পরিপূর্ণ একটি থলে! বললেন: ‘এগুলো গ্রহণ করুন। হে দুর্বল নিশ্চয়তাসম্পন্ন ব্যক্তি!’”

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলার সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি বললেন: ‘আবুল ক্বাসিম! যেসব বয়ান তুমি করো ওগুলো কোথায় পাও?’ জবাব দিলাম: ‘আমি সত্য ছাড়া কিছুই বলি না।’ তিনি বললেন: ‘তুমি সত্য কথা বলেছো।’”

হযরত আবু বকর খাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি স্বপ্নে একজন যুবককে দেখলাম। এমন সুদর্শন কাউকে আমি কখনো দেখি নি।’ জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? জবাব আসলো: ‘আমি হলাম খোদাভীতি [তাক্বওয়া]’। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার বাসস্থান কোথায়?’ জবাব আসলো: ‘প্রত্যেক দুঃখিত ব্যক্তির হৃদয়ে।’ এরপর আমি ফিরে তাকালাম। চোখে পড়লো খুব কালো বিশ্রি এক নারী। এমন বিশ্রি কাউকে ইতোমধ্যে দেখি নি। তার পরিচয় জানতে চাইলাম। বললো: ‘আমি হলাম হাস্য!’ বললাম, ‘আর তোমার বাসস্থান কোথায়?’ জবাব আসলো: ‘প্রত্যেক প্রফুল্ল, অসাধন হৃদয়ে।’ জেগে ওঠে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, একমাত্র নিয়ন্ত্রণহীনতা ছাড়া আমি কখনো হাসবো না।”

বর্ণিত আছে হযরত আবু আবদুল্লাহ বিন খাফীফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন: ‘যে কেউ আল্লাহ তা’আলার রাস্তা জেনেছে এবং তার উপর চলেছে, তারপর পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে এমন শান্তির স্বাদ পাবে যা জগতের কেউ কখনো পায় নি।’” কেউ একজন হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন?’ তিনি জবাব দিলেন: “আল্লাহ তা’আলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন যতক্ষণ না আমি হতাশ হয়ে যাই। আমার হতাশগ্রস্ততা দেখে তিনি আমার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন।”

হযরত আবু উসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “স্বপ্নের মধ্যে আমি একটি আওয়াজ শুনলাম: ‘আবু উসমান! দারিদ্র্যতার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করো, যদিও বিষয়ের গুরুত্ব একটি তিলের দানা থেকেও অল্প হয়ে থাকে।’” হযরত আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক পুত্রসন্তান ছিলো। তাঁর পূর্বেই সে মারা

গেল। তিনি ছেলেটিকে স্বপ্নে দেখলেন। বললেন, আমাকে উপদেশ দাও। ছেলে বললো: ‘পিতাজি! আল্লাহর সঙ্গে কাপুরুষের মতো আচরণ করবেন না!’ পিতা বললেন, আরো উপদেশ দাও। ছেলে বললো: ‘আল্লাহ তা’আলা আপনার পক্ষ থেকে যাকিছু দাবী জানান তাতে প্রতিবাদ করবেন না!’ ‘আরো বলো’ বললেন পিতা। ছেলে বললো: ‘আপনি ও আল্লাহর মধ্যে একটি জামাও [পর্দা] রাখবেন না!’” বর্ণিত আছে আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর থেকে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ কোনোদিন জামা পরেন নি।

একজন সুফি দু’আর সময় বললেন: “হে আমার প্রভু! যদি কিছু আমাদের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহলে তা লাভে বাধাদান করবেন না।” তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হলো: “তোমাকে যদি কোনো কিছু ক্ষতিও করে না এবং উপকারও করে না, তাহলে এটা গ্রহণ থেকে বিরত থাকো!” হযরত আবুল ফজল ইসবাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি স্বপ্নযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁকে আবদার জানালাম: ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা’আলাকে বলুন, আমি যেনো ঈমান থেকে বঞ্চিত না হই।’ তিনি বললেন: ‘এটা তো আল্লাহ তা’আলা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছেন!’” হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “একরাতে স্বপ্নের মধ্যে শয়তানকে দেখে আঘাত হনতে আমার যষ্টি উঁচিয়ে ধরলাম। হঠাৎ এক গায়েবী আওয়াজ আমার কর্ণগোচর হলো: ‘সে এতে ভয় পাবে না! সে তো ভয় করে [ঈমানের] নূরকে, যার বাসস্থান হৃদয়ে।’”

একজন সুফি বলেন: “আমি হযরত রাবিয়া বসরী আদাওবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহা প্রতি সওয়াব রেসানী করতাম। একরাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। বললেন: ‘তোমার হাদিয়াগুলো আমাদের নিকট আসে, নূরের থালায় নূরের রেশমী রুমালে আবৃত হয়ে!’”

বর্ণিত আছে হযরত সাম্মাক বিন হারব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখলাম কে একজন বলছেন: ‘যাও, ফোরাতে নদীতে যেয়ে ডুব দাও। এরপর চোখ খুলো!’ আমি তা-ই করলাম। আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে এলো।” একব্যক্তি হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: ‘হযরত! আপনার সঙ্গে আল্লাহ তা’আলার আচরণ কি ছিলো, বলুন?’ তিনি জবাব দিলেন: “আমি যখন আমার প্রভু সুবহানাহু ওয়াতাতা’আলাকে

রিসালাতুল কুশাইরী (রাহ.)

দেখলাম, তখন তিনি বললেন: ‘স্বাগত বিশ্ব! আমি তোমাকে নিজের করে নিয়েছি। যেদিন নিজের করেছি সেদিন থেকে পৃথিবীতে আর কাউকে তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসি নি!’”

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet

باب الوصية للمريدين

বাবুল ওয়াসিয়াতু লিলমুরিদীন [মুরীদদের প্রতি আধ্যাত্মিক উপদেশ]

قال الأستاذ الإمام: لما اثبتنا طرفاً من سير القوم، وضممنا إلى ذلك أبواباً من المقامات، أردنا أن نختتم هذا الرسالة بوصية للمريدين، نرجو من الله تعالى حسن توفيقهم لاستعمالها، وأن لا يجرمنا القيام بها، وأن لا يجعلها - سبحانه - حجة علينا.

فول قدم للمريد في هذه الطريقة ينبغي أن يكون على الصدق، ليصح له البناء على أصل صحيح؛ فإن الشيوخ قالوا: إنما حُرِّموا الوصول لتضييعهم الأصول..

كذلك سمعت الأستاذ أبا علي يقول؛ فتجب البداية بتصحيح اعتقاد بينه وبين الله تعالى، صاف عن الظنون والشبه، خال من الضلالة والبدع، صادر عن البراهين والحجج.

ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة.

وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من مذاهب المختلفين، سوى طريقة الصوفية، إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة؛ فإن هؤلاء حججهم في مسائلهم أظهر من حجج كل أحد، وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب.

والناس: إمَّا أصحاب النقل والأثر، وما أرباب العقل والفكر. وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة؛ فالذي للناس غيب، فهو لهم

ظهور، والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه، موجج،
فهم أهل الوصال، والناس أهل الاستدلال.
وهم كما قال القائل:

ليل بوجهك مشرق ... وظلامه في الناس ساري

فالناس في سدف الظلام ... ونحن في ضوء النهار

ولم يكن عصر ن الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه
الطائفة، ممن له علوم التوحيد، وإمامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من
العلماء استسلموا لذلك الشيخ، وتواضعوا وتبركوا به...
ولولا مزية، وخصوصية لهم، وإلا كان الأمر بالعكس..

هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعي، رضي الله عنهما، فجاء شيبان
الراعي فقال أحمد: أريد يا ابا عبد الله أن أنبّه هذا على نقصان علمه،
ليشتغل بتحصيل بعض العلوم.

فقال الشافعي: لا تفعل!! فلم يقنع؛ فقال لشيبان: ما تقول فيمن نسي صلاة
من خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا يدري أي صلاة نسيها، ما
الواجب عليه: يا شيبان؟! فقال شيبان: يا أحمد، هذا قلب غفل عن الله
تعالى، فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه بعد!! فغشي على أحمد..
فلما أفاق، قال له الإمام الشافعي، رحمه الله: ألم أقل لك لا تحرك هذا!!

وشيبان الراعي كان أمياً منهم، فإذا كان حال الأمي منهم هكذا، فما الظنُّ
بأئمتهم؟؟ وقد حكي أن فقيهاً من أكابر الفقهاء كانت حلقة بجنب حلقة
الشبلي في جامع المنصور، وكان يقال لذلك الفقيه أبو مران وكان تتعطل
عليهم حلقتهم لكلام الشبلي.

فسأل اصحابُ أبي عمران يوماً الشبلي عن مسألة في الحيض، وقصدوا إخجال!! فذكر مقالات الناس في تلك المسألة، والخلاف فيها..
فقام أبو عمران وقبل رأس الشبلي، وقال: يا أبا بكر، استفدت في هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعها، وكان عندي من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل.

وقيل: اجتاز أبو العباس بن سريج الفقيه بمجلس الجنيد، رحمهما الله، فسمع كلامه، فقيل له: ما تقول في هذا الكلام؟ فقال: لا أدري ما يقول.. ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل.
وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: أنت تتكلم على كلام كل أحد، وهاهنا رجل يقال له الجني، فانظر هل تعترض عليه أم لا؟ فحضر حلقة..
فسأل الجنيد عن التوحيد فأجابه، فتحيّر عبد الله وقال: أعد عليّ ما قلت؟.

فأعاده ولكن لا بتلك العبارة.
فقال له عبد الله: هذا شيء آخر لم أحفظ، تعيده عليّ مرة أخرى..
فأعاد بعبارة أخرى، فقال عبد الله: ليس يمكنني حفظ ما تقول!! أمليه علينا، فقال: إن كنت أجزته فأنا أمليه، فقام عبد الله، وقال بفضله، واعترف بعلوّ شأنه.

فإذا كان أصول هذه الطائفة أصحّ الأصول، ومشايخهم أكبر الناس، وعلمائهم أعلم الناس، فالمريد الذي له إيمان بهم: إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدهم فهو يساهمهم فيما خُصوا به من مكاشفات الغيب، فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن هذه

الطائفة، وإن كان مريداً طريقةً الاتباع وليس بمستقبل بحاله، يريد أن يعرج في أوطان التقليد إلى أن يصل إلى التحقيق فليقلد سلفه، وليجر على طريقة هذه الطبقة؛ فإنهم أولى به من غيرهم.

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الشبلي يقول: ما ظنك بعلم علم العلماء فيه تهمة!! وسمعتة يقول: سمعت محمد بن علي بن محمد المخرمي يقول: سمعت محمد ابن عبد الله الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول: لو علمت أن لله علماً تحت أديم السماء اشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه ما أصحابنا وإخواننا لسعيت إليه، ولقصده.

وإذا أحكم المريد بينه وبين الله عقده، فيجب أن يحصل من علم الشريعة، إما بالتحقيق، وإما بالسؤال عن الأئمة ما يؤدي به فرضه، وإن اختلف عليه فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط، ويقصد الخروج من الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال.

وهؤلاء الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه، ولهذا قيل: إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله، ونقض عهده فيما بينه وبين الله تعالى.

ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبداً. هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان.

وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غراس فإنها تورق، ولكن لا تثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ

يأخذ منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواه، لا يجد نفاذاً.
ثم إذا أراد السلوك فبعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه من كل زلة؛ فيدع جميع الزلات: سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، ويجتهد في إرضاء الخصوم أولاً، ولم يُرض خصومَه، لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء.

وعلى هذا النحو جروا، ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق والشواغل؛ فإن بناء هذا الطريق على فارغ القلب.

وكان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية التي تأتيني فيها غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني.

وإذا أراد الخروج عن العلائق فأولها: الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي يميل به عن الحق، ولم يوجد مريدٌ دخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرت تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج، فإذا خرج عن المال، فالواجب عليه الخروجُ عن الجاه، فإن ملاحظة حب الجاه مقطعة عظيمة.

وما لم يستو عند المريد قبول الخلق وردهم لا يجيء منه شيء، بل اضرُّ الأشياء له ملاحظة الناس إياه بعين الإثبات والتبرُّك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث، وهو بعد لم يصحح الإرادة، فكيف يصح أن يتبرك به؟! فخرجهم من الجاه واجب عليهم؛ لأن ذلك سم قاتل لهم، فإذا خرج عن ماله وجاهه فيجب أن يصحح عقده بينه وبين الله تعالى، وأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه: لأن الخلاف للمريد في ابتداء امره عظيم الضرر؛ لأن ابتداء حاله دليل على جميع عمره.

ومن شرطه: أن لا يكون له بقلبه اعتراض على شيخه، فإذا خطر ببال المريد أن له في الدنيا والآخرة قدراً أو قيمة، أو على بسيط الأرض أحد دونه لم يصح له في الإرادة قدم، لأنه يجب أن يجتهد، ليعرف ربه، لا ليحصل لنفسه قدراً.

وفرق بين من يريد الله تعالى وبين من يريد جاه نفسه، إما عاجله وإما، آجله، ثم يجب عليه حفظ سره حتى عن زره إلا عن شيخه، ولو كنتم نفساً من أنفاسه عن شيخه فقد خانه في حق صحبتته، ولو وقعت له مخالفة فيما شار علي شيخه، فيجب أن يقر بذلك بين يديه في الوقت، ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيخه عقوبة له على جنائته ومخالفته، إما بسفر يُكلفه، أو أمر ما يراه.

ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى، وما لم يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجوز لشيخ أن يلقنه شيئاً من الأذكار، بل يجب أن يقدم التجربة له، فإذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحيث يشترط عليه أن يرضي بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء، فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرر والذل، والفقر والأسقام والآلام، وأن لا ينجح بقلبه إلى السهولة، ولا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات، ولا يؤثر الدعة، ولا يستشعر الكسل فإن وقفة المريد شر من فترته.

والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها، والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل.

وكان مرید وقف في ابتداء إرادته لا یجیء منه شیء.

فإذا جر به شیخه، فیجب علیه أن یلقنه ذکرًا من الأذکار علی ما یراه شیخه فیأمره أن یذكر ذلك الاسم بلسانه، ثم یأمره أن یرتوي قلبه مع لسانه، فیقول له: اثبت علی استدامة هذا الذکر كأنک مع ربک أبدأ بقلبك، ولا یجری علی لسانک غیر هذا الاسم ما أمکنک ثم یأمره أن یكون أبدأ فی الظاهر علی الطهارة، وأن لا یكون نومه إلا غلبة، وأن یقلل من غذائه بالتدریج شیئاً بعد شیء حتی یقوی علی ذلك، ولا یأمره أن یترك عادته بمرة، فإن فی الخبر: "إنَّ المنيث لا أرضا قطع، ولا ظهراً أبقى".

ثم یأمره بإیثار الخلوة والعزلة، ویجعل اجتهداه فی هذه الحالة لا محالة فی نفی الخواطر الدنیة والهواجس الشاغلة للقلب. واعلم، أن فی هذه الحالة قلما یخلوا المرید فی أوان خلوته فی ابتداء إرادته من الوسوس فی الاعتقاد، لا سیما إذا كان فی المری کیاسة قلب، وقلَّ مریدٌ لا تستقبله هذه الحالة فی ابتداء إرادته.

وهذه من الامتحانات التي تستقبل المریدین، فالواجب علی شیخه إن رأى فیہ کیاسة، أن یحمله علی الحجب العقلیة، فإن بالعلم یتخلص لا محالة المتعرف مما یعتریه من الوسوس.

وإن تفرس شیخه فیہ القوة والثبات فی الطریقة أمره بالصبر واستدامة الذکر حتی تسطع فی قلبه أنوار القبول، وتطلع فی سره شمس الوصول، وعن قریب یكون ذلك.

ولكن لا یكون هذا إلا لأفراد المریدین، فأما الغالب فأن تكون

معالجتهم بالرد إلى النظر، وتأمل الآيات بشرط تحصيل علم الأصول على قدر الحاجة الداعية للمريد.

واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب، وذلك أنهم إذا خلوا في مواضع ذكرهم، أن يكونوا في مجالس سماع، أو غير ذلك فيهجس في نفسه ويخطر، بباهم أشياء منكراً، يتحققون أن الله، سبحانه، منزّه عن ذلك، وليس تعتريهم شبهة في أن ذلك باطل، ولكن يدوم ذلك، فيشتد تأذيه به، حتى يبلغ ذلك حداً يكون أصعب شتم وأقبح قول وأشنع خاطر، بحيث لا يمكن للمريد إجراء ذلك على اللسان، وإبداء لأحد، وهذا أشد شيء يقع لهم. فإلوجب عند هذا ترك مبالاتهم بتك الخواطر، واستدامة الذكر، والابتغال إلى الله باستدفاع ذلك.

وتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطان، وإنما هي من هواجس النفس، فإذا قابلها للعبد بترك المبالاة بها ينقطع ذلك عنه. ومن آداب المريد، بل من فرائض حاله، أن يلازم موضع إرادته، وأن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق، وقبل الوصول بالقلب إلى الرب، فإن السفر للمريد في غير وقته سم قاتل، ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير وقته.

وإذا أراد الله بمريد خيراً ثبتته في أول رادته، وإذا أراد الله بمريد شراً رده إلى ما خرج عنه من حرفته أو حالته، وإذا أراد الله بمريد محنة شرّده في مطارح غربته.

هذا إذا كان المريد يصلح للوصول: فأما إذا كان شاباً طريقته الخدمة في

الظاهر بالنفس للفقراء، وهو دونهم في هذه الطريقة رتبة، فهو وأمثاله يكتفون بالترسم في الظاهر، فينقطعون في الأسفار. وغية نصيبهم من هذه الطريقة حِجَّات يحصلونها، وزيارات لموضع يُرتحل إليه، ولقاء شيوخ بظاهر سلام، فيشاهدون الظواهر، ويكتفون بما في هذا الباب من السير، فهؤلاء الواجب لهم دوام السفر، حتى لا تؤديهم الدعة إلى ارتكاب محذور فإن الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان في معرض الفتنة.

وإذا توسط المريد جمع الفقراء والأصحاب في بدايته فهو مضر له جداً، فإن امتحن واحد بذلك فليكن سبيله احترام الشيوخ، والخدمة للأصحاب، وترك الخلاف عليهم، والقيام بما فيه راحة الفقير، والجهد في أن لا يستوحش منه قلب شيخ.

ويجب أن يكون في صحبته مع الفقراء أبداً خصمهم على نفسه، ولا يكون خصم نفسه عليهم، ويرى لكل واحد منهم عليه حقاً واجباً، ولا يرى لنفسه واجباً على أحد.

ويجب أن لا يخالف المريد أحداً، وإن علم أن الحق معه يسكت، ويظهر الوفاق لكل أحد.

وكل مريد يكون فيه ضحك ولجاج ومماراة فإنه لا يجي منه شيء!! وإذا كان المريد في جمع من الفقراء، إما في سفر أو حضر، فينبغي أن لا يخالفهم في الظاهر، لا في أكل ولا صوم ولا سكون ولا حركة، بل يخالفهم بصره وقلبه، فيحفظ قلبه مع الله عزَّ وجلَّ، وإذا أشاروا عليه بالأكل، مثلاً، يأكل لقمة أو لقمتين، ولا يعطى نفس شهوتها.

وليس من آداب المريدين كثرة الأوراد في الظاهر، فإن القوم في مكابدة

إخلاء خواطرهم، ومعالجة أخلاقهم، ونفى الغفلة عن قلوبهم، لا في تكثير أعمال البر. والذي لا بد لهم منه إقامة الفرائض والسنن الراتبة. فأما الزيادة من الصلوات النافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم. ورأس مال المرید: الاحتمال عن كل أحد، بطيبة النفس، وتلقي ما يستقبله بالرضا، والصبر على الضر والفقر، وترك السؤال والعارضة في القليل وكثير فيما هو حظ له.

ومن لم يصبر على ذلك فليدخل السوق، فإن من اشتهى من يشتهي الناس، فالواجب أن يحصل شهوته من حيث يحصلها الناس: من كد اليمين، وعرق الجبين... وإذا التزم المرید استدامة الذكر وآثر الخلوة فإن وجد في خلوته ما لم يجده قبله إما في النوم وإما في اليقظة، أو بين اليقظ. والنوم من خطاب يسمع، أو معنى يُشاهد مما يكون نقضاً للعادة، فينبغي أن لا يشتغل بذلك البتة، ولا يسكن إليه، ولا ينبغي له أن ينتظر حصول أمثال ذلك، فإن ذلك كله شواغل عن الحق سبحانه.

ولابد له في هذه الأحوال من وصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبه فارغاً عن ذلك.

ويجب على شيخه أن يحفظ عليه سره، فيكتم عن غيره أمره، ويصغر ذلك في عينه، فإن ذلك كله اختبارات والمساكنة إليها مكر، فليحظر المرید عن ذلك، وعن ملاحظتها، وليجعل همته فوق ذلك.

واعلم أن أضر الأشياء بالمرید: استئناسه بما يلقي إليه في سره من تقریبات الحق سبحانه له، ومنته عليه بأني خصصتك بهذا وأفردتك عن

أشكالك، فإنه لو قال بترك هذا فعن قريب سيختطف عن ذلك مما يبدو له من مكاشفات الحقيقة.

وشرح هذه الجملة بإثباته في الكتب متعذر.

ومن أكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به في موضعه أن يهاجر إلى من هو منصوب في وقته لإرشاد المريدين، ثم يقيم عليه، ولا يبرح عن سدّته إلى وقت الإذن.

واعلم أن تقديم معرفة رب البيت - سبحانه - على زيارة البيت واجب، فلولاً معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت، والشبان الذين يخرجون إلى الحج ثم زيارة البيت من هؤلاء القوم من غير إشارة إلى الشيوخ فهي بدلالات نشاط النفوس، فهم متوسمون بهذه الطريقة، وليس سفرهم على أصل.

ALL RIGHTS RESERVED

والذي يدل على ذلك: أنه لا يزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلوبهم، فلو أنهم ارتحلوا من عند أنفسهم بخطوة لكان أحظه لهم من ألف سفرة.

Ali Centre, Subinbazar, Sylhet

ومن شرط المريد إذا زار شخصاً أن يدخل عليه بالحرمة، وينظر إليه بالحشمة، فإن أهله الشيخ لشيء من الخدمة عدّ ذلك من جزيل النعمة.

ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة بل الواجب أن يزوهم وأحوالهم؛ فيحسن بهم الظن ويراعى مع الله تعالى حده فيما يتوجه عليه من الأمر.

والعلم كافية في التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلول.

فصل

وكلُّ مرید بقي في قلبه لشيء من عروض الدنيا مقدار وخطر قاسم الإرادة له مجاز.

وإذا بقي في قلبه اختيار فيما يخرج عنه من معلومه فيريد أن يخص به نوعاً من أنواع البرّ، أو شخصاً دون شخص، فهو متكلف في حاله، وبالخطر أن يعود سريعاً إلى الدنيا، لأن قصد المرید في حذف العلائق الخروج منها، لا السعي في أعلى البر.

وقيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله، وقنيتة، ثم يكون أسير حرفة.

وينبغي أني ستوي عنده وجود ذلك وعدمه، حتى لا ينافر لأجله فقيراً، ولا يضايق به أحداً، ولو مجوسياً.

فصل

ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غبّ ذلك، ولو بعد حين. ومن خذل بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته، وذلك لا يخطيء.

فصل

من أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ: ذلك عبدٌ أهانه الله عزّ وجل وخذل، بل عن نفسه شغله، ولو بألف ألف كرامة أهله.

وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر تلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق!! وأصعب من ذلك: تهوين ذلك على القلوب، حتى يعد ذلك يسيراً، وقد قال الله تعالى: "وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم".

وهذا الواسطي رحمه الله، يقول: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء

الأنتان والجيف.

سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت أبا عبد الله الحصري يقول: سمعت فتحاً الموصلي يقول: صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقى إياهم، وقالوا لي: اتق معاشرَةَ الأحداث ومخالطتهم.

ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق، وأشار إلى أن ذلك من بلاء الأرواح وأنه لا يضرّ، وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد، وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ، لما كان الأولى بهم إسبال الستر عن هناتهم وآفاتهم، الصادرة منهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر فليحذر المريد من مجالسة الأحداث، ومخالطتهم؛ فإنه ليسير منه فتح باب الخذلان، وبدء حال الهجران. ونعوذ بالله من قضاء السوء.

فصل

ما يتداخل النفس من خفيّ الحسد للإخوان والتأثر بما يفرد الله عز وجل به أشكاله من هذه الطريقة، وحرمانه إياه ذلك. وليعلم أن الأمور قِسَم، وإنما يتخلص العبد عن هذا باكفائه بوجود الحق، وقدمه عن مقتضى جوده ونعمه. فكل من رأى أيها المريد قَدَم الحق، سبحانه، رتبته فأحمل أنت غاشيته؛ فإن الظفراء من القاصدين على ذلك استمرت سنتهم.

فصل

من حق المريد إذا اتفق وقوعه في جمع إثارة الكل بالكل فيقدم الجائع والشبعان على نفسه، ويتلمذ لكل من أظهر عليه التشيخ، وإن كان هو

أعلم منه، ولا يصل إلى ذلك إلا بتبريه عن حوله وقوته، وتوصله إلى ذلك بطول الحق ومنته.

فصل

فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار ألبتة؛ فإن ورد عليه وارد حركة لم يكن فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر فإذا زالت الغلبة يجب عليه القعود والسكون، فإن استدام الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة وضرورة لم يصح، فإن تعود ذلك يبقى متخلفاً لا يكشف بشيء من الحقائق، فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه.

وفي الجملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله، مريداً كان أو شيخاً، إلا أن تكون بإشارة من الوقت، أو غلبة تأخذه عن التمييز. فإن كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته فلا بأس إذا كان الشيخ ممن له حكم على أمثاله.

وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة فيساعدتهم في القيام، وفي أداء مالا يجد منه بداً مما يراعى عن الاستيحاش لقلوبهم.

ثم إن صدقه في حاله يمنع قلوب الفقراء من سؤا لهم عند المساعدة معهم. وأما طرح الخرقة فحق المريد أن لا يرجع في شيء منه ألبتة، اللهم إلا أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه، فيأخذه على نية العارية بقلبه، ثم يخرج عنه بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ.

وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة، وعلم أنهم يرجعون فيها، فإن لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته وحرمته، وكان طريق هذا المريد أن لا يعود في الخرقة فالأحسن له أن يساعدهم في الطرح، ثم يؤثر به القول إذا

رجعوا هم فيها، ولو لم يطرح؛ فإنه يجوز إذا علم من عادة القوم أنهم يعودون فيما طرحوا فإن القبيح إنما هو سنتهم في العود إلى الخرق، لا في مخالفته لهم. على أن الأولى الطرح على الموفقة، ثم ترك الرجوع فيه. ولا يسلم للمريد ألبتة التقاضي على القول؛ لأن صدق حاله يحمل القول على التكرار، ويحمل غيره على الاقتضاء. ومن تبرك بمريد فقد جار عليه، لأنه يضره لقلّة قوته، فالواجب على المريد ترك تربية الجاه عند من قال بتركه وإثباته.

فصل

أو معلوم، أو صحبة حدث، أو ميل إلى امرأة، أو استنامة إلى معلوم، وليس هناك شيخ يدلّه على حيلة يتخلص بها من ذلك، فعند ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع، ليشوش على نفسه تلك الحالة. ولا شيء أضر بقلوب المريدين من حصول الجاه لهم قبل خمود بشريتهم. ومن آداب المريد: أن لا يسبق علمه في هذه الطريقة منازلته. فإنه إذا تعلم سير هذه الطائفة، وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحقّقه بها بالمنازلة والمعاملة بعد وصوله إلى هذه المعاني ولهذا قال المشايخ: إذا حدّث العارف عن المعارف، فجَهَلْوه، فإن الاخبار عن منازل دون المعارف.

ومن غلب علمه منازلته فهو صاحب علم، لا صاحب سلوك.

فصل

أن لا يتعرضوا للتصدر، وأن يكون لهم تلميذاً ومريداً فإن المريد ذا صار مراداً، قبل خمود بشريته وسقوط آفته، فهو محجوب عن الحقيقة، لا تنفع

أحداً إشارته وتعليمه.

فصل إذا خدم المريد الفقراء فخواطر الفقراء أرسلهم إليه. فلا ينبغي أن يخالف المريد ما حكم به باطنه عليه من الخلوص في الخدمة، وبذل الوسع والطاقة.

فصل شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه. وأن يعتقد أنه يبذل روحه في خدمتهم. ثم لا يحمدون له أثراً. فيعتذر إليهم من تقصيره. ويقر بالجناية على نفسه؛ تطبيقاً لقلوبهم.

وإن علم أنه بريء الساحة، وإذا زادوه في الجفاء، فيجب أن يزيدهم في الخدمة والبر.

سمع الإمام أبا بكر بن فورك يقول: إن في المثل: "إذا لم تصبر على المطرقة فلماذا كنت سندناً". وفي معناه أنشدوا:

ربما جثته لأسلفه العذر... لبعض الذنوب قبل التجني

فصل حفظ آداب الشريعة بناء على هذا الأمر وملاكه على حفظ آداب الشريعة وصون اليد عن المدّ إلى الحرام والشبهة، وحفظ الحواس عن المحظورات، وعدّ الأنفاس مع الله تعالى عن الغفلات، وأن لا يستحل مثلاً سمسمة فيها شبهة في أوان الضرورات فكيف عند الاختيار، ووقت الراحة؟! ومن شأن المريد دوام المجاهدة في ترك الشهوات، فإن من وافق شهوته عدّم صفوته.

وأقبح الخصال بالمريد رجوعه إلى شهوة تركها لله تعالى.

فصل حفظ العهود مع الله تعالى من شأن المريد حفظ عهوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق الإرادة كالردة عن الدين لأهل الظاهر.

ولا ينبغي للمريد أن يعاهد الله تعالى على شيء باختياره ما أمكنه، فإن في لوازم الشرع ما يستوفي منه كل وسع: قال الله تعالى في صفة قوم: "ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها".

فصل من شأن قصر الأمل فإن الفقير ابن وقته. فإذا كان له تدبير في المستقبل، وتطلع لغير ما هو فيه من الوقت، وأمل فيما يستأنفه لا يجيء منه شيء.

فصل أن لا يكون له معلوم وإن قل من شأن المريد أن لا يكون له معلوم وإن قل ولا سيما إذا كان بين الفقراء؛ فإن ظلمة المعلوم تطفىء نور الوقت. فصل ترك قبول رفق النسوان من شأن المريد، بل من طريقة سالكي هذا المذهب: ترك قبول رفق النسوان، فكيف التعرض لاستجلاب ذلك؟! وعلى هذا درج شيوخهم، وبذلك نفذت وصاياهم. ومن استصغر هذا، فعن قريب يلقي ما يفتضح فيه.

فصل التباعد عن أبناء الدنيا من شأن المريد: التباعد عن أبناء الدنيا. فإن صحبتهم سم مجرب!! لأنهم ينتفعون به وهو ينتقض بهم، قال الله تعالى: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا". وأن الزهاد يخرجون المال عن الكيس تقرباً إلى الله تعالى، وأهل الصفاء يخرجون الخلق والمعارف تحقيقاً بالله تعالى.

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، رضي الله تعالى عنه: فهذه وصيتنا إلى المريدين، نسأل الله الكريم لهم التوفيق، وأن

لا يجعلها وبلاً علينا.

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة في أوائل سنة: ثمان وثلاثين وأربعمائة،
نسأل الله الكريم أن لا يجعلها حجة علينا ووبلاً، بل تكون لنا وسيلة
ونوالاً، إنَّ الفضل منه مألوف، وهو بالعفو موصوف.

والحمد لله حقَّ حمده، وصلواته، وبركاته، ورحمته على رسوله سيدنا النبيِّ
الأُمِّي وآله الطاهرين، صحبة الكرام المنتخبين، وسلم تسليماً كثيراً.

অনুবাদ: শায়খ ও ইমাম [কুশায়রী রাহ.] বলেন: “আমরা সুফিয়ায়ে কিরামের
জীবনী থেকে কিছু ঘটনাবলীর বর্ণনা ও একে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছি সুফিদের
রাস্তায় আধ্যাত্মিক স্তরসমূহের উপর অধ্যায়াবলী উপস্থাপন করে। আমরা এ
রিসালাতটির সমাপ্তি টানবো সুফি রাস্তার সালিকদের প্রতি কিছু আধ্যাত্মিক
উপদেশ [ওয়াসিয়াত] দ্বারা। এই উপদেশগুলো সঠিকভাবে পালনের তাওফিক
কামনা করছি আল্লাহ তা’আলার দরবারে। আমরা এটাও আবদার জানাই তিনি
যেনো এগুলো পালনে তাদেরকে অক্ষম করেন না। তিনি যেনো এসব
উপদেশকে আমাদের জন্য হিদায়াতের পরিপন্থী হিসাবে সাব্যস্ত না করেন
[অর্থাৎ: ভুল-ত্রুটি যদি হয়ে যায়]।”

সুফি রাস্তার একজন সালিকের প্রথম পদক্ষেপ হলো, তাকে অবশ্যই আন্তরিক
হওয়া চাই। ফলে সে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হবে।
সুফি মাশাইখে আজম [এ ব্যাপারে] বলেছেন: “তারা আল্লাহ তা’আলার নৈকট্যে
পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন এ কারণে যে, তারা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে উপেক্ষা
করেছেন।” অনুরূপ বক্তব্য আমি আমার শায়খ হযরত আবু আলী দাঙ্কাক
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকেও শ্রবণ করেছি: “সুফি রাস্তার শুরুতেই প্রয়োজন
হয় সঠিক ঈমানের যাতে করে বান্দা এবং প্রভুর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।
অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা চাই। চাই মুক্ত থাকতে
প্রতারণা ও বিদআত থেকে। বিশ্বাস রাখতে হবে এ রাস্তার মূলে আছে অকাট্য
প্রমাণাদি ও যুক্তি।”

তাসাওউফের এ রাস্তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোনো জ্ঞানার্জনের প্রতি মুরীদের আকর্ষণ হবে বিদ্রোহের সামীল। যারা সঠিক সুফি তরীকা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের শিক্ষাকে কোনো নতুন সালিক যদি গ্রহণ করে, তাহলে বুঝতে হবে সে এ রাস্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণে এরূপ হয়েছে। কারণ সুফি তরীকা সম্পর্কিত তাঁদের বিশ্বাস ও শিক্ষার সমর্থনে সুস্পষ্ট যুক্তিতর্ক ও দলিলাদি রয়েছে যা অপরদের তুলনায় বেশি স্পষ্ট। মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত: তারা হয় প্রাপ্ত জ্ঞান [নাকুল] এবং সনদসমৃদ্ধ বর্ণনার [আছার] অনুগামী, না হয় তারা যুক্তি [আকুল] এবং ধারণাভিত্তিক [ফিকর] জ্ঞানের সমর্থক। সুফি সম্প্রদায়ের মাশাইখরা [তা'ইফা] সবকিছুর উর্ধ্বে আরোহণ করেছেন। যেসব বিষয় অন্যরা অজানা বলে মনে করেন, তাঁদের নিকট ওগুলো সুস্পষ্ট [সত্য]। যে জ্ঞান আহরণের জন্য অন্যরা শুধুমাত্রা অভিকাজ্জী, তাঁদের নিকট ওগুলো [আহরণ] আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বাস্তবতা। তাঁরা হলেন ওসব ব্যক্তি যারা পৌঁছিয়েছেন [আল্লাহর উপস্থিতিতে], আর বাকিরা পথপ্রদর্শিত হন তর্কভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে। তাঁরা [উচ্চ পর্যায়ের সুফিরা] কবির ভাষায় বলেন:

আমার রাত ভোরের আভায় পরিণত হয়েছে, তোমার মুখশী হেতু
আর এ রাতের অন্ধকার অপরদের মাঝে বিস্তৃত হয়েছে
তারা আবৃত আছে অন্ধকারের ছায়া দ্বারা
আর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি দিনের উজ্জ্বল আলোতে।

ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো যুগ এ [সুফি] সম্প্রদায়ের উচ্চতর কোনো শায়খ ছাড়া অতিক্রান্ত হয় নি, যিনি তাওহীদের উপর নিপুণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। প্রত্যেক যুগের সর্বাধিক বড়ো ফকীহ সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ওয়ালির কাছে নিজের গৌণতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দু'আ চেয়েছেন। যদি ওসব সুফিয়ায়ে কিরামের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলী বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে অবশ্যই যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ফকীহ দ্বারা এরূপ আনুগত্য সম্ভব হতো না।

একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এসময় [সুফি] হযরত শাইবান রায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাশরিফ আনলেন। ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বললেন: “ইয়া আবু

আবদুল্লাহ! তাঁর [আগত ব্যক্তির] জ্ঞানের স্বল্পতার প্রতি আপনার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক [তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো আগন্তকের মধ্যে যে হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান নেই তা প্রদর্শন করা]।” ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে সাথে বললেন: “এ কাজ করো না!” কিন্তু ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই উপদেশ অমান্য করে হযরত শাইবান রায়ীকে [ঠেকানোর উদ্দেশ্যে] প্রশ্ন করলেন: “বলুন তো, কেউ যদি ভুলে কোনো ফরয নামাজ কাজা করে এবং তার মনে থাকে না কোন্ ওয়াক্তের নামায কাজা হয়েছে, তাহলে সে কি করবে?” হযরত শাইবান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: “ইয়া আহমদ! এটা এমন একটি অন্তর যা আল্লাহ তা’আলাকে অবহেলা করেছে! সুতরাং এ অন্তরকে শিক্ষা দেওয়া জরুরী, যাতে সে কখনো তার প্রভুকে কোনোদিন এভাবে অবহেলা না করে!” একথা শুনে হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। হুঁশ ফিরে আসার পর ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “আমি বলি নি, তাঁকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকো!” উল্লেখ্য হযরত শাইবান রায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উম্মি ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতো একজন উম্মি সুফির স্তর যদি এরূপ উচ্চ পর্যায়ে হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের নেতারা [সুফি মাশাইখে আজম] কোন্ স্তরে উপনীত আছেন, তা শুধু ধারণা করা যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির [তাসাওউফের] ওয়াজ-মাহফিল ও যুগের এক বিখ্যাত ওয়ায়েজ হযরত আবু ইমরান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজ-মাহফিল পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হতো। যখনই শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াজ করতেন তখনই হযরত আবু ইমরান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শ্রোতারাও এসে যোগ দিতেন। একদিন হযরত শিবলীকে লজ্জায় ফেলার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি মহিলাদের হায়েজ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলো। তিনি হায়েজ সম্পর্কে শরীয়তের সকল গ্রহণীয় ও পরিত্যক্ত দলিলাদি বর্ণনা করলেন। তাঁর এ বর্ণনা শুনে হযরত ইমরান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উঠে এসে হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কপালে চুমো খেলেন। বললেন: ‘ইয়া আবু বকর! আমি এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকে দশটি বক্তব্য শুনলাম যা ইতোমধ্যে আমি শুনি নি। আপনার বর্ণিত সবগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি সম্পর্কে জ্ঞাত আছি!’

একদিন [শাফিঈ ফকীহ] হযরত আবুল আব্বাস শুরাইজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওয়াজ মাহফিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, ‘হযরত! জুনাইদ সাহেবের ওয়াজ সম্পর্কে মন্তব্য করুন?’ তিনি বললেন: “আমি তো বুঝতে পারি নি, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বয়ানের মধ্যে আমি এমন এক [আধ্যাত্মিক] শক্তি অনুভব করেছি যা কোনো অলস ওয়াইজের মুখ থেকে কখনো বের হবার নয়।”

কেউ একজন হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ কুল্লাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন: “আপনি ইতোমধ্যে প্রায় সকল ফকীদের সঙ্গে বাহাস করেছেন। এবার হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে একটি বাহাস করলে কেমন হয়?” সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ হযরত জুনাইদের একটি ওয়াজ-মাহফিলে উপস্থিত হলেন। এক পর্যায়ে তিনি ‘তাওহিদ’ সম্পর্কে হযরত জুনাইদকে প্রশ্ন করলেন। তাঁর জবাব শুনে হযরত আবদুল্লাহ কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অনুরোধ করলেন: ‘আপনি যা বলছিলেন, দয়া করে আবার বলুন?’ এবার ভিন্নভাবে একই বর্ণনা তুলে ধরলেন হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। এবারও হযরত আবদুল্লাহ কথাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে বললেন: ‘আমি আপনার কথাগুলো এখনো বুঝতে সক্ষম হই নি, আপনি দয়া করে এগুলো লিখার জন্য আবার বলুন।’ হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: ‘আপনি যদি [এ সুফি রাস্তায় যেতে] প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমি বলছি।’ হযরত আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদীর মাহাত্ম্য। তিনি তাঁর সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় হলেন।

এই সম্প্রদায়ের ভিত্তিমূল খুব শক্ত। তাঁদের শায়খগণ মহাত্মন এবং তাঁদের ফকীগণ অতীব জ্ঞানবান। সুতরাং তরীকতের সালিকের মধ্যে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস আছে। সে যদি তাঁদের রাস্তায় চলে এবং কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছতে সচেষ্ট হয়, তাহলে গায়েব তত্ত্ব তার নিকট উন্মোচন হবে। তার কোনো প্রয়োজন হবে না, ওসব লোকের সঙ্গে মেলামেশার, যারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। সালিক যদি [পরহেজগার] পূর্বনির্দেশনের রাস্তায় চলার অভিকাজ্জী হয় এবং নিজের আধ্যাত্মিক স্তরের ব্যাপারে স্বাধীন না থাকে, যদি সে সত্যোপলব্ধি (তাহকিক্ব) অর্জনে অন্ধ অনুসরণের ক্ষেত্র থেকে বের হয়ে আসতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তরীকতের প্রতিষ্ঠাতাদের পদক্ষেপগুলোর অনুসরণ করতে হবে। এই

[সুফি] প্রজন্মের রাস্তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, কারণ এরা সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্ন করে বলেন: “আপনারা কি মনে করেন? [এই আধ্যাত্মিক] জ্ঞান ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের [কিতাবী আলিমদের] জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি হতে পারে?” হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি যদি জানতাম যে, এই জগতে আল্লাহ তা’আলা এমন কোনো জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন যা আমরা একত্রে আমাদের ভাইগণ ও সাথীরা শিক্ষা দিচ্ছি তার থেকেও উঁচুমানের, তাহলে অবশ্যই আমি এর প্রতি অভিকাজ্জী ও বিচেষ্টিত হতাম!”

সালিক যখন আল্লাহ ও তার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হবে, তখন তার জন্য উচিৎ হলো- নিজের তাহকিকের মাধ্যমেই হোক, বা কোনো বিজ্ঞ আলিমকে জিজ্ঞেস করেই হোক, শরীয়তের জরুরী বিষয়গুলো সঠিকভাবে জেনে নেওয়া যাতেকরে এগুলো পালনে সে দৃঢ় থাকতে পারে। যখন সে দেখবে [একই বিষয়ে] শরীয়তের নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, তখন তার জন্য উচিৎ হবে, সবগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণটি অনুসরণ করা। কোনো ধরনের ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। জরুরী কর্তব্যগুলো [রুখাস] থেকে অব্যাহতি শুধুমাত্র মা’জুরদের এবং যারা নিজেদের [জাগতিক] জরুরত ও কাজকর্মের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর এই [সুফি] সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি হলো, আল্লাহ তা’আলার হুকু আদায় ব্যতীত তাদের আর কেনো চিন্তা নেই। অতএব, তারা বলেন, যদি কোনো সুফি হাক্কিকাতের সারি থেকে সরে যেয়ে শরীয়তের প্রয়োজনীয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি অবলম্বন করে তাহলে সে আল্লাহ তা’আলার সঙ্গে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

এখন, মুরিদকে উত্তম আখলাক গঠনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে মুর্শিদ কর্তৃক। আর [উত্তম আখলাক] এটা ছাড়া সে কখনো সফল হবে না। হযরত আবু ইয়াজিদ বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “যার কোনো মুর্শিদ নেই, তার নেতা হলো শয়তান।” আমি শায়খ আবু আলী দাঙ্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “মালি ছাড়া যে বৃক্ষ গজে ওঠে তার থেকে পত্রাদি আসলেও, কখনো ফল আসে না। অনুরূপ, সালিকের যদি মুর্শিদ থাকেন না যিনি তাকে

শ্বাসে শ্বাসে শিক্ষা দিবেন ও পথনির্দেশ করবেন, তাহলে সে তার নিজের নফসের অনুসরণ করবে। সে কখনো তার আশান্বিত অবস্থায় উপনীত হতে পারবে না।” শিক্ষানবিস সালিক যদি সঠিক রাস্তায় পদচারণে আগ্রহী হয়ে থাকে, তাকে অবশ্যই বিচ্যুত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতে হবে এবং সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি [পাপকার্য] পরিহার করতে হবে- হোক তা বাহ্যিক কিংবা গোপন, ছোট কিংবা বড়ো। তাকে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আগ্রহশীল হতে হবে। কারণ যে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবে, সে এই রাস্তায় চলে কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

সুতরাং তাঁরা [অর্থাৎ তরীকতপন্থীরা] অগ্রসর হতে থাকেন সে পর্যন্ত, যখন তারা দুনিয়ার সকল আকর্ষণ ও বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া শুরু করেন। কারণ এ রাস্তার সফলতা নির্ভরশীল হৃদয়ের শূন্যতার মধ্যে। হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নতুন মুরিদ হুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেছিলেন: “যদি এক শুক্রবারে আমার সাথে সাক্ষাতের পর পরবর্তী শুক্রবারের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমার মনে ঢুকে পড়ে, তাহলে আমার সাথে আর সাক্ষাৎ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না।”

সালিক যখন জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করবে, তখন তার জন্য উচিৎ হলো প্রথমেই সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত হওয়া; সম্পদ মানুষকে আল্লাহ তা’আলা থেকে দূরে রাখে। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সালিক নেই যিনি জাগতিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত আছেন। যদি তিনি এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত থাকেন, তাহলে শীঘ্রই এটা তাকে টেনে পেছনে নিয়ে যাবে যা থেকে তিনি মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। সম্পদ থেকে আকর্ষণমুক্ত হওয়ার পর তার কাজ হলো সামাজিক স্তরকেও [জাহ] বিসর্জন দেওয়া। কারণ বড়ত্বের আকাঙ্ক্ষা হলো একটি বিরাট বাঁধা। অপর ব্যক্তির তাকে গ্রহণ না বর্জন করেছেন বা করবেন, এসব ব্যাপারে যদি সালিক চিন্তিত থাকে, তাহলে তার থেকে কোন ভালো কিছু বের হয়ে আসবে না। সর্বাধিক খারাপ যে বিষয়টি কোনো সালিকের জন্য ঘটতে পারে তাহলো, মানুষ তার প্রতি সমর্থিত চোখে দৃষ্টিপাত করে ও তার নিকট আশীর্বাদ চায়। কারণ সাধারণ মানুষ এসব ব্যাপারে কোনো ধারণাই রাখে না। অপরদিকে সালিক তো তখনো তার [আল্লাহপ্রাপ্তির] আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নি, সুতরাং তার নিকট আশীর্বাদ চাওয়া সঠিক হবে কি করে? তরীকতের সালিকদেরকে যশ-

খ্যাতির ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ এটা হলো তাদের জন্য সর্বাধিক মারাত্মক বিষ।

সম্পদ ও [সামাজিক] স্তরকে পরিত্যাগ করার পর সালিককে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার অঙ্গীকার পূরণে অগ্রসর হতে হবে। সে তার মুর্শিদের বিরোধিতা কখনো করবে না এবং তিনি তাকে যাকিছু আদেশ-নিষেধ করেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চলতে হবে। মুরিদ হওয়ার পর প্রথম থেকেই নিজের শায়খের নির্দেশাবলী অমান্য করা একটি গুরুতর হীনতা, কারণ প্রাথমিক স্তরেই বুঝা যায় বাকী জীবনের পথনির্দেশনা কি হবে। সফলতার একটি শর্ত হলো, মুরিদের হৃদয়ে শায়খের প্রতি অনীহা কখনো জাগ্রত হবে না। কোনো মুরিদ যদি মনে করে ইহ কিংবা পরজগতে তার কিছু মূল্য ও ক্ষমতা আছে, তাহলে তার জন্য এ রাস্তায় চলা যথাযোগ্য হবে না। কেউ শুধু তার প্রভুকে জানার চেষ্টা-সাধনা করবে, একই সময় ক্ষমতার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা বর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার চেষ্টা ও ক্ষমতা-বিত্ত-গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টার মধ্যে বিরাট তফাৎ বিদ্যমান- তা এ জগতে কিংবা পরজগতে হোক।

এরপর, সালিককে অবশ্যই তার সমগোত্রীয়দের কাছ থেকে নিজের গোপন বিষয়াদি লুকিয়ে রাখা চাই, শুধুমাত্র তার নিজের মুর্শিদ ছাড়া। যদি এক-শ্বাস পরিমাণও তার মুর্শিদের কাছ থেকে গোপন রাখে তাহলে সে সুহবতের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য হবে। মুর্শিদের কোনো নির্দেশের প্রতি সে যদি ভিন্নমত পোষণ করে থাকে, তাহলে তার উচিত হবে সাথে সাথে মুর্শিদকে অবগত করা। এরপর শায়খ যে সিদ্ধান্ত দেবেন তার প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে। তা হতে পারে তাঁর প্রতি দ্বিমত পোষণ ও সীমালঙ্ঘনের শাস্তি। এটা হতে পারে তার প্রতি মুর্শিদ কর্তৃক একটি [অবসানের] ভ্রমণের নির্দেশ কিংবা অন্য কোনো প্রায়শ্চিত্ত, যা মুর্শিদ মুরিদের জন্য সমোচিত বলে বিবেচনা করেন।

সালিকের ব্যর্থতা উপেক্ষা করার অধিকার মুর্শিদের নেই। কারণ এটা আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকারহানি ছাড়া আর কিছুই নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তরীকতের সালিক তার [পার্শ্ব] বিষয়ের প্রতি যুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুর্শিদ তার মধ্যে জিকিরের প্রবেশকরণ ক্রিয়া শুরু করতে পারবেন না। মুর্শিদ প্রথমে মুরিদকে পরীক্ষা করতে হবে। যখন মুর্শিদের হৃদয় এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তার মুরিদের নিয়ত সঠিক হয়েছে, তখন মুর্শিদকে সুফি রাস্তায় পাড়ি জমানেওয়াল্লা

এই সালিককে চুক্তির শর্ত হিসাবে আল্লাহপ্রদত্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য বলতে হবে। মুর্শিদ তার মুরিদের নিকট থেকে অঙ্গীকার অর্জন করতে হবে যে, সে যেনো কোনো অবস্থাতেই এই রাস্তা পরিহার না করে। এমনকি তার উপর কোনো আঘাত, অবমাননা, দারিদ্র্যতা, রোগ-ব্যাদি কিংবা কষ্ট-বেদনা পতিত হলেও তাকে অটল থাকতে হবে। তার হৃদয় যেনো সহজ পথের দিকে চলে দিগ্ভ্রান্ত না হয়। সে যেনো বিশ্বামের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে না পড়ে কিংবা অলসতায় বিজড়িত না হয়। কারণ সালিকের জন্য [রাস্তায় চলায়] স্থির হয়ে যাওয়া হলো শৈথিল্য থেকেও ক্ষতিকর।

শৈথিল্য ও স্থির থাকার মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটির অর্থ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা থেকে সরে আসা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ, অলসতার আনন্দানুভূতির আকাঙ্ক্ষায় রাস্তায় ভ্রমণের কাঠিন্যতা থেকে বিশ্রাম গ্রহণ। রাস্তায় চলার শুরুতেই যদি সালিক থেমে যায়, তাহলে সে ভালো কোনো প্রাপ্তির আশা করতে পারে না। মুর্শিদ কর্তৃক পরীক্ষা শেষে সালিককে তার যোগ্য অনুযায়ী আল্লাহর কোনো নামের জিকির জিহ্বার দ্বারা করার নির্দেশ দেবেন। তিনি তাকে বলবেন: “এই জিকিরটি নিজের সাথে সর্বদা রাখবে, যেনো তুমি হৃদয়ে সবসময় আল্লাহর সাথে থাকো। যদি তুমি পারো, তাহলে এই নাম ছাড়া তোমার জবান থেকে অন্য কিছু বের করবে না।” মুর্শিদ তাকে এটাও নির্দেশ দেবেন যে, সে যেনো সর্বদা নিজেকে পাক-পবিত্র রাখে। নিদ্রা থেকে বিরত থাকে যদি না অপারগ হয়ে পড়ে। সে খাবারের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে যতক্ষণ না কম খাওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হবে। প্রবাদ আছে: “ভ্রমণকালে যে তার সওয়ারী জন্তুকে নিরুদ্দেশ হতে দেয়, সে দূরত্ব অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়, না থাকে তার বহনের পিঠ [যার ওপর সামানা রাখা যায়]।”

মুর্শিদ এরপর তার মুরিদকে নির্দেশ দেবেন, সে যেনো একাকিত্ব ও নির্জনবাসের সন্ধানে থাকে। একই সময় এটাও বলে দেবেন, এ স্তরে থাকতে, সে যেনো বিতাড়িত জাগতিক চিন্তার প্রতি দ্রুক্ষেপ না করে। এছাড়া এটাও বলতে হবে, তার হৃদয় থেকে মনোযোগ নষ্টকারী তৎপরতা যেনো তাকে বাধাদান না করে।

জেনে রাখুন, শুরুর স্তরে সালিককে তার কাজিক্ত পথে চলাকালে সে কখনো দুষ্ট কানকথা থেকে মুক্ত নয় যা তার দৃঢ়-সংকল্পকে কলুষিত করে দিতে পারে।

বিশেষকরে যখন সে একটি সুদক্ষ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়। অতি অল্প সালিকই প্রাথমিক স্তরে এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় না। এগুলো হলো লোভ-লালসা যার সম্মুখীন সালিকরা সাধারণত হয়ে থাকে। মুর্শিদ যখন সালিকের মধ্যে সুদক্ষতার সন্ধান পাবেন, তখন তাকে যৌক্তিক প্রমাণাদির দিকে ধাবিত করা জরুরী। কারণ নিঃসন্দেহে, যে কেউ [ধর্মীয়] জ্ঞানার্জনের প্রতি অগ্রসর হয়, সে নিজেকে এর দ্বারাই দৃষ্ট কানকথা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে, যার প্রতি তাকে আহ্বান করা হয়। যখন শায়খ উপলব্ধি করবেন যে, সুফি রাস্তায় অগ্রসরের [জরুরী] শক্তি এবং দৃঢ়তা তার শিষ্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি তাকে ধৈর্যশীল হতে ও আল্লাহর নামের জিকির সর্বদা জারি রাখতে নির্দেশ দেবেন। এর ফলে অচিরেই তার অন্তঃস্থলে [আল্লাহর পক্ষ থেকে] তাকে গ্রহণ করার আলো হৃদয়কে নূরান্বিত করবে। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে সূর্যসমূহের আগমন ও উদয় ঘটবে। এসব ব্যাপার শুধুমাত্র অল্প সালিকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এদেরকে [সালিকদেরকে] শায়খরা ভাবনামূলক যুক্তি [নাযার] এবং ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা চিকিৎসা করে থাকেন। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে সালিককে তার নিজের প্রয়োজনমাত্মক দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির উপর জ্ঞানবান হতে হবে।

ALL RIGHTS RESERVED

জেনে রাখুন, উপরোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা যে কোনো সালিক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যখন তারা জিকিরের জন্য নির্জনে অবস্থান করে কিংবা সামান্য অংশগ্রহণ করে ইত্যাদি, তখন শুনতে পারে আত্মার মধ্যে কানকথা অথবা দোষণীয় চিন্তার উদ্বেগ হতে পারে। তবে তারা নিশ্চয়ই জানে, আল্লাহ তা'আলা এ সবকিছুর বহু উর্ধ্বে। তারা সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞাত, তাদের এ রাস্তা মিথ্যাবাদিতা নয়, কিন্তু উক্ত কানকথা হেতু তারা কঠিন সমস্যায় পড়ে যায়। এ পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে যে, তাদের উপর পতিত হয় সর্বাধিক কদাকার অভিশাপ, সর্বাধিক কদাকার পরোক্ষ ইঙ্গিত এবং সর্বাধিক কদাকার বীভৎস চিন্তা-ভাবনা। অথচ এসব ব্যাপার সালিক মুখে উচ্চারণ করতে কিংবা কারো সম্মুখে প্রদর্শনে অপারগ থাকে। এটা সালিকের জন্য সবচেয়ে গুরুতর সংকটজনক সমস্যা হতে পারে। এসময় তার উচিত হলো এরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করা ও নামায পড়া। বার বার তাঁর দরবারে আবদার করা যে, তিনি যেনো এ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

[উপরে বর্ণিত] এসব চিন্তা-ভাবনা কিন্তু শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আসে না। এগুলো মূলত নফসে আম্মারার তৎপরতা। তবে আল্লাহর বান্দা যদি এগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে শীঘ্রই এসব চিন্তার সমাপ্তি ঘটবে। যে কোনো সালিকের জন্য যেসব করণীয় ব্যাপার নির্দিষ্ট আছে- বা ওয়াজিব বলে বিবেচিত তার মধ্যে একটি হলো, সে সর্বদাই তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যাপারে দৃঢ় থাকবে। অন্যদিকে ভ্রমণে যাবে না, যতক্ষণ না তরীকতের রাস্তার উপর সে গ্রহণযোগ্যতা হাসিলে সমর্থ হয় এবং তাঁর হৃদয় প্রভুর উপস্থিতিতে পৌঁছুয়ে যায়। অসময়ে ভ্রমণ সালিকের জন্য মারাত্মক বিষ। যারা অসময়ে ভ্রমণে গিয়েছে, তারা কখনো তাদের কাক্ষিত মাক্বামে পৌঁছুয় নি। সালিকের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দরদমূলক ইচ্ছা থাকলে, তিনি তাকে শুরু থেকেই রাস্তার উপর দৃঢ় রাখেন। কিন্তু যদি তিনি তার প্রতি এরূপ ইচ্ছা না করেন, তাহলে তিনি তাকে বার বার প্রাথমিক অবস্থা ও কর্মে ফিরিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন সালিককে পরীক্ষা করার, তাহলে তিনি তাকে তাঁর থেকে দূরে বিচ্ছিন্নতার বিরানভূমিতে নির্বাসিত করবেন।

এখন, উপরোক্ত বিষয়গুলো এসব সালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা তাদের কাক্ষিত মাক্বামে পৌঁছার জন্য নির্ধারিত। অপরদিকে অনেক যুবক আছে যারা শুধুমাত্র দরবেশদের বহির-খাদিম হিসাবে যোগ্য। এরূপ ব্যক্তির তরীকতের স্তর অপরদের তুলনায় নিচে। সে এবং তার মতো অন্যান্যরা শুধুমাত্র সুফিদের বাহ্যিক আচার-আচরণকে অনুসরণ করে থাকে। তারা ভ্রমণের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। এই রাস্তায় সর্বাধিক যেটুকু প্রাপ্তি সম্ভব তাহলো, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা, ওসব জায়গায় যাওয়া যেখানে যেতে মানুষ আগ্রহী এবং বিভিন্ন সুফি শায়খের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সাক্ষাতলাভ। সুতরাং এরা শুধুমাত্র বাহ্যিক বিষয়-আসয় অবলোকন করে এবং এরূপ ধরনের ভ্রমণ দ্বারাই তারা সন্তুষ্ট। এরূপ ব্যক্তিদের উচিৎ হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণ করা, যাতে করে অলসতা এসে শরীয়তের বিধি-নিষেধ বিরুদ্ধ পাপের কাজ তাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়। কারণ, কোনো যুবক যখন বিশ্রাম ও অলসতার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন সে প্রবেশ করে ফিতনার ক্ষেত্রে। কোনো প্রাথমিক সালিকের জন্য উচ্চ পর্যায়ে সুফি শায়খদের সংস্পর্শে থাকা খুব ক্ষতিকর হতে পারে। তবে কাউকে যদি এভাবে সুহবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তার উচিৎ হলো, সুফি শায়খদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানপ্রদর্শন করা ও তাঁদের সহচরদেরকে খিদমাত করা, আর কখনো

তাদের নির্দেশাবলী অমান্য না করা এবং তাঁদেরকে আরামদানে চেষ্টা চালানো। এটাও কারো পক্ষে চেষ্টা চালানো উচিত যে সুফি শায়খের হৃদয়াকর্ষণ থেকে, সে যেনো বঞ্চিত না হয়। সুফি শায়খের প্রতি আচরণের একটি অংশ হলো নিজের ইচ্ছার ওপর তাঁর ইচ্ছার প্রতি অগ্রাধিকার দান এবং নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধাবিত না করা।

সালিক সর্বদাই নিজেকে শায়খের প্রতি ঋণী মনে করতে হবে এবং কখনো এটা ভাবতে নেই যে তিনি সালিকের ওপর কোনো ক্রমেই ঋণী আছেন বা হবেন। কোনো শায়খের সাথেই সালিক কখনো অসম্মত হবে না। এমনকি সে যদি মনে করে তার ধারণা সঠিক, তথাপি তাকে যেতে হবে সেটা সমর্থন করে। সালিক যদি হাসে কিংবা গোস্বাপ্রবণ ও তর্কবাজ হয় তাহলে সে কিছুই লাভ করতে পারবে না। যদি সালিক সুফি-দরবেশদের সংস্পর্শে আসে- তা ভ্রমণে বা কোনো মাহফিলে হোক, তার উচিত হবে তাঁদের কোনো বাহ্যিক আচরণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করা- তা হতে পারে খাবার, রোযা, বিশ্রাম কিংবা চলন-বলন সম্পর্কিত ব্যাপার। সে যদি অনুভব করে তার অভ্যন্তরস্থ নিজ কিংবা হৃদয় কোনো ব্যাপার মানতে রাজী নয় তাহলে তার উচিত হবে হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে রাখা। একটি দৃষ্টান্ত হলো- যেমন, তাঁরা তাকে খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানানেন, তখন তার উচিত হবে অতি অল্প কিছু খেয়ে নেওয়া এবং নফসে আম্মারাকে তার চাহিদা প্রদর্শন [বেশি খাবার খাওয়া] থেকে বিরত রাখা।

অনর্গল জাঁকজমকপূর্ণ সুফি বর্ণনার আবৃত্তি সালিকদের জন্য সঠিক আচরণ নয়। সুফিরা নিজেদের চিন্তার পবিত্রতা অর্জনে সাধনা করেন, চেষ্টা করেন নিজেদের নৈতিকতার উন্নয়ন ও হৃদয়ের গাফিলতি থেকে মুক্ত থাকতে। তাদেরকে [অর্থাৎ সালিকদেরকে] অবশ্যই শরীয়তের সকল নির্দিষ্ট আমল করে যেতে হবে, অনুসরণ করতে হবে সুন্নাতের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। নফল ইবাদত হিসাবে অবিরাম জিকরুল্লাহর মধ্যে ডুবে থাকাই সালিকের জন্য অতি উত্তম কাজ। সালিকের সর্বাধিক মূখ্য সৌভাগ্য হবে, সে যদি সকলকে সহ্য করতে সক্ষম হয় উত্তম হৃদয়ে; যাকিছুর মুখোমুখি হবে, তা সে সম্ভ্রষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে; যতো দুঃখ-বেদনা-কাঠিন্যতা ও দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হবে তা সে ধৈর্যসহ সহ্য করবে; এবং ছোট কিংবা বড় জিনিস যাই তার ভাগ্যে জুটে, তা গ্রহণ করতে হবে দাবী ও বিরোধিতা বিসর্জন করে। যদি সে এসব ব্যাপার বরদাশত করতে অপারগ হয়

তাহলে তাকে বাজারে ফিরে যেতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষ যাকিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সেও যদি তা-ই করে, তাহলে এগুলো অর্জন করতে হবে ওসব জায়গা থেকে যেখান থেকে সাধারণ মানুষ করে থাকে- অর্থাৎ তার হাতের পরিশ্রম ও শরীরের ঘর্ম দ্বারা অর্জন করতে হবে।

সালিক যখন অবিরত আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হবে এবং নির্জনবাসে চলে যাবে, সে সেখানে এমন কিছু জিনিস পেতে পারে যা ইতোমধ্যে সে কখনো দর্শন করে নি। এগুলোর আবির্ভাব নিদ্রাবস্থায় কিংবা জাগ্রতাবস্থায় অথবা উভয়টির মধ্যবর্তী অবস্থায় ঘটতে পারে। সে শ্রবণ করতে পারে অদ্ভুত কথোপকথন ও দেখতে পারে দৃশ্যাবলী যা অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। এসবের প্রতি তাকে কখনো নিজের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে নেই। এগুলোর মধ্যে কোনো শাস্তিবোধ তালাশ করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। এছাড়া এগুলোর আত্মপ্রকাশের জন্য লালায়িত হওয়াও তার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ, এগুলো তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতা'আলা থেকে দূরে থাকার নামান্তর। এসব ব্যাপার কিন্তু তার শায়খের [মুর্শিদে] নিকট অকপটে বলতে হবে। ফলে এগুলো দ্বারা ভারী হওয়া হৃদয় হালকা হয়ে যাবে।

মুর্শিদ অবশ্যই তার সালিকের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। অপর থেকে এগুলো দূরে রাখবেন এবং সালিকের দৃষ্টিতে এসব ব্যাপার মূল্যহীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কারণ এগুলো অবশ্যই পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলোর মধ্যে আস্তা স্থাপন হলো [আল্লাহর পক্ষ থেকে] একটি কৌশল মাত্র। সুতরাং সালিককে এসবের বিরোধিতায় সতর্ক থাকতে হবে। এসবের প্রতি অতি অল্পই দৃষ্টিপাত করা চাই। কারণ এর অতিরিক্ত তেমন কোনো গুরুত্ব এতে নেই।

জেনে রাখুন, সালিকের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর জিনিস হলো, আল্লাহর নৈকট্যের নিদর্শন অনুভব করে হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে আনন্দ বোধ করে: যেহেতু তার মধ্যে এরূপ চিন্তা জাগ্রত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন: “আমি বিশেষ দয়া তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি এবং তোমার সহচরদের মধ্যে তোমাকে আলাদা করে গ্রহণ করেছি।” অথচ, সে যদি এরূপ অভিভাবনাকে অগ্রাহ্য করে তাহলে বাস্তব উন্মোচনের মাধ্যমে সে দেখবে, তার স্তর আরো উন্নততর হয়েছে। গ্রন্থাদি দ্বারা, অবশ্যই, এসব ব্যাপার বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

সালিক যদি নিজের আবাসভূমির কাছে পথনির্দেশক কোনো শায়খকে না পায়, তাহলে তার জন্য কর্তব্য হবে যুগের কোনো প্রসিদ্ধ ওয়ালির সুহবতের লক্ষ্যে ভ্রমণ করা। তিনি অবশ্যই তার মতো সালিকদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানোর যোগ্যতা রাখবেন। তাকে এই উস্তাদের সুহবতে থাকতে হবে। কখনো তার কক্ষের দরোজা পেরিয়ে বাইরে যাবে না, একমাত্র ফরয নামায আদায়ের জন্য বের হওয়া ছাড়া।

জেনে রাখুন, ঘরের মালিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, ঘর দেখার চেয়ে বেশি মূল্যবান [কা'বা দেখা থেকে এ ঘরের মালিক আল্লাহকে জানা বেশি মূল্যবান]। কারণ আল্লাহর মা'রিফাত না থাকলে আল্লাহর ঘরকে দেখার জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হতো না। সুফি রাস্তায় ভ্রমণকারী যুবকদের মধ্যে যারা নিজেদের শায়খের অনুমতি ছাড়া হজ্জের ভ্রমণে যায়, মূলত তারা নিজেদের নফসে আশ্রয় করার অনুসরণ করে। এমনকি তারা হয়তো এ রাস্তার বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু তাদের ভ্রমণ মূলত ভিত্তিহীন। এর একটি নিদর্শন হলো, তারা যতো বেশি ভ্রমণ করে, তাদের অন্তর [প্রভু থেকে] ততো বেশি দূরে চলে যায়। অথচ নিজেদের নফসে আশ্রয় থেকে ক'টি মাত্র পদক্ষেপ দূরে যেতে পারাই হতো তাদের জন্য হাজার বার ভ্রমণের চেয়েও উত্তম।

সালিকদের যারা কোনো সুফি শায়খের সুহবতে থাকে, তাদেরকে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। দেখা হওয়ার মুহূর্তেই সে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন দেখাবে এবং বিনয়সহ দৃষ্টিপাত করবে। শায়খ যদি কোনো খিদমাতের জন্য নির্বাচন করেন তাহলে এটা তোমার জন্য সৌভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ [১]

সালিক কখনো সুফি শায়খকে অশান্তিসত্ত্বতার অধিকারী হিসাবে আরোপ করবে না। বরং তাঁদের অবস্থা [তাঁরা যেভাবে আছেন] তাঁদের প্রতিই ছেড়ে দেবে, তাঁদের সম্পর্কে সর্বদা ভালো ধারণা রাখবে এবং শায়খ কর্তৃক নির্দেশিত ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সকল আমল করে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানই হলো হালাল-হারামে পার্থক্য নির্ধারণে যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ [২]

এ জগতের যাকিছু বিষয়-আসয় প্রত্যেক সালিকের অন্তরে যেটুকু মূল্যবান ও গুরুত্ব হিসাবে অবশিষ্ট থাকে, তা [আল্লাহপ্রাপ্তির] আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রূপকাত্মকভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে ঐসব আনন্দদায়ক জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থেকে যাবে- যা সেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে, আর অপরদিকে একই সময় সে পরহেজগারী করবে কিংবা অপর কোনো ব্যক্তির সাথে কার্যাদি সারবে, তাহলে সে তার আসল অবস্থার প্রতি প্রত্যাহার করলো। এতে শিক্ষা থেকে যায় যে, সে এ জগতে [গাইরুল্লাহ] পুরনায় ফিরে আসতে পারে। অথচ সালিকের মূল লক্ষ্য হলো গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া। তার সংগ্রাম [লোকদেখানো] পরহেজগারী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এটা নিশ্চিতরূপে অনুপযোগী যে, কোনো সালিক প্রথমে নিজের বিষয়-সম্পদ ও উত্তরাধিকার বিসর্জন করে এই নতুন পেশায় জড়িত হবে। বরং, তার জন্য উচিত হলো এমন [আত্মিক] অবস্থায় উপনীত হতে চেষ্টা করা, যার দ্বারা সম্পদ থাকা বা না থাকা তার জন্য পার্থক্যহীন অনুভব হবে। ফলে সে একদিকে দরীদ্রদেরকে তার গরীবত্বের কারণে যেমন পরিহার করবে না, তেমনি অন্য কোনো মানুষকেই সে পীড়িত করা থেকে বিরত থাকবে- এমনকি সে যদি অগ্নিপূজকই হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ [৩]

যখন সুফি শায়খের হৃদয় কোনো সালিককে গ্রহণ করে নেয়, তখন বুঝতে হবে এটা হলো এই সালিক তার কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে পৌঁছার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপরদিকে যাকে তার শায়খের হৃদয় পরিত্যাগ করেছে, সে এর পরিণতি দেখবে, যদিও তা দেরিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কারো ভাগ্যে যদি থেকে থাকে যে, সে সুফি শায়খদের প্রতি অভদ্রমূলক আচরণ করবে, তাহলে [বুঝতে হবে] সে তার এই হীনাবস্থার সুস্পষ্ট নিদর্শন ইতোমধ্যে [রুহানী জগতে] প্রদর্শন করে এসছে।

অনুচ্ছেদ [৪]

তারুণ্যের সংস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো এই রাস্তার একটি গুরুতর মানসিক ক্লেশ। সুফি শায়খদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে এই পাপ দ্বারা ব্যথাতুর করে ফেলেন, তাহলে এ ব্যক্তি অপমানিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নি, বরং নিজেই পরিত্যাগ করেছে। এমনকি সে যদি হাজার হাজার কারামাত প্রকাশক

হয়ে থাকে তবুও সে পরিত্যক্ত; এমনকি সে যদি, একটি হাদিসের বর্ণনানুযায়ী, শুহাদার স্তরে উন্নীত হয়ে থাকে, তথাপি এটা সত্য নয় কি যে, তার হৃদয় একটি সাধারণ সৃষ্ট জীবীর আকর্ষণে ডুবে আছে? এর চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো, [তার] হৃদয় এটিকে তুচ্ছ ভাবে এবং এটা তার নিকট গুরুত্বহীন বিষয় বলে বিবেচিত হয়। [এ ব্যাপারে] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

অর্থাৎ: “তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল।” [নূর : ১৫]

হযরত ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [এ ব্যাপারে] বলেন: “যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো বান্দাকে অপমানিত করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা এবং মরদেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।”

আমি আবু আবদুল্লাহ সুফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত মুহাম্মদ বিন আহমদ নাযযার রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত আবু আবদুল্লাহ হুসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: আমি হযরত ফাতহুল মাওলিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “আমি ত্রিশ জন সুফি শায়খের সঙ্গ পেয়েছি। তাঁদের স্তর ছিলো আবদাল [প্রতিনিধি] পর্যায়ের। তাঁদের থেকে আলাদা হওয়ার মুহূর্তে প্রত্যেকেই আমাকে একটি মাত্র উপদেশ দেন: ‘যুবকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করো, তাদের সাথে মেলামেশা করবে না!’”

তবে অনেকে দাবী করেন, তারা কোন ধরনের দুষ্কর্ম করা থেকে বিরত থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এছাড়া কেউ কেউ বলেন, এটা হলো মানবাত্মার জন্য একটি পরীক্ষা এবং এতে কারো কোনো ক্ষতি হয় না। [প্রমাণ হিসাবে] তারা কিছু সুফি শায়খ কর্তৃক প্রবর্তিত ‘নিদর্শন’ [শাহিদ] ধারণাটির কথা বলেন [অর্থাৎ যুবক বা বালকদের মধ্যে ঐশি সৌন্দর্যের নিদর্শন বিদ্যমান]। তারা কিছু সুফি শায়খদের পাপযুক্ত আচরণের কাহিনী বর্ণনা করেন, যা সাধারণের থেকে গোপন রাখাই ছিলো আরো যথাযোগ্য। এরূপ কাথাবার্তা শিরকের কাছাকাছি ও কুফরের সমপরিমাণ হয়ে যায়। সুতরাং সালিককে অবশ্যই তারুণ্যের সঙ্গ কিংবা মেলামেশা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে অতি সহজেই পরিত্যাগ

ও প্রত্যাখ্যানের দরজা [তার জন্য] উন্মুক্ত হবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দুষ্কর আচরণে জড়িত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি চাই।

অনুচ্ছেদ [৫]

অপর আরেক গুরুতর পাপকার্যে যে কোনো সালিক জড়িয়ে যেতে পারে। তার [সুফি] ভাইদের প্রতি গোপন ঈর্ষা হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিতে পারে। এটার সৃষ্টি হতে পারে সাথীদের কারোর প্রতি তার [সুফি রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে] আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করার ফলে, যা থেকে সে নিজে বঞ্চিত আছে। তাকে জানা উচিত যে, যে যেটাই লাভ করুক না কেনো, এটা তারই [আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি] হিস্যা [কিসাম]। ঈর্ষা থেকে বান্দা নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও চিরন্তনতার বৈশিষ্ট্যকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকেও বেশি, সেটা অনুধাবনের মাধ্যমে। হে সালিক! যাকিছুই তুমি দেখছো তা সবই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। সুতরাং তাঁর থেকে আরোপিত বোঝা তুমি ধৈর্যসহ বহন করতে থাকো। বুদ্ধিমান [আল্লাহর] অনুসন্ধানীরা এ পন্থাই অনুসরণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ [৬]

সালিক যদি মানুষের সংস্পর্শে আসে তাহলে এটা তার জন্য অবশ্যকরণীয় যে, প্রত্যেকের প্রতি [নিজের থেকে বেশি] অগ্রাধির প্রদান করা। প্রতিটি মানুষের গুরুত্ব তার থেকে উর্ধ্বে রাখতে হবে, হোক তারা ক্ষুধার্ত কিংবা তৃপ্ত। মুর্শিদসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কেউ থাকলে তাঁর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে, এমনকি তুমি নিজে যদি ঐ ব্যক্তি থেকে আরো বেশি জ্ঞানবানও হয়ে থাকো। এরূপ স্তরে উপনীত হতে সালিককে নিজের ক্ষমতা ও ধীশক্তি থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসতে হবে। এ স্তরে পর্থনির্দেশিত হবে আল্লাহর ক্ষমতা ও হিতসাধন হেতু।

অনুচ্ছেদ [৭]

সালিককে যদি কোনো সামান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় তাহলে মনে রাখা দরকার যে, সে কখনো নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া [হারকাত - নাচানাচি] করবে না। তাকে শুধুমাত্র তখনই অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে, যখন কোনো ঐশি ইশারায় তার মধ্যে নড়াচড়ার সূত্রপাত ঘটে। এ ক্ষেত্রে খিয়াল রাখতে হবে যে, নড়াচড়ার প্রবাল্য যেনো [প্রাপ্ত] শক্তির মাত্রা [গ্বালাবা] থেকে বেড়ে না যায়। যেই মুহূর্তে

অনিয়ন্ত্রিত শক্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই তাকে নীরব হয়ে বসে যেতে হবে। অপরদিকে সে যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে নড়াচড়া করতে থাকে আত্মিক আনন্দ লাভের নিমিত্তে, তাহলে এটা সঠিক হবে না। যখন সে এসব বিষয়ে পারদর্শী হবে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে, তার প্রতি প্রবর্তিত ঐশি বাস্তবতাকে গোপন রাখতে পারবে, তখন তার জন্য হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব লাভ করা সঠিক হবে।

সাধারণত, নড়াচড়ার সাথে জড়িত সকলের উপরই একটি প্রতিক্রিয়া পড়ে। এ থেকে আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধা সালিক কিংবা শায়খ উভয়ের ক্ষেত্রেই সক্রিয় থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, এটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে কারো মরমি মুহূর্ত [ওয়াজ্ঞ] দ্বারা অথবা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি দ্বারা, যার ফলে ব্যক্তির উপলব্ধির ক্ষমতা [তামীজ] বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে, যদি স্বয়ং শায়খ তার মুরিদকে নড়াচড়ার নির্দেশ দেন, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ শায়খ তার মুরিদকে তামিল করার ক্ষমতা রাখেন। যদি [উচ্চ পর্যায়ের] সুফিরা সালিককে তাদের সঙ্গে নড়াচড়ায় যুক্ত হতে উপদেশ দেন, তাহলে [সালিককে] যোগ দেওয়া উচিত। যাকিছু প্রয়োজন তা আজাম দিয়ে সুফিদের হৃদয়াকর্ষণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে তাঁরা অসন্তুষ্ট না হন। যদি সালিকের আধ্যাত্মিক অবস্থায় ইখলাস বিদ্যমান থাকে, তাহলে যুক্ত হওয়ার পর উচ্চ পর্যায়ের সুফিদের হৃদয় তাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে।

সামা'র সময় জুব্বা ছুড়ে মারার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, সালিকের জন্য নিজেদের পরিত্যক্ত কিছুই ফিরে নেওয়া বৈধ নয়। তবে সুফি শায়খ নির্দেশ দিলে ভিন্ন কথা। সে অবশ্য নিয়ত করবে সাময়িকভাবে শায়খের নির্দেশ মানার জন্য তা নেবে, পরে এটা বিলিয়ে দেবে। ইতোমধ্যে সালিক যদি এমন সুফিদের সাক্ষাৎ পায় নি, যাদের অভ্যেস হলো সামা'র সময় জুব্বা ছুড়ে দেওয়া, তাহলে এটা তার জন্য উত্তম হবে, সে-ও তাঁদের অভ্যেসকে অনুসরণ করা এবং নিজের জুব্বা সামা' শিল্পীর প্রতি [কৃতজ্ঞতা ও বিনিময়ের নিদর্শন হিসাবে] নিবেদন করা, যদিও অপররা [নিবেদন করে] ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন না কেনো। অবশ্য সে যদি জুব্বা খুলে না দেয় তবুও সমস্যা নেই, কারণ সে জানে তাঁদের [সুফিদের] অভ্যেস হলো নিবেদন করেও ফিরিয়ে নেওয়া। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অভ্যেসের মধ্যে অনৌচিত্য বিদ্যমান। কিন্তু তাঁরা যা করেন তার বিরোধিতার মধ্যে অনৌচিত্য নেই। এরপরও, উত্তম হলো তাঁদের মতো নিজের জুব্বা নিক্ষেপ করা এবং [তাঁরা

নিলেও] ফিরিয়ে না নেওয়া। কোনো অবস্থাতেই সামা'র গায়কের নিকট কোনো কিছুই আবেদন সালিকের জন্য বৈধ হবে না। কারণ সালিকের আধ্যাত্মিক ইখলাসের ফলেই গায়ক কোনো সঙ্গীত পুনরায় গাইবে, একই সময় অপরদেরকে তাকে অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধও করবে।

যে কেউ কোনো সালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করে, সে তার প্রতি অবিচার করলো। কারণ, অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হেতু এটা তার ক্ষতি করবে। সুতরাং সালিকের জন্য জরুরী ব্যাপার হলো কারো সম্মুখে নিজের [আধ্যাত্মিক] অবস্থা উন্মোচন না করা, যাতে করে কেউ তার থেকে আশীর্বাদ কামনায় উদ্বুদ্ধ না হয়।

অনুচ্ছেদ [৮]

কোনো সালিককে [দুনিয়াবী] যশ, ধন-সম্পদের প্রচুর্য, যুবকদের সঙ্গ, কোনো মহিলার প্রতি আকর্ষণ অথবা আত্মতৃপ্তিমূলক বিশ্বাস যে, এই-এই তার রুজির সূত্র নিশ্চিত করেছে, ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হতে পারে। এমতাবস্থায় তাকে সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য নিজের মুর্শিদ কাছে না থাকলে তার উচিত হবে নিজের বাসস্থান ছেড়ে ভ্রমণ করা, যাতে করে এসব বিষয়ের প্রতি তার নফসের আকর্ষণে বাধার সৃষ্টি হয়। মানবিক স্বভাব বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত, সালিকের হৃদয়ের জন্য [দুনিয়াবী] যশ-খ্যাতির আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর আর কোনো কিছু নেই।

সুফি সালিকের জন্য একটি সঠিক আচরণ হলো, নিজের তরীকতের জ্ঞান তার বাস্তব আধ্যাত্মিক স্তরকে অতিক্রম করবে না। যদি সে সুফিদের তরীকা শিখে নেয় এবং বিষয়ের জ্ঞানার্জনকে এবং আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়াকে নকল ও প্রদর্শন করে, অথচ বাস্তবে সেখানে নয়, তাহলে এসব স্তরে সত্যিকার অর্থে উন্নীত হতে বিলম্ব হবে। এ কারণেই সুফিরা বলেন: “যখন কোনো মা'রিফাতপন্থী [উচ্ছ্বসিতভাবে] মা'রিফাতের আলাপ করে, জেনে রাখো, সে হলো অজ্ঞ!” কারণ, এটা হলো সরাসরি জ্ঞানলাভ ছাড়া মা'রিফাতের স্তরসমূহ নিয়ে বাক্যালাপ। যার জ্ঞান তার [মা'রিফাতের] স্তর থেকে উপরে, সে [বিমূর্ত] জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু [সুফি] রাস্তার পথিক নয়।

অনুচ্ছেদ [৯]

সঠিক আচরণের একটি প্রয়োজন হলো, সালিককে প্রাধান্য [তাছাদ্দুর] লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে নেই। এছাড়া মুরিদ করার আশাও পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ মুরিদ তার মানবিক স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে হাক্কিকাতের পর্দানোচনের স্তরে উন্নতী না হলে, তার নিকট মুরাদ [অভিকাঙ্ক্ষি] হওয়া অর্থহীন। এরূপ মুরিদ কর্তৃক উপদেশ ও নির্দেশনা থেকে কারো কোন উপকার হবে না।

অনুচ্ছেদ [১০]

কোনো সালিক যখন [উচ্চ পর্যায়ের] সুফিদের খিদমাত করবে, তখন জানা উচিত যে, তাঁদের মনের চিন্তা হলো তার জন্য বার্তাবাহক। সুতরাং, সালিক কখনো তাঁদের খিদমাতে আন্তরিকতা বিসর্জন দেবে না। সে যেনো তার নিজের অভ্যন্তরস্থ নিজ এর নির্দেশ মুতাবিক [তাঁদের খিদমাতে] চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ক্রটিহীন থাকে।

অনুচ্ছেদ [১১]

সালিক যদি সুফিদের খিদমাত করার আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাহলে ধৈর্যসহ সুফি শায়খদের কর্কষ ব্যবহারও মেনে নিতে হবে। এমনকি সে যদি মনে করে, তাঁদের খিদমাত করার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনো ক্রটি হচ্ছে না, তাঁরা কখনো তাকে এজন্য প্রশংসা করেন না, তথাপি সে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে নিজের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য। এরই মাধ্যমে তাঁদের হৃদয় অনেকটা শান্ত হবে। এসব কাজ করা তার জন্য উচিত, যদিও সে নিজে কোনো কিছুর জন্য দোষি না থাকে। তাঁরা যদি তার প্রতি কর্কষ ব্যবহার করতেই থাকেন, তবুও সে তাঁদের খিদমতে একনিষ্ঠ হবে ও ব্যাকুল থাকবে। আমি ইমাম আবু বকর বিন ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি: “একটি প্রবচন আছে: ‘তুমি যদি হাতুড়ির নিচে থাকতে ধৈর্যধারণে অপারগ হও, তাহলে কেনো প্রথমে কামারের নেহাই হতে চেয়েছিলে?’” এ কথাই অন্তরে পোষে সুফির আবৃত্তি করেন:

“আমি ক্ষণে ক্ষণে তার কাছে আসবো, তার প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করতে
ওসব পাপের জন্য যা আমি এখনো করি নি।”

অনুচ্ছেদ [১২]

এই বিষয়ের [তরীকতের] ভিত্তি ও নির্ধারিত হলো: শরীয়তের আইনকে সম্পূর্ণরূপে মানা; যাকিছু নিষিদ্ধ কিংবা সন্দেহযুক্ত তার দিকে হাত বাড়ানো থেকে বিরত

থাকা; নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিজের ইন্দ্রিয়কে সুরক্ষা রাখা; এবং একটি মাত্র শ্বাসও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল অবস্থায় বের না করা। যদি, প্রয়োজনের তাগিদের সময়ও, একটি তিল পরিমাণ বস্তুর উৎসমূল সন্দেহযুক্ত থাকলে অবৈধ বিবেচিত হয়, তাহলে [ভেবে দেখুন কিভাবে] মানুষ আরাম ও মুক্তভাবে পছন্দের সময় কিরূপ আচরণ করা উচিত?

যে কোনো সালিকের কর্তব্য হলো, সর্বদা নিজেকে আবেগপূর্ণ কামাসক্তি [শাহাওয়াত] পরিহার করার জন্য সচেষ্টিত থাকা। কারণ যে কেউ তার আবেগের অনুসরণ করে, সে তার পবিত্রতাকে জলাঞ্জলি দেয়। সালিকের মধ্যে সর্বাধিক কদর্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অতীতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিহার করার পর সে আবেগময়তায় প্রত্যাবর্তন করে।

অনুচ্ছেদ [১৩] *Khanqa-e-Aminia-Asgaria*

সালিকের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার অঙ্গীকার রক্ষা করা। তরীকতের রাস্তায় থাকাবস্থায় এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা [সালিকের জন্য] সাধারণ মানুষের স্বধর্ম ত্যাগের মতো। সালিককে কখনো নিজের মুক্ত ইচ্ছায় আল্লাহর সঙ্গে কোনো ধরনের [আমলী] প্রতিজ্ঞা করতে নেই। কারণ, শরীয়তের সীমার ভেতরই যে কোনো ব্যক্তির [আল্লাহর ইবাদাতের] সামর্থ্য নিহিত আছে। কিছু লোককে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ: “[বৈরাগ্যতা] তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করি নি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে, অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করে নি।” [সূরা হাদীদ : ২৭]

অনুচ্ছেদ [১৪]

সালিকের কর্তব্য হলো, ভবিষ্যতের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা না করা। কারণ দরবেশরা তো [‘বর্তমান ও এখন’ এর মধ্যে বাস করেনেওয়ালা] মুহূর্তের পুত্র। ঐ সালিকের কিছুই অর্জিত হবে না, যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে, তার [অবস্থার] বর্তমান মুহূর্তের বাইরে তাকায় এবং যাকিছু ঘটতে পারে তার প্রত্যাশা করে।

অনুচ্ছেদ [১৫]

সালিক এবং সুফি রাস্তার উপর ভ্রমণকারী সকলের কর্তব্য হলো, কোনো মহিলার নিকট থেকে অনুগ্রহ [সুনজর] লাভ থেকে বিরত থাকা- তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অব্বেষণ তো দূরের কথা। এটাই হলো সুফি সম্প্রদায়ের মাশাইখদের তরীকা। আর এটাই তাঁরা অপরকে আমল করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

অনুচ্ছেদ [১৬]

সালিকের কর্তব্য হলো দুনিয়াদার মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকা। কারণ তাদের সঙ্গ অব্বেষণ হলো সময়-পরীক্ষিত বিষ। তারা সালিক থেকে লাভবান হয়তো হবে ঠিকই, কিন্তু একই সময় সালিকের আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করবে। আল্লাহ সুবহাছ ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

অর্থাৎ, “যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।” [কাহাফ : ২৮]

যারা এ জগতকে প্রত্যাখ্যান করেছে [জুহুহাদ] তারা পকেট থেকে টাকা বের করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায়। অপরদিকে পবিত্র ব্যক্তির [আহলে সাফা - তথা সুফির] এই জগতের মানুষ ও তাদের অন্তরের [গাইরুল্লাহর] জ্ঞানকে উঠিয়ে নেন আল্লাহর হাক্কিকাত অর্জনের উদ্দেশ্যে।

শায়খ ও ইমাম আবুল কাসিম আবদুল করিম বিন হওয়াজিন কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সালিকের প্রতি আমাদের উপদেশ এটুকুই। আমরা দুয়ালু আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো তাদেরকে সফলতা দান করেন এবং তিনি যেনো এটি [উপদেশ] [হাশরের ময়দানো] আমাদের জন্য প্রতিবন্ধক না বানান। আমরা এই রিসালাত প্রণয়ন সম্পন্ন করেছি চারশত আটত্রিশ হিজরি সনের শুরুতে [১০৪৬ ঈসায়ী]। আমরা দুয়ালু আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, এটি যেনো আমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে খাড়া না হয়, এবং এর জন্য আমাদেরকে শাস্তি থেকে বিরত রাখেন। অপরপক্ষে, [আমরা প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করি] এটা যেনো আমাদের জন্য মুক্তির কারণ ও উপকারী হয়। অবশ্যই, তাঁর অনুগ্রহ তাঁরই জন্য খাস, চাওয়া ও ক্ষমার উৎস সর্বদা তাঁরই।

রিসালাতুল কুশাইরী (রাহ.)

আল্লাহর প্রশংসা করছি তাঁর প্রাপ্তি অনুসারে। তাঁর অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল, আমাদের উম্মী সর্দার, নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের] এবং তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও মহান আসহাবে কিরামের প্রতি! আল্লাহ যেনো তাঁদের সকলকে পর্যাণ্ডভাবে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন!”

সমাপ্ত

*Khanqa-e-Aminia-Asgaria
Ali Centre, Subidbazar, Sylhet*

ALL RIGHTS RESERVED

Ali Centre, Subidbazar, Sylhet